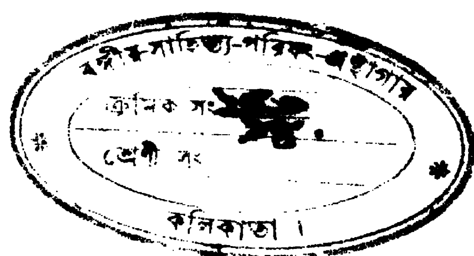
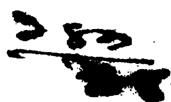




REGIRETED No. C. 192.

কৃষক

কৃষি, শিল্প, সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

চতুর্দ্দশ খণ্ড,—১ম সংখ্যা।

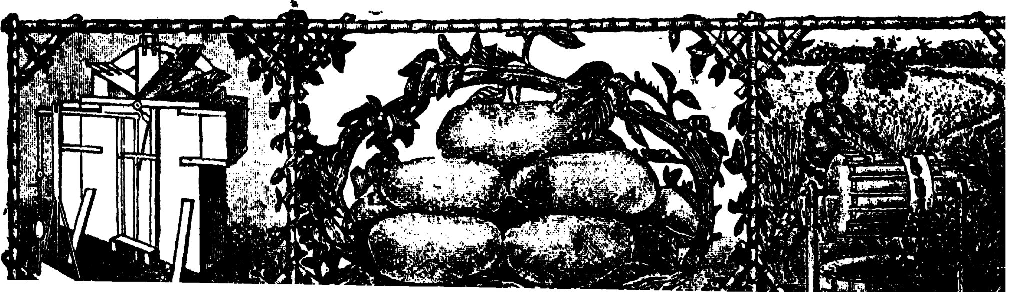


সম্পাদক—শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দত্ত, এম, আর, এ, এস্।

বৈশাখ, ১৩২০।

কলিকাতা; ১৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, ইণ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসয়েসন হইতে
শ্রীযুক্ত শশীভূষণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা; ১৯৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, দি মিলার প্রিণ্টিং ওয়াকস্ হইতে
শ্রীযুক্ত ভবতারণ মল্লিক দ্বারা মুদ্রিত।



কৃষক।

সূচীপত্র।

বৈশাখ, ১৩২০ সাল।

[লেখকগণের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন]

কৃষক।

পত্রের নিয়মাবলী।

"কৃষকে"র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ৵০ তিন আনা মাত্র।

আদেশ পাইলে, পরবর্ত্তী সংখ্যা ভিঃ পিতে পাঠাইয়া বার্ষিক মূল্য আদায় করিতে পারি। পত্রাদি ও টাকা ম্যানেজারের নামে পাঠাইবেন।

KRISHAK

Under the Patronage of the Governments of Bengal and E. B. and Assam.

THE ONLY POPULAR PAPER OF BENGAL

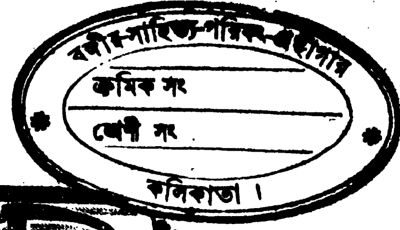
Devoted to Gardening and Agriculture. Subscribed by Agriculturists, Amateur-gardeners, Native and Government States and has the largest circulation.

It reaches 1000 such people who have ample money to buy goods.

Rates of Advertising.

1 Full page Rs. 3-8. 1 Column Rs. 2.
½ Column Rs 1-8

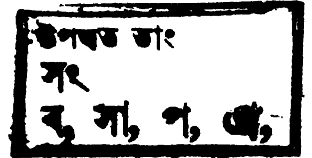
MANAGER—"KRISHAK,"
162, Bowbazar Street, Calcutta.



কৃষক

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৪শ খণ্ড। } বৈশাখ, ১৩২০ সাল। { ১ম সংখ্যা।



গোপাল-বান্ধব

(১)

ভারতে গোজাতির অবনতি

আমাদের দেশে কৃষিকার্য্যে গোজাতির বিশেষ আবশ্যকতার কথা কাহাকেও নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। কেবল কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত যে গোজাতির আবশ্যক তাহা নহে, গাভীর দুগ্ধ হইতে আমাদের জীবন রক্ষার উপায় হয়। বাঙ্গালা দেশে গোজাতির যে অতি অবনতি ঘটিয়াছে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই অনুভব করিতেছেন। প্রত্যেক চক্ষুষ্মান তাহা সন্দর্শন করিতেছেন। বলিষ্ঠ বলদ আমাদের দেশে নাই বলিলেই হয়—সোন্‌পুরের, হরিহরছত্রের মেলা, চিৎ-পুরের হাটই আমাদের বলদ প্রাপ্তির স্থান, কিন্তু ঐ সকল স্থান বঙ্গদেশ হইতে বহুদূরে অবস্থিত বলিয়া বাঙ্গালী কৃষকেরা সহজে উহা সংগ্রহ করিতে পারে না। বলিষ্ঠ বলদের অভাবে আমাদের চাষের অবনতি ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই।

আমাদের দেশের সে দধি ক্ষীর মাখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ঘাটালের সে মাখন ঘৃতের আর আমদানী নাই, সহৃদয় পাঠক ইহার অনুসন্ধান করিয়াছেন কি? কেন।০ চারি আনা সের দিয়াও জলমিশ্রিত দুগ্ধ পান করিতে-ছেন? আজ যে বাজারে ঘৃত দেখিতেছেন, উহার সহিত বাদামের তৈল, আলু বা কলার কাথ, মৃত জন্তুর চর্ব্বি প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া পশ্চিমাঞ্চল হইতে ব্যবসায়ীরা এদেশে আনাইয়া প্রচুর লাভবান হইতেছে। এসব কেন? বঙ্গে গাভীর অভাব নিবন্ধন দুগ্ধের অল্পতা বশতঃ ঘৃত কম পরিমাণে উৎপন্ন হয়। সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা বঙ্গে আজ গোজাতির এ অবনতি কেন হইল? বাঙ্গালী হিন্দুগণের গোয়ালে আজ দুগ্ধবতী গাভীর অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে কেন? ইহা কি কেহ চিন্তা

করিয়া দেখিতেছেন ? ভেজাল দুগ্ধ, ঘৃত পানাহার করিয়া বাঙ্গালী রুগ্ন, ক্লিষ্ট, শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বে বাঙ্গালায় দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, গৃহস্থ গাভীর চারিটী বাঁটের মধ্যে দুইটী বাঁট গো-বৎসের জন্য পৃথক রাখিয়া দুইটীর দুগ্ধমাত্র গৃহস্থের সমস্ত পরিবারের জন্য দোহন করিয়া লইতেন। গাভী প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ দান করিত। এখন বঙ্গে সে নিয়মের কথা গল্পমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। রাজপুতনায় এখন কিয়ৎপরিমাণে আছে।

আমরা এখন লেখা পড়া শিখিয়া কেবল চাকুরীর জন্য লালায়িত হই। আমরা সে পরাশর বাক্য ভুলিয়া পরসেবায় আত্মহারা হইয়াছি. চাষের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখি না, কাজেই বলিষ্ঠ বলদের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে পারি না। আমরা এখন এমন অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছি যে, উৎকৃষ্ট দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতির জন্য আমরা কিছুমাত্র উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিতেছি না।

গোজাতির অবনতির কারণ কি ?

(১) পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, (২) গোজাতির স্বাস্থ্যরক্ষার অমনোযোগিতা (৩) অবাধ গোহত্যা (৪) সাধারণের মধ্যে কৃষককুলের জাতীয় নিঃস্বতা কৃষির অবনতি।

আমাদের দেশে গোচারণভূমি থাকিত। এখন আর তাহা নাই। জমিদারগণ সেই গোচারণভূমি আর রাখে না; প্রজাবিলি করিয়া দেওয়ায় গোচারণভূমি চাষ করা হইতেছে। কাজেই গোজাতির প্রচুর কাঁচা ঘাস খাওয়ার পক্ষে অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে। আমেরিকা মহাদেশে ঘাসের চাষ করা হয়। সেই ঘাস খাইয়া গরু বিশেষ উন্নতি লাভ করে। সাধারণ লোকে গরুর তেমন যত্ন করে না। গরুর কোনও রূপে স্বাস্থ্য হানি ঘটিলে তাহার প্রতীকার হয় না। মফস্বলে উপযুক্ত পশু চিকিৎসক নাই। আজকাল যাহারা গরুর চিকিৎসা করে, তাহাদের উপর বিশ্বাস ন্যস্ত করা যায় না। তখন আমাদের দেশে ধর্ম্মের ষাঁড় অবাধে চরিয়া বেড়াইত, কিন্তু এখন আর ষাঁড় সেরূপ যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারে না। মিউনিসিপালিটী প্রভৃতিতে কতকগুলি ষাঁড় ধরিয়া বলদের ন্যায় গাড়ী টানা কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে। বলিষ্ঠ ষাঁড়ের অভাবে গাভী আর বলিষ্ঠ বৎস প্রসব করিতেছে না। বিভিন্নদেশ হইতে ষাঁড় সংগ্রহ করিয়া ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে গোজাতির অসাধারণ উন্নতি হইতেছে।

বর্ত্তমানে এদেশে যেরূপ অবাধে গোহত্যা সাধিত হইতেছে তাহা আর কাহারও অবিদিত নাই। বিগত বৎসর বকরিদের সময় গোহত্যা লইয়া কি ভীষণ হাঙ্গামা হইয়া গেল। এদেশে যেরূপ কসাই হস্তে গোহত্যা হইতেছে, তাহার প্রতিবিধান

কল্পে কি কোন উপায় করা যায় না? ভাই চিন্তাশীল পাঠক, ভাবিয়া দেখুন—এই ভীষণ প্রথার গতিরোধ করা যায় কি না। পাশ্চাত্যদেশে দুগ্ধবতী গাভী অথবা গোবৎস কখনও হত্যা করা হয় না। সেখানে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশে সকল প্রকার গরুই কসাই-হস্তে ছুরিকা রঞ্জিত করিয়া দেশের প্রভূত অমঙ্গল সাধন করিয়া—আমাদের ভবিষ্যৎ ঘোর তিমিরাবৃত করিবার উপক্রম করিয়াছে। দয়ালু গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন কি?

কৃষিকার্য্যের অবনতি ও গোজাতির অবনতি একই সূত্রে গ্রথিত। কৃষিকার্য্যের অবনতি ঘটিলে দেশের শুভ সম্পাদিত হইতে পারে না। গাভীর অবনতিতে দুগ্ধের অভাবে উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্যের অভাব হইতেছে। দুগ্ধের অভাবে ঘৃত উৎপন্ন হইতেছে না। ঘৃতের অভাবে এদেশে জনসাধারণের যে ভয়াবহ দুর্গতি হইতেছে, তাহা প্রগাঢ় দুঃখের অবসাদে কেহ উপলব্ধি করিতে পারিবেন কি না জানি না। যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, তাঁহারা কৃষককুলের প্রতি সহানুভূতিসূচক দৃষ্টিপাত করেন না, চাষা ইত্যাদি অবজ্ঞাপূর্ণ ভাষায় তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া থাকেন। কৃষককুলের নিঃস্বতা অভাব অভিযোগ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ দেখেন না,—তাঁহাদের এই অমনোযোগিতাই কৃষির, কৃষককুলের এবং সঙ্গে সঙ্গে গোজাতির অবনতির সহায়তা করিয়া আসিয়াছে। সম্প্রতি কতিপয় যুবক আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশ হইতে কৃষিবিষয়ক শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা বেশ চেষ্টা করিয়া এই সমস্ত লক্ষ্য রাখিবেন, ইহাই আমার বিশ্বাস। আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যেন তাঁহারা গোজাতির উন্নতি সাধনার্থ বিশেষ আগ্রহ সহকারে চেষ্টা করেন। গোজাতির অবনতি ও তাহার কারণগুলি চিন্তা করিলেই উন্নতির উপায় করিতে সাধারণের আগ্রহ জন্মিবে।

খেজুর চাষ।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার লিখিত

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমাদের দেশের খেজুর গাছের রস হইতে ২৪ পরগণা যশোর' মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় বহুল গুড় প্রস্তত হয়। এই গুড়ের আস্বাদন খুব ভাল হইলেও তাহা সকলে পছন্দ করে না। বিগত আষাঢ় মাসের কৃষকে বাবু ললিতমোহন রায় খেজুর গুড় সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেন কিন্তু তাহাতে চাষ কারকিৎ গুড় প্রস্তুতকরণ, সংরক্ষণ ও ব্যবসাদির সম্বন্ধে সবিশেষ লেখা না থাকায় আমি অত্র প্রবন্ধে তাহার যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিন্তু ১৩১৯ সালের ভাদ্র সংখ্যা কৃষক পত্রিকায় বাবু জগৎপ্রসন্ন রায় মহাশয়ের খেজুর গাছ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া কোন্ স্বদেশবৎসল কৃষকের হৃদয় শতধা বিদীর্ণ না হয়? আমি বেহারদেশীয় বাঙ্গালি হইলেও কলিকাতার সহিত বিশেষ সম্পর্কিত এবং বঙ্গের প্রধান কৃষিজীবি সম্প্রদায়ের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা রাখি। আমাদের দেশের সাধের খেজুর গাছের আবাদ হনন বাঙ্গালার কয়েকটি জেলায় পরিদর্শন করিয়া যারপর নাই মর্ম্মাহত হইয়াছি এবং এই বৃক্ষকুল যাহাতে অস্মদ্দেশে নির্ম্মূল উচ্ছেদের হাত হইতে রক্ষা হয় তাহার চেষ্টার ক্রুটী করিতেছি না। জগৎবাবু বা ললিতবাবুর সহিত দেখা করিবার বহুদিন হইতে বাসনা আছে। দেখি পরমেশ্বর কোথায় আমাদিগের মিলন ঘটান। চিনি, আকগুড়, শর্করা, মিশ্রি হইতে আমি খেজুর গুড়ের অধিক পক্ষপাতী, আমাদের দেশের চাষীগণ খেজুরগাছ হননে প্রবৃত্ত, কিন্তু জগৎবাবু ও ললিতবাবুর প্রবন্ধদ্বয় পাঠ করিয়া বুঝিলাম যে আমাদের মত খেজুর পাগলা লোকের এই বঙ্গভুমে অভাব নাই। যাহা হোক গুড় প্রস্তুত সম্বন্ধে দুই একটি গবেষণাপূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ যদি উক্ত বাবুগণ এই পত্রিকায় প্রকাশিত করেন তাহা হইলে বোধ হয় সাধারণের অনেক উপকার সাধিত হইতে পারে। বিগত ১৯০৬ সালের কৃষি-লেজার নামক পত্রিকায় মিঃ এফ্ ফ্লেচার সাহেব খেজুরগাছ ও তাহার চাষের সম্বন্ধে বিশেষ যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। আমিও ওমন, পারস্য, মিশর উপকুল প্রভৃতি দেশে গিয়াছিলাম ; সেই সময়ে এই গাছ সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সমর্থ হই, তাহা এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিতে ক্রুটী করি নাই।

মিশর, আলজিরিয়া, টুনিস, মেসোপোটামিয়া, আরব, পারস্য, প্রভৃতি দেশের খেজুর চাষীগণ খেজুর ফলকে তিন ভাগে সচরাচর বিভক্ত করিয়া থাকেন।

(১) কোমল (২) মধ্যবিৎ (৩) শুষ্ক। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অন্যূন ২॥০ বা ৩ শত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার খেজুরফল আরব, পারস্য, মিশর প্রভৃতি দেশে উৎপাদিত হইয়া থাকে। পুংপরাগের দ্বারা মনুষ্য দ্বারা বা কীট সাহয্যে ঐশ্বরিক নিয়মে স্ত্রীপুষ্প-গুলিকে ফলবতী করা হয়।

১। কোমল or soft dates খুব কমই ফলে এবং তাহার অধিকাংশই ইউরোপ এবং আমেরিকা প্রদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। কোমল খেজুরে বিচিত্রতা এই যে এই ফলগুলি পাকিলে অত্যন্ত পুষ্ট এবং সুমধুর হয়। এ ফল আমাদের ভারতে প্রায় আইসে না। তফিলেৎ, হেল্‌বী, দেগ্‌লেৎনূর, ঘর, মোগাক্ষীর, খালাসী, মোজাটি, প্রভৃতি জাতীয় খেজুর এই প্রথম শ্রেণীভুক্ত। ইহারা পাকিলে পক্ক ফল হইতে মিষ্ট রস ঝরিয়া থাকে এবং ইহাতে শতকরা ৬০ p. c. চিনি থাকে। রস ঝরাইয়া এই গুলিকে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া পরে উত্তমরূপ প্যাক করিয়া বিদেশী বাজারে রপ্তানি করা হয়। ঘর খেজুর হইতেই আমাদের দেশের ঘড়ার খেজুর নাম অপভ্রংশ করিয়া সঞ্জাত হইয়াছে। সিন্ধ ও বেলুচিস্থান অথবা ওমল বা পারস্য উপকুলের অপরিপক্ক ক্ষুদ্র জাতীয় খেজুরকে "খড়ক্ পোক্তা" পাক করিয়া আমাদের "ছোহড়া" রূপে ভারতের সকল বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে যে সকল খেজুর সচরাচর দেখিয়া থাকি তাহা অধিকাংশই মস্কাট বন্দর হইতে আসিয়া থাকে। ইহারা তৃতীয় বা শুষ্ক শ্রেণীর অন্তর্গত। উপরোক্ত কয়েকপ্রকার জাতীয় খেজুর ছাড়া নিম্নলিখিত গুলিও প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত :— খাদ্রাবি, নাগাল, রাশিদী, রামলী এবং টেডালা। নিম্নলিখিত তালিকা দেখিলে কোন জাতীয় খেজুর কোন দেশে জন্মে এবং কিরূপ মাটীতে জন্মে তাহা জানা যাইবে :—

নাম	দেশ	বাজার	মাটী
তফিলেৎ	মরক্কো	বিশ্‌ক্রা	বালু
বরণী	মেসোপোটামিয়া	বগ্‌দাদ্	,,
দেগ্‌লেৎ			
নুর্	মিশর	আলেকজান্দ্রিয়া	,,
টেডালা	মাজাব্	আলজিয়ার্স	বালু
ঘর	বিশ্‌ক্রা	,,	এঠেল
হেলুই	মেসো	বশোরা	,,
মোগাক্ষীর	টিউনিস্	রোজেটা	বেলে
খাদ্রাবি	মেসো	বশোরা	এঠেল
মাখ্‌তুম্	,,	,,	,,

নাম	দেশ	বাজার	মাটী
কার্দ	আরব	কশকট্	বেলে
রাশিদি	মিশর	রোজেটা	,,
রামলী	,,	আলেকজেন্দ্রিয়া	,,
নাগাল	,,	,,	,,
মস্কাট	আরব	ওমান	,,
বরণী	মেশোপা	বোগদাদ্	,,

উপরোক্ত তালিকা দেখিলে বেশ জানা যাইবে যে কোন দুই জাতী খেজুর কোন্ কোন্ দেশে জন্মে, কিরূপ মাটী তাহাদের বর্দ্ধনের ও জননের বিশেষ সহায়তা করে এবং উপযোগী এবং উহা কোন্ কোন্ বাজারে পাওয়া যায়। মস্কাট্ শানিয়ল্গুলি ক্ষুদ্রজাতীয় খেজুর। তাহা কেবল ওমান্, তিহ্বান ও পারস্য উপকুলে জন্মে এবং বেশীর ভাগ ওমান এবং মস্কাট বন্দর হইতে কলিকাতা, করাচি ও বম্বাই বন্দর হইয়া ভারতবর্ষের সকল স্থানে বিক্রীত হইয়া থাকে। সানিয়ল এবং বরণীগুলিই আমাদের দেশে আসিয়া থাকে। প্রথম শ্রেণীর খেজুর দেবভোগ্য সামগ্রী। তাহা আমেরিকা, ইংলণ্ড, দক্ষিণ ইউরোপ, ইটালি ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে নীত হইয়া থাকে। দীন ভারতের ভাগ্যে তৃতীয় শ্রেণী বা শুষ্ক জাতীয় খেজুর ভিন্ন বড় আইসে না। ১৮৭৫ সালে আমার পূজনীয় পিতৃদেবের সহিত কোন আদালত সংক্রান্ত ব্যাপারে লোহিত সমুদ্রের কোন দ্বীপে যাই। অনেক দিনের কথা দ্বীপের নামটি ভুলিয়া গিয়াছি। সেইখান হইতে আমরা তিন চারি দিনের পথ জিদ্দা বন্দরে ২ দিন অবস্থিতি করিয়া সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া মদিনার দিকে ২ দিন উষ্ট্র পৃষ্ঠে বেদুইনদের দেশের অভ্যন্তরে যাই। ঐ সময়ে আমরা যে ২।৫ প্রকারের খেজুর খাইয়াছিলাম তাহা ইহজীবনে বিস্মৃত হইব না। মোগাক্কীর, দেগলেৎনুর, বরণী, এবং ফর্দজাতীয় খেজুর ঐ সময়ে আমরা বহুল খাইয়াছিলাম। পালা মুরড়িঃ কমিশাগার মিঃ ইবব্নো সাহেব আমার পিতা ঠাকুর ৺উমেশচন্দ্র সরকার ও পালামুর খাতনামা ভূস্বামী ও জমিদার ৺শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে হেলবী মোনাক্কীর এবং খাদ্রাবী জাতীয় খেজুরের বীজ পরীক্ষার্থ দিয়াছিলেন। আমরা ঐ বীজ গয়ায় রোপিত করি। ২।৪টি নমুনা অঙ্কুরিত হইয়া ২।১ বৎসরের মধ্যে অযত্ন হেতু সম্ভবতঃ মরিয়া যায়। আমরা উহার চাষের বিধি সম্যক অবগত না হওয়ায় ঐ চারাগুলিকে রক্ষা করিতে পারি নাই। শশীবাবুর গাছগুলিরও ঐ দশা উপস্থিত হইবার উপক্রম কিন্তু বহু যত্নে তাঁহার বাগানে ২টি বাঁচিয়া বড় হইয়াছে। গাছ দুটি এখন তাঁহার জামাতা বাবু হরিদাস মুখোপাধ্যায়ের গৃহস্থিত উদ্যান মধ্যে রোপিত আছে। গাছগুলি খুব বড় হইলেও ফলবতী হয় না। পুষ্প ধরে এবং ঝরিয়া পড়িয়া যায়।

এখন কোথায় এই সকল উত্তম জাতীয় খেজুরের বীজ বা চারা পাওয়া যায় বা আনান যাইতে পারে তাহার নিদর্শন জানিতে পারিলে চেষ্টা করিয়া দেখিলে মন্দ হয় না যে আমাদের গয়া ও পালামৌ দেশের মত গরম ও শুষ্ক প্রদেশে ঐ সকল খেজুর গাছ জন্মিতে পারে কি না।

বিদেশে পক্ক ফলগুলিকে বাছিয়া প্যাক করিয়া পাঠাইবার পূর্ব্বে তৈয়ার করার প্রক্রিয়াকে "কিউরিং" (curing) বলিয়া থাকে। কিয়োরিং দুই প্রকারের হয়। ১। খুরমা ২। খড়কপেক্কা পরিপক্ক সুমিষ্ট অনাঘাত প্রাপ্ত বড় ২ ফলগুলিকে বাছিয়া তাহা হইতে রুতাব অর্থাৎ শর্করা বহুল রস ঝরিয়া বাহির হইয়া যাইলে ফল গুলিকে রৌদ্রের উত্তাপে মাদুর বা চেটাইর উপর শুষ্ক করিয়া বিদেশে ছোট ২ বাক্সে বন্ধ করিয়া রপ্তানি হয়। এই প্রক্রিয়াকে "খুরমা" বলে। পক্ক ফল হইতে যে রস সংগৃহীত হয় তাহাকে রুতাব্ বলে। ইহা "খরকপোক্কা" প্রক্রিয়ায় বহুল ব্যবহৃত হয় এবং স্থানীয় লোকগণ ভোজন করে।

ক্ষুদ্র অপরিপক্ক বরণী বা অপরাপর জাতীয় খেজুর (যে গুলি ওমান, পারস্য, মস্কাট প্রভৃতি উপকূলে বহুল জন্মে) সংগ্রহ করিয়া ধৌত করিয়া "রুতব রসে পাক্ করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া প্যাক করিয়া ভারতীয় বন্দর সমূহে রপ্তানী করা হয়। এই সিদ্ধ খেজুরে অল্প মাত্রা শর্করা বা রুতব থাকিলে তাহা ছোহাড়া হয় বেশী চিনি মিষ্ট বা রুতব থাকিলে তাহা আমাদের দেশে ঘড়ার খেজুর অথবা চটের খেজুর বলিয়া বিক্রীত হইয়া থাকে। এই প্রক্রিয়াকে "খড়ক পোক্কা" বলে। কান্দির মধ্যে ২।১০ টা ফল পাকিলে বা রঙ্ ধরিলেই খড়কের জন্য কান্দি গুলিকে আহরণ করা হইয়া থাকে। অতঃপর আমি আরবী ও মিশরী খেজুর সম্বন্ধে যাহা কিছু বক্তব্য আছে তাহা পরবর্ত্তী ২।১টি প্রবন্ধে শেষ করিয়া আমাদের দেশী খেজুর গাছ হইতে গুড় ও চিনি প্রস্তুতের বিষয় সামান্য আলোচনা করিব।

বৃক্ষের স্বেদ

শ্রীবিশ্বেশ্বর ঘোষ লিখিত

বিজ্ঞান সাহায্যে কতই অভিনব ব্যাপার আমাদের জ্ঞান গোচর হইতেছে। যতই অনুসন্ধান চলিতেছে, ততই জীবজগতের সহিত উদ্ভিদ্‌জগতের সাদৃশ্য প্রতীয়মান হইতেছে। জীবের ন্যায় উদ্ভিদের সর্ব্বাঙ্গ হইতে অনবরত স্বেদ নির্গত হইতেছে। অধিকাংশ সময় ইহা বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে মিশ্রিত হইতেছে।

কিন্তু রাত্রিতে যখন বায়ুমণ্ডল অপেক্ষাকৃত শীতল থাকে, তখন এই বাষ্প ঘনীভূত হইয়া মুক্তাফলের ন্যায় শিশিরবিন্দুরূপে শোভা পাইতে থাকে। অশিক্ষিতগণ এই শিশির বায়ুমণ্ডলের জলীয় অংশ ঘনীভূত হইয়া উৎপন্ন হয় বলিয়া থাকে।

বহুকালের প্রচলিত জ্ঞানের বিরুদ্ধে কথা উঠিলেই লোকে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করে। কিন্তু বিজ্ঞান উপহাসে বিচলিত হয় না; ইহা সাধারণের চক্ষুর সম্মুখে স্পষ্ট দেখাইয়া দিবে যে ইহাকে উপহাসে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা বৃথা। প্রাতঃকালের বৃক্ষপত্রস্থ মুক্তাবিন্দুর সহিত বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্পের কিঞ্চিৎ সম্বন্ধ আছে সত্য, কিন্তু এই সুবিমল অলঙ্কার বহুল পরিমাণে উদ্ভিদের নিজস্ব। বিজ্ঞান দেখাইয়া দিতেছে, বায়ুমণ্ডলের জলীয় অংশের কিছুমাত্র সাহায্য না লইয়া বৃক্ষপত্রে প্রচুর পরিমাণে শিশিরবিন্দু উৎপন্ন হয়।

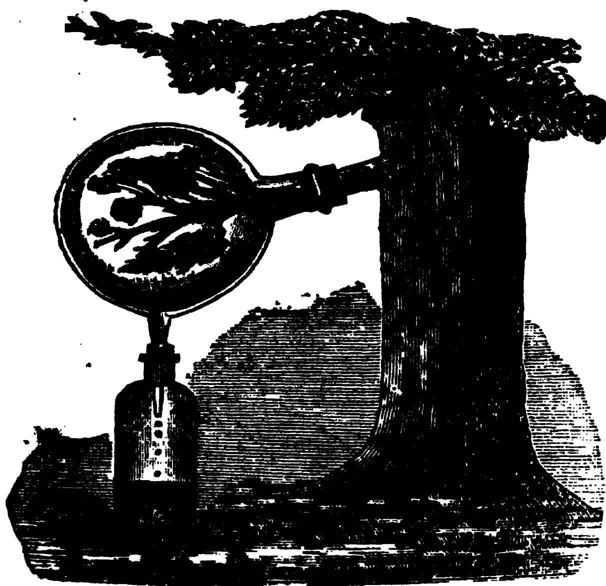
অধ্যাপক মুসেন্‌ব্রুক (Muschenbroeck) বিশেষ অধ্যবসায় সহকারে এ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। ইঁহার জ্ঞানপ্রভায় লীডেন বিশ্ববিদ্যালয় আলোকিত হইয়াছে। ইনি দেখাইয়া দিতেছেন বায়ুমণ্ডলের সাহায্য না লইয়া শিশির উৎপন্ন হইতেছে। বৃক্ষপত্রস্থ জলবিন্দু সাধারণ পরিজ্ঞাত শিশির অভিষার হইতে পৃথক ও ইহাই বৃক্ষের স্বেদ।

উক্ত অধ্যাপক একটী অহিফেনের চারা লইয়া পরীক্ষা করিয়াছেন। এই চারা মূলের চারিদিকে মৃত্তিকার উপর সীস নির্ম্মিত পাত বিস্তার করিয়াছেন। একটী কাচাবরণের দ্বারা (bell-glass) চারাটিকে ঢাকিয়া রাখেন। এই কাচাবরণ দেখিতে সেজের কাচাবরণের ন্যায়। কাচাবরণের সহিত মৃত্তিকাস্থ সীসনির্ম্মিত পাত্র এরূপভাবে সংলগ্ন রাখিয়াছিলেন যেন কোনক্রমে বাহিরের বায়ু ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারে। যৎসামান্য আবদ্ধ বায়ুতে জলীয় অংশ যত কম রাখিতে পারা যায় তাহার দিকেও বিশেষ লক্ষ ছিল। চারাটিকে এইরূপে বায়ুমণ্ডল হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক রাখা সত্বেও উহার পত্রে প্রচুর জলবিন্দু দেখিয়া অধ্যাপক মহাশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। কাচাবরণের অভ্যন্তরদিকেও বহুল পরিমাণে জলকণা দেখা গিয়াছিল। তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে ইহা অবলোকন করিতেন। বায়ু-মণ্ডলে যে রাত্রে জলীয় অংশ অতি কম সে রাত্রেও পত্রে জলবিন্দুর অভাব হয় নাই।

ইহাতেই বিশেষরূপে প্রমাণিত হয় বৃক্ষের পত্রোদ্ভূত জলবিন্দু বৃক্ষের স্বেদ। সাধারণ লোকে যাহাকে শিশির বলে ইহা তাহা নহে। কি পরিমাণে স্বেদ নির্গত হয়, বৈজ্ঞানিকগণ তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক মারিয়ট (Moriotte) একরূপ সহজ পরীক্ষা দ্বারা ইহার মীমাংসা করিয়াছেন। তিনি একটী ক্ষুদ্র বৃক্ষ প্রশাখা কাটিয়া লইয়া কর্ত্তিত স্থানে মোমের প্রলেপ দিয়া ওজন

করিয়া রাখিয়া দিলেন। দুই ঘণ্টা পরে পুনরায় ওজন করিয়া দেখিলেন উহার ওজন কমিয়া গিয়াছে। দুই চামচ জলের যাহা ওজন এই দ্বিতীয় ওজন তত কম। এই দেখিয়া তিনি বলেন ঐ প্রশাখা বৃক্ষে থাকিয়া ১২ ঘণ্টায় বার চামচ স্বেদ বাহির করিত। বৃক্ষের জাতি ও শাখার পরিমাণ অনুসারে স্বেদ নির্গমের পরিমাণও ইতর বিশেষ হইবে সে কথা বলাই বাহুল্য।

এই পণ্ডিতের পরীক্ষায় দোষ এই যে ইহার দ্বারা বৃক্ষের স্বাভাবিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় না। বৃক্ষ সংলগ্ন থাকিবে অথচ তাহার স্বেদের পরিমাণ লইতে পারিলেই যথার্থ পরীক্ষা হয়। গেটার্ড (Guetord) সাহেব এইরূপ পরীক্ষা দেখাইয়া জগতকে স্তম্ভিত করিয়াছেন। তাঁহার পরীক্ষা অতিশয় কৌতুহল উদ্দীপক।



বৃক্ষের স্বেদ পরিজ্ঞাপক যন্ত্র

গেটার্ডের পরীক্ষা।

তিনি একটী ক্ষুদ্র বৃক্ষ শাখা বৃক্ষ সংলগ্ন অবস্থায় সরু মুখবিশিষ্ট একটী কাচ নির্ম্মিত হাঁড়ির (globe of glass) মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেন। ঐ হাঁড়ির এক পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র রাখিয়া তাহাতে একটী নল সংযুক্ত করেন। এই দিকটী নিম্নদিকে রাখিয়া ঐ নল নিম্নস্থ একটী বোতলে প্রবেশ করান। বৃক্ষসংলগ্ন হাঁড়ির মুখ ও সমস্ত অপরাপর মুখগুলি মোম দ্বারা বিশেষরূপে আবদ্ধ করা হয়;—ইহাতে বাহিরের বায়ুর সহিত অভ্যন্তরের কোন সম্বন্ধ রহিল না। বৃক্ষশাখার জলীয় অংশ

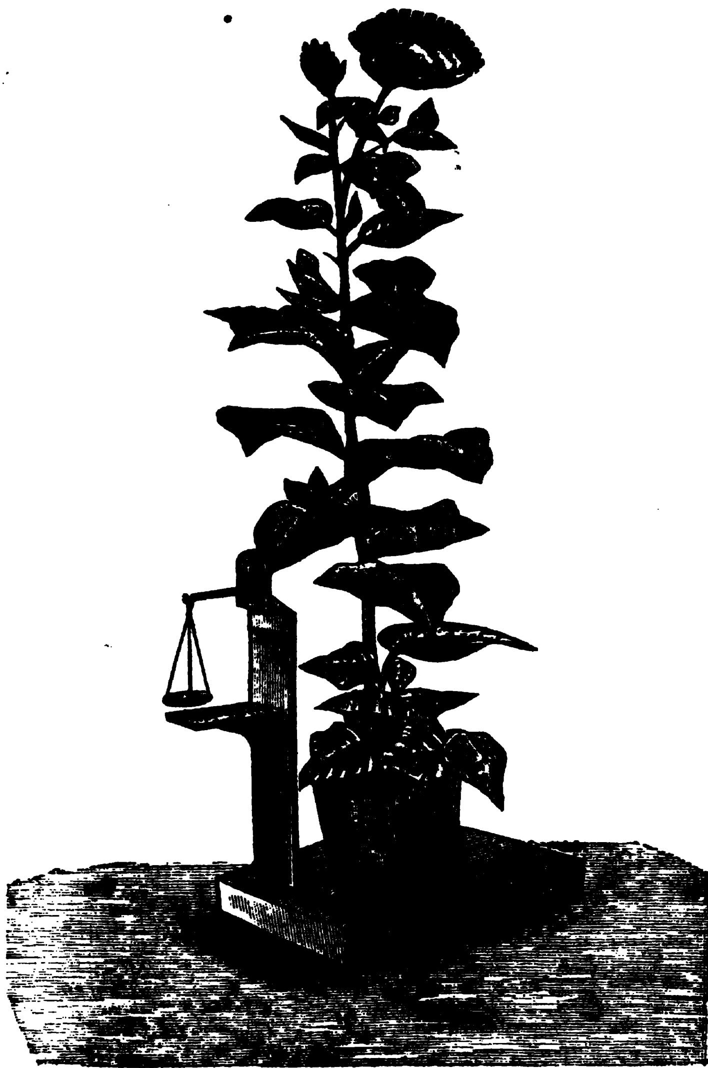
বাষ্পাকারে বহির্গত হইয়া জলবিন্দুরূপে কাচপাত্রের অভ্যন্তরে দেখা যাইতে লাগিল। ক্ষণপরে এত জলবিন্দুর আবির্ভাব হইল যে, তাহা গড়াইয়া নিম্নস্থ নল দ্বারা বোতলের মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা পড়িতে লাগিল। এই পরীক্ষায় ঐ জলবিন্দুর কিঞ্চিন্মাত্রও অপচয়ের সম্ভাবনা ছিল না।

গেটার্ড শাখার পরিমাণ ও স্বেদের পরিমাণ ওজন করিয়া দেখিয়াছেন। শাখাটীর ওজন সাড়ে পাঁচ ড্রাম। তাহা হইতে প্রতিদিন এক আউন্স তিনড্রাম জল বাহির হইত। সামান্য একটী শাখা হইতে এত জল প্রত্যহ বাহির হইত। সমস্ত বৃক্ষ হইতে প্রত্যহ কত জল বাহির হইত ভাবিবার বিষয়। মনে হইতে পারে ঐ শাখাটী লাউ, কুমড়া, কচু, পুঁই ইত্যাদির ন্যায় জলপূর্ণ; কিন্তু তাহা নহে। কাঠিন্য তেঁতুলের ন্যায় দৃঢ় কাষ্ঠ বিশিষ্ট গাছের শাখা লইয়া তিনি পরীক্ষা করিয়াছেন। করনেল্ বৃক্ষ (Cornel tree) সুদৃঢ় দারুময়। ইহার কাষ্ঠ মহিষশৃঙ্গের ন্যায় কঠিন। এই করনেল্ বৃক্ষেরই শাখা লইয়া তিনি পরীক্ষা করিয়াছেন।

এই বিষয়ে আর একটী বড়ই মনোহর পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছে। সূর্য্যমুখী ফুল দেখিতে সুন্দর ও বৃহৎ; ইহাকে কেহ কেহ রাধাপদ্ম বলে। পদ্মের সহিত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। তুমি ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া যখন উহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সৌন্দর্য্যে মোহিত হইতেছ, বিশ্বশিল্পীর অপার নির্ম্মাণ কৌশল দেখিয়া আত্মহারা হইতেছ, সূর্য্যের দিকে প্রফুল্ল মুখ রাখিয়া ঐ জ্যোতিষ্কের বাতির সহিত আপন গ্রীবা ফিরাইতেছে দেখিয়া বিস্মিত হইতেছ, তখন উহার বৃক্ষের আর একটী অদৃশ্য অতি বিস্ময়কর কার্য্য তোমার অগোচরে সম্পাদিত হইতেছে, তুমি তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছ না। ফুলটী সূর্য্যের দিকে মুখ রাখিয়া ঘুরিতেছে। ইহার বিশাল পত্র গুলি স্থিরভাবে রহিয়াছে উহার কার্য্য কিছুই বুঝা যাইতেছে না।

বিজ্ঞান দেখাইয়া দিতেছে যে ঐ বৃক্ষ পত্র আমাদেরই মত স্বেদ নিঃসরণ করিতেছে। পূর্ব্বে এ কথা কে ভাবিয়াছিল যে ঐ বৃক্ষ উহার শরীর অনুপাতে আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী স্বেদ ত্যাগ করিয়া থাকে। অধ্যবসায়ী বৈজ্ঞানিক গণ মানব দেহের ও ঐ বৃক্ষের স্বেদ নিঃসরণের পরিমাণ নিরূপিত করিয়াছেন। ধন্য তাঁহাদের কৌশল ও পরিশ্রম, ধন্য তাঁহাদের অধ্যবসায়। তাঁহাদের সহিত তুলনা করিলে আমাদের জীবন অতি হেয় অতি নগণ্য। উদর পূরণ ও মলমূত্র নিঃসারণ ভিন্ন আমাদের দ্বারা জগতের অতি সামান্য কার্য্য সাধিত হইতেছে। আমরাও অনেক সময় আনন্দে মত্ত হই; কিন্তু বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া পণ্ডিতগণ যেরূপ অপার আনন্দ অনুভব করেন, আমরা তাহার শতাংশের একাংশও ধারণা করিতে পারি না।

পাডুয়ার বিখ্যাত ভিষক সাংটোরিয়াস (Sanctorius) অভিনব বিষয়ের আবিষ্কারের জন্য জগতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। কি কি কারণে ও কি পরি-



সূর্য্যমুখী গাছের স্বেদ
বৈজ্ঞানিক হেলস্ সাহেবের পরীক্ষা।

মাণে আমাদের শরীরের ওজন হ্রাস বৃদ্ধি হইতেছে নির্ণয় করিবার জন্য তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি অতি সহিষ্ণুতা সহকারে তুলাদণ্ডে দণ্ডায়মান থাকিয়া অতিবাহিত করিয়াছেন। তাঁহার শরীরের প্রতি মিনিটের ওজন ও তারতম্যের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কি পরিমাণ আহার করিলেন, কি পরিমাণ মলমূত্র ত্যাগ করিলেন, এবং তদ্দ্বারা শরীরের কি পরিমাণ গুরুত্ব লঘুত্ব ঘটিল সকলই লক্ষ্য রাখিয়াছেন। আমাদের শরীর হইতে সর্ব্বদাই বাষ্পাকারে কখনও

বা জলবিন্দু আকারে ঘর্ম্ম নিঃসরণ হইতেছে। বিজ্ঞান প্রতিপন্ন করিতেছে যে প্রত্যেক সাধারণ মানবের চর্ম্মপথে চব্বিশ ঘণ্টায় ২·২ পাউণ্ড জলীয় অংশ বাহির হইয়া যাইতেছে। কেবল স্বেদ নিঃসরণে আমাদের শারীরিক ওজন প্রায় একসের কমিয়া যাইতেছে। বাষ্পাকারে বা বিন্দু বিন্দু জলকণা রূপে নির্গত স্বেদের পরিমাণ একসের হইতে পারে ইহা বড়ই বিস্ময়ের কথা। আমাদের এই গ্রীষ্ম প্রধান ভারতবাসীর স্বেদের পরিমাণ প্রত্যহ দুইসের বা ততোধিক হইবে না কে বলিতে পারে।

একবার সূর্য্যমুখী বৃক্ষের স্বেদের পরিমাণ দেখা যাউক। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক হেলস্ (Hales) ইহার পত্র নিঃসৃত স্বেদের পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। তিনি অতি যত্ন সহকারে একটী পাত্রে একটি সূর্য্যমুখী বৃক্ষ উৎপন্ন করেন। গাছটী বেশ সতেজ ও পুষ্প দ্বারা সুশোভিত হইলে ঐ পত্রের উপরিভাগ তিনি টিন নির্ম্মিত পত্রের দ্বারা বিশেষরূপে আবদ্ধ করেন। বৃক্ষে জল দিবার জন্য কেবল মাত্র সামান্য একটী নলপথ সংলগ্ন রাখেন। এখন ঐ বৃক্ষটাকে কয়েক দিন তুলাদণ্ডে রাখিয়া দিয়া দেখিয়াছেন যে কেবল মাত্র নিঃসৃত স্বেদ দ্বারা উহার ওজন ২৪ ঘণ্টায় কুড়ি আউন্স কম হইয়াছে। ঐ ক্ষুদ্র বৃক্ষ প্রতিদিন প্রায় আড়াই পোয়া স্বেদ নিঃসরণ করে। তিনি বলেন শরীরের অনুপাতে সূর্য্যমুখী বৃক্ষ মানব দেহ অপেক্ষা সতের গুণ অধিক স্বেদ নিঃসরণ করে।

বৃক্ষরাজী হইতে রাশি রাশি জলীয় বাষ্প আমাদের চক্ষুর অগোচরে অবিরত নির্গত হইয়া যাইতেছে। এই কারণেই প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় বন ভূমির উপর কখন কখন কুজ্ঝটিকার ন্যায় আবরণ দেখা যায়। যেমন জলরাশির উপরিভাগ হইতে সর্ব্বদাই জলভাগ বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে মিশিয়া যাইতেছে, তেমনই সমস্ত উদ্ভিদ হইতেই জলীয় অংশ অবিরত বাহির হইয়া যাইতেছে। শীতকালে কখন কখন জলরাশির উপর বাষ্পরাশি ধুমের ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায়।

আবার কতকগুলি বৃক্ষ আছে তাহারা প্রকাশ্য ভাবেই পরিশ্রুত জলের ন্যায় অবিরত স্বেদ নির্গত করিতেছে। এই প্রচুর জলরূপী স্বেদ দেখিয়া বস্তুতঃই বিস্মিত হইতে হয়। হলণ্ডের শরীর তত্ত্ববিদ্ রুইস্ (Ruysch) এক জাতীয় কচু পত্রের প্রান্ত হইতে অনবরত ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতে দেখিয়াছেন। জল সেবনের আধিক্য অনুসারে ইহার স্বেদেরও পরিমাণ বৃদ্ধি পাইত।

এইরূপ অনবরত ফোঁটা ফোঁটা জল বাহির হওয়া এতই বিচিত্র যে অনেকে ইহা অতিশয়োক্তি বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন; কিন্তু মসেট্ (Musset) নামক টুলোঁ (Tenlénse) সহরের এক বিজ্ঞানবিদ্ আর একজাতীয় কচু পত্রে আরও বিস্ময়কর ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। তিনি আমাদের আহারের উপযোগী

এক জাতীয় কচু পত্রের অগ্রভাগ হইতে অতি সূক্ষ্ম ফোয়ারার ন্যায় অনবরত জল বাহির হইতে দেখিয়াছেন। প্রতি পত্রের অগ্রভাগ হইতে প্রায় এক ইঞ্চি দূরে ঐ জল নিক্ষিপ্ত হয়। তিনি বলেন কোন কোন পত্রের অগ্রভাগ হইতে প্রতি মিনিটে এক শত ফোঁটা স্বেদ নির্গত হয়। অতি অল্প দিন পূর্ব্বে তিনি ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন। সেকালের পুরাতন গল্প গাথা বলিয়া উপহাস করা চলিবেনা।

আফ্রিকার পশ্চিমে কানারি দ্বীপ পুঞ্জের অশ্রুতরুর বিবরণ শুনিলে আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকিবে না। এই বৃক্ষের পত্রগুচ্ছ হইতে অবিরত ঝর ঝর করিয়া বৃষ্টিপাত হইতেছে। এই জল পরিশ্রুত জলের ন্যায় পবিত্র। স্থানীয় অধিবাসীগণ এই জল অতি সুস্বাদু পেয় বলিয়া পাত্র ভরিয়া লইয়া যায়। অনবরত এত বৃষ্টি হইতেছে যে উহার তলদেশে জলাশয় আকার ধারণ করিয়াছে। বৃক্ষ যেন অবিরত অশ্রু মোচন করিয়া কাঁদিতেছে; এই জন্যই ইহার নাম অশ্রুতরু (weeping tree) ইহাকে বর্ষণ বৃক্ষ বলা যাইতে পারে। ইহা কয়েক বৎসর পূর্ব্বের কথা। অনেকে বলেন এখন এ বৃক্ষের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে।

এক জাতীয় বৃক্ষ আছে তাহাদের প্রচুর স্বেদ নির্গম হয়, কিন্তু তাহারা বড়ই কৃপণ। নিঃসৃত জল স্ব স্ব পেটকে আবদ্ধ করিয়া রাখে। আমাদের ভারতবর্ষেও এই জাতীয় বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। পর্য্যবেক্ষণ অভাবে কত আশ্চর্য্য ঘটনা আমাদের পরিলক্ষিত হয় না। চক্ষু আছে তথাপি আমরা দেখিব না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আসিয়া আমাদিগকে দেখাইয়া দিবেন তবে দেখিব। এই কৃপণ স্বভাব বৃক্ষকে ইংরাজগণ pitcher plant আখ্যা দিয়াছেন। আমরা ইহাকে উহাদেরই অনুকরণে ভাণ্ড বৃক্ষ বা ঘটবৃক্ষ বলিতে পারি, কারণ ইহার দেশীয় নাম অপরিজ্ঞাত। এই বৃক্ষের পত্র হলুদ পাতার ন্যায় লম্বা কিন্তু তদপেক্ষা পুরু ও রসাল। এই পত্রের মধ্য শির দৃঢ় এবং পত্রের অগ্রভাগে বর্দ্ধিত হইয়া লম্বা সুন্দর ভাণ্ডের আকার ধারণ করে। বর্দ্ধিত অংশ নীচের দিকে বাঁধিয়া পুনরায় অগ্রবর্ত্তী ভাণ্ডটীকে উর্দ্ধমুখে ধরিয়া থাকে। ঐ ভাণ্ড সর্ব্বদাই জলপূর্ণ থাকে। আবার পেটকের আবরণের ন্যায় একটী আবরণ আছে। বৃক্ষ ইচ্ছামত ঐ ভাণ্ডের মুখ কখন আবদ্ধ কখনও বিমুক্ত রাখে। আবার আশ্চর্য্যের বিষয় কৃপণের ন্যায় রাত্রিকালেই ভাণ্ড মুখ অধিকতর যত্নের সহিত বদ্ধ করে। যেমন সূর্য্য উঠিতে থাকে ইহার মুখও অল্পে অল্পে খুলিয়া যায়। তখন সঞ্চিত জল কিয়দংশ বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়।

ভাণ্ড বৃক্ষ আবার অতিশয় গ্রীষ্ম প্রধান দেশে জন্মায়। এমন কি মরুভূমিতেও এই বৃক্ষের অভাব নাই। বিশ্বনিয়ন্তার কৃপায় কত পথিক এই বৃক্ষের সঞ্চিত বিশুদ্ধ জল অপহরণ করিয়া পিপাসা নিবৃত্তি করিয়াছে। কৃপণের ধন অপব্যয়েই

যায়। মধুমক্ষিকাও কত কষ্টে কত যত্নে তিল তিল করিয়া মধু সংগ্রহ করিয়া নিজ আবাসে সঞ্চয় করে ; কিন্তু দস্যু কর্তৃক মুহূর্ত্ত মধ্যে সকলই অপহৃত হয়।

দক্ষিণ আমেরিকার জলা ভূমিতে সারাসীনিয়া (Sarracenia) নামক এক প্রকার উদ্ভিদ জন্মায়। ইহার পত্র প্রান্ত মিলিত হইয়া সুন্দর ঘটাকার ধারণ করে। ইহার মধ্যে সুন্দর পরিশ্রুত জল সঞ্চিত থাকে। পথিকগণ এই জল পান করিয়া পিপাসা নিবৃত্তি করে। ইহাতে বিশ্বনিয়ন্তার অপার মহিমা প্রচার করিতেছে। যে জলাভূমিতে এই উদ্ভিদ জন্মায় তথায় প্রচুর জল আছে, কিন্তু অতি বিষাক্ত ; সে জল অপেয়। কিন্তু বিধির বিধানে এই উদ্ভিদ তথায় পথিকের জন্য কেমন সুবিমল জল সঞ্চিত রাখিয়াছে।

পত্রের নিম্নভাগ দিয়াই সাধারণতঃ অধিক পরিমাণে স্বেদ নির্গত হয়। যিনি ইচ্ছা করিবেন তিনি সহজেই ইহার প্রমাণ পাইবেন। আবার পত্রের মধ্যশিরা অগ্রভাগ দিয়াই অধিক পরিমাণে জল নিঃসৃত হয়। যে সকল উদ্ভিদের পত্র সরু ও দীর্ঘ তাহাদের অগ্রভাগে প্রচুর জল নিঃসরণ দেখিতে পাওয়া যায়। কার্ত্তিক মাসের অপরাহ্নে যিনি ধান্য ক্ষেত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন তিনিই ইহার যাথার্থের প্রমাণ পাইয়াছেন। বেলা চারিটার সময়, রৌদ্রের তেজ কমিয়া যাইবার পূর্ব্বেই প্রত্যেক ধান্য পত্রের অগ্রভাগে মুক্তাফলের ন্যায় একটী করিয়া জল বিন্দু দেখা দিয়া মাঠের অপরিসীম সৌন্দর্য্য সম্পাদন করে। যে জমীতে যথেষ্ট জল আছে সেই জমীর ধান্য পত্রেই জল বিন্দুর প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়।

মধ্যাহ্নকালেও বুট গাছে হস্ত প্রদান করিলে হস্ত জল কণায় অভিষিক্ত হইয়া যায়। বুট গাছ স্পর্শ করিলেই ইহা সকলে বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু ইহা পরিশ্রুত জল নহে—লবণাক্ত। তামাক গাছেও স্বেদ নিঃসরণ সহজেই প্রত্যক্ষীভূত হয়। ইহাও পরিশ্রুত জল নয়। কিছু আঠাল ও তিক্ত আস্বাদ বিশিষ্ট।

বায়ুমণ্ডলের জলীয় অংশ ঘনীভূত হইয়া যে শিশির উৎপন্ন হয় না তাহা কেহই বলিতে পারিবে না। অনাচ্ছাদিত স্থানের লৌহদণ্ড, প্রস্তর ফলক, বা ধাতু পাত্র প্রভৃতি বস্তুর উপর রজনীতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জলকণা পরিলক্ষিত হয়। তাহা অবশ্য ইহাদের স্বেদ হইতে পারে না। উহাই অবিমিশ্র শিশির! উদ্ভিদ সংলগ্ন জলকণা অধিকাংশই উহার স্বেদ। উল্লিখিত পরীক্ষা গুলি প্রণিধান পূর্ব্বক লক্ষ্য করিলেই ইহাতে আর কাহারও আপত্তি থাকিবে না।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট সার

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় লিখিত

ভারতের কৃষি কুল, বিশেষতঃ যাহারা হিন্দু সম্প্রদায় ভুক্ত, কৃষি কার্য্যে হাড়ের সার ব্যবহার করিতে চায় না। সমুদয় সুসভ্য দেশে হাড়ের সার প্রয়োগে নিজ নিজ ক্ষেত্রে দ্বিগুণ ত্রিগুণ ফসল ফলাইয়াঃধন কুবের হইয়া যাইতেছে, আর আমাদিগের চিরকালই যে দুর্দ্দশা সেই দুর্দ্দশা কৃষিপ্রধান স্থানে কৃষকের উন্নতিতেই প্রকৃত দেশের উন্নতি নির্ভর করে। কেবল শিক্ষার অভাবে কতকগুলা কুসংস্কার, ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আধুনিক বিজ্ঞানলব্ধ নানাবিধ প্রত্যক্ষ ফল সম্পদ হইতে আমাদের কৃষকেরা চিরদিনের জন্ম বঞ্চিত রহিয়াছে। যেরূপ দাঁড়াইয়াছে এক্ষণে ভারতের কৃতবিদ্য সন্তানগণের একমাত্র কর্ত্তব্য প্রত্যেক পল্লীতে সভা সমিতি করিয়া কৃষি শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া, এবং যাহাতে তাহাদের মনে কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণা চিরদিনের জন্ম সম্যকরূপে বিদুরিত হইয়া যায় সেইরূপ চেষ্টা করা। যাঁহারা শাস্ত্র ব্যবসায়ী পণ্ডিতগণ তাঁহাদেরও কর্ত্তব্য কোনরূপে অস্পর্শীয় সার কোন দোষ নাই ইত্যাদি অনুকুল মত ও শাস্ত্রীয় যুক্তি দ্বারা কৃষকের ব্যবহার করায় উৎসাহ বর্দ্ধন করা। অনেক কৃষক একমত হইয়া কার্য্য করিলে সারের আপত্তি কাটিয়া যাইতে পারে। একে এদেশের চাষ বৃষ্টি সাপেক্ষ, যদি দ্বিগুণ ত্রিগুণ ফসল ফলে এরূপ সার ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে অনেক আশা ভরসা আবার কৃষকের মনে জাগিয়া উঠে।

আমরা অদ্য "কৃষকের" গ্রাহককে একটী উৎকৃষ্ট অথচ অনায়াস লব্ধ সার প্রস্তুত প্রণালী শিখাইব। ইহা দ্বারা বিঘা করা উৎপন্ন শস্যের ত্রিগুণ ফসল উৎপন্ন হয়, অথচ চেষ্টা করিলে অতি অল্প ব্যয় ও অতি অল্প শ্রমে প্রস্তুত করা যাইতে পারে। চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশে মনুষ্যের মলমূত্র পর্য্যন্ত সার রূপে ব্যবহৃত হয়।

হাড় প্রস্তুত প্রণালী।

ভাগাড় মাঠ প্রভৃতি স্থান হইতে হাড় সংগ্রহ করিতে হইবে। চামার, ডোম, হাড়ি, মুচি, মেথর প্রভৃতি নীচ জাতির সাহায্যে সামান্য ব্যয়ে সহজে এ কার্য্য হইতে পারে। হাড় দেখিতে যত পুরাতন, জীর্ণ, শীর্ণ, উইধরা অকর্ম্মণ্য হউক কোনটি পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই। হাতুড়ি ও বাটালির দ্বারা কাটিয়া ছোট ছোট টুক্‌রা করিতে পারিলে শীঘ্র কার্য্য সিদ্ধি হয়, নতুবা দীর্ঘকাল বিলম্ব হয়। টুক্‌রা

গুলি ছোট বড় ভেদে গলিতে এক সপ্তাহ হইতে দুই মাস পর্য্যন্ত বিলম্ব হয়। আড়াই মন তিন মন জল ধরে এইরূপ একটা বড় পিপা যোগাড় করিতে হইবে। পিপা যত বড় পাওয়া যায় ততই ভাল।

খুব একটা বড় পিপাতে আড়াই মন জল পূর্ণ করিবে। অনন্তর অতি সাবধানে এবং অল্প অল্প করিয়া সলফিউরিক এসিড (গন্ধক দ্রাবক বা মহা দ্রাবক) সওয়া মন তাহাতে সংযোগ করিবে। এসিড জলের সহিত মিলিত হইলেই আগুনের ন্যায় গরম হইয়া উঠিবে। হাড়ের টুকরা গুলির পরিমাণও আড়াই মন ওজন হইলে ভাল হয়, অতি সাবধানে আস্তে আস্তে টুকরাগুলি ঐ এসিড মিশ্রের সহিত মিলাইবে যেন ছিটা উঠিয়া বস্ত্রে বা কোন অঙ্গে না লাগে ইহা অগ্নির ন্যায় তীব্র পদার্থ, লম্বা কাঠের শাবলদ্বারা হাড়গুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দিবে। এসিড মিশ্রিত জলে হাড়গুলির উপর প্রবল জোর করিতে থাকিবে। মধ্যে মধ্যে কাঠের শাবল দ্বারা নাড়িয়া পরীক্ষা করিবে। সমস্ত টুকরা গুলি গলিত হইলে, পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত একটা বড় চৌবাচ্চাতে রাস্তার ধুলা শুষ্ক মাটি, বালি প্রভৃতি সাত আট মন ওজনের মত গ্রহণ করিয়া ঐ হাড় সংযুক্ত এসিড মিশ্রের সহিত ভাল করিয়া মিশাইবে। পিপা হইতে হাড় এসিড মিশ্র ধুলা মাটিতে ঢালিয়া দিবে ও কাঠের শাবল লাঠি প্রভৃতি দ্বারা ঘুঁটিয়া ঘুঁটিয়া মিশাইবে। যেন ধুলা গুলি সমস্ত উত্তমরূপে সিক্ত হয়। এসিড মিশ্র ধুলাতে শুষ্ক হইয়া যাইলে পূর্ব্বোক্ত চৌবাচ্চাতে সঞ্চিত করিয়া রাখিবে যেন বৃষ্টির জলে ধুইয়া না যায় সেই জন্য কোন আচ্ছাদন যুক্ত স্থানে রাখিয়া দিবে ও প্রয়োজন মত অন্যান্য সার যে ভাবে ব্যবহৃত হয় ইহাও সেই ভাবে ব্যবহৃত হইবে। এই সারের উৎপাদিকা শক্তি অতীব প্রবল। যে জমিতে বিঘাকরা দশ মণ শস্য উৎপন্ন হয়, এই সারগুণে তাহাতে ত্রিশ মণ ফসল ফলিবে। এই সার সকল জাতীয় ফসলে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

সরকারী কৃষি সংবাদ

দাক্ষিণাত্যে আমের বাগান—

আম ভারতে একটা প্রধান ফল—ইতর ভদ্র সকলেই কবে আম পাকিবে যেন উৎসুক হইয়া থাকে। বাগান ছোট হউক বা বড় হউক তাহাতে আমের গাছ থাকিবেই—না থাকা আশ্চর্য্য মনে করিতে হইবে। কিন্তু ভারতে কত বিঘা জমিতে আমের বাগান আছে তাহা ঠিক বলা

যায় না ; কারণ আমের গাছ-সমুদয় ভারতময় ইতস্ততঃ ছড়াইয়া আছে। গৃহস্থের গৃহপার্শ্বেই দুইটা দশটা আমের গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। ফলকথা আম বাগানের জমি যে সমধিক পরিমাণ তাহার কিছু মাত্র সংশয় নাই।

সর্ব্বত্রই আম বাগানে খুব লাভ হয় না, কারণ এমন স্থান আছে যেখনে ২০সের বা ততোধিক আম এক টাকায় কিনিতে পাওয়া যায়। ভাল আম হইলে বা জনবহুল নগর গ্রামের সন্নিকটে বাগান হইলে, রেল বা নৌকাযোগে চালান দিবার সুবিধা থাকিলে এত সস্তা আম পাওয়া যায় না। হায়দ্রাবাদে স্থানীয় বাগানের আম ৮ সের টাকায়, ইহার কম মূল্যে পাওয়া যায় না, তথায় ভাল আমের দাম টাকায় ৪ সের। তথায় মে, জুন মাসে যে আম পাওয়া যায় তাহাতে স্থানীয় লোকের কুলায় না। যে কয়দিন তথাকার আমে চলে চলিল অন্য সময় অন্যত্র হইতে হায়দ্রাবাদের আম আমদানী করা হয়। পূর্ব্ব উপকুল, পুনা, বাঙ্গালোর, সালেম ও চিতমুর হইতে হায়দ্রাবাদে আম আসিয়া থাকে। স্থানীয় দেশী আম যে দরে বিক্রয় হয়, রেল ভাড়া অন্য খরচ করিয়া আনীত হইলেও সেই দরে বিক্রিত হইতে দেখা যায়।

হায়দ্রাবাদে বড়লোকগণের সখের আম বাগান আছে। কেহ কেহ বা নিজের খরচ চলিয়া যাহা উদ্বৃত্ত হইলে বিক্রয় করিব বলিয়া আম বাগান লাগান, কাহারও কেবলমাত্র ব্যবসাই উদ্দেশ্য। কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় যে ক্ষেত্র বা ভাল জাতীয় আম নির্ব্বাচন জন্য ইহারা বিশেষ কোন যত্ন প্রকাশ করে না। যে সে জমি, যা তা আম গাছ লাগান হইয়া থাকে।

উর্ব্বরা মৃত্তিকার স্তর সর্ব্বত্র সমান গভীর থাকে না—কোথাও ১ ফুট গভীর নহে কোথাও বা ৫ কিম্বা ৬ বা ততোধিক ফিট গভীর দেখিতে পাওয়া যায়। গভীর জমিতেই আম বাগান ভাল হয়—অনতি গভীর চটাং জমিতে ফলের বাগানে ফল ভাল হইবে না। এই কারণে উত্তর আর্কট, সালেম, বাঙ্গালোর, ওয়ালটেয়ারের সন্নিকট যেখানকার সারবান মাটি ৫ ফিটেরও অধিক গভীর, যেথানে জমি সরস থাকে অথচ অনাবশ্যকীয় জলভাগ নিম্নস্তরে শুষিয়া যায়, জমিয়া কাদা হইয়া থাকে না, এরূপ স্থান সমূহে আম বাগানের খুব খ্যাতি আছে, গাছে ফল অধিক হয়, গাছ অধিক দিন সতেজ থাকে এবং অধিক দিন বাঁচে। এই সকল অঞ্চলে যে সকল আম বাজারে আদরের সহিত বিক্রয় হয় সেইরূপ আম নির্ব্বাচন করিয়াই বাগানে লাগান হইয়াছে। এই সকল জায়গায় আম বহুদুরে রেলযোগে চালান হয়। ভাদ্রের শেষ এমন কি আশ্বিনের প্রথম পর্য্যন্ত এখানে আম থাকে।

দিল পসন্দ, তুতাপারি, নিলাম, কালাপাহাড়, নবাব পসন্দ, বেনীসান এবং

সেকেরপাড় এই কয় রকমের আমের বাজারে খুব আদর আছে, এই সকল আম* দাক্ষিণাত্যে বহুতর স্থানে ছড়াইয়া আছে।

আমের জাতি বিশেষের ফলের কম বেশী, ভাল জমি, অনুকুল আবহাওয়ায়ও আমের ফলনের তারতম্য হয়। আঁটী হউক বা কলম হউক অধিকাংশেরই এই দোষ দেখা যায়। কতকগুলি আম এমন আছে যে তাহা দুই কিম্বা তিন বৎসর অন্তর মুকুলিত হয়। কিন্তু এমন কয়টি জাতি নির্ব্বাচন করা যাইতে পারে যেগুলি প্রতি বৎসর কিছু না কিছু ফল প্রদান করিবে। দাক্ষিণাত্যে এত আমের বাগান আছে যে যদি প্রতিবৎসর তাহার অর্দ্ধেক ফলে, তবে তত্রস্থ লোকে আম খাইয়া বা চালান দিয়া ফুরাইয়া উঠিতে পারে না।

সব মাটিতে, বিভিন্ন আবহাওয়ায় সব আম সমান ফলে না—বোম্বাইয়ে যে আমের নাম পায়েরি, মান্দ্রাজে তাহাকে পিটার পসন্দ বলে, সেই আমের নামে হায়দ্রাবাদে গোয়াবন্দর, চিতচুরে তাহাকেই বাদামী বলে। ইহা সর্ব্বত্র বেশ ফলে, কিন্তু হায়দ্রাবাদে খুব ফল কম হয়।

হায়দ্রাবাদে পৌষ মাসে আমের মুকুল হইতে সুরু হয় এবং মাঘ মাসের মধ্যেই সব আম গাছ মুকুলিত হয়। বৈশাখে আম পাকে এবং তিন মাসের মধ্যে এতদঞ্চলের অধিকাংশ বাগানের আম শেষ হইয়া যায়। কিন্তু যে সকল আম দেরীতে পাকে, যে সকল আম অধিক দিন গাছে থাকে, সেই সকল আমের নির্ব্বাচন করিয়া বাগান লাগান উচিত। আর্কট সালেম, ওয়ালটেয়ার বাগান গুলি এইরূপ নির্ব্বাচন দ্বারা বিশেষ লাভপ্রদ হইয়া উঠিয়াছে।

হায়দ্রাবাদের আবহাওয়ায় আম ফলে ভাল, ইহা স্বতঃই বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়। হায়দ্রাবাদে কয়েকজাতীয় ভাল আম আছে এবং কতিপয় ভাল জাতীয় আমের কলম এখানে আনীত হইয়া গুণে, গন্ধে অপেক্ষাকৃত উন্নততর ফল প্রসব করিতেছে।

একই জাতীয় আম বিভিন্ন স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া পাশাপাশি তুলনা করিয়া দেখা হইয়াছে যে, ফলের বর্ণে, আকৃতিতে, গন্ধে এবং স্বাদে বিশেষ পার্থক্য আছে— আবহাওয়ার বিভিন্নতাই ইহার একমাত্র কারণবলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে যে, দাক্ষিণাত্যে আবহাওয়ায় শুষ্কতা ও বৃষ্টির অল্পতা হেতু এখানে ফলের ফলন তাদৃশ অধিক না হইলেও ফলে রঞ্জনভাগ কমই উৎপন্ন হয় সুতরাং দাক্ষিণাত্যের ফলের আস্বাদন ভালই হইয়া থাকে।

---

* দিলপসন্দ, কালাপাহাড়, নবাবপসন্দ বাঙলায় সখের বাগানে বহুদিন যাবৎ স্থান পাইয়াছে। সম্প্রতি তুতাপারি আসিয়া অল্পে অল্পে সকল বাগানেই প্রবেশলাভ করিতেছে। তবে দোষ এই বাঙলায় সকল আম ভাল ফলে না। বাঙলায় জমি কিছু অধিক রসা বলিয়া এরূপ ফল কম হয়—ইহাই আমাদের ধারণা। কৃঃ সঃ।

আমের বাগানে জল সেচন—

যেখানে ঘন ঘন জলপ্লাবনে আমের ক্ষেত ডুবিয়া যায় বা যেখানে পুকুর, খাল বা নদী হইতে আমের ক্ষেতে জল সেচিয়া তুলিয়া দেওয়া হয় বা যে সকল স্থানে আমের গাছের শিকড় পর্য্যন্ত জলের স্তরের সীমা সে সকলের স্থানের আম খারাপই হইয়া থাকে। কিন্তু যে সকল উচ্চভূমিতে জল সহজে নিসারিত হইয়া যায়, যেখানে নিতান্ত আবশ্যক হইলে জল সেচন করা হয় এমন স্থানে আম বাগান রচিত হইলে আম ভালরূপ ফলে। উচ্চ শুষ্ক ধরণের জমিতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত আম গাছের পূর্ণ বাড় না সমাপ্ত হয়, ততদিন আমের বাগাণে বিশেষরূপে জল সেচনের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু জমি নিচু ও সরস হইলে তিন চারি বৎসরের পর আর জল সেচনের আবশ্যকতা দেখা যায় না।

ফল ফলানই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। পূর্ণবয়স্ক ও পূর্ণাবয়ব গাছ না হইলে অধিক ফলের আশা করা যায় না, সেই জন্য প্রথমটা গাছের বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতে হয়। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে বর্ষা শেষ হইলে আম গাছের তলা যতদুর ডাল বিস্তৃত হইয়াছে ততদূর কোদাল দ্বারা কোপাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে রৌদ্র বাতাস পাইয়া জমি শুষ্ক হইয়া আসিলে আমের মুকুল ধরিবার সহায়তা হয়। আমের মুকুলে যতদিন না ফলগুলি বড় বড় হয়, ততদিন আম গাছে জল দিলে লাভ না হইয়া ক্ষতি হয়। গাছের গোড়ায় জল পাইলে সহসা ডালে ও পাতায় রস সঞ্চালিত হইয়া বড় বড় মার্ব্বেলের মত ফলগুলিও ঝরিয়া পরিতে আরম্ভ হয়।

হায়দ্রাবাদে আমের বাগানে বিশেষ কোন সার প্রয়োগের আবশ্যকতা দেখা যায় না। দুই কিম্বা তিন বৎসর অন্তর গোশালা বা অশ্বশালার আবর্জ্জনা সার দিলেই যথেষ্ট। সার প্রয়োগের সময় শ্রাবণ ভাদ্র মাস। আমের বাগানে পাতা সারই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল সার বলিয়া গণ্য। অন্য কোন বিশিষ্ট সার দিলে ফলের আস্বাদনের তফাৎ হইয়া যায়। যেখানে আম বাগানে অধিক তেজস্কর সার দিলে গাছ মরিয়া যাইতে দেখা যায়।

আমের আর একটা শত্রু আছে—আম-মাছি (Aphides) নামক পোকা আমের এই ক্ষুদ্র শত্রু। আমের মুকুলের রস শোষণ করিয়া ইহা গাছ সমেত দুর্ব্বল করিয়া দেয় এবং রস শোষণ করিয়া এক প্রকার তরল পদার্থ উৎসর্গ করে—লোকে উহাকে ভ্রমবশতঃ অম্লমধু মনে করে, বস্তুতঃ উহা পোকা উৎসৃষ্ট রসমাত্র, ইহাতে মুকুলে, ফলে, গাছের পাতায়, ডালে বার্ণিসের মত ছোপ ধরিয়া যায়। খুব জোরে বৃষ্টি না হইলে যে ছোপ উঠে না। এরূপ অবস্থা ঘটিলে ফল আদৌ বাড়ে না। সাবান জল বা বর্দো মিশ্রণ, বা তুঁতের জল ইত্যাদি দিয়া গাছে পিচকারী দিতে পারিলে প্রতিকার হয়। মুকুল ধরিবার আগে এই কার্য্য করিলে পোকা লাগে

না*। এ সব দেশে গাছে পিচকারী দিবার প্রথাই দেখা যায় না। কিন্তু আমেরিকায় ইহা বাগানের গাছের একটা বিশেষ পাইট মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। আমেরিকার উদ্যান পালকগণ তাহাতে লাভ দেখিতে পান।

পঞ্জাবে ইক্ষুর আবাদ—১৯১০—

আবাদি জমির পরিমাণ ২৮৪,৮০০ একর। দেখা যাইতেছে যে, ইক্ষুর আবাদি জমির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে; তাহার কারণ বিগত দুই বৎসর ইক্ষু রোপণের সময় আবহওয়া অনুকুল ছিল। গত বৎসর তুষার পাতে অনেক বীজ আক নষ্ট হইয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষে ইক্ষু গুড়ের দামও অধিক। অনুকুল আবহাওয়ায় এবং আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায় ইক্ষুর পক্ষে বড়ই উপকার হইয়াছে। এ বৎসরের ফসল অন্যান্য বৎসরের তুলনায় গড়ে অধিক জন্মিবে বলিয়া অনুমান করা যায়। অমৃতসর, গুজরানওয়াল, শিয়ালকোট্, গুজরাট এবং সাপুর প্রভৃতি স্থানে পশু খাদ্যের অভাব হওয়ায় কতক পরিমাণে ইক্ষু পশুখাদ্য রূপে বব্যহৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে শিয়ালকোটে শতকরা ৭০ ভাগ হিসাবে এবং সাপুরে শতকরা ৫০ ভাগ হিসাবে ইক্ষু পশুখাদ্য রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা স্বত্ত্বেও মোট গুড়ের পরিমাণ ২৫৫,৭১৭ টন। (১ টন—১৭ মণ ২৪ সের) অনুমানে বলা যায় যে, বিগত বর্ষ অপেক্ষা বর্ত্তমান বর্ষে দ্বিগুণ গুড় উৎপন্ন হইয়াছে।

আসামে ইক্ষুর চাষ—

মিঃ কভেণ্টারি কিছুদিন পূর্ব্বে ভারত গবর্ণমেণ্টকে চিনির কারখানা ও কারবার সম্বন্ধে পরামর্শ প্রদান উপলক্ষে বলিয়াছিলেন, আসামের বহু স্থানে ইক্ষুর চাষের উপযোগী ভূমি অনেক আছে।

সকল স্থানে ইক্ষুর চাষ আবাদ করিলে এ দেশে চিনির কারখানা সংস্থাপনের সুবিধা হইতে পারে। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, মিঃ কভেণ্টারির এই উপদেশ উপেক্ষিত হয় নাই। কর্ত্তৃপক্ষ আসামের কামরূপ অঞ্চলে প্রায় ত্রিশ হাজার বিঘা জমিতে ইক্ষুর চাষ করিবার সংকল্প করিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে কামরূপে চাষ করা হইবে। আসামের শ্রমজীবী ও কৃষকদিগকেই কর্ত্তৃপক্ষ ইক্ষু ক্ষেত্রের কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। অধিকতর সুখের বিষয় এই যে, আসামের কোনও ধনচ্য ভূম্যধিকারী ইক্ষুর চাষ করিবার জন্য লক্ষ্মীপুর জেলায় ভূমি সংগ্রহ করিতেছেন। ইক্ষুর চাষের উন্নতি না হইলে এ দেশের বিলুপ্তপ্রায় চিনির কারবারের কখনই উন্নতি হইবে না। এতদিন পরে গবর্ণমেণ্ট প্রত্যক্ষভাবে চিনির কারবারের উন্নতি সাধনেউদযোগী হইয়াছেন দেখিয়া আমরা মুক্তকণ্ঠে তাঁহাদিগের ধন্যবাদ করিতেছি। গবর্ণমেণ্টের এই উদ্যম সফল হইলে আসাম প্রদেশের অনেক স্থানে ইক্ষুর চাষ হইবে।

* মুকুল ধরিবার আগে ধোঁয়া দিলেও পোকা লাগে না।



বৈশাখ, ১৩২০ সাল।

কৃষকের নববর্ষ

দিনের পর দিন আসিতেছে, বর্ষের পর বর্ষ চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু এই সুজলাসুফলা বঙ্গভূমি সেই পূর্ব্বকালের আনন্দ ফিরিয়া পাইতেছে না। পূর্ব্বে চৈত্র সংক্রান্তির মেলায় সমগ্র কৃষিকুল আনন্দে মাতিয়া উঠিত, বৈশাখের প্রথম দিনে কৃষিকুলের প্রধান সহায় গোকুলের সেই প্রাণানন্দকর গোষ্ঠবিহার, গোকুলের সেই নয়ন মনোহর বেশবিন্যাস, দেখিতে আনন্দ বিভোর হৃদয় লইয়া আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা সকলেই মেলাস্থলে উপস্থিত হইত। এখনও স্থানে স্থানে চৈত্রসংক্রান্তির মেলা হয়, এখনও গোষ্ঠবিহার হয়, কিন্তু সে সকলই যেন প্রাণহীন, যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় লোকে পুরাতন একটা প্রথা যেন কোন রকমে বজায় করিয়া রাখিয়া যাইতেছে। যে বঙ্গভূমি আগে ছিল, সেই বঙ্গভূমি এখনও আছে, বঙ্গভূমি এখনও সুজলাসুফলা, এক স্থানে অতিবৃষ্টি কিম্বা অনাবৃষ্টিতে শস্য নষ্ট হইল, অন্যত্র এক গুণের স্থানে দশগুণ শস্য জন্মিল, পর পর দুই বৎসর হয়ত শস্য নষ্ট হইল, কিন্তু তারপর এক বৎসর এমন শস্য জন্মিল, এমন দুই তিন বৎসরের ক্ষতি সুদ সমেত পুরণ হইয়া গেল। তবে কৃষক কেন স্ফূর্ত্তিহীন, কেন কৃষকের অন্নাভাবে হাহাকার! কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়াছে, তবে কেন কৃষকের অভাব ঘুচে না!

ভারতে দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে। সুবৃষ্টি না হইলে অজন্মা হয়। মাঝে মাঝে বর্ষার কম বেশী হইবে, ইহা বিধির বিধানের মত। কিন্তু ভারতে বিশকোটী লোক কৃষিজীবি; সুতরাং এক বৎসর বৃষ্টি না হইলে দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমান যুগের দুর্ভিক্ষে খাদ্যাভাবে মানুষ মরে না—মানুষ মরিতে পারে না—দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানে নানাদিক-

দেশ হইতে খাদ্য যোগান যাইতে পারে। বর্ত্তমান যুগের দুর্ভিক্ষ খাদ্য ক্রয় করিবার পয়সার অভাবে হইয়া থাকে। লোক লাখে লাখে মারা যায় এবং যখন বহুদুরব্যাপী স্থান লইয়া শস্যহানি হয়, তখন গভর্ণমেণ্ট পুর্ত্তকার্য্য ও সাহায্য ভাণ্ডার খুলিয়াও অতি অল্প সংখ্যক লোকের প্রাণ বাঁচান। কৃষকের শ্রমজাত শস্যের দাম বাড়িয়াছে বটি কিন্তু সামান্য কৃষিজীবির অনেক নুতন নুতন অভাবের উপসর্গ আপনার গায়ে চাপাইয়াছে। এই কারণে আশাতিরিক্ত অর্থের অনেকটা অকেজো জিনিষ ক্রয়ে অপব্যয়িত হয়। কৃষকের নিজের অর্থ নাই, পরের অর্থ লইয়া তাহাকে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয় সুতরাং টাকার সুদ যোগাইয়া, নিজের কল্পিত ও বাস্তব অভাব মোচন করিয়া তাহার কিছুই থাকে না। কৃষকগণকে পয়সার অভাবে উৎপন্ন শস্য সমস্ত বেচিয়া ফেলিতে হয় সুতরাং দুর্ব্বৎসরের জন্য খাদ্য কিছুই সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে না। স্থানে স্থানে যৌথ ঋণদান সমিতি গঠিত হইতেছে। গভর্ণমেণ্ট এই সকল সমিতিতে সাহায্য প্রদান করিতেছেন। কৃষকের সুদের ভার কমাইতে পারিলে তাহাদের অনেক আসান হইবে। জমিদারগণ তাহাদিগকে সুদের সুদ হইতে অব্যাহতি দিলে তাহারা নিজ নিজ চাষের জমিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিবে। কিন্তু কৃষককুলকে বাঁচাইবার কয়জনের ইচ্ছা আছে! সেই সদিচ্ছার অভাবে আজ কৃষক জীবন্মৃত, তাই আজ সে এত প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে।

কৃষিকার্য্যে তিনটি জিনিষের আবশ্যক—জমি, কৃষাণ ও মূলধন। এদেশের জমিদারগণ মধ্যবর্ত্তী লোক মাত্র, গভর্ণমেণ্টই সকল জমির মালিক। সূক্ষ্ম হিসাব দেখিতে পাইবে যে গভর্ণমেণ্টকে উৎপন্নের প্রায় শতাংশের ২৫ ভাগ দিতে হয়—বাকি পঁচাত্তর ভাগের অধিকাংশ জমিদারের ঘরে যায়—কৃষক অল্পই উপভোগ করিতে পায়, তাই কৃষকের দুর্দ্দশা ঘুচে না। তারপর যাহারা মজুর খাটিয়া খায়, তাহাদের রোজগণ্ডা খুব কম—লক্ষ্মীর কৃপা না থাকিলে ষষ্ঠীর কৃপা বেশী হয়—দিন দিন লোকসংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে, তাই সকলের গ্রাসাচ্ছাদনের মত রোজগার হয় না—এই কারণে কৃষক ও কৃষাণের দুর্গতি সমান। ইহার একমাত্র প্রতিকার নষ্টশিল্পের পুনরুদ্ধার, অল্প মূলধন লইয়া ছোট শিল্প ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করিয়া যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র মূলধন বাড়ে এবং অনেক লোককে কাজে লাগান যায়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এত অভাব বুকে করিয়া লইয়া কৃষক জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। চেষ্টার অভাবে সুজলা বঙ্গভূমির খাল, বিল, মজিয়া পঙ্কিল হইয়া উঠিয়াছে, পল্লিভূমি কৃষকের আবাস স্থল দারুণ অস্বাস্থ্যকর। দুরারোগ্য রোগসমূহ পল্লিবাসীগণের উপর একাধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়া আছে।

কৃষক এখন কি করিতে পারে—রাজা, জমিদার দয়া করিলে তাহারা না পারে কি?

তাহারা তাহাদের সেই একঘেয়ে পুরাতন লাঙ্গল কোদালের সংস্কার করিতে পারে। বাঙলায় এমন কি ভারতের অনেক স্থানের লাঙ্গল কাঠেই নির্ম্মিত তাহাতে লৌহ বা ইস্পাতের ভাগ খুব কম। এখন কৃষক ক্রমশঃ জমির অবস্থা বুঝিয়া ও আবাদী ফসলের আশুবক মত নূতন ধরণের লাঙ্গল ব্যবহার করিতে শিখিতেছে। ধান, পাট, কলাই, সরিষার জন্য অধিক গভীর চাষের আবশ্যক নাই, কিন্তু মূবজ খন্দ—আলু, পালম, বীট, মানকচু, ওল প্রভৃতির ক্ষেতের গভীর কর্ষণ আবশ্যক। এই জন্য মাটী উলটান লাঙল (Turn-wrest) ব্যবহার করিলে ভাল হয়। এদেশের চাষীরা লেখাপড়া না জানিলেও তাহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ নহে। তাহারা কাজের জিনিষের আদর বুঝে। বিগত বর্ষে ভারতীয় কৃষি-সমিতি হইতে ৫১ খানা মাটি উলটান মেষ্টন লাঙ্গল ও কয়েকখানি প্লানেট জুনিয়ার কোদাল সরবরাহ করা হইয়াছে। তাহারা একটু সচ্ছল বোধ করিলে ছোট বড় নানারকমের হাত কোদাল, চাকা ওয়ালা জুনিয়ার হো, আক কাটা, পাট কাটা, যব গম কাটা যন্ত্র, বীজ বপন যন্ত্র, দাঁড়াটানা যন্ত্র, অচিরে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিবে এবং দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে, স্থানীয় আবশ্যকানুযায়ী কৃষি যন্ত্র নির্ম্মাণের ও মেরামতের কারখানা স্থাপিত হইবে। ইতিমধ্যেই গ্রামে গ্রামে সুদূর পল্লিতে আখমাড়া লোহার কল, গুড় জ্বাল দিবার চিট্‌কা কড়া ব্যবহার হইতেছে। বিগত বর্ষে দুই মণ, এক মণ দশ পাঁচ সের করিয়া বিভিন্ন লোককে, একশত ১৪৯ মণ দার্জ্জিলিঙ আলু, একশত ১৫২ মণ নৈনিতাল আলু ভারতীয় কৃষি সমিতি হইতে যোগান হইয়াছে। কতিপয় উদ্যোগী চাষী আলুর ক্ষেতে পোকা নিবারণের জন্য বোর্দো মিশ্রণের ব্যবহার করিয়াছে। এ সকল সুভ সুচনা সন্দেহ নাই কিন্তু রাজা, জমিদার ও ধনী তাহাদিগের আর্থিক সম্বল করিয়া না দিলে যাহা দুই জনে করিতেছে তাহা দশ জনে করিতে পারিবে না।

সারের বিষয় যে বাঙলাদেশের চাষীরা এককালে অনভিজ্ঞ একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। তাহারা গোময়, গোমুত্র, গোশালা, অশ্বশালা ও গৃহস্থের বাটীর আবর্জ্জনা সারের বিশেষ ব্যবহার জানে। কিন্তু আজকাল গোময় সার পাওয়া কঠিন হইয়া উঠিতেছে কারণ জ্বালানি কাষ্ঠ অতি বিরল, কাঠের বদলে কয়লা স্থান অধিকার করিতেছে, কিন্তু অনেকে হাতের কাছে গোময় পাইয়া ঘুটে প্রভৃতি করতঃ জ্বালাইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারে না। কাজেই কৃষককে অন্য সারের সন্ধানে ফিরিতে হয়। অল্পে অল্পে সকলে ধঞ্চে, শণ, নীল, প্রভৃতি বীজ ক্ষেতে বুনিয়া, তাহাদের গাছগুলি ছোট অবস্থায় জমির সহিত চষিয়া জমি সারবান করিয়া লইবার সন্ধান পাইয়াছে। আসামের চা বাগানের মালিকগণ সবুজ সারের বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন। চা বাগান হইতে ভারতীয় কৃষি সমিতি প্রায়ই দুই শত চারি

শত, পাঁচ শত মণ ধঞ্চে বীজের যোগাইবার হুকুম পাইয়া থাকেন কিন্তু কলিকাতায় সন্নিহিত স্থানে বেশী ধঞ্চে বীজ সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য। ভারতীয় কৃষি সমিতিকে এই কারণে এক শত দেড় শত মণ ধঞ্চে বীজ যাহা সংগ্রহ হইয়া থাকে, সেই বীজ সাধারণ চাষীকে দুই মণ এক মণ হিসাবে সরবরাহ করিতে বাধ্য হইতে হয়। অনেক চাষী এক্ষণে ক্ষমতা অনুসারে ধানের একরপ্রতি (৩ বিঘায়) ৩ মণ হাড়ের গুড়া ও ৩০ সের সোরা ব্যবহার করিয়া প্রতি একরে ২৫ মণ ধানের স্থলে ৩৫ মণ ধনে ফলাইতে পারিতেছে। সাধারণতঃ চাষীরা আম ও আলুর ক্ষেতে রেড়ীর খৈল ব্যবহার করিয়া থাকে কিন্তু এখন তাহারা বন সুপার নামক রাসায়নিক সারের (Superphosphate)* সন্ধান পাইয়াছে। বিঘা প্রতি যে আখের ক্ষেতে তাহারা ৭ কিম্বা ৮ মণ রেড়ীর খৈল ব্যবহার করিত তাহার পরিবর্ত্তে ২ মণ সুপার ও দশ সের সোরা ব্যবহার করিয়া কম খরচে বিঘায় ৩০ মণের স্থলে ৩৫ মণ গুড় উৎপন্ন করিতে পারিতেছে। বিগত বর্ষে ভারতীয় কৃষি সমিতি হাড়ের গুড়া ও রেড়ীয় খৈল ছাড়া অন্ততঃ ১৫০ মণ বন সুপার আখের ক্ষেতে ব্যবহারের জন্য চালান দিয়াছে।

ভারতীয় কৃষি সমিতি

সি আইল্যাণ্ড, আপল্যাণ্ড জর্জ্জিয়ান, কারাভোনিকা প্রভৃতি অনেক জাতীয় আমেরিকান তুলা বীজ আনাইয়া বিগত দুই তিন বৎসর সাধারণকে বিতরণ করিতেছেন এবং কৃষি বিভাগের সহকারী ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ও কৃষি পরিদর্শক শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত কার্পাশ চাষ সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলি কখন পুরাদামে কখন বা অর্দ্ধ মূল্যে কখন বিনা মূল্যে বিতরণ করা হইয়াছে। কিন্তু অদ্যাপিও বাঙলায় তুলা চাষের কোন উন্নতি সাধিত হয় নাই। বাঙলায় ঢাকা-যুক্ত বীজ কাপাস ও বুড়ী কার্পাস ছাড়া কোন তুলা ভালরূপ হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। পূর্ব্ববঙ্গের কৃষি বিভাগের প্রধানতম কর্ম্মচারী রায়বাহাদুর বি, সি, বসু এই মতই প্রকাশ করিয়াছেন।

সুবীজ, সারবান ক্ষেত্র, এবং সময়মত চাষই কৃষির গুঢ় তত্ব। আমাদের দেশের চাষীরা বীজের নির্ব্বাচন কাহাকে বলে তাহা জানিত না বলিলে অত্যুক্তি হয় না এখন তাহারা ভাল বীজের সন্ধান করিয়া থাকে। কিছু দিন পূর্ব্বে সখের বাগানের মালিকগণ কেবলমাত্র সুবীজ খুঁজিতেন এখন কিন্তু দেখা যাইতেছে যে দুই দশ জন সুদক্ষ চাষী খাসীকাটা মুলার বীজ, এমেরিকান ভাল বীট, শালগম, কপি বীজের অনুসন্ধান করিয়া থাকে। বিগত বর্ষে ভারতীয় কৃষি সমিতি ৯॥০ সাড়ে

---

* রাসায়নিক সার সম্বন্ধে কৃষি রসায়ন পুস্তকে আলোচনা দেখুন।

নয় সের আন্দাজ খাসী কাটা মূলা বীজ ও ৭ সাত সের মাত্র কুলকপি বীজ তৈয়ারি করিতে পারিয়াছিল। সমিতির মেম্বর ছাড়া দুই চারি জন সাধারণ চাষী উক্ত বীজ পাইয়াছে মাত্র, বাকী অনেক চাষীকে নিরাশ হইতে হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় যে বাতাস ফিরিয়াছে। "কৃষকের" কর্ম্মক্ষেত্রের গণ্ডী তাদৃশ বিস্তীর্ণ না হইলেও তাহাতে একেবারে নিরাশ হইবার কথা নাই কারণ কৃষক, মনে করে যদি দশ জনের মন গড়িয়া ঠিক করিয়া দিতে পারে তাহা হইলে সেই দশ জন হইতে ভবিষ্যতে সহস্রলোক শিক্ষা পাইবে। "কৃষকে" আলোচনার ফলে কলিকাতার সন্নিকটে সৌখিন লোক দ্বারা ব্যবসায়ার্থ কতিপয় মালঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছে। তাঁহারা বেল, জুই, রজণীগন্ধ ও মারসাল নিল, পালনিরোণ, ব্লাকপ্রিন্স, লেবেনিয়া প্রেসিডেন্ট মাস প্রভৃতি গোলাপ সমিতির কথামত চাষ করিয়া বেশ দুপয়সা লাভ করিতেছেন। নিম্নবঙ্গে ও পূর্ব্ববঙ্গে গোলাপ ভাল হয় না তথাপি অল্প বিস্তর চাষে কাজ চালান গোছ ছোট খাট ব্যবসা চলে। আগে যে মেডেন হেয়ার ফার্ণের গাছ লোকে উলুর ছাউনি গাছঘর ব্যতীত জন্মাইতে পারিত না এখন সেগুলি কৃষি সমিতির সঙ্কেত মত গাছ তলায় বা ছায়া যুক্ত স্থানে সহজেই জন্মিতেছে। এই গুলি বোকে বা তোড় বাঁধিবার বিশেষ উপযোগী পত্র। ফুলের আদর দিন দিন বাড়িতেছে। সৌখীনের সখের জীনিষ যোগান দিয়া এমেরিকা, জার্ম্মনি ইংলণ্ড যে পয়সা রোজগার করে এই নানা পুষ্প শোভিত ভারতভূমে ফুল যোগাইয়া কি শত শত লোকে তাহার সহস্রাংশের এক অংশও রোজগার করিতে পারে না! নিশ্চয়ই পারে, আবশ্যক— উদ্যোগ, আয়োজন, মূলধন, সততা ও পরস্পরের কার্য্যে আস্থা।

"কৃষকের" আশা অতিউচ্চ ও অনন্ত প্রসারিণী। কৃষক অরণ্য কাটিয়া নগর বসাইতে চায়, বিবিধ শিল্পের উপাদান যোগাইতে চায়, অতি দরিদ্রকে ধণী করিতে চায়। কিন্তু তাহার সকল আশা বিধির বিধানের উপর নির্ভর করে। উদ্যোগী পুরুষ, উপযুক্ত ক্ষেত্রে এবং দেব অনুগ্রহ ভিন্ন একার্য্য সম্ভবপর নহে। ইহার কোন একটির অভাব হইলে কৃষককে অনেক আশা বুকে লইয়া মৃত্যুদ্বারে উপস্থিত হইতে হয়। "কৃষকের" আশা যে বঙ্গের ঘরে ঘরে এক এক খানি কৃষক বিরাজ করুক। কিন্তু উপযুক্ত সময় এখনও আসে নাই বলিয়া হউক বা আশানুরূপ উদ্যোগ আয়োজন হইতেছে না বলিয়া হউক "কৃষকের" সে আশা অদ্যাপিও পরিপূরিত হয় নাই। "কৃষক" অনুপযুক্ত হইলে আজ ১৩ বৎসর তাহার সত্ব অক্ষুন্ন রাখিতে পারিত না. কৃষক, অনুপযুক্ত হইলে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের সহায়াতা লাভে সমর্থ হইত না, কৃষক অকেজো হইলে কুচবিহারের মহারাজা ও অন্যান্য দুই চারিটি ধণী ও জমিদারের সহানুভূতি পাইত না, কৃষক আবশ্যকীয় নাহইলে বঙ্গের প্রধান প্রধান কৃষি সমিতি তাহার গ্রাহক শ্রেণী ভুক্ত হইতেন না, কৃষক কাজের কথা লেখে বলিয়া, কৃষক শত

সহস্র লোকের কৃষি সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তর দেয় বলিয়া পুষা তত্ত্বানুসন্ধানাগারের কৃষি-দক্ষ কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত এম, এম, দে সাগ্রহে কৃষকে তাহাদের প্রবন্ধ প্রচার করিতে প্রয়াসী। কৃষক চিত্তাকর্ষক বলিয়া উকিল, কর্ণেল কলেজের ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত প্রকাশচন্দ্র সরকারের মত লেখক পাইয়াছে। অবশেষে বলি আজিও মহামান্য শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ মুখোপাধ্যায় যাহার হাল ধরিয়া আছেন, ইহা দুরাশা নহে। সে 'কৃষক' আপনার পথে ঠিক চলিবে হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ ভারতীয় কৃষি সমিতির মুখপত্র বলিয়া যে "কৃষকের কল্যাণকামনা করেন। "কৃষক" এখন দীন দরিদ্র। এমেরিকা, ইলণ্ডের লোকের মত ইহাকে সাজাইতে হইলে সাধারণ বঙ্গবাসীর চেষ্টা আবশ্যক। এক কোটী বঙ্গবাসীর মধ্যে কয়েক সহস্রের করুণ দৃষ্টি পড়িলে গুণ, জ্ঞান, গরিমায় "কৃষক" সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারে। স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে "কৃষকের" ইচ্ছা যে বঙ্গের ঘরে ঘরে নিজের খরচে আপনি না ডাকিতে আসিয়া হাজির হয়।

ভূষার সারবত্বা—এমেরিকায় পরিক্ষা—২ পাউণ্ড ভূষা এবং ২ পাউণ্ড খাড়ি-লবণ বাঙলা আধ কাঠায় পরিমাণ গাজর ক্ষেতে ছড়াইয়া দেখা হইয়াছে যে সম পরিমাণ হাড়ের গুঁড়া ছড়াইয়া যে ফল হয় তদপেক্ষা ভাল ফল হয়। গাজরের রঙ অতি সুন্দর হইয়াছিল।

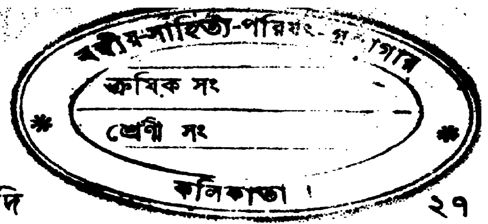
বাঙলার আধ কাঠা পরিমাণ আলু ক্ষেতে ১ পাউণ্ড খাড়ি লবণ ও ২ পাউণ্ড ভূষা ছড়াইয়া অলুর ফলন অন্যান্য সার প্রয়োগ অপেক্ষা কিছুতেই কম হয় নাই। আলু পুতিবার সময় নালীতে আধ কাঠায় দুই পাউণ্ড ভূষা ছড়াইয়া আলু পুতিলে তুল্য ফল হয়।

রুবার্ব ক্ষেতে ঐ পরিমাণ জমিতে ৬ আউন্স গুয়ানোর সহিত দুই আউন্স ভূষা মিশাইয়া দেওয়াতে অন্য সার দিবার তুল্য ফল দাঁড়াইয়াছে। তরল অবস্থায় দেওয়ায় অধিকতর ফলদায়ী হইয়াছে।

বাধাকপির ক্ষেতে সমপরিমাণ জমিতে কেবল মাত্র ২ পাউণ্ড ভূষা প্রয়োগে অতি সুন্দর কপি ফলিয়াছে। কপির যেমন গাঢ় সবুজ রঙ হইয়াছে কপি তেমনি ভারি ও দেখিতে সুন্দর হইয়াছে।

বর্ষার আরম্ভে ঘাস মাঠে অর্দ্ধ কাঠা পরিমাণ জমি প্রতি ১ পাউণ্ড হিসাবে ভূষা ছড়াইলে ঘাস খুব বাড়ে।

২ ভাগ কাঠের ছাই ও এক ভাগ ভূষা মিশাইলে যে সার প্রস্তুত হয় তাহা প্রায় গুয়ানোর তুল্য ফল প্রদান করিয়া থাকে। এই সার বীজ বপনের সমকালে হাতে যথেচ্ছ ছড়ান হইয়া থাকে অথবা বীজ বপনের লাঙ্গল দ্বারা লাঙ্গলের শিরালে বীজ বপন করা হইলে সেই শিরালে প্রয়োগ করিলে সালগম খুব শীঘ্র জন্মায় ও ফসল খুব ভাল হয়। বাঙলার মাপে আধ কাঠায় ২পাউণ্ড ভূষা ও ৪পাউণ্ড ছাই ব্যবহার করিতে হইবে।



পত্রাদি

পিট ও মেডেন লোম মাটি—এসানসোল হইতে কোন ইংরাজী পত্র প্রেরক পিট (Peat) এবং মেডেন লোম (Maiden) মাটি কি প্রকার জানিতে চাহেন—

বাঙলা দেশে সাধারণতঃ উদ্ভিজ্জগলিত সার মাটিকে পাঁক মাটি বা বোদ মাটি বলা হইয়া থাকে। ইহারই ইংরাজী নাম পিট। পিট মাটি কিন্তু দুই তিন প্রকারের আছে জলা ভূমির জলজ উদ্ভিদ পচিয়া যে পিট বা বোদ মাটি উৎপন্ন হয় তাহাতে চাযের উপযুক্ত সার মাটি খুব কমই থাকে। ঐ মাটিতে কয়েক জাতীয় আর্কিড বা মরসুমী ফুল গাছ বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়। শস্য কাঁকুড় প্রভৃতি সব্জী ক্ষেতে বা ফল বৃক্ষের সম্পূর্ণ সার যোগাইবার শক্তি এই মাটির নাই। যখন দেখিতে পাইবে যে উদ্ভিজ্জগলিত পদার্থ পচিয়া একেবারে পাকে পরিণত হইয়াছে এবং বহুকাল যাবৎ মৃত্তিকার একটি স্তররূপে বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাকে ও পিট বলা যাইতে পারে এবং এই মাটি খুব সারবান ও তেজস্কর। আবার খনির সন্নিহিত স্থান সমূহে গলিত খনিজ পদার্থে মৃত্তিকার কর্দ্দমময় এক প্রকার স্তর নির্ম্মিত হয়। ইহাও পিট বিশেষ কিন্তু এই মাটি অধিকাংশ সময় বৃক্ষাদির পরম অনিষ্টকারী। এই মাটি প্রায়ই বিষাক্ত খনিজ তৈল বা জলে সিক্ত থাকে সুতরাং উহা বৃক্ষের জন্য সার রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে না।

মেডেন লোম—দোঁয়াস মাটিকে বলা যায়। যে দোঁয়াস মাটিতে স্বভাবতঃ বনজ উদ্ভিদ জন্মিয়াছে মাত্র কিন্তু কখন কোন শস্য উৎপন্ন হয় নাই বা যে মাটির কখন চাষ কারকিৎ হয় নাই। বাঙলা দেশে এই মাটিকে আচট্ বা আভাঙা মাটি বলা হইয়া থাকে। এই মাটির তেজ অধিক। এই মাটিতে চাষ করিলে কিছু দিন বিনা সারে বেশ ফসল হয়। এই মাটি উপর দিক হইতে পর পর তিন কোদাল মাটি কাটিয়া লইয়া স্তরে স্তরে সাজাইয়া কিছু দিন রৌদ্র, বাতাস বৃষ্টি খাওয়াইয়া অবশেষে অন্যক্ষেতে ব্যবহার করিলে ক্ষেত খুব সারবান হইয়া উঠে ক্ষেতে ব্যবহারের জন্য যখন মাটি কাটা হইবে তখন তিন স্তরের মাটি খাড়াভাবে কাটিয়া লওয়া উচিত। তিন স্তরের তিন রকম মৃত্তিকা মিশ্রিত হইয়া ক্ষেতে পড়িবে।

সুট বা ভুষা কালী—শ্রীগণনাথ চক্রবর্ত্তী চাতরা বীরভূম উদ্যান কার্য্যে ভুষা কালীর ব্যবহার জানিতে চাহেন। ফার্ণের পট বা টব বদল করিয়া দিবার সময় পাতাসার ছাদভাঙা রাবিস মাটি ও কাঁকরের সহিত কিঞ্চিৎ পরিমাণ ভুষা

মিশাল করিয়া দিলে ফার্ণের পাতার রঙ ভাল হয়। গোলাপ ক্ষেতে গোলাপের সারের সঙ্গে ভূষা মিশাইলে গোলাপের রঙ্গ খুব খোলতাই হয়। ভূষা, খুব কম পরিমাণে ব্যবহার করিতে হয়। ১০০পাউণ্ড সারের সহিত ১পাউণ্ড ভূষা যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। সেই সার প্রায় এক শত গোলাপ গাছে দেওয়া চলে। ভূষার কীট-নিবারক গুণ আছে। অনেকেই জানেন টেপারি গাছে পোকার উপদ্রব খুব বেশী বেশী হইয়া থাকে। ক্ষেতে টেপারির চারা পুতিয়া খুব মিহি মাটির সহিত ঝুল বা ভূষা মিশাইয়া গাছের উপরে ও তলা মাটিতে ছড়াইতে অরম্ভ করা গেল। তখন ও পাতা গুলি সব বেশ খোলেসাই। পাতা বড় হওয়া পর্য্যন্ত একার্য্য বন্ধ রহিল না, ইহাতে গাছের কোন ক্ষতি হইল না, গাছগুলি কাল ভুতের মত দেখাইতে লাগিল মাত্র কিন্তু পোকার হাত হইতে নিস্তার পাইল। পাতায় কীট পতঙ্গ বসিতে পাইল না বা পাতা খাইয়া পাতার উপর ডিম্ব পাড়িয়া বংশ বৃদ্ধি করিতে পারিল না। ভূষা, জমিতেও সার যোগাইল। কীট পতঙ্গ ভূষার স্বাদ গন্ধ আদৌ সহিতে পারে না। গোলাপে বড় পোকা লাগে সুতরাং ভূষা গোলাপ ক্ষেতে অত্যাবশ্যক। স্থানান্তরে ভূষার সারবত্তা সম্বন্ধে এমেরিকা হইতে যে কয়টি পরীক্ষা হইয়াছ তাহা প্রকাশ করিয়াছি।

কাঁচা আম রপ্তানি—আজকাল প্রায় প্রতি জাহাজে বরফ গুদাম থাকে। ঐ সকল গুদামে বিদেশে রপ্তানীর জন্য ফলাদি পচনশীল দ্রব্য সমূহ নীত হয়। কাঁচা আম বিদেশে যাইয়া চাটনি জেলী প্রভৃতি নানারূপে রূপান্তরিত হইয়া আসিয়া বোতলে বোতলে চাট্‌নি ওয়ালার দোকানে দোকানে বিরাজ করিতে থাকে। এখানে ঐ কার্য্য বা শেষ পর্য্যন্ত শেষ করিতে পারিলে ঘরের পয়সা ঘরেই থাকিয়া যাইতে পারে। অধিকন্তু বিদেশে পাঠানর উদ্যোগ ও করা যাইতে পারে। আজ কিছু কিছু এই রকম চাটনি জেলী বিদেশে চালান যাইতেছে। কিন্তু তাহার পরিমাণ উল্লেখ যোগ্য নহে। বলিলেই আমাদর দেশে তার্কিকেরা বলিবেন। যে একদিনে মনোহর রোম নগরী নির্ম্মিত হয় নাই সবই ক্রমশ ভাল, আমরা বলি সময় থাকিতে করিলেই ফল ফলে।

সার-সংগ্রহ

অর্থোপার্জ্জনের সহজ উপায়।

অধুনা ভারতবাসী দেশে শিক্ষা বিস্তারের আবশ্যকতা অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। দেশের নানাস্থানে স্কুল পাঠশালা, মক্তব, মাদ্রাসা, উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও ক্রমে হইতেছে। সরকার পক্ষীয় শিক্ষোদ্যম ব্যতীত হিন্দু মুসলমান স্ব স্ব আবশ্যকানুসারে জাতীয় বিদ্যালয় ও জাতীয় কলেজ স্থাপনেও উদাসীন নহেন, এমন কি তাঁহারা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কল্পে দৃঢ়-সংকল্প হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছেন। আশা করা যায় অচিরেই তাঁহাদের আশালতিকা ফলবতী হইবে। শিক্ষা বিস্তারের এত উদ্যম সত্ত্বেও এদেশের শতকরা ৯০ জন লোক এখনও অশিক্ষিত, তাই জন্মভূমির কৃতি সন্তান মাননীয় মিঃ গোখলে দেশময় নিম্নশিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার আবশ্যকতা অনুভব করিয়া সাধন-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। দেশে এখনও শতকরা ৯০ জন বা ততোধিক লোকের সাধারণশিক্ষা এবং শতকরা ৯৯ জন লোকের উচ্চশিক্ষা লাভের অভাব আছে বটে কিন্তু তথাপি ইতিমধ্যেই শিক্ষিত দলের মধ্যে "হা অন্ন" "হা অন্ন" রব উঠিয়াছে। শিক্ষালাভ করিয়া অনেকে অন্নের সংস্থান করিতে না পারিয়া নিজের জীবন ও শিক্ষার প্রতি ধিক্কার দিতেছেন, অনেকেই বলিতেছেন শিক্ষিত না হইয়া অশিক্ষিত থাকিলেই ভাল ছিল, কৃষিকর্ম্ম ইত্যাদি শ্রমজনিত ব্যবসা অবলম্বনে জীবিকা উপার্জ্জনে সক্ষম হইতাম। কেহ পরীক্ষায় পাশ করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিতেছেন, কেহ হায় চাকুরি ! হায় চাকুরি ! বলিয়া বিশ্ব-সংসার সমস্তটা ঘোর অন্ধকার দেখিতেছেন। ফলতঃ এদেশে শতকরা ১০ জন লোক শিক্ষা লাভ করিতে না করিতেই যখন শিক্ষার বাজার এত সস্তা হইয়া পড়িয়াছে এবং শিক্ষিত লোকদের হতাদর হইয়াছে, তখন অনেকেই হতাশ ও শিক্ষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু ইহা যে শিক্ষার দোষ নহে বরং আমাদের বুদ্ধির দোষ তাহা আমরা আদৌ চিন্তা করিনা। জর্ম্মনীতে সকলেই শিক্ষিত, ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ ও আমেরিকায় শিক্ষিত লোকের সংখ্যা ভারত অপেক্ষা অনেকগুণ অধিক তথাপি তাহারা এতদ্দেশবাসী অপেক্ষা সহস্রগুণে সুখী ও সম্পদশালী।

ফলকথা এই যে আমরা বুঝিয়াছি শিক্ষার উদ্দেশ্য চাকুরি করা। চাকুরি করা ভিন্ন শিক্ষার অন্য কোনও উদ্দেশ্য আছে কিনা এবং শিক্ষাদ্বারা চাকুরি,

ওকালতি, মোক্তারী, কবিরাজী ব্যতীত অর্থোপার্জ্জনের অন্য কোনও পন্থা আছে কিনা তাহা আমরা চিন্তা করিতেও ইচ্ছুক নহি। প্রকৃত প্রস্তাবে চাকুরি ও তাদৃশ কার্য্যের জন্য শিক্ষা নিকৃষ্ট ও সঙ্কীর্ণতর অবলম্বন। শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষি প্রভৃতি প্রশস্ততর ও উন্নতিজনক ব্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক সুখ সৌভাগ্য লাভ করার জন্যই শিক্ষার অধিক প্রয়োজন, শিক্ষা তাহারই শ্রেষ্ঠতম উপকরণ। শিক্ষা ব্যতীত শিল্প বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যে আশানুরূপ উন্নতি লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। ভারতবাসী শিক্ষা বিষয়ে পশ্চাদ্পদ বলিয়াই শিল্প, বাণিজ্য, ও কৃষি কর্ম্মে সভ্যজগত অপেক্ষা বহু পশ্চাতে পতিত। শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষিই মানব জাতীর উন্নতির প্রধান সোপান।

আমি অবতরণিকাতেই অনেক সময় নষ্ট করিলাম, পাঠক মহোদয় ক্ষমা করিবেন। এখন প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে যাহা বলিবার বলিতেছি। যে সকল শিক্ষিত নব্য যুবক শিক্ষালাভ করিয়া অর্থোপার্জ্জনের কোনও পন্থা দেখিতেছেন না, কর্ম্ম জীবনের সম্মুখে বিশ্বসংসার ঘোর অন্ধকার দেখিতেছেন তাঁহাদের অবগতির নিমিত্ত ও অর্থোপার্জ্জনের একটী পথ প্রদর্শন মানসে আমার নিজ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া কয়েকটী কথা ব্যক্ত করিতে এস্থলে উদ্যত হইয়াছি। যাঁহারা জীবিকা উপার্জ্জনের উপায় সম্বন্ধে কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া আছেন, তাঁহাদের জন্য আসাম, পার্ব্বত্য ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম জেলা ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে অর্থোপার্জ্জনের বিশালক্ষেত্র পড়িয়া আছে। থেকাসের ডাইরেক্টরী খুলিয়া দেখিবেন আসাম প্রদেশে ও চট্টগ্রামে কত চাবাগান বিরাজমান; জলপাইগুড়ি ও দার্জ্জিলিঙ্গ জেলাতেও অসংখ্য চাবাগান আছে। বলা বাহুল্য যে এসকল চা বাগানের শতকরা ৯৯ জন স্বত্বাধিকারী ইয়োরোপীয় কর্ম্মী পুরুষ। তাঁহারা এদেশ হইতে প্রতিবৎসর বহুলক্ষটাকার চা ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য ইয়োরোপ প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। তাঁহাদের বাগানে ও কৃষিক্ষেত্রে যতলোক খাটিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে তাহাদের সংখ্যা ভারতের সমুদয় ছোট বড় রাজকর্ম্মচারীদের অপেক্ষা বেশী ব্যতীত কম নহে। বিদেশীরা আমাদের পাহাড়ে জঙ্গলে বাস করিয়া বৎসর বৎসর কত লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়া লইয়া যাইতেছে আর আমরা ১৫।২০ টাকার কেরাণীগিরির জন্য কত জনের পদলেহন করিতেছি, কতজনের তোষামোদ করিতেছি, কতজনের নিকট ভেট উপঢৌকন উপস্থিত করিতেছি তাহার ইয়ত্তা নাই।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, চা বাগান করা, শত সহস্র কুলি মজুর পরিপোষণ, ও কল কারখানা স্থাপন বহু অর্থসাপেক্ষ কার্য্য; তাহা দরিদ্র ভারতবাসীদের পক্ষে

সহজ সাধ্য নহে। বলি, ভ্রাতঃ তাহা অপেক্ষাও সহজ উপায়ে অল্প মূলধনে অর্থোপার্জ্জন করা যাইতে পারে।

আসাম, পার্ব্বত্য ত্রিপুরা ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের কথা বলিবনা; আমার জন্মভূমি চট্টগ্রামে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের সংলগ্ন সীতাকুণ্ড পাহাড় শ্রেণীতে নিজ জমীদারী ভুক্ত পাহাড়ে অর্থোপার্জ্জনের যে সুবিধা ও স্বর্ণসুযোগ দিব্যচক্ষে দেখিতেছি এবং স্বয়ং পরীক্ষাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া প্রত্যক্ষ ফল পাইতেছি তাহাই নব্য শিক্ষিত যুবক মণ্ডলীর কৌতুহল নিবারণ কল্পে নিম্নে ব্যক্ত করিতেছি।

(ক্রমশ)

শ্রীমহাম্মদ সফী মিয়া।

বাঙ্গালায় পাটের চাষ—আগামী শরৎকালে যে পাট উৎপন্ন হইবে, এখন হইতে তাহার জন্য টাকা দাদন করা যাইতেছে। অনেকে ১০৷৷০ পর্য্যন্ত মণ দিতে স্বীকার করিয়াছে। পাটের চাষে কৃষকের হস্তে নগদ টাকা আসিতেছে।

গোচারণের মাঠ—মিঃ চক্রবর্ত্তীর প্রশ্নোত্তরে মিঃ কার বলিয়াছেন, গোচরগুলি ক্রমে কৃষি ক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে। আইন করিয়া ইহা নিবারণ করা সহজ নহে কৃষকেরা যখন বুঝিবে, হৃষ্টপুষ্ট গরু না হইলে কৃষি কার্য্য চলে না, তখন তাহারা গোচর রাখিবার জন্য নিজেরাই ব্যস্ত হইবে।

উত্তরটা ভাল হয় নাই। পূর্ব্বে বঙ্গের প্রত্যেক গ্রামে গোচর ও হালট ছিল। প্রাচীন কাগজ পত্রে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এখন তাহার চিহ্ন মাত্র নাই। গভর্ণমেণ্ট কত কি করেন, আইনদ্বারা কি গো-চর করিতে পারেন না?

কলার ময়দা—(Bannana meal) কদলীর পুষ্টিকারিতা গুণ জানিতে পারিয়া জার্ম্মানী ও অপরাপর দেশে কলার খুব আদর বাড়িতেছে। ভারতে কলা প্রচুর জন্মায় ও আরও অধিক কলা উৎপন্ন করা যাইতে পারে। কলা দুর দেশে পাঠান সহজ নহে। কলার ময়দা করিয়া পাঠাইতে অনায়াসে পারা যায়। আমেরিকায় বহুল কলার চাষ সেখান হইতে নানা স্থানে কলার ময়দা চালান যায়। কলার ময়দা তৈয়ারী করা নিতান্ত সহজ নহে। যব গম জৈয়ের মত সহজে চুর্ণ করা যায় না। কলাও শুষ্ক করিয়া চুর্ণ করিতে হয়। কদলী চুর্ণ করিবার জন্য আমেরিকায় বিশেষ কল ব্যবহৃত হয়। ভারতে সে সব কল আমদানী হয় নাই। ভারতে কিন্তু কলার ময়দা প্রস্তুত করিবার বিশেষ সুযোগ আছে। এখন চাই উদ্যোগ চাই উদ্যোম।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

জ্যৈষ্ঠ মাস।

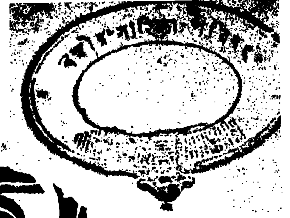
কৃষিক্ষেত্র।—এই সময় আমন ধান বোনা হয়, পাট ও আউশ ধানের ক্ষেত নিড়াইতে হয়, বেগুন ভাঁটি বান্ধিয়া দিতে হয়। জৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত অরহর বীজ বপন করা চলে। আদা, হলুদ, কচু, ওল প্রভৃতি জ্যৈষ্ঠ মাসেও বসাইতে পারা যায়। শাঁকালুর বীজ বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত বপন করা চলিতে পারে।

সব্জী বাগ।—এই মাসে ভুট্টা বীজ বপন করা উচিত। কেহ কেহ ইতিপূর্ব্বেই বপন করিয়াছেন। জলদি ফসল হইতে ইতি মধ্যে ভুট্টা ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। লাউ, কুমড়া, ঢেঁড়স, পালা ঝিঙ্গা, পালা শসার বীজও এই মাসে বপন করা চলে। বর্ষাতি মুলা ও নানা জাতীয় শাক বীজের বপন কার্য্য জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমেই শেষ করিতে হইবে। জলদি ফুল কপি খাইতে গেলে এই সময় হইতে পাটনাই ফুল কপি বপন করিয়া চারা তৈয়ারি করিতে হইবে।

ফুলবাগিচা।—এই সময় জিনিয়া, দোপাটী, গাঁদা বীজ বপন করিতে হইবে। ডালিয়া বীজ ও এই সময় বপন করা চলে। কেহ কেহ ডালিয়া মূল এই সময় বসাইতে বলেন, আমরা কিন্তু বলি আমাদের দেশের অত্যধিক বর্ষায় মূল গুলি পচিয়া যাইবার ভয় আছে, সেই জন্য বর্ষান্তে বসাইলেই ভাল। কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র ফুলের মুখ দেখিতে গেলে একটু কষ্ট স্বীকার না করিলে চলে না। পূর্ব্ব কথিত ফুল বীজ ব্যতীত আমরাহ্বাস, কক্সকোম্ব, আইপোমিয়া, রাধাপদ্ম, ধুতুরা, মার্টিনিয়া প্রভৃতি ফুল বীজ বপনেরও এই সময়।

ফলের বাগানের এখন বিশেষ কোন পাট নাই। ফল আহরণ এখন একমাত্র কার্য্য। তবে কুল, পীচ, লেবু প্রভৃতি যে সকল গাছের থাপকলম করিতে হইবে তাহার বন্দোবস্ত এখন হইতে করিতে হয়।

পার্ব্বত্য প্রদেশে কিন্তু ঋতুর পার্থক্য হেতু বিভিন্ন প্রথা অবলম্বন করা হইয়া থাকে। সেখানে এখন ডালিয়া ফুটিতেছে। তথায় মটর ও সীম ফলিতেছে। বাঁধা কপি ও ফুলকপির বীজ এখন বপন করা যায়।



কৃষক।

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৪শ খণ্ড। } জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০ সাল। { ২য় সংখ্যা।

মালদহে নারিকেল চাষ।

শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত লিখিত

মালদহ জেলায় রীতিমত নারিকেলের চাষ আবাদ নাই, বা কোথাও কাহারও দুই একটী বিস্তীর্ণ বাগান নাই, তবে সখ করিয়া আম্র বাগানে বা বাটীর সন্নিকটে কেহ কেহ দুই পাঁচটী গাছ লাগাইয়াছেন। সেই সমস্ত গাছেও নানা বিঘ্ন দেখা যায়, কোনটী পোকা ধরা, কোনটী অর্দ্ধ মৃতবৎ ও কোনটীর বা অকাল মৃত্যু ও ঘটিয়া থাকে, এবং আশানুযায়ী ফলও প্রসব করিতে দেখা যায় না। যাহা হউক আমরা নানাবিধ কৃষি বিষয়ক পুস্তকাদি পাঠ ও তদভিজ্ঞার ফলে দুই দশটী গাছের আবাদ করিয়া যেরূপ ফল লাভ করিয়াছি, এবং আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্র পাঠে ইহার গুণাগুণ সম্বন্ধে যতদূর অবগত হইয়াছি তাহাই এস্থলে লিপীবদ্ধ করা হইল, জানিনা ইহাতে ব্যক্তি বিশেষের মতানৈক্য থাকিলেও মোটামুটী চাষ আবাদ প্রণালী পাঠ করিয়া পাঠকবর্গের কথঞ্চিৎ উপকার বোধ হইলেই কৃতার্থ হইব। প্রথমতঃ গুণাগুণ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়া পরে চাষ প্রণালী ইত্যাদি বিবৃত হইতেছে।

"নারিকেরো দৃঢ় ফলো লাঙ্গলী কূর্চ্চ শীর্ষকঃ।
তুঙ্গ স্কন্দ ফলশ্চৈব তৃণরাজ সদাফলঃ॥
নারিকেলং গুরু স্নিগ্ধং পিত্তঘ্নং স্বাদু শীতলং।
বল-মাংস করং হৃদ্যং বৃংহণং বাস্ত শোধনম্॥
বিশেষতঃ কোমল নারিকেলং
হন্তি পিত্ত জ্বর মূত্র দোষান্।

তৃষ্ণা ছর্দ্দি দাহাময় মাশু হন্তাৎ
সরক্ত পিত্ত প্রভবান্ বিকারান্ ॥
নারিকেলাম্বু তরুণং তৃষ্ণায় পিত্ত নাশনং।
বালস্য নারিকেলস্য জলং প্রায়ো বিরেচনম্।
নারিকেলোদকং জীর্ণং বিষ্টাম্ভগুরু পিত্তলং ॥
নারিকেল ফলোদ্ভূতং তৈলং বাজী করং গুরু।
পোষণং ক্ষীণ ধাতুনাং বাত পিত্ত প্রণাশনম্ ॥
শুক্রে নষ্টে প্রমেহে চ শ্বাসে কাশে চ যক্ষ্মণি।
মেধা লোপেচ হিতদং ক্ষতাশু করণং শুভম্ ॥
নারিকেলোদ্ভবা ক্ষীরী স্নিগ্ধা শিতাতি পুষ্টিদা।
গুবর্বী সুমধুরা বৃষ্যা রক্ত পিত্তা নিলাপহা ॥
নারিকেলস্য তালস্য খর্জ্জুরস্য শিরাংসিতু।
কষায় স্নিগ্ধ মধুর বৃংহনানি গুরুণি চ ॥
নারিকেলো দকং কাংসে তাম্র পাত্রে স্থিতং মধু।
গব্যঞ্চ তাম্র পাত্রস্থং মদ্য তুলং ঘৃতং বিনা ॥

নারিকেল তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ নারিকেলের বহুবিধ নাম করণ করিয়াছে। যেমন, নারিকের, দৃষ্ট ফল, লাঙ্গলী, কুর্চ্চ শীর্ষ, তুঙ্গ, স্কন্ধ ফল, তৃণ রাজ ও সদা ফল, এতদ্ব্যতীত রাজ নির্ঘণ্ট, শব্দ মালা প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে নারিকেলের আরও অনেক নাম পরিদৃষ্ট হয়, যথা রসফল, দাক্ষিণাত্য, দুরারুহ, ত্র্যম্বক ফল, সদা পুষ্প, শিরঃ ফল, নাড়িকেল ইত্যাদি। বারমাস নারিকেল ফলে এই জন্য ইহার একটী নাম সদা ফল। ভারতের দাক্ষিণাত্য প্রদেশে ইহার প্রাচুর্য্য নয়ন গোচর হয়, এই জন্য ইহার একটী নাম দাক্ষিণাত্য। আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্রে চিকিৎসা তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ পরীক্ষা দ্বারা নারিকেলের যে সমস্ত গুণাবলী বিবৃত করিয়াছেন, তাহা এই; নারিকেল গুরুপাক, স্বাদু শীতল, পিত্ত নাশক, বল মাংস বৃদ্ধি কর, মুখ প্রিয়, মল মূত্র শুদ্ধি কারক, বিশেষতঃ কোমল নারিকেল পিত্ত জ্বর, মূত্র দোষ, তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, দাহ, রক্ত পিত্ত জন্য বিকার নষ্ট করে, তরুণ নারিকেলের জল সারক পিত্ত তৃষ্ণা নাশক ও পক্ক নারিকেল জল আধ্মান কারক, গুরু পাক ও পিত্ত বৃদ্ধি কর। নারিকেল তৈল স্নিগ্ধ কারক, পুষ্টিকর, ও কেশ বর্দ্ধক। তাহা ছাড়া ইহা শারিরীক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। ইহা বাজীকারক, গুরুপাক, ক্ষীণ ধাতু সমূহের পুষ্টিকারক এবং বাত পিত্ত নাশক। নষ্ট শুক্র, প্রমেহ, শ্বাস, কাশ, যক্ষ্মা, স্মরণ শক্তির হীনতা ও ক্ষত রোগে হিত কর। নারিকেল ক্ষীর স্নিগ্ধ, শীতল, অতিশয় পুষ্টিকর, গুরুপাক, অত্যন্ত মধুর, বাজীকর, রক্ত পিত্ত ও বায়ু নাশক। নারি-

কেলের মজ্জা কষায় রস, স্নিগ্ধ, মধুর, বলকারক, ও গুরুপাক, কাংস্য পাত্রে কখনও নারিকেল জল পান করিবে না, ইহা মদের স্থায় অপেয়, অদেয় ও অগ্রাহ্য বলিয়া জানিবে। সুপক্ক নারিকেল শস্য হইতে সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় "নারিকেল খণ্ড" নামক ঔষধ প্রস্তুত হয়। সুপক্ক নারিকেল দুগ্ধ অত্যন্ত বিরেচক। ইহার মত উৎকৃষ্ট জোলাপ আর নাই। উহা অধিক মাত্রায় সেবন করিলে বিসূচিকা হইবার সম্ভাবনা। নারিকেল তৈল স্নিগ্ধকারক, মৃদু বিরেচক ও ধাতু পোষক। এই জন্য অনেক ডাক্তার কড্‌লিভার ওয়েলের পরিবর্ত্তে টাটকা নারিকেল তৈল ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। ইঁহারা বলেন কড্‌লিভার ওয়েলের সমস্ত গুণ ইহাতে বিদ্যমান। এই তৈল দীর্ঘকাল অধিক মাত্রায় সেবন করিলে উদরাময় হইবার সম্ভাবনা, সুপক্ক নারিকেলের জল কতকটা জোলাপের কার্য্য করে ডাবের জল ও ইহার কোমল শস্য সেবন করাইলে পিত্তজ্বর গ্রস্ত রোগীর বমন নিবারিত হয়। জ্বরের সময় নারিকেল শস্য লবণ সহ চর্ব্বন করিলে মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়। নারিকেল অম্ল রোগীর বিশেষ হিতকারী, নারিকেলের সুপক্ক শিকড়ের ক্ষার সেবণ করিলে অম্ল নাশ করে। ইহা মূত্র বৃদ্ধিকর বলিয়া প্রসিদ্ধ। অপক্ক শিকড়ের রস পান করিলে মূত্র কৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়। নারিকেল পাতার গোড়ায় তুলার মত এক প্রকার পদার্থ দেখা যায়, উহাতে রক্ত নিবারক গুণ বিদ্যমান। অপক্ক নারিকেল শস্য বিসমথ সহ ভক্ষণে সত্বর বমন নিবারিত হয়।

নারিকেল তাল জাতীয় উদ্ভিদ শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট। ক্রান্তি দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ ইহার জন্মস্থান। নারিকেল বৃক্ষ সচরাচর ৩৩ হইতে ৬৪ হস্ত পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই বৃক্ষ আমাদের বিশেষ পরিচিত, সুতরাং ইহার আকার প্রকার সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা বাহুল্য মাত্র। নারিকেল কাণ্ডের গোড়াকে বাগলো বলে।

ফলের অবস্থা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রদত্ত হয়, যথা; শৈশবাস্থার নাম মুচি, যৌবনাবস্থার নাম ডাব, প্রৌঢ়াবস্থার নাম দুর্ম্মো এবং পরিণত অবস্থার নাম ঝুনো। ফলের উপরস্থ শক্ক বিশিষ্ট দৃঢ় ত্বকের নাম ছোবড়া এবং শস্য পরিবেষ্টক নিরাতিশয় দৃঢ় আবরণের নাম খোলা, খুলি বা মালা। নারিকেল যখন জল শূন্য হইয়া শস্য দ্বারা পরিপূর্ণ হয়, তখন তাহাকে খড়েল বলে, অভ্যন্তরস্থ ঐ শস্য কোঁপল নামে অভিহিত হয়। মুচি গুলি যে গুচ্ছে জন্মে তাহাকে চুমরী কহা যায়। সমুদ্র উপকূলবর্ত্তী ভূভাগে নারিকেল প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে, বঙ্গদেশ, সমগ্র করমণ্ডল উপকূল, সিংহল এবং পূর্ব্ব উপদ্বীপে এই বৃক্ষের বহুলতা নয়ন গোচর হয়, সাধারণ নারিকেল, রাহু নারিকেল, বামন নারিকেল, ও মাল দ্বীপ জাতীয় নারি-

কেন ভেদে চারি জাতীয় নারিকেল উৎপন্ন হয়। এই দ্বীপে কেবল ইউরোপীয়-দিগের শতাধিক বাগান আছে

নারিকেল বৃক্ষকে মানুষাপেক্ষাও দীর্ঘ জীবী হইতে দেখা যায়। অনেক বৃক্ষ দেড় শত বৎসর পর্য্যন্ত পরমায়ু লাভ করিয়া থাকে। অল্প বালুকা যুক্ত দোয়াঁশ মৃত্তিকায় নারিকেল গাছ রোপণ করিলে বেশ সতেজে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ঈষৎ লবণাক্ত সরস মৃত্তিকা নারিকেল চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বেলে মাটিতে রোপীত গাছ সত্বর বাড়ে এবং ফল খুব বড় হয়। কিন্তু গাছ দীর্ঘ জীবী হয় না। পোকা লাগিয়া গাছ অকালে নষ্ট হইয়া যায়। দোঁয়াশ মৃত্তিকায় গাছ তদপেক্ষা দীর্ঘ জীবী হয়, ফল মিষ্ট হয় ও গাছ বৃদ্ধি হইতে সময় লাগে। এঁটেল মাটীর গাছ তদপেক্ষা অধিক সময়ে বর্দ্ধিত হয়; কিন্তু অপরিমিত ফল প্রসব করে। ফল অত্যন্ত সুমিষ্ট হয়। ইহার আকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হয়, বৃক্ষ অত্যন্ত দীর্ঘ জীবী হয়, তাহা কীটে নষ্ট করিবার আশঙ্কা থাকে না। কোন কোন কৃষিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলিয়া থাকেন, যে জমীতে অযত্ন সম্ভূত ভাবে প্রচুর উলু ঘাস জন্মে, সেই জমীতে যদি নারিকেল চারা রোপণ করা যায়, তাহা হইলে আশাতিরিক্ত ফল লাভ করিয়া বিশিষ্টরূপ লাভবান হওয়া যায়। যে প্রণালীতে নারিকেল চারা রোপণ করা উচিত, তাহা এই; প্রথমে দশ হাত অন্তর এক হাত পরিসর ও দেড় হাত গভীর এক একটী গর্ত্ত খনন করিতে হয়। যদি সার দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক বোধ হয়, তবে দশ সের লবণ ও পাঁচসের সোরা মাটীর সহিত মিশাইয়া ঐ গর্ত্তগুলি ভরাট করিয়া দিবে। এইরূপ অবস্থায় তিন মাস রাখিয়া পরে উহাতে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া এক একটী নারিকেল চারা রোপণ করিবে। এইরূপ প্রণালীতে বিঘা প্রতি ৬৪ টা নারিকেলের চারা রোপিত হইতে পারে। এক শতটী রোপণ করিলে নিতান্ত ঘন সন্নিবিষ্ট হয়। তৎপরে এই সকল নারিকেল গাছের মধ্যে মধ্যে পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা এক একটী কলা গাছ রোপণ করিবে ও উভয় শ্রেণীর মধ্যে ঐরূপ পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা এক একটী নালা কাটিবে। এরূপ করিবার তাৎপর্য্য এই যে নারিকেল চারা গুলি কদলী বৃক্ষের ছায়ায় অবস্থিত হওয়ায়, উভয় দিক হইতে সূর্য্যোত্তাপে উহারা নিস্তেজ হইতে পারিবে না। আর নালা সর্ব্বদা জলপূর্ণ থাকায় গাছগুলি ঐ জল মূল দ্বারা আকর্ষণ করিয়া পরিপুষ্ট হইবে ও উহার গোড়া সর্ব্বদা শীতল ও সরস থাকিবে। কলা পাকিলে গাছগুলি কাটিয়া নালায় ফেলিয়া রাখিবে।

কিছু কাল ঐরূপ অবস্থায় রাখিলে কলা গাছগুলিও পচিয়া নারিকেল বৃক্ষের শরীর পোষণোপযোগী এক প্রকার উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত হইবে, এই সার মধ্যে মধ্যে তুলিয়া গাছের গোড়ায় দিবে, সার দিবার পূর্ব্বে গাছের গোড়া খনন করা বিধেয়। বৃক্ষের চতুর্দ্দিকে অশ্ব পুরীষ মৎস্যের শল্ক ও পানা দিলেও গাছগুলি বেশ সতেজ

হইয়া উঠে, মাটীতে যদি লবণের ভাগ কম দেখা যায়, তবে ঐ কদলী বৃক্ষের পচা সার তাহা সংপুরণ করিয়া দেয়, একসের পরিমিত কলা গাছের ছাইয়ে এক ছটাক পরিমাণ লবণের বিদ্যমানতা পরিলক্ষিত হয়। নারিকেল গাছের মধ্যে মধ্যে এক একটী কলা গাছ রোপণ করিবার আর এক উপকারিতা আছে; যদি কখনও বাগানে গবাদি পশু প্রবেশ করে কলা গাছগুলি নারিকেলের চারা অপেক্ষা বড় বলিয়া সর্ব্ব প্রথমে তাহাদিগের নজর ঐ সকল কলা গাছের উপর পড়ে, সুতরাং যে সময়ে তাহারা কলা পাতা খাইতে আরম্ভ করে, সেই অবসরে উদ্যান স্বামী বাহির হইয়া ঐ গবাদি পশুকে বাগান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারে।

এইরূপে নারিকেল চারাগুলি কদলী বৃক্ষের অন্তরালে অবস্থিত হওয়ায়, গবাদির গ্রাস হইতে রক্ষা হইতে পারে। তাহা ছাড়া কলা গাছ প্রভূত পরিমাণে নালা হইতে জল আকর্ষণ করে, নারিকেল চারা গুলিও সেই জলের অংশ প্রাপ্ত হয়, আষাঢ় মাসের প্রথমে নারিকেল চারা রোপণের প্রসস্ত সময়, চারা রোপণ করিয়া পানা সার উহার গোড়র চারিদিক ঢাকিয়া দিবে ঐরূপ করিলে গাছের গোড়া শীতল থাকিবে, এবং ঐ সকল পানা পচিয়া সারের কার্য্য করিবে, দুই বৎসর অন্তর সার প্রদান বিধেয়। রীতিমত পাইট করিতে পারিলে সাত আট বৎসরের মধ্যে নারিকেল গাছ ফলবান হয়। প্রথম প্রথম মুচিগুলি ঝরিয়া যাইতে দেখা যায়। কোন ভারি বস্তু রাখিয়া চুমরীর অগ্রভাগ অবনত করিয়া দিলে এই ফল ঝরা নিবারিত হয়। কাঠ বিড়াল প্রভৃতি অনেক মুচি নষ্ট করিয়া ফেলে, তৎপক্ষে উদ্যান স্বামীর সাবধান হওয়া উচিৎ। গাছ অতিশয় সরল হইলে ভাল ফলে না, এই জন্য মাটী হইতে দেড় হস্তের উর্দ্ধে অঙ্গুলি প্রবেশ করিতে পারে, গাছের গায়ে অস্ত্র দ্বারা এমন একটী ছিদ্র করিয়া দিতে হয়। ফলবান বৃক্ষকে যদি স্থানান্তরিত করা আবশ্যক হয়, তবে গাছের যে দিকে যে অভিমুখে পূর্ব্ব অবস্থায় ছিল পুণরায় রোপণ কালে সেই দিকে সেই অভিমুখে রাখিয়া রোপণ করা বিধেয়, নারিকেল বৃক্ষের মধ্যে মধ্যে এক একটী সুপারি গাছ রোপণ করা যাইতে পারে। তাহাতে নারিকেল গাছের কোন হানি হয় না। প্রতি বৃক্ষে গড়ে প্রতি বৎসর দুই শতের অধিক নারিকেল ফলিতে পারে। এ অঞ্চলে সচরাচর ছয় বা সাত টাকা প্রতি শতের কম নারিকেল পাওয়া যায় না। ডাব অবস্থায় প্রত্যেকটীর মূল্য ।৹ চারি আনা হইতে ॥৹ আট আনা পর্য্যন্ত হয়।

প্রতিবৎসর আশ্বিন মাসের প্রথম পক্ষের মধ্যে নারিকেল গাছের বাগলো ছাড়াইয়া গাছ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া বিধেয়। ইহাতে গাছ বেশ তেজস্কর হইয়া উঠে। কেহ কেহ বলেন গাছের কতকগুলি বাগলো ছাড়াইয়া দিলে গাছ নিস্তেজ হইয়া যায়, কিন্তু তাহা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। এইরূপ করিলে

গাছ নিস্তেজ হওয়া দূরে থাকুক বরং সমধিক সতেজ হইয়া উঠে। নারিকেল বৃক্ষ মূল দ্বারা যে রস আকর্ষণ করে, তাহা সমস্ত কাণ্ড পত্রাদিতে সঞ্চারিত হয়। এই রস অধিক সংখ্যক বাগলোতে সঞ্চারিত না হইয়া যদি অল্প সংখ্যক বাগলোতে সঞ্চারিত হয়, তাহা হইলে ইহার আংশিক মাত্রাও অধিক হইয়া থাকে। এবম্প্রকার রসাবেশ নিবন্ধন বৃক্ষ বিশিষ্টরূপ পরিপুষ্ট এবং অত্যন্ত সতেজ হইয়া উঠে। বৈশাখ মাসে অতি প্রাচীন গাছ হইতে যে সকল নারিকেল পাকিয়া পড়িয়া যায়, তাহাই বীজের জন্য মনোনীত করা কর্ত্তব্য ; অপক্ক বীজ হইতে উৎপন্ন বৃক্ষ কখনও দীর্ঘ জীবী এবং আশানুরূপ ফলবান হয় না, ইহা যেন সকলের স্মরণ থাকে। ঐরূপ সুপক্ক নারিকেলের এক দিকের একখানি ছোবড়া এবং বোঁটার নিম্নস্থ খোসাটী ফেলিয়া দিয়া একমাস কাল ঘরে তুলিয়া রাখিলে উহা অঙ্কুরিত হয়। চারা রোপণ কালে নারিকেলের চোক দক্ষিণাভিমুখে রাখিতে হয়। নারিকেলের যে দিকের ছোবড়া সর্ব্বপ্রথমে তোলা হয় সেই দিকেই নারিকেলের চোক আছে বলিয়া জানিতে হইবেক। কেন এরূপ হয় তাহা নির্ণয় করা কিছু কঠিন।

যাহারা কাদা হাপর করিয়া নারিকেলের চারা প্রস্তুত করেন, তাহাদিগকে একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, যখন হাপোরে নারিকেল গুলি শয়ন করান হয়, তখন উহাদিগকে উত্তানভাবে রাখা বিধেয়। নারিকেলের পৃষ্টদেশ এইরূপে মৃত্তিকা-ভিমুখে অবস্থিত হওয়ায়, উহা হইতে উৎপন্ন চারা গুলি বেশ সতেজ হইয়া উঠে, তখন প্রশ্ন হইতে পারে নারিকেলের পৃষ্টদেশ কোনটা তাহা কিরূপে নির্ণয় করা যাইবে ; তাহা নির্ণয় করা অতি সহজ হাপোরে ফেলিবার পূর্ব্বে এক একটী নারি-কেল একটি জল পূর্ণ গামলাতে ফেলিতে হইবে, ভাসমান নারিকেলের যে দিকে জলাভিমুখে অবস্থিত হইয়া স্থির ভাবে ভাসিতে থাকে, সেই দিকে উহার পৃষ্টদেশ বা স্বভাবাদিষ্ট শয়ন স্থান বলিয়া জানিতে হইবে। সুতরাং হাপোরে উহাকে ঐরূপ ভাবে রাখা বিধেয়। কারণ স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া সুফলের আশা দুরাশা মাত্র। অনেকে বলিয়া থকেন "উঠান্ত মূল পত্তনে চেনা যায়"। মূল কিরূপ হইবে চারার অবস্থা দেখিয়া তাহা বলা যায়। যাহারা নারিকেলের চারা কিনিয়া বাগানে রোপণ করেন, তাহাদিগকে দেখিতে হইবে তাঁহারা যে চারা কিনিতেছেন, তাহা ভাল কি মন্দ, সুপক্ক কি অপক্ক বীজের চারা, সাধারণের পক্ষে চারার উত্তমাধম স্থির করা বড় কঠিন কৃষিতত্ত্ববিৎ বিচক্ষণ ব্যক্তি ভিন্ন অপরের পক্ষে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। অপর চারার পক্ষে যাহা হউক, নারিকেল চারা চিনিবার পক্ষে বুদ্ধিমতী খনা এক সুগম পন্থা আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, খনা বলিতেছেন,—

"নারিকেল চারা কিঙ্গে ভাজা।
সবার সেরা সবার রাজা॥"

অর্থাৎ যে সকল নারিকেলের চারা ফিঙ্গে ন্যাজা (যাহার শাখার অগ্রভাগ ফিঙ্গে পক্ষীর পুচ্ছের ন্যায় দ্বিধা বিভক্ত এবং ঈষৎ অবনত) তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

নারিকেল গাছকে অতিশয় সতেজ ও বিশিষ্টরূপ ফলবান করিতে হইলে আর একটী পাইট করা বিধেয়, তাহাকে নারিকেলের "পিলে কাটা" বলে। নারিকেল চারা তিন চারি বৎসরের হইলেও উহার মূল দেশে বীজ নারিকেলটী নষ্ট হয় না। এই নারিকেলটী মূলে রহিয়া গেলে গাছের অনেক অনিষ্ট করে। গাছের শিকড় না কাটীয়া এই নারিকেল অতি সাবধানে বাহির করিয়া ফেলিতে হয়, ইহা সেই নারিকেলের "পিলে কাটা" বলে।

দাতার নারিকেল, বকিলের বাঁশ।

খনার এই প্রবচনটী বহুকাল হইতে এদেশে চলিয়া আসিতেছে। ইহার ভাবার্থ এই যে, ডাব যত অধিক খরচ করিবে, এবং বাঁশ যত কম কাটিবে ততই ভাল। বাস্তবিক যে গাছে নারিকেল সব ঝুনা করা যায়, সে গাছের ফলন তত কম হয়, যত বেশী পরিমাণে ডাব পাড়া যায়, গাছ তত অধিক ফলে। এই জন্য বোধ হয় খনা "দাতার নারিকেল" এবম্প্রকার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

নারিকেল বৃক্ষের সকল অংশই গাভীর ন্যায় মানবের হিতকারী। লোক পাছে এই মহোপকারী গাছ নষ্ট করে, এই জন্য হিন্দু শাস্ত্র ব্রহ্মহত্যার ভয় দেখাইয়া ইহার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। গাভী এইরূপ মানবের হিতকারিণী বলিয়া দেবতা বোধে ইহার পূজা হিন্দুর গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গাভীর কি দুগ্ধ, কি মলমূত্র, কি অস্থি চর্ম্ম শিরা, সকল গুলিই যেমন মানবের হিতসাধক, সেইরূপ নারিকেল বৃক্ষের কি ফল মূল মুকুল, কি কাণ্ডপত্র শিকড়, সমস্তই মানবের প্রয়োজন সাধন করিয়া থাকে। যে স্থানে বৃহৎ নারিকেল গাছের বিদ্য মানতা, তাহার আশি হস্ত দূরবর্ত্তী চতুপার্শ্বস্থ স্থানে বজ্রপাত হয় না। বৃহৎ নারিকেল বৃক্ষে পরিচালকতা গুণ বিদ্যমান, এই জন্য অনেক গৃহস্থ আপন ভদ্রাসনে নারিকেল গাছ রোপন করিয়া থাকেন।

নারিকেল শস্য অতি পুষ্টিকর খাদ্য, যদি একটী মাত্র ফল ভক্ষণ করিয়া প্রাণ ধারণ করা সম্ভব পর হয়, তবে তাহাই নারিকেল। প্রকৃতি তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা রাসয়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা স্থির করিয়াছেন, কেবল গোদুগ্ধে ও নারিকেলে আমাদিগের শরীর পোষণোপযোগী অধিকাংশ উপাদান বিদ্যমান। নারিকেল শস্য হইতে রস করা, চন্দ্রপুলী প্রভৃতি বিবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভূত পূর্ব্ব স্কুল ইনস্পেক্টর ও বিখ্যাত উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত সি, বি, ক্লার্ক সাহেব মফঃস্বলে স্কুল সমূহের পরিদর্শন কালে কেবল নারিকেল ভক্ষণ করিয়া দীর্ঘকাল অতিবাহি করিতেন। এই নারিকেল শস্য হইতে অতি স্নিগ্ধ কেশ বর্দ্ধক ও পুষ্টিকর নারিকেল তৈল প্রস্তুত হয়।

এই নারিকেল তৈল এক্ষণে গন্ধ দ্রব্য যোগে সুবাশিত ও রঞ্জন দ্রব্য যোগে সুরঞ্জিত করিয়া ব্যবসায় দ্বারা কত লোক জীবিকার্জ্জন করিতেছেন। নারিকেলের মালা আমাদিগের নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তু। উহার খোলা ধুমপায়ী দিগের হুকা, গৌরাঙ্গ শিষ্যদের করঙ্গ ও বাউল ফকির দিগের কিস্তী নামক ভিক্ষা পাত্র প্রস্তুত হয়। এই খোলা হইতে জামার বোতাম, ছুরির বাঁট প্রভৃতি এবং শিশুদিগের নানা প্রকার খেলানা প্রস্তুত করিয়া বিদেশীয় বনিকেরা বানিজ্য দ্বারা কত টাকা এদেশ হইতে লইয়া যায়, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে। ডাবের জল অত্যন্ত স্নিগ্ধ কারক। পিপাসার সময়ে এই জল পান করিলে বিশেষ তৃপ্তি বোধ হয়। নারিকেল মোচ হইতে এক প্রকার তাড়ি প্রস্তুত হইয়া থাকে। অতি প্রাচীন কালে কলিঙ্গ দেশে এই তাড়ির বিশেষ আদর ছিল। তাহা রঘু বংশের ৪র্থ স্বর্গে রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গ পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় ;—

"তাম্বুলীনাং দলৈস্তত্র রচিতাঃ পান ভূময়ঃ।
নারিকেলা সবং যোধাঃ শাত্র বঞ্চ পপুর্যশঃ"॥

রঘু বংশ ৪র্থ সর্গ ৪২ শ্লোক।

অর্থাৎ রঘুর সৈন্যদল মহেন্দ্র পর্ব্বতের অধিত্যকায় পান শালা রচনা করিয়া তাম্বুল দল বিনির্ম্মিত পত্র পুট দ্বারা নারিকেল আসব পান করিল, তাহাতে যেন তৎ সঙ্গেই রিপুগণের যশঃ ও পান করা হইল।

অদ্যাপি করাচী প্রভৃতি স্থানের, নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা অত্যন্ত তাড়ি খোর বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই জন্য ডাক্তার ষ্টক্স্ বলেন, করাচীর নিকটবর্ত্তী স্থানে নারিকেল চাষ করিলে বেশ লাভ জনক ব্যবসায় চলিতে পারে।

যে নারিকেল ছোবড়া আমরা অকিঞ্চিৎকর বোধে চুল্লীতে নিক্ষেপ করিতেছি, তাহা যে মানবের কত দূর হিতসাধন করিতেছে, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইউরোপ অঞ্চলে এই ছোবড়ার উপর কোটী কোটী টাকার বানিজ্য চলিতেছে। নারিকেল ছোবড়া হইতে নানা প্রকার গার্হস্থ্য দ্রব্যজাত প্রস্তুত হইতেছে, গদি, ঘোড়ার সাজ, মেমেদের করসেট ও কার্পেট, ডাক্তারদের বাড়, গৃহস্থের পাপোষ, টুপী, মেজের কাপড়, চুপড়ী, ঘোড়ার বুরুষ, ঘোড়ার গাত্রাবরণ, পক্ষীর পিঞ্জর, গির্জ্জার গদি জাহাজের বিছানা, আসন, দড়ি, থলে প্রভৃতি নানা প্রকার গৃহস্থের হিতসাধক দ্রব্যজাত এই নারিকেল ছোবড়া হইতে প্রস্তুত হইতেছে। এই ছোবড়া হইতে উৎপন্ন কাতা দড়ি পৃথিবীর একটী নিতান্ত প্রয়োজনীয় পণ্য দ্রব্যে পরিগণিত হইয়াছে। কোচিনের কাতা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ। ষোড়স শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী সময়ে ইউরোপ অঞ্চলে সর্ব্বপ্রথমে কাতা ব্যবহৃত হয়। কোচিন, লাক্ষাদ্বীপ, মালাক্কা, মালদ্বীপ, সিংহল, সিঙ্গাপুর, জ্যামেকা, ডিমারারা প্রভৃতি স্থান হইতে

আমাদের দেশে বহু লক্ষ টাকার কাতা আমদানী হইয়া থাকে, আমাদের দেশে মান্দ্রাজ, মহীশূর, মালাবার উপকূল প্রভৃতি স্থানে এক্ষণে কাতা উৎকৃষ্ট উৎপন্ন হইতেছে। নারিকেল ছোবড়া সাধারণতঃ ৮০ আনা ১৲ টাকা মণ বিক্রী হয়। নারিকেল পাতা হইতে বিদেশীয় বণিকেরা এক প্রকার ক্ষার প্রস্তুত করিয়া থাকে, আমরা উহা চুল্লীতে অগ্নিসাৎ করিয়া থাকি। অনেক স্থলে নারিকেল পাতায় ঘর ছাওয়া হয়। সিংহলীদিগের নিকট এই জন্য ইহার অত্যন্ত আদর। পত্রমধ্যস্থ পশুকায় আমাদিগের নিত্য ব্যবহার্য্য শতমুখী সম্মার্জ্জনী প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমাদিগের নিকট পশুকায় ব্যবহার এই পর্য্যন্ত। কিন্তু ফ্রেণ্ডলী দ্বীপ প্রভৃতি স্থানের অধিকারী এই পশুকায় বা ঝাঁটার কাটি হইতে মাদুর, পর্দ্দা, ঝুড়ী, চিরুনী, ছোট নৌকার এক প্রকার পাইল প্রস্তুত করে। নারিকেলের অতিসূক্ষ্ম পত্রাবরণ গুলি ফিল্টার ও চালনির জন্য ব্যবহৃত হয়। উহার মোটা গুলিতে কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে, নক্স সাহেব বলেন ইহা দ্বারা মোটারকমের বেশ গণি বা থলে প্রস্তুত হইতে পারে। নারিকেলের অসিফলক (নারিকেল গুবাক প্রভৃতি তাল জাতীয় বৃক্ষের পৌষ্পিক পত্রকে অসিফলক বলা যায়) মধ্যে পুষ্পরাশি নিশ্চিত থাকে। উহা চিরিয়া অনেক স্থানে দড়ির ন্যায় ব্যবহার হয়, ইহা বেশ শক্ত। নারিকেল বৃক্ষের সুদীর্ঘ দেহও সেতু ও গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যে প্রযুক্ত হয়। ঘরের খুঁটী, কড়ি, বরগা, প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

একদা কোন যবন দূত বঙ্গদেশ হইতে দিল্লীতে প্রত্যাগত হইয়া দিল্লীশ্বরকে বলিয়াছিলেন, "মহারাজ! পরমেশ্বর বঙ্গের প্রতি অতি সুপ্রসন্ন, বঙ্গবাসীগণের আহারের কোন প্রকার অপ্রতুল নাই। আমি দেখিয়া আসিলাম, ঈশ্বর তাহাদিগের আহারের জন্য দুই খণ্ড রুটী ও জল বৃক্ষের উপর তুলিয়া রাখিয়াছেন।" অপর কোন বৈদেশিক ভ্রমণকারী আমাদের এই নারিকেল বৃক্ষ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন "ভারতবর্ষ কি অদ্ভুত স্থান, এখানে বৃক্ষের অগ্রভাগে রুটী ও জল মিলে।" যে দেশের প্রতি ভগবান যতদূর প্রসন্ন সেই দেশে ঔদাস্য না করিয়া এই নারিকেল বৃক্ষ বহুল পরিমাণে আবাদ করত জীবিকা নির্ব্বাহের পথ সুগম করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যুধিষ্ঠির জীবিত থাকিলে হয়ত বক রূপী ধর্ম্মের প্রশ্নোত্তরে বলিতেন "কিমাশ্চর্য্য মতঃ পরম্"।

চাকরী ও কৃষি।

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় (ডাক্তার) লিখিত

" বাণিজ্যে লক্ষ্মী বাস, পূর্ণ অভিষেক,
কৃষি কার্য্যে ফল লাভ তাহার অর্দ্ধেক;
তাহার অর্দ্ধেক ফল রাজার চাকরী,
অন্যকায মিছা কায, ভিক্ষা সম ধরি।"

চাকরী অপেক্ষা কৃষি কার্য্যে ফল লাভ অধিক, মান সম্ভ্রম মর্য্যাদা ও অধিক দুঃখের বিষয় এ কথা আমাদিগের কৃতবিদ্য যুবক বৃন্দকে বুঝাইতে পারা যায় না। "যেমন তেমন চাকরীতে ঘি ভাত" এই আপাত মধুর প্রলোভনে পড়িয়া আমাদিগের সর্ব্বনাশ হইতেছে, কেহ ভ্রমে ও একবার ইহা ভাবিয়া দেখে না। ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কারের বশে দেশের কি ক্ষতি হইতেছে, এবং চাকরীতে কখন স্থায়ী উপকার হয় না আজ আমরা "কৃষকের " গ্রাহক ও পাঠকদিগকে সেই কথা একটু ভাল করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিব। অভ্রান্ত সর্ব্বদর্শী ঋষিরা যাহা আমাদিগের ভাল, যাহাতে আমাদিগের মঙ্গল সেই কথাই বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বাণিজ্যের নিম্নে কৃষি কার্য্যের স্থান দিয়াছেন, চাকরীর মধ্যে রাজ সেবা বা রাজার চাকরীর উল্লেখ করিয়াছেন, অন্যান্য কোন কার্য্যে প্রকৃত উন্নতির আশা নাই জানিয়া, ভিক্ষার সহিত তাহাদের তুলনা করিয়াছেন। ভিক্ষার গৌরব নাই, স্থিরতা নাই, ফলের নিশ্চয়তা নাই, কেবল পেট মাত্র ভরিতে পারে, ভক্ষণটা কায় ক্লেশে চলিতে পারে, সেই জন্য ভিক্ষাকে উচ্চাসন দিতে পারেন নাই। চাকরীতে আমরা মান, মর্য্যাদা, কার্য্য তৎপরতা, শারীরিক বল, মানসিক বল সমস্ত হারাইয়াছি। দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া আমরা অলস, অকর্ম্মণ্য, স্ফূর্ত্তিহীন, স্বার্থপর, সঙ্কীর্ণ হৃদয়, মনুষ্যত্ব বর্জ্জিত এক অদ্ভুত জীবে পরিণত হইয়াছি। স্বাধীন ভাব, উদারতা, সত্যপ্রিয়তা, সৎসাহস প্রভৃতি মহৎ গুণ গুলি নষ্ট হইয়া তৎপরিবর্ত্তে হিংসা, দ্বেষ, পর গ্লানি, পরচর্চ্চা, আত্মাভিমান প্রভৃতি যতগুলি নীচবৃত্তির পরিপোষণ করিতেছি। চাকরীতে বাবু গিরির সুবিধা ; পরের চাকর, পরের বেয়ারা, দরয়ান, হুকুমে খাটিতেছে। চেয়ারে বসিয়া চাকরী, টানা পাখার বাতাস, সকলে "বাবু বাবু" বলিয়া সম্বোধন করিতেছে, মাসটী বাধা মাত্র বেতন; পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জামা যোড়া জুতা পায় চাকরী, পুঁজি পাটার কোন আবশ্যক নাই। সকল দিকে সুখ? ইহার সঙ্গে কৃষিকার্য্যের কি তুলনা হয়? রৌদ্র বৃষ্টি মাথার উপর

দিয়ে যাবে, কষ্টের সীমা পরিসীমা নাই, মুখে রক্ত উঠে যায়, চাষ বাস কি আর এখন আমাদের চলে? খেয়ে দেয়ে পান চিবুতে চিবুতে বেশ আফিস গেলুম্ কোন ঝঞ্ঝাট আর নাই? লাভ লোকসানের কোন ধার ধার্‌তে হয় না, এমন সুবিধা আর কিসে আছে? কৃষি ও চাকরীর দোষ গুণ সম্বন্ধে আধুনিক মত যাহাই হউক, ঋষিরা কৃষি কার্য্যকে হীন কার্য্য বলিয়া ধরিতেন না সে বিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র নাই। আর্য্য জাতির মধ্যে কৃষি কার্য্যের বিশেষ আদর ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, দ্বিজ পদ বাচ্য উচ্চ বর্ণত্রয় মধ্যে কৃষি কার্য্যের বহুল প্রচলন ছিল, পুরাণাদি প্রত্যেক গ্রন্থে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা কৃষি কার্য্যকে নীচ কার্য্য ও কৃষককে চাষা বলিয়া যতই পরিহাস করি না কেন, সমাজের শীর্ষ স্থানীয় মুনি ঋষিদের চক্ষে কৃষক বা কৃষিকার্য্য হেয় বলিয়া পরিগণিত হইত না। ঋষিদের সকলেই চাষ বাস করিতেন এবং সকলেই গো পালন করিতেন। প্রত্যেক ঋষি রাজদত্ত বিপুল ভূমি ভোগ করিতেন। যে ঋষি প্রথমে রাজ দত্ত সম্মান, বৃত্তি ও সনন্দ প্রাপ্ত হয়েন সেই ঋষির নামে ঐ সম্পত্তির নাম করণ হয়, তাঁহার সন্তান সন্ততিগণ পুরুষানুক্রমে ঐ সম্পত্তি ভোগ দখল করিতে থাকে। বংশের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন, বৃত্তি প্রাপ্ত মূল ঋষির নামের সহিত তাঁহাদের ও নামের উল্লেখ দেখিতে পাই। মূল ঋষির নামে গোত্র এবং লব্ধ প্রতিষ্ঠ শেষোক্ত ঋষিদের নামে প্রবর ধরিয়া ব্রাহ্মণদের বংশ পরিচয় নির্ণয় করিয়া থাকি। "গোত্র" শব্দে গো রক্ষণের স্থান। ব্রাহ্মণেরা রাজদত্ত যে সম্পত্তি পাইতেন তাহার কিয়দংশে গো রক্ষণ ও গোচারণের স্থান নির্ণীত হইত, অবশিষ্ট অংশ বাস গৃহ, পাঠ গৃহ শিষ্যাদির আশ্রম, তপোবন, শস্য ক্ষেত্র প্রভৃতি নানা প্রয়োজনে নিয়োজিত হইত। কুমারী কন্যাগণকে গো দোহন কার্য্যে ব্রতী থাকিতে হইত। তাহারা গো-দোহন করিত বলিয়া দুহিতা নামে পরিচিতা হইল। এক নামে ২।৩ জন ঋষি থাকা অসম্ভব নয়, পাছে উত্তর কালে গোল বাঁধিয়া যায়, সেই জন্য গোত্রের পর প্রবরের উল্লেখ করিয়া ব্রাহ্মণদের পরিচয় অবধারণ করিতে হয়।

ব্রাহ্মণেরা স্বয়ং অথবা শিষ্য দ্বারা কৃষি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ক্ষত্রিয় কুলতিলক জনক, কুরু, নহুষ প্রভৃতি রাজর্ষিবর্গ সকলেই স্বহস্তে হল চালনা করিতেন। বলরাম ঠাকুর হল চালনা করিতেন বলিয়া জগতে হলধর নামে পরিচিত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণেরা যে স্বহস্তে চাষ করিতেন গ্রাম্য ভাষায় আজি ও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। লোক কথায় কথায় বলিয়া থাকে "বামন্ গেল ঘর ত লাঙ্গল তুলে ধর।"

শাস্ত্রে পৃথিবীকে বসুন্ধরা বলিয়াছে, বসুন্ধরা অর্থে যিনি ধন রত্ন ধারণ করেন, তিনিই বসুন্ধরা। এক্ষণে দেখিতে হইবে শাস্ত্রের চক্ষে সে ধন রত্ন বা বসু কি? সোণা, রূপা, হীরা, মতি প্রভৃতিকে শাস্ত্রকারগণ ধন বলিয়া ধরিয়া যান নাই।

তাঁহাদের কাছে প্রকৃত ধনই ধান্ত। অকিঞ্চিৎকর সোণা রূপার কাল্পনিক মূল্য তাঁহারা গ্রাহ্য করেন নাই। সোণা রূপার প্রয়োজনীয়তা তাঁহারা স্বীকার করিতে পারেন নাই। ঋষিদের কাছে ধন অর্থে ধান্য, তাই তাঁহারা ধান্য দ্বারা লক্ষ্মীপূজার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহারা ধান্য উৎসর্গ করিলেই ধন উৎসর্গ করা হইল, এই কথা বার বার বলিয়া গিয়াছেন।

আমরা বৎসরে যে চারিবার লক্ষ্মী পূজা করি তাহাও শস্যের মঙ্গলের জন্য। ভাদ্র মাসে আশু ধানের জন্য; কার্ত্তিক মাসে হৈমন্তিক ক্ষুদ্র ফসলের জন্য; পৌষ মাসে আমন ধানের জন্য; চৈত্র মাসে রবি শস্যের জন্য। মোট কথা ধরিতে গেলে শস্যই আমাদের ধন, শস্যই আমাদের সর্ব্বস্ব! আমাদের ধন বিভব সম্পত্তি, সমস্তই কৃষিজাত ও ক্ষেত্রোৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রী। অসার সোণা, রূপা, হীরা, মতি নয়। কৃষিজাত দ্রব্য সামগ্রী বলিলে কেবল শস্য ও কন্দ মূল ফলাদি বুঝায় না, আমরা এই কথাটি কৃষকের পাঠকদিগকে একটু বিশদভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। আমরা যাহা কিছু ব্যবহার করি তাহার অধিকাংশ দ্রব্যই কৃষিজাত দ্রব্য, কেবল তাহার কোনটা মুখ্যভাবে কোনটা বা গৌণভাবে প্রস্তুত হইয়াছে, এই মাত্র প্রভেদ। আমাদের পরিধেয় বস্ত্র, লিখিবার কাগজ আমাদের নিত্য ব্যবহারের ঝুড়ি, চুবড়ী ধুচুনী, আমাদের রসি রসা দড়ি, আমাদের চৌকাট, দরজা, কড়ি, বরগা, আমাদের ঘর সাজাবার খাট, পালঙ্গ, চেয়ার, বেঞ্চি, কেদারা, টেবিল, আলমারি, সমস্তই কৃষিজাতদ্রব্য হইতে উৎপন্ন। কৃষিজাত দ্রব্য হইতে কত কি হয়, আমরা ধারাবাহিক রূপে কৃষকের গ্রাহক দিগকে উপহার দিব। দশ কুড়ি টাকার দাসত্বের মায়া পরিত্যাগ করিয়া কৃষি কার্য্যের উৎকর্ষ উপলব্ধি করিতে পারিলে দেশের মঙ্গল ও আমাদিগের শ্রম সফল হইবে।

গোজাতির উপকারিতা।

গোজাতির উল্লেখ আমরা বেদে দেখিতে পাই। ঋক মন্ত্রে গোকুলের আরাধনা দেখিতে পাওয়া যায়। গোজাতির রক্ষণ কুশলতা হইতে পুরাকালে ঋষিগণের গোত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। পর্ব্বতের আসন্ন তৃণ বহুল প্রদেশে ঋষিগণের গোচারণ রক্ষিত হইত বলিয়া "গোত্রের" সৃষ্টি হয়। হিন্দুর গৃহস্থজীবনে গোজাতির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ হেতু আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে গোজাতীর উন্নতি সাধন, রক্ষণ ও প্রতিপালন কর্ত্তব্য, জনক রাজা স্বহস্তে গো-যুগলের সাহায্যে ভূমিকর্ষণ করিতেন। স্মৃতিতেও গোদানের যথেষ্ট ফল দৃষ্ট হইয়া থাকে, আমাদিগের গৃহস্থালীতে অনেক প্রকারে উপকার সাধিত হইয়া থাকে। চাষে বলিষ্ঠ বলদের বিশেষ প্রয়োজন। অতি

পুরাকাল হইতেই কি পার্ব্বত্য কি সমতল সকল প্রদেশে গোযানের ব্যবহার প্রচলিত আছে। যুদ্ধ বিগ্রহে গোযানের প্রচলন পরিদৃষ্ট হয়। মুসলমানগণ যুদ্ধে গোশকটের এবং কামান টানিবার জন্য গো চতুষ্টয়ের ব্যবহার করিতেন। গোময় হইতে অত্যুত্তম সার হয়। আমাদিগের দেশের চাষারা মুগ, কড়াই, কপী, বিট ইত্যাদি গাছের পরি-বৃর্দ্ধন জন্য গোমূত্র আদৌ ব্যবহার করে না। ইহাতে একটি প্রধান "সারের" পদার্থ নষ্ট হইতেছে, তাহা আমাদিগের দেশের অজ্ঞ অশিক্ষিত চাষীরা দেখে না। দুগ্ধের জন্যও গোপালন আমাদের দেশে বহুল দৃষ্ট হয়। বঙ্গের প্রায় প্রত্যেক গৃহে ২।১টী করিয়া গাভী দুগ্ধের জন্য পালিত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের শিশু ও বালকগণ গোদুগ্ধপান ব্যতিরেকে জীবন সংগ্রামে অবস্থিতি লাভে একান্ত অসমর্থ। কলি-কাতা ও বড় বড় সহরে দুগ্ধ দিন দিন বড়ই দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। এ বিষয়ে আমাদিগের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্ত্তব্য।

ইউরোপ দেশীয় গো অপেক্ষা আমাদিগের দেশীয় গো সকল প্রকারে হীন। পূর্ব্বোক্তগুলি টারস্ জাতীয়। ইহার মধ্যে হলষ্টীন, আরশায়ার, জারসী, গার্ণসী, ডেভনশায়ার, চেশায়ার, হাইল্যাণ্ড, শ্রপশায়ার প্রভৃতি জাতীয় দুগ্ধবতী গাভীগুলিই প্রধান। ইউরোপখণ্ডের মধ্যে ফরাসী, ডেনমার্ক ও সুইস দেশীয় গাভীগুলিই অত্যধিক দুগ্ধবতী এবং ঐ দেশগুলি হইতেই ঐ খণ্ডের যাবতীয় গোজাত সামগ্রী উৎপাদিত হইয়া থাকে। ইংলণ্ড দেশের মধ্যে চেশায়ার ও ডেভনশায়ার, জার্সি ও গার্ণসি গাভীই সর্ব্বপ্রধান। বিলাতের গাভী বহু শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক ফল। ইহা-দের "ঝুঁটি" নাই। কোন কোন বিলাতী গাভীর শিং ও নাই। শৃঙ্গবিহীন করিতে হইলে শৈশবাস্থায় বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় "কষ্টিক" প্রয়োগ করিলে সহজেই শৃঙ্গের উদ্গম রহিত হয়। বিলাতী গাভীগুলি স্কোয়ার সাইজ; তাই তাহারা দেখিতে এত সুন্দর। আমাদের দেশের গোজাতীর শকট বহন, লাঙ্গলকর্ষণ প্রভৃতি কার্য্যের জন্য ঝুঁটের প্রয়োজন আছে। তাই তাহাদের মধ্যে ঝুঁট দেখা যায়। আমাদের দেশের গাভীগুলি যাহাতে বিলাতী গাভীর ন্যায় স্কোয়ার সাইজ হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রয়োজন। "Origin of species, ওয়ালেসের Animals & plants under domesticat. প্রভৃতি পুস্তক পাঠে গো রক্ষণ এবং পালনের পদ্ধতি সকল আয়ত্ত করিয়া তাহা আমাদের দেশের গো-জাতির উন্নতিসাধনে প্রয়োগ করিলে সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর হয়। আমাদিগের দেশে বহু গরু-রোগে মারা যায়। গো-চিকিৎসকের একান্ত অভাব। এই অভাব মোচন আশু হওয়া কর্ত্তব্য। চাষীদিগের একান্ত কর্ত্তব্য যে তাহারা গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়া প্রত্যেক জেলায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গো-চিকিৎসালয় স্থাপন করান। আমা-দের দেশে গোজাতির প্রতি খুবই অনাদর প্রদর্শন করা হয়; কিন্তু তাহাদের দ্বারায়

কাজ লইতে আমরা খুবই অগ্রসর। তাহাদিগকে আমরা ভাল গোয়ালে রাখি না, পুষ্টিকর আহার দিই না, অত্যন্ত খাটাই, গুরুতর বোঝা বহাই, না বহিতে পারিলে অযথা নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া থাকি। পশ্চিমের বড় বড় নগরে প্রত্যেক চৌ-রাস্তার গোজাতীর লেহন জন্য বড় চাই লবণ বা সৈন্ধব পাথর থাকে, জলপানের জন্য ইন্দারার সঙ্গে চৌবাচ্চাপূর্ণ জল রাখা হইয়া থাকে। বঙ্গে এ সব আদৌ নাই। বোধ হয় পূর্ব্বে পুষ্করিণীর বাহুল্য ছিল বলিয়া পশ্চিম দেশীয় প্রথা এদেশে আদৌ প্রচলিত ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমানকালে বাঙ্গালা দেশে পানীয় জলের অভাব যে কি পরিমাণে হইয়াছে তাহা সকলেই জানেন। গ্রীষ্মকালে মনুষ্যের পানীয় জলের অভাবের সহিত গোজাতির পানীয় জলের সমধিক অভাব হইয়া থাকে।

কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত মিশর দেশীয় পিরামিডের উপরিস্থিত ষাঁড়ের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া বলিয়া থাকেন যে, ভারতবর্ষে গোজাতি অতি প্রাচীন কালে মিশর দেশ হইতে আর্য্যজাতির উপনিবেশ স্থাপনের সহিত আনীত হইয়াছিল। এই মতটি আমি সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। ঋক্ ও অথর্ব্ববেদে রামায়ণের বশিষ্ঠ-সুমন্ত সংবাদে ও অপরাপর স্থলে, মহাভারতে, স্মৃতিগ্রন্থে, পুরাণে ও তন্ত্রাদিতে গোজাতির বহুল উল্লেখ দেখা যায়। খৃষ্টের জন্মের ৩ শতাব্দীর পূর্ব্বে ভারত-বিজয়ের অব্যবহিত পরে ভারতীয় গোজাতির উৎকর্ষতা দর্শনে প্রীত হইয়া আলেকজাণ্ডার ২ লক্ষ গাভী, বলদ ও ষাঁড় নিজ ম্যাসিডোনিয়া প্রদেশে গোজাতির উন্নতি সাধনের জন্য লইয়া যান। গ্রীক্ ঐতিহাসিক এরিয়ান হইতে মেটফোর্ড সাহেব তাঁহার গ্রীসের ইতিহাসে এই কথা তুলিয়াছেন। এরিয়ান টলেমী হইতে ইহা প্রাপ্ত হইয়াছেন। গোজাতি দ্বারা আমাদিগের প্রাত্যহিক সাংসারিক জীবনে অশেষবিধ উপকার সাধিত হইয়া থাকে বলিয়া ধর্ম্মগ্রন্থে গোজাতির নাশ বা হানি সাধন অধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এমন কি মোগল সম্রাট্ আকবর আইন দ্বারা অবাধ গোবধ নিষিদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন। ১৮০২ সালে মহারাষ্ট্র কুলগৌরব দৌলতরাম সিন্ধিয়া যাহাতে ইংরাজরাজ্য মধ্যে গোবধ সাধিত না হয়, তজ্জন্য ইংরাজ সম্রাটকে বরং কতক দেশ ছাড়িয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। নেপাল ও অন্যান্য অনেকগুলি স্বাধীন দেশীয় রাজ্যের মধ্যে গোবধ নিষিদ্ধ। এইজন্য ভরতপুরের মহারাজা বৃদ্ধ ও হীনবল গরু ক্রয় করিয়া জঙ্গলে ছাড়িয়া দিতেন। এই স্বাধীনীকৃত গোজাতির বংশাবলীর বিষয় বোধ হয় পাওনিয়ার পত্রিকায় এগ্রিকোলা সাহেবের কোন পত্রপ্রেরক লিখেন। ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউজ পত্রিকায় "বন্য গোজাতি শীর্ষক এক বৃহৎ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। দামো, হোসেঙ্গাবাদ, বাবাই প্রভৃতি মধ্যভারতের জঙ্গল সমূহে এইরূপ বন্য গো পালে পালে বিচরণ করিয়া থাকে। একপাল একরূপ বন্য গোজাতি কৃষকগণের শ্যামল শস্যক্ষেত্র অবাধে নষ্ট করিত

বলিয়া সহৃদয় সরকার বাহাদুর অনুসন্ধানে অবগত হইলেন যে, অনুমান ২৫ বর্গ মাইলের শস্য এইরূপে নষ্ট হইয়া থাকে। নিঃস্ব প্রজাবর্গকে অশেষ ক্ষতিগ্রস্ত করে বলিয়া এইরূপ ২৪ পাল বন্য গাভীকে বন্দী করণাভিপ্রায়ে বিগত ১৯০৯ সালের মে মাসে মধ্যপ্রদেশের ডেপুটী কমিসনার, ডেঃ ডাইরেক্‌টার-অব-এগ্রিকলচার এবং তহশীলদার কৃতসংকল্প হন। সামান্য চেষ্টার পর বাবাই পাল গ্রেপ্তার হয় এবং কিছুকাল পরে ধৃত গোগুলি প্রকাশ্য নিলামে বিক্রীত হয়। এইগুলির মধ্যে অধিকাংশই চাষের জন্য জল তোলার কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে।

ইউরোপ দেশে গৃহপালিত অশ্বের দ্বারায় চাষের যে সাহায্য হয় অস্মদ্দেশে বলদবৃন্দ দ্বারা সেই কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে চাষের যাবতীয় কার্য্য হালবহন, ভূমিকর্ষণ, শকটবহন, মোটবহন, ফৌজের ট্রান্‌স্‌পোর্ট বহন বলদের দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। এই কারণে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সামর্থ্যবান বলদ উৎপাদনে এত উৎসুক। পঞ্জাব প্রদেশ মধ্যে হিসারের এবং মহীশূর মধ্যে হান্সুরের breeding farms ইহার চাক্ষুষ প্রমাণ স্থল। ইউএন্ সাঙএর ভ্রমণ বৃত্তান্ত এবং আইন-ই-আকবরী পাঠে আমরা অবগত হই যে, অতি প্রাচীনকাল হইতে যুদ্ধ বিগ্রহের অভিযানে গোজাতির সাহায্যে বহুতর কার্য্য অবাধে সাধিত হইত।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে চাষের জন্য বলদের ব্যবহার সমগ্র ভারতবর্ষে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার কয়টি কারণ আছে। (১) অশ্ব (labour) শক্তি অপেক্ষা "গো শক্তি" আমাদের দেশে সস্তা। (২) আমাদের দেশের মাটী বাষ্প-শক্তির সাহায্যে কর্ষণোপযোগী নহে। (৩) বলদের মূল্য অস্মদ্দেশে অশ্ব অপেক্ষা বহু সস্তা ও উহা অনায়াস লভ্য।

ঘি, মাখন, ছানা, ক্ষীর, ছানার জল আমাদিগের প্রধান খাদ্য সামগ্রী মধ্যে গণ্য বলিয়া, গোপালন আমাদিগের একটি প্রধান ধর্ম্ম। পুরাকাল হইতে অর্থাৎ রামায়ণ ও মহাভারতের যুগ হইতে, হিউএন সাংঙের সময় ও আইন-ই-আকবরীর সময় হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ গোপালনের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের অনাস্থাপ্রযুক্ত গোজাতির সমধিক অবনতি ঘটিয়াছে। গোপালনের দিকে আমাদিগের সমধিক দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, যেহেতু ভারত কৃষিপ্রধান দেশ।

এখন একটী জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে ভারতীয় গাভীর দুগ্ধ বিলাতী গাভীর দুগ্ধ অপেক্ষা ভাল না মন্দ এবং কোন জাতীয় গাভী অধিক দুগ্ধবতী? সম্যক্

আলোচনা করিয়া এই প্রশ্নদ্বয়ের উত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য। অবশ্য ভারতবর্ষের অনেক স্থানের ক্ষুদ্র জাতীয় গাভীকুল স্বল্প দুগ্ধবতী হইলেও এই বিশাল প্রদেশে অধিক দুগ্ধবতী গাভী আছে। এদেশে এখনও সুরভিনন্দিনীর বংশজাগণ আছে যাহারা জার্সি; ডিভনশায়ার, গার্ণসি, হোলষ্টিন বা সুইস্ গাভিকুলের দুগ্ধদানের সহিত সমকক্ষতা করিতে পারে। নেল্লোর, কাথিয়াবাড়, কৃষ্ণা, মণ্টগোমেরী, হিসার, ঝান্সি, পগেয়া গাভী যত্নে লালিত পালিত হইলে পাশ্চাত্য গাভীকুলের দর্পচূর্ণ করিতে সমর্থ। কেহ কেহ বলেন যে—The milk of the Indian cows is too poor in quality to be of any use for large dairy purposes ইহা সম্পূর্ণ ভুল। গাভীর দুগ্ধ, যত্ন, খাওয়ানর উপর এবং উত্তম বলদের উপর নির্ভর করে। শেষ বিষয়ে ২।১ কথা এইখানে বলা আবশ্যক। একটি কম দুগ্ধবতী ক্ষুদ্র জাতীয়, অপরটি বেশী দুগ্ধবতী ভারতীয় গাভীর কথা ধরুন। প্রথমটিকে একটি হৃষ্টপুষ্ট ষাঁড় দ্বারা এবং দ্বিতীয়টিকে অপেক্ষাকৃত কৃশ ষাঁড় দ্বারা Breed করুন। কি ফল হইবে তাহা দেখুন। গবর্ণমেণ্ট ফারমে এবং আমেরিকার কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাক্ষেত্রে একরূপই ফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। প্রথমটির বৎস মাতা অপেক্ষা বলিষ্ঠ, বড় এবং হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে; যেহেতু বড় fœtusটি ধরাইবার জন্য জরায়ুটকে অপেক্ষাকৃত বড় আকার ধারণ করিতে হইয়াছে এবং ফলে যথাকালে বলিষ্ঠ বৎস প্রসব করিয়াছে। দ্বিতীয়টির বৎস যদিও ষাঁড়ের মত বড় হয় নাই, কিন্তু মাতা অপেক্ষা বড় হইলেও হীনবল হইয়াছে। বড় Ovaryতে ভাসিয়া থাকায় fœtusটি সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টিলাভ করে নাই বলিয়া ছানাটি হীনবল হইয়াছে। সেইজন্য তেজস্কর উত্তম জাতীয়, লক্ষণাপন্ন ও বলিষ্ঠ দেখিয়া ষাঁড় দ্বারা serve করান উচিত। যে গাভী গরম হয় না বা জল বায়ুর প্রভাবে ঋতুমতী হয় না, তাহাকে মাঠে দেওয়া কর্ত্তব্য এবং অমাবস্যা ও পুর্ণিমার সময়ে শ্বেত কুঁচ ও কুক্কুট অণ্ডের কুসুমটি ২।১ বার ১৫ দিবস ব্যতিক্রমে খাওয়ান কর্ত্তব্য। গাভী ঋতুমতী হইলে তাহার কয়েকটি লক্ষণ পরিদর্শিত হয়—বাঁটগুলি লালবর্ণ ধারণ করে, গাভী মুহুর্মুহুঃ ডাকিতে থাকে, ছটফট্ করিতে থাকে, ঘন ঘন মলমূত্র ত্যাগ করিতে থাকে, লেজটি সোজা অবস্থায় পড়িয়া থাকে না। ইত্যাদি আরও অনেক লক্ষণ আছে, যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

ভারত গবর্ণমেণ্টের কৃষি বা রসায়ন তত্ত্ববিদ্ ভারতীয় গাভীর দুগ্ধ সম্বন্ধে ১৯০৫-৬ সালের রিপোর্টে কি বলিয়াছেন, তাহা দেখুন :—The Indian Cow's milk is not poorer than, but as rich as that of the European Cow's milk in butter fat. ডাঃ লেদার তাঁহার রিপোর্টে ১৯ নং Agricultural Ledgerএ ১৯০০ সালে নিম্নলিখিত ফল দেখাইয়াছেন :—

		প্রতীদ	শেতসার বা শর্করা	খনিজ পদার্থ
পুণা	৬·২৯৯	৪·৬০	৪·৪৩	০·৯৭
সৈদাপত	৪·৪০০	৪·৩৫৫	৬·২৬৫	১·০২
,,	৭·৪০০	৪·৩৭	৬·৬৫৫	০·৯৭৫

ভারতজাত গোদুগ্ধে শতকরা ৪·৬ ভাগ মাখন বা ঘৃত, প্রতীদ (কেশীন ব এলবুমেন) ৩·৫ ভাগ, চিনি ৪·৫ ভাগ থাকে। উপাদান গুলি প্রকারে বিলাত গো-দুগ্ধের উপাদানের মত। গোদুগ্ধের উপর আমাদিগের জীবন ধারণ নির্ভর করে। সেই জন্য ইহা যতই টাট্‌কা (fresh) এবং বিশুদ্ধ ব্যবহৃত হয়, ততই মনুষ্য জীবনের হিতকর। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সেই জন্য বলিয়াছেন "The cow is a chemical laboratory in which continued chemical changes are going on." গোময় ও গোমূত্রের বিশ্লেষণ দ্বারা যাহা ডাঃ লেদার ১৯০০ সালে পাইয়াছেন, তাহা দেখিলে সম্যক্‌ উপলব্ধি হইবে যে, আমাদের চাষাগণ কিরূপ সার নষ্ট করিয়া থাকে। সারের জন্য গোমূত্রের ব্যবহার আমাদের দেশে প্রায় দৃষ্ট হয় না। গোহাড়ে সার হয়। ইহার ব্যবহার আমাদের দেশে চা—বাগান ছাড়া অপর কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না। গোজাতি কি জীবিত কি মৃত উভয় অবস্থায় আমাদিগের উপকার প্রদান করে। গো-হাড় ছুরির বাঁট ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যে হস্তিদন্তের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হাড় পোড়াইয়া তদ্দারা রূপা পরিষ্কৃত করা হয় এবং গুঁড়াইয়া, পোড়াইয়া, এবং পচাইয়া সারের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। গুঁড়া হাড় সলফিউরিক এসিডে কিম্বা কষ্টিক পটাসে গলাইয়া সারার্থে অবাধে ব্যবহৃত হইতে পারে। হাড়ে শতকরা ৫৫ p. c. ফস্‌ফেট-অব-লাইম এবং মেগনিসিয়া আছে। বৃদ্ধ গোহাড় অধিকতর উপকারী।

গো-চর্ম্ম আমাদের দেশে জুতা, গাড়ির সাজ, ব্যাগ, পোর্টমেণ্টো, মৃদঙ্গ, ঢোলাদি বাদ্যযন্ত্র ছাওয়ান, এবং শত শত আবশ্যক কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে যত গোবধ হয়, এরূপ আর কোন দেশেই প্রায় হয় না। সেইজন্য ভারতবর্ষ চামড়ার জন্য বিখ্যাত। অল্পদিনের মধ্যে শত শত মুসলমান চর্ম্ম ব্যবসায় করিয়া ধনকুবের হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। হিন্দুগণ এ ব্যবসা করেন না। ইহা হিন্দুর ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া ত্যজ্য। কিন্তু আজকাল মুখুয্যে, চাটুয্যে ও কত বন্দ্যঘটী, কুলের মুখুটী সন্তান জুতার দোকান করিয়া স্বীয় পদমর্য্যাদা মস্তকহীন হিন্দু সমাজে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছেন।

লোম হইতে গদি, জিন, কুশান ইত্যাদি প্রস্তুত হয়, শিঙ হইতে ছুরির বাঁট, চিরুণী ইত্যাদি তৈয়ারি হয়, গোপদ হইতে নীটস্‌ ফুট অয়েল চোলাই হয়।

ইহাতে চর্ম্ম নরম এবং মসৃণ থাকে। ক্ষুর, হাড়, চর্ম্ম হইতে শিরীষ প্রস্তুত হয়। গোরক্তে চিনি পরিস্কৃত হয়, সার হয় এবং শিঙ রক্ত এবং ক্ষুরে রঙ তৈয়ার হয়. গো-চর্ব্বিতে সাবান, এবং বাতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, গোজাতি অশেষ প্রকার আমাদিগের হিতসাধন কারী।

সরকারী কৃষি সংবাদ।

মধ্য-ভারতে ও মধ্যপ্রদেশে খেজুর গুড়।

গত ১৭ই মের শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত প্রবন্ধে, মধ্যভারত ও মধ্যপ্রদেশে খেজুর গাছ হইতে গুড় চিনির ব্যবসা চলিবার সম্ভাবনা নাই, এই কথা তিনি লিখিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে যৌথ প্রণালীতে খেজুর গুড়ের করবার চালাইবার ব্যবস্থা আমিই করিয়াছিলাম। সে কার্য্য ২।৩ বৎসর চলিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। যৌথ কার্য্য বন্ধ হইয়াছে সত্য কিন্তু আমরা নিজে যে গ্রামেতে চাষবাস করি, সেখানে বিস্তর খেজুর গাছ থাকায়, তাহা হইতে আমরা প্রায় প্রতি বৎসরেই খেজুর গুড় ও কখনও কখনও চিনি প্রস্তুত করিয়া থাকি। যৌথ কারবার ১৮৯৯ সালে আরম্ভ করা হইয়াছিল। এদেশের ধনবান্ লোক ও উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারিগণ এই নুতন প্রণালীতে গুড় চিনি প্রস্তুত করা সম্ভাবিত নয় মনে করিয়া, ঐ যৌথ কার্য্যে যোগদান করেন নাই। সুতরাং যৌথ কারবার বন্ধ হইয়াছিল। তথাচ, গ্রামে গ্রামে এ কার্য্য প্রচলিত হইলে, এ দেশের কৃষকেরা, পূর্ব্ব বাঙ্গালার কৃষকদিগের মত, চাষ ও খেজুর গুড়ের ব্যবসা অবলম্বন করিয়া উন্নতি সাধন করিতে পারিবে বিবেচনা করিয়া, আমি আজ পর্য্যন্ত ঐ কার্য্যে ও চিন্তাতে বিশেষ মনোযোগের সহিত নিযুক্ত আছি। মধ্য-প্রদেশ ইংরেজ শাসনাধীন। সেখানে গ্রামের অধিকারী গণকে মালগুজার বলে। সচরাচর তাহাদের ও কৃষকদিগের ব্যবস্থা উন্নত নয়, এবং নুতন প্রচলিত কার্য্যে তাহাদের আদৌ শ্রদ্ধা বা মনোযোগ হয় না। সেই জন্য আমি কয়েক বৎসর হইতে মধ্য ভারতের দরবারে এই প্রকার প্রার্থনা করিতেছি যে, দরবার হইতে খরচ করিয়া স্থানে স্থানে প্রদর্শন-ক্ষেত্র স্বরূপ (Demonstration farm) খেজুরগুড় ও চিনি প্রস্তুতের প্রণালী ব্যবস্থাপিত করা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। কেননা, তাহা হইলে এদেশীয় কৃষি ও শ্রমজীবি লোক সকল এই নুতন কার্য্যপ্রণালী দেখিতে দেখিতে শিক্ষিত হইতে থাকিবে। তাহাতে এ

দেশের অত্যন্ত মঙ্গল ও গ্রামসমূহের মঙ্গল সাধন হইবে, কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এ পর্য্যন্ত মধ্যভারতের রাজকীয় দরবার এ বিষয়ে কোন লক্ষ্য বা ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন না।

উল্লিখিত ঘটনা সকল হইতে যদ্যপি কেহ এরূপ অনুমান করিয়া থাকেন যে, এতদ্দেশীয় খেজুর গাছ হইতে রস নির্গত হয় না কিম্বা ভাল গুড় চিনি হয় না, তাহা অত্যন্ত ভ্রম। আমি এ কথা জানিতাম না যে, শীতকালে এদেশে খেজুররস গেঁজে ঘোলা হইয়া যায়; অল্পদিন মাত্র রস পরিষ্কার থাকে, সুতরাং এদেশে খেজুরগুড়ের ব্যবসা করিয়া কোন লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই; এ কথাও সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক ও কিছুমাত্র অনুসন্ধান না করিয়া লেখা হইয়াছে। আমি যৌথ কারবার খুলিবার পর ইন্দোর দরবার, প্রকৃত এ কার্য্যে লাভ হইতে পারে কিনা দেখিবার জন্য, মোরদ নামক একটি গ্রামে প্রদর্শন ক্ষেত্র খুলিয়াছিলেন এবং আমাকেই ঐ কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ১৯০২ সালের শীতকালে নদীয়া হইতে ১১ জন শিউলি আনাইয়া আমি ঐ প্রদর্শনক্ষেত্রে যথোচিত পরিশ্রম করিয়াছিলাম। মোরদ গ্রামে প্রায় ৮।১০ হাজার খেজুর গাছ আছে। তাহা হইতে প্রায় ১২০০ গাছের মহলে আমি কার্য্য চালাইয়াছিলাম। ঐ সমস্ত খেজুর বন জঙ্গল ও ঘাসে পরিবেষ্টিত। গাছের তলায় জমিতে কখনও চাষ দেওয়া হয় না। পূর্ব্ব বাঙ্গালায় কৃষকেরা এবং জমিদারগণ রীতিমত খেজুর চারা বপন করিয়া ও জমি চাষ করিয়া খেজুরের মহল প্রস্তুত করিয়া থাকে। কিন্তু এদেশে স্বভাবজ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে যে সকল খেজুরবন গ্রামে গ্রামে বিদ্যমান আছে এদেশের লোক তাহার উপযোগিতা না জানায় ঐ খেজুর বনসমূহের কোনও আদর নাই ও রক্ষণাবেক্ষণ নাই; এবং জমি চাষ করা দূরে থাক, গ্রীষ্মকালে খেজুর গাছ সকল হইতে লোকে পাতা কাটিয়া লইয়া থাকে, সেজন্য খেজুরগাছ বলহীন হইয়া যায়। তথাচ এই প্রকার গাছ হইতে আমি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রস নির্গত করিয়া গুড় ও চিনি প্রস্তুত করিয়াছি। তাহা বাঙ্গালা প্রদেশ অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নয়। ইহা শীতপ্রধান দেশ। বরং বাঙ্গালাতে কখন কখন শীতকালে গরম হাওয়া চলিলে, বা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে খেজুর রস খারাপ হইয়া যায়, কিন্তু সে অবস্থা এখানে কম দেখিতে পাই। এবং এই সকল পাহাড়ী দেশে খেজুর রস বাঙ্গালা অপেক্ষা জেয়াদা মধুর। আমি দেখিয়াছি যে পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ১০।১১ সের রস হইতে ১ সের গুড় প্রস্তুত হয়, কিন্তু এদেশে ৭০সের রস হইতে ততই গুড় হয়, তাহা বাঙ্গালার খেজুর গুড় অপেক্ষা অনেক পরিমাণে উৎকৃষ্ট এবং ঐ গুড়ে চিনির পরিমাণ জেয়াদা। মিঃ অ্যানেণ্ট সাহেব (Mr. H. E. Aunelt of Pusa) সম্প্রতি যশোহরের ও

মধ্য-ভারতের গুড় দেখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, এদেশের খেজুরগুড়ে চিনির পরিমাণ বেশী।

ইন্দোরের সরকারি রিপোর্টে (Indore State Administration Report of of 1903) মোরদের কার্য্য সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"বাঙ্গালাপ্রদেশ হইতে ১১ জন শিউলি আনাইয়া মোরদ গ্রামে গত বৎসর খেজুর বাগান হইতে গুড় ও চিনি প্রস্তুত করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় এই কার্য্যের জন্য সরকার পক্ষ হইতে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। ইহাতে প্রায় ১০০০৲ টাকা ব্যয় ও গুড় চিনিতে ৮০০৲ টাকা আমদানী হইয়াছিল। এ সওয়ায়, অনেক কড়াই ইত্যাদি মাল মশলা মজুত ছিল। এদেশের লোকেরা নূতন কার্য্যপ্রণালী শিখিবার জন্য চেষ্টা বা ইচ্ছা করে না। কিন্তু শিখিলে এ কার্য্য হইতে লাভ করিতে পারিবে। প্রায় ১৮০ মণ গুড় ও ৫০ মণ চিনি প্রস্তুত হইয়াছিল ইত্যাদি।"

উল্লিখিত হিসাবে চিটের পরিমাণ ধরা হয় নাই। প্রায় ৭০।৮০ মণ চিটে নির্গত না হইলে ৫০ মণ চিনি প্রস্তুত হয় না। সুতরাং গুড়, চিটে ও চিনি মিলাইয়া ১১ জন শিউলী প্রায় অনুমান ৩০০ মণ খেজুরগুড় প্রস্তুত করিয়াছিল। তাহা হইলে প্রত্যেক গাছী প্রায় ২৮ মণ, অর্থাৎ ১ টন গুড় প্রস্তুত করিয়াছিল। ১৯০৮ সালে নাগপুরের শিল্প ও কৃষি সম্বন্ধীয় যে প্রদর্শনী (Fxhibition) হইয়াছিল, সেই সময় আমি নাগপুরে সরকারী বাগানে (Agricultural farm) ৩ জন শিউলী নিযুক্ত করিয়া খেজুর গাছ হইতে রস, গুড় ও চিনি প্রস্তুত করিয়াছিলাম। প্রত্যহ সকালে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে নাগপুর সহরে রস বিক্রয় হইত। আদরের সহিত লোকে সমস্ত গুড় ক্রয় করিত। প্রদর্শনীক্ষেত্রে ঘূর্ণিত চক্র-যন্ত্র (Centrifegal) গুড় হইতে চিনি করিয়া দেখাইয়াছিল। প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষেরা সেই জন্য আমাকে বিশেষ আদরের সহিত প্রশংসাপত্র ও পারিতোষিক দিয়াছিলেন।

উল্লিখিত কথাগুলি আমার কাল্পনিক নহে, প্রকৃত ঘটনাগুলি বিবৃত করিলাম। যদ্যপি ত্রৈলোক্যনাথ বাবুর আমার সহিত সাক্ষাৎ হয়, অথবা এদেশে একবার আসিয়া তদন্ত অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে আমার এতাবৎ চেষ্টা ও কার্য্য "বালকের ক্রীড়া" মনে করিবেন না। সম্প্রতি আমার বয়ঃক্রম ৬২ বৎসর। আমার পৌত্রগণ ও দৌহিত্রগণ বালকের মধ্যে পরিগণিত; কিন্তু ঐ সকল বালকবৃন্দ যেমন তাহাদের পুতুলও ক্রীড়ার সামগ্রী লইয়া যত্নের ও আনন্দের সহিত তন্ময়ভাবে দিনযাপন করে, সেইরূপ সম্প্রতি আমি, চির-পরিচালিত

ওকালতি ব্যবসা প্রায় পরিত্যাগ করিয়া, খেজুরের গুড় চিনির ক্রীড়াতে তন্ময় হইয়া আছি এবং বালকদিগের ক্রীড়া দেখিয়া অপর লোক নিন্দা বা অগ্রাহ্য করিলে যেমন তাহাদের মন বিচলিত হয় না, বরং কতক পরিমাণে আগ্রহান্বিত হইয়া ক্রীড়াতে অধিকতর মনোনিবেশ করে, ত্রৈলোক্য বাবুর নিরুৎসাহে আমিও কিছু আনন্দলাভ করিলাম। সেই জন্য আমি আপনাদিগকে ও ত্রৈলোক্যনাথ বাবুকে আজ ডাকযোগে দুই খানি পুস্তক উপহার স্বরূপ আপনাদের নিকট পাঠাইলাম। এক খানি আপনারা লইবেন ও দ্বিতীয়খানি ত্রৈলোক্য বাবুকে পাঠাইবেন; অবশেষে সানুনয় নিবেদন এই যে, বহুকাল এদেশে বাস করিয়া আমি জীবনের শেষভাগে এই বাঞ্ছনীয় কার্য্য সম্বন্ধে যতটুকু চেষ্টা করিতেছি ও করিয়াছি তাহাতে আপনারা এ বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া আমার কার্য্যে যোগদান করিলে বাধিত হইব। কেননা, বালকের অরণ্যে রোদনের মত আমার কথায় লোকে কর্ণপাত করিতেছেন না। অথচ কোন কোন দুরদর্শী ও জ্ঞানী লোকেরা আমার কার্য্যে উপহাস করিয়া থাকেন। কেবল এইমাত্র ভরসা ও ইচ্ছা যে, কল্পিত উদ্যোগ ও কার্য্য সম্বন্ধে আমার জীবনে সফলতা লাভ হউক বা না হউক, আপনাদের এ বিষয়ে সহানুভূতি হইলে স্থানে স্থানে এই প্রস্তাবটি প্রতিধ্বনিত হইতে পারে; এবং আপনাদের ন্যায় কৃষিতত্ত্বানুরাগী মহাশয়েরা এই কার্য্যের প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান করিয়া যথার্থ কথার আন্দোলন করিলে আমি সার্থক এদেশে আসিয়াছিলাম বোধ করিব।—শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়।

ইন্দোর, মধ্যভারত।

বিজ্ঞাপন।



জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০ সাল।

ছোট জোতদার ও ছোট জোত জমি

ব্যবসা কিম্বা বাণিজ্য লব্ধ অর্থ বল, রাজস্ব বল, খনিজ ধনরত্ন বল সকলেরই মূল প্রস্রবণ সেই ভূমি। কোন না কোন প্রকারে ভূমি হইতে সমুদয় ধন সম্পত্তি উৎপাদিত হইতেছে এবং প্রকারান্তরে দেখিতে পাওয়া যায় যে যাহারা ভূমি লইয়া পড়িয়াছে তাহারাই এক একটি জাতির মূল ভিত্তি। যে জাতির কৃষি কিম্বা কৃষি জাত শিল্পের প্রতি আস্থা কমিয়া আসিয়াছে বা যে জাতি কৃষক কুলকে অনাদর করিতে আরম্ভ করিয়াছে সে জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী, ইতিহাসের অক্ষরে অক্ষরে এই কথাই লেখা আছে।

কৃষিক্ষেত্র ছোট হইতে পারে, বড়ও হইতে পারে। কোন একটি চাষী ২৫ কিম্বা ৫০ অথবা বড় অধিক হইলে ১০০ বিঘা জমি লইয়া তাহার ক্ষেত্র রচনা করিতে পারে, কিন্তু তাও এক সঙ্গে পঁচিশ, পঞ্চাশ বা শত বিঘা জমি যোগাড় করা তাহার পক্ষে নিতান্ত সহজ নহে। অপর পক্ষে একজন ধনকুবের মনে করিলে সহস্র সহস্র বিঘা জমি লইয়া কৃষিকর্ম্ম পরিচালনা করিতে পারে। ছোট ছোট চাষীগণ সে ক্ষেত্রে বেতন ভোগী মাত্র। দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক বেতন লইয়া মজুরালী করিতেছে মাত্র।

এক সময়ে ইংলণ্ডের মত দেশেও ছোট ছোট জোত জমি ছিল। তথায় চাষীগণ স্বাধীন ভাবে স্ব স্ব ক্ষেত্রে কার্য্য করিত। দেশের ধন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকের মত ফিরিয়া গেল। প্রকাণ্ড কৃষি ক্ষেত্র রচিত হইল। ছোট ক্ষেত্র স্বামীর জমি বড় ক্ষেত্রের মধ্যে ঢুকিয়া গেল এবং তাহারা সাপ্তাহিক বেতন লইয়া বড় ক্ষেত্রস্বামী ধনীর নিকট মজুরি করিতে বাধ্য হইল। ধনীর প্রভাব বাড়িতে লাগিল, সামান্য চাষীগণ ক্রমশঃ নগন্য হইয়া পড়িল, দিন মজুরীতে তাহাদের সব অভাব পূরণ হয় না। তাহাদের পরিবার গণের মধ্যে দুঃখ

দারিদ্র দেখা দিল। তাহাদের ছোট ক্ষেত্রটির এক কোণ ফলিলে তাহারা সপরিবারে খাইয়া ফুরাইতে পারিত না, উদ্বৃত্ত ফসল বেচিয়া তাহাদের অন্য অভাব মোচন করিত। তার উপর তারা চাষের সঙ্গে সঙ্গে দুই একটা গরু পুষিত, দুই চারিটা হাঁস, মুর্গী, ভেড়া, শুকর পালিত, তাহাতে তাহাদের আরও স্বচ্ছলে দিন কাটিত কিন্তু তাহারা এখন সে অবসর হারাইয়াছে। ইংলণ্ড, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়ায় বৃহৎ হইতে বৃহত্তম ক্ষেত্র রচনা হইয়া আধুনিক কালে এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। ধনীগণ ক্রমাগত মজুরের মজুরীয়ানা কমাইবার চেষ্টায় ফিরিতেছেন, তাহাদিগকে ক্রীত দাসের মত খাটাইতে চাহেন। মজুরগণ কম মজুরিতে খাটিতে রাজি নহে তাহারা বুঝিয়াছে যে তাহারা স্বাধীনতা হারাইয়া ধনে প্রাণে মজিতে বসিয়াছে। ভারতে মূল ধনের অভাব বলিয়া এখনও সম্পূর্ণ ঐ প্রথায় কার্য্য আরম্ভ হয় নাই কিন্তু বহুতর চেষ্টা হইতেছে। ইতিমধ্যেই বড় বড় দুইটি দশটি কল কারখানার সৃষ্টি হইয়া ক্ষুদ্র শিল্পগুলি উঠিয়া যাইতে বসিয়াছে। জগত জুড়িয়া এখন বড় বড় কারবার, বৃহৎ কলকারখানা, প্রকাণ্ড কৃষিক্ষেত্র। সেগুলিতে ধনীর একচ্ছত্র আধিপত্য। একবার ছোট ছোট কৃষক পরিবারের কথা ভাবিয়া দেখ তাহারা কেমন সানন্দ মনে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতেছে, তাহাদের স্ত্রী পুত্র পরিবার সকলেই তাহাদের কার্য্যে যোগ দিয়াছে, ছোট খাট শিল্পালয়ে, ছোট ছোট বালক বালিকারাও ছোট খাট কাজেতে লিপ্ত, তাহারাও শিল্পীর সহায়, এক একটি পরিবার বহুকাল যাবৎ এক একটি শিল্প লইয়া কেমন তাহাতে সুনিপুণ হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রকারের এক একটি স্বাধীন পরিবার লইয়া সমাজ গঠিত হইত; কেমন সানন্দে আহার, ব্যবহার ও বিহারের ব্যবস্থা ছিল। এখন মহৎ ক্ষুদ্রকে গ্রাস করিতে উদ্যত, ক্ষুদ্র তাহার সত্তা হারাইতে বসিয়াছে।

বড় বড় শিল্পের কেন্দ্রে এখন কৃষিকার্য্যের স্থান নাই। তথায় কৃষিকার্য্য সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষিত হইতেছে। সেই সকল কেন্দ্রে খাদ্য শস্যের প্রায়ই অভাব অন্যত্র হইতে আহার যোগান না পাইলে তাহাদের আর উপায়ান্তর নাই। শিল্প বাণিজ্যে অধিক লাভ, তাই সেই দিকে লোকে ছুটিতেছে, নগরে নগরে শিল্পের কেন্দ্র, লোক নগরে থাকার সুখ বুঝিয়াছে, তাহারা আর পল্লিবাসে রত নহে, পল্লিবাসের কষ্ট সহ্য করিতে পারে না, চাষের কর্ম্ম অপকর্ম্ম বলিয়া মনে দৃঢ়তর ধারণা জন্মিতেছে। কে কাদা ধুলা ঘাঁটে, কে রোদ, বৃষ্টি, ঝড় ঝাপটা মাথায় করিয়া ক্ষেতে রাত দিন খাটে। কিন্তু হায়! লোকে মোহ বশতঃ বিস্মৃত হইতেছে যে স্বচ্ছন্দ চাষ বাসে স্বাধীন ভাবে স্বভাবে থাকাতে অনেক সুখ। ভারতীয় কৃষক পরিবারকে ঋণদায় হইতে মুক্ত কর তাহলেই তাহারা দেশের সকল অভাব

যোগাইবে। শিক্ষিত যুবকদল দুই এক শত বিঘা জমি লইয়া সামান্য মূলধন লইয়া কার্য্যে নামুন। তাঁহাদের কৃষিক্ষেত্র আদর্শ কৃষিক্ষেত্র হউক, চাষাদের সঙ্গে এক যোগে কার্য্য করুণ, এক একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন চাষী পরিবার প্রতিষ্ঠিত হউক, তাঁহারা সমাজ বদ্ধ হইয়া এক মতে কার্য্য করুণ দেখিবেন ভূমি হইতেই তাঁহাদের সব অভাব মোচন হইতেছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম যে চৌদ্দ বিঘা জমি লইয়া একজন তাহার স্ত্রী ও দুই একটি সন্তান লইয়া বেশ স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারে। জাপানে এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু কৃষক পরিবার আছে। তাহারা সামান্য জমি লইয়া চাষবাস করে। তাহারা জমিতে অশ্রান্ত পরিশ্রম করে এবং এক জমি হইতে তিন চারি বা ততোধিক ফসল উৎপাদন করে। তবে এরূপ স্থলে জমিতে কায়েমী সত্ব থাকা চাই, রাজা জমিদারের একটু সহায়তা চাই। মনে থাকে যেন চাষ ও চাষী রক্ষা হইলে তবে জাতীয়ত্ব ও মহত্ব রক্ষা হইবে।

ভারতের মত কৃষি প্রধান দেশেরও কৃষির বিশেষ দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে। কল কারখানার চাকুরির লোভে বলিষ্ঠ কর্ম্মঠ লোকে সহর নগরের দিকে ছুটিতেছে, কৃষিকর্ম্ম অপেক্ষাকৃত হীনবল নির্ব্বোধ লোকের উপর ন্যস্ত হইতেছে। জমিদারগণ, যাঁহাদের কর্ম্মভূমি পল্লিগ্রাম, তাঁহারা পল্লিবাস ত্যাগ করিয়া সহর বাসে আছেন। চাকুরি ও বাণিজ্য ব্যবসায়ের লোভে অনেকে দেশ বিদেশেও যাইতেছেন। অধিক মজুরীর লোভে কত শত লোকে বিদেশীয়ের পদানত হইয়া প্রবাসে কাল কাটাইতেছে। অনেক কর্ম্মী লোকও দারুণ করভারে পীড়িত হইয়া বা জমিতে স্থায়ী সত্বলাভ করিতে না পারিয়া ইতঃস্ততঃ ছুটা ছুটী করিয়া বেড়াইতেছে। এই ব্যাপারের একটা সুব্যবস্থা করিতে না পারিলে চতুর্দ্দিকে বিশৃঙ্খলা দেখা যাইবে ইহা সুনিশ্চিত। রাজা কিম্বা জমিদার মনে করিলে তবে সুব্যবস্থা সম্ভব নচেৎ নহে।

এখন কল কারখানার যুগ আসিয়াছে সকল দেশেই সকলে চিৎকার করিতেছে যে কলে জল উত্তোলন কর, কলে লাঙ্গল চালাও, কলে মাটি কাট, কলে কাপড় বয়ন কর, যাহা কিছু কর্ম্ম সব কলেই হউক। অধিকাংশ কাজ কলেই সাধিত হইতেছে, সূক্ষ্ম শিল্প কারিগরী, কারু কার্য্য লোপ পাইতে বসিয়াছে। রাজা না মনে করিলে কে তাহার পুনরুদ্ধার করিবে? শক্ত পাথুরে জমি না হইলে কলে লাঙ্গল চালান চলে না। দুই প্রকারে কলে লাঙ্গল চালান যায়। এক রকম—এঞ্জিন ক্ষেতের দুই বা তিন কোণে বসাইয়া সমুদয় ক্ষেতময় দড়ি খাটাইয়া লাঙ্গল টানা টানি করা। একজন লোক কেবল লাঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে যাইবে মাত্র। সুপ্রশস্ত ক্ষেত না হইলে একার্য্য সম্ভব নহে কেননা খরচ পুষাইবে কেন।

আর এক রকম মোটার লাঙ্গল—মোটরের সহিত লাঙ্গল বাঁধা। কিন্তু ক্ষেতের উপর ঐ মটর চলিলে ক্ষেতের জমি বসিয়া যায় তাহাতে ক্ষতি হয়। মটর লাঙ্গল চালাইতে খরচ কিছু কম নহে। বিস্তর মূলধন বা যৌথ মূল ধন না হইলে কলে চাষ চলে না। যেখানে জলের অভাব, বহুদূর কোন নদ নদী হইতে জল আনিতে হয় সেই খানে কলে জল তুলিতেই হইবে বা কূপ খুব গভীর হইলে তাহা হইতে জল তোলবার জন্যও কলের আবশ্যক। কিন্তু কল অপেক্ষা কৌশলে কার্য্য সারিতে পারিলে ভাল হয়।

ছোট ছোট জোত জমি লইয়া এক একটি আদর্শ কৃষক পরিবারের প্রতিষ্ঠা করিলে যেন সকল দিকে সুমঙ্গল হয়। তাহাদের আমরা পরিশ্রম লাঘব কারী কৃষি-যন্ত্র ব্যবহার করিতে নিষেধ করি না। হস্ত চালিত কলের বিদে, কোদাল, খুরপি ব্যবহার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আলু তুলিতে, আকের ক্ষেতের গোড়া তুলিয়া ফেলিতে কলে চালিত কোদাল ব্যবহার নিতান্ত আবশ্যক। জল তুলিবার সুকৌশল আবশ্যক। আমরা চাই আবশ্যকমত সীমাবদ্ধ পরিমিত জমি লইয়া কৃষক পরিবার স্বাধীন ভাবে তাহাদের কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। কিন্তু তাহাতে একটু অন্তরায় আছে। সহর নগরের সুখ স্বচ্ছন্দতা পরিত্যাগ করিয়া নাচ তামাসা ছাড়িয়া পল্লিবাসের সেই এক ঘেয়ে চাষে জীবন নিক্ষেপ করা কম দৃঢ়তার কাজ নহে। জগত জুড়িয়া এখন সাধারণ জ্ঞানের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। অতি দূরবর্ত্তী দেশও নিকট হইয়াছে, ইচ্ছা করিলে ঘরে বসিয়া তুমি সমস্ত পৃথিবীর খবর লইতে পার। কিন্তু এ সকল সুযোগ কেবল নগর বাসেই ঘটিয়া থাকে। পল্লীবাসী অনেক সময় সমগ্র ভূখণ্ড হইতে আপনাকে পৃথক করিয়া, এক কোণে ফেলিয়া রাখে। যেন তাহার সহিত অন্যের কোন সংস্রব নাই। সে যেন তাহার ছেলেপিলেদের উচ্চ শিক্ষা দিবার অধিকারী নহে। সে যেন সাধারণ জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ্চার ধার ধারিতে পারে না। সে যেন অবিশ্রান্ত অশ্রান্ত ক্ষেতে খাটিতে আসিয়াছে এবং খাটিয়া কোন রকমে গ্রাসাচ্ছাদনের যোগাড় করিবে মাত্র এবং খাটিয়াই জীবন শেষ করিবে। তাহার পয়সা কোন কালে তাহার অভাব ছাপাইয়া উঠিবে না এবং সে বর্ত্তমান যুগের সুখ সম্ভোগের অধিকারী হইবে না। কেবল কৃষি লইয়া পড়িয়া থাকিলে সত্যই কোন চাষীর অদৃষ্ট অধিকতর সুপ্রসন্ন হইবার আশা নাই। কিন্তু ঐ সকল কৃষক পরিবার যদি তাহার সহিত দেশের ক্ষুদ্র অথচ সুনিপুণ শিল্প সমূহের পুনরুদ্ধার করিতে পারে, যদি তাহার সমাজ ও একতা বন্ধন ঠিক করিয়া লইতে পারে, মনকে উচ্চ আদর্শে গড়িয়া তুলিতে পারে, আপাততঃ সুখ ত্যাগ করিলেও তাহারা যে জাতীয়ত্ব রক্ষা করিবার মুখ্যপাত্র একথা প্রাণে প্রাণে বুঝিতে পারে, তবে অচিরে সকলেই

তাহাদের করায়ত্ব হইবে। রাজা জমিদার তাহাদের দিকে ফিরে চাহিবেন, দেশের রক্ষকদের আগে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিবেন এবং তাঁহাদের সুখ স্বচ্ছন্দের উপায় বিধান করিবেন। চাই দৃঢ়তা, চাই উদ্যম, চাই কর্ত্তব্য পালনে দৃঢ় পণ।

কপি প্রভৃতি বিলাতী শাক সব্জীতে পোকার প্রতিকার।

বিশেষ যত্নের সহিত ক্ষেতের পাট করিতে হইবে, ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকের আইল পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য, পোকা নষ্ট করিবার উপযোগী সার ব্যবহার করিতে হইবে এবং ক্ষেতে আকাশ প্রদীপ দিয়া তাহার তলায় জলপূর্ণ পাত্র রাখিয়া দিতে হইবে। এইরূপ কোন না কোন উপায়ে পোকা আক্রমণ নিবারণ করা যাইতে পারে। জমীতে চাষ দিয়া বীজ রোপণের ও গাছ তুলিয়া নাড়িয়া পোঁতার পূর্ব্বে তাহাতে হাঁস মোরগাদি পক্ষী ছাড়িয়া রাখিয়া দিতে হইবে। কেরোসিন নির্য্যাস ব্যবহার করিলে উপকার হইতে পারে। কিন্তু বাঁধা কপি যখন বাঁধিতে আরম্ভ করে তখন ঐ আরক ব্যবহার করা উচিত নহে। কপি পোকাগুলা অর্থাৎ চোরা পোকা বা কাট্‌রি পোকা রাত্রিচর সুতরাং আকাশ প্রদীপ দ্বারা উপকার দর্শিবে। কুমিরকে পোকা বা কুম্ভকারিকা নামক প্রজাপতি জাতীয় পোকা দিনে বিচরণ করে এবং ডিম পাড়ে। ঐ সকল পোকা খুঁটিয়া ফেলিয়া দেওয়া ভিন্ন আর উপায় নাই—কপি বাঁধিলে তাহাও অসম্ভব। সুলফা ও ধনে প্রভৃতি তীব্র গন্ধযুক্ত মসলা গাছ কপি ক্ষেত্রের চারি ধারে রোপণ করিলে তাহার গন্ধে প্রজাপতি পোকা কপির ধারে ঘেঁসেনা। সবজী ক্ষেতের চারি ধারে অরহর কড়াইয়ের বেড়া দেওয়া ভাল। অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে অরহরের ফুল হয়। সেই ফুলের গন্ধে পতঙ্গ ও মক্ষিকাকুল আকৃষ্ট হয়। ঐ পোকাগুলি ক্ষেতে বসিলে অনেক অনিষ্ট করিত।

মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের কৃষি ভিন্ন আর উপায় নাই।

পি, সি, সরকার একজন খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক ছিলেন। ২০।২৫ বৎসর যাবৎ ১৫ টাকা হইতে ২৫ টাকা বেতনে ধর্ম্ম প্রচারের কার্য্য করিতেন। ২০।২৫ বৎসর কার্য্য করিয়া এ পর্য্যন্ত একটী পয়সা জমাইতে পারিলেন না। সময়ে সময়ে ঋণ করিতেন, এবং অতি হীন অবস্থায় থাকিতেন। তাঁর ছেলে মেয়ের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। আর ২০।২৫ টাকায় চলে না। তখন সরকার মহাশয় বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া দরিদ্রতা নিবারণের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। শেষে ক্যানিং টাউন নামক সুন্দরবনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে অল্প মূল্যে কিছু জমি খরিদ করিয়া এক খানা ঘর তৈয়ার করিয়া চাষ করিতে আরম্ভ করিলেন বলা বাহুল্য ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার চাকুরী ইস্তফা দিয়াছিলেন। এখন তিনি ৪৫/০ বিঘা জমী চাষ করেন। তাহাতেই তাঁর ৪টি ছেলে মেয়ে নিজেরা স্ত্রী পুরুষ ও বৃদ্ধা মা এই কয়টি পরিবার সুখ স্বচ্ছন্দে ভদ্রভাবে চলিয়া যাইতেছে। তিনি যে হিসাব আমাকে দিয়াছেন। নিম্নে আপনার পাঠকগণের জ্ঞাতার্থে অবিকল সেই হিসাব দিলাম।

৪৫/০ বিঘা জমীর খাজনা প্রতি বিঘা ২'০ টাকা হিসাবে	১০১।০
চাষের খরচ ৩৲ হিসাবে	১৩৫৲
	২৩৬।০

এই গেল খরচ। আর প্রতি বিঘায় ১২/ মোণ হইতে ১৫/ মোণ পর্য্যন্ত ধান্য ফলিয়া থাকে। এখন ধরুণ ১২ মোণের হিসাবে ধরিলেও ৪৫ বিঘায় ৫৪০ মোণ ধান্য। ইহার মূল্য খুব কম পক্ষে প্রতি মণ ১॥০ হিসাবে ধরিলেও

	৮১০৲
আর বিচালী প্রায়	১০০৲
	৯১০৲
টাকার বিক্রয় হইয়া থাকে।	
এখন ধরুণ এই টাকা হইতে খরচ বাদ দিলে	২৩৬।০
	৬৭৩৸০

লাভ থাকে। ইহাতে যে তাঁর বেশ সুখ স্বচ্ছন্দে চলিয়া যায় তাহাতে আর সন্দেহ

নাই। ইহা ছাড়া সেখানে মাছ তরকারী খরিদ করিতে হয় না। এখন দেখুন চাকুরি অপেক্ষা চাষ করা কত লাভ।

আর একজন চাকুরে ভদ্র লোকের বিষয় লিখিতেছি।

ইনি বেশ শিক্ষিত ভদ্র হিন্দু। ইহার নাম "**বসু' ইনি ৩৮ টাকা বেতন হইতে আরম্ভ করিয়া ১০০ টাকা বেতনে উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তার এক পয়সাও তিনি বাঁচাইতে পারিতেন না। বাটী ভাড়া খাওয়ার খরচ, কন্যার বিবাহ ইত্যাদিতে তাঁর সব টাকা ফুরাইয়া যাইত। কোন কারণে তাঁহার চাকুরি জবাব হইয়া গেল। তখন যে তাঁর কি দুরবস্থা পাঠক একবার চিন্তা করুণ। ৬মাস বসিয়া থাকিয়া ঘরের পরিবারের জিনিসপত্র সব বিক্রয় করিয়া শেষে দালালী করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ছিলেন আপিসের বড় বাবু। তাঁকে বেশী খাটিতে হইত না এখন দালালীতে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া অল্পদিনের মধ্যে ইহধাম পরিত্যাগ করিতে হইল। এখন তাঁর স্ত্রী রাঁধুনির কার্য্য করিতেছেন। দুইটী পুত্রকে লেখা পড়া শিক্ষা করাইতেছেন। পাঠক একবার দেখুন। ১০০৲ বেতনের কেরাণী গিরি অপেক্ষা ৪০।৫০ বিঘা জমী চাষ করিয়া কত সুখ। এখন দেখুন এই দুইটি চিত্র তুলনা করুণ। বিশেষতঃ এখন আর চাকরির বাজার সেরূপ নহে। এখন কত বিএ, এমে পাশ করিয়া ২০।২৫ টাকার চাকরির জন্য লালায়িত। আর এন্ট্রান্স এফএর ত কথাই নাই। ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ। অল্প পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত যদি যুবকগণ ধৈর্য্য সহকারে কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, আমার বিশ্বাস চাকরি অপেক্ষা বিশেষ লাভবান হইবেন। অধ্যবসায় থাকিলে জমিদার পর্য্যন্ত হইতে পারেন।

আমি যে কেবল সুন্দরবনে যাইয়া ধান চাষ করিতে উপদেশ দিতেছি তাহা নহে। মধ্য প্রদেশে মানভুম ইত্যাদি অনেক স্থানে অনেক পতিত উর্ব্বরা জমি আছে। যুবকগণ যদি এপ্রেন্টিস না খাটিয়া অল্প করিয়া জমী চাষ করিতে আরম্ভ করেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে "শত কষ্ট হইলেও সংকল্পচ্যুত হইব না," তাহা হইলে নিশ্চয়ই সুফল ফলিবে। অনেকে কোম্পানী গঠন করিয়া কৃষিকার্য্য করিতে উপদেশ দেন। আমি কিন্তু এমতের পক্ষপাতী নহি। বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ে নহে। তবে দুই চারি জন বন্ধু এক সঙ্গে চাষাবাদ আরম্ভ করিয়া ভবিষ্যতে বিভাগ করিয়া লইতে পারা যায়। এরূপ করিলে মন্দ হয় না। আমরা বাঙ্গালী জাতি যৌথ কারবার করিবার ক্ষমতা এখনও আমাদের হয় নাই।

এখন কি কি করিলে এবং কোথায় কি প্রকার চাষ করিলে সুবিধা হইবে, চাষ করিবার আগেই তাহা বিবেচনা ও পরীক্ষা করা আবশ্যক। স্থানের জল বাতাসের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রকৃতির সাহায্য ব্যতীত আমরা কোন কার্য্যে

সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিব না। অনেকে অস্বাভাবিক উপায়ে আজকাল অনেক গাছ ফুল ও ফল প্রস্তুত করাইতেছেন বটে, কিন্তু তাহাতে খরচ পত্র এত অধিক যে লাভ হওয়া দূরের কথা অধিকাংশ স্থানে লোকসান হইয়া পড়ে। অতএব সর্ব্বপ্রথমে আমাদের প্রকৃতির উপর নির্ভর করিতে হইবে। পরীক্ষা করিতে হইলে প্রথমে কিছু কিছু জমী লইয়া পরীক্ষা কার্য্য করা কর্ত্তব্য। বেশী জমী পরীক্ষা করিলে যদি লাভ না হয় তাহা হইলে বেশী লোকসান হইবে। অতএব বিশেষ বিবেচনা করিয়া এবং নিজে থাকিয়া পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।—রসিকলাল রায়।

সার-সংগ্রহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমাদের নিজ জমিদারী ভুক্ত পাহাড়ে অর্থোপার্জ্জনের যে সকল সুপথ প্রত্যক্ষ ভাবে দেখিতেছি তাহাই এ স্থলে উল্লেখিত হইল। প্রায় পার্ব্বত্য স্থানেই যে এরূপ সুবিধা আছে তাহা বলাই বাহুল্য। একজন বা একাধিক শিক্ষিত নব্য-যুবক যৌথ ভাবে উপযুক্ত পরিমাণ মূলধন লইয়া এ সকল পাহাড়ে উপস্থিত হইলে নিম্নলিখিত প্রণালীতে অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিবেন।

(১) যে পরিমাণ জমী বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া হইবে তাহার সীমার মধ্যস্থিত সারবান গাছ বিক্রয় করা।

(২) সাইজমত কাঠ প্রস্তুত করাইয়া নানাদিকে চালান দেওয়া।

(৩) কাঠের ফার্ণিচার প্রস্তুত করাইয়া বিক্রয় করা।

(৪) পতিত ও কর্ত্তিত কাষ্ঠ জ্বালাইয়া কয়লা বিক্রয় করা।

(৫) সেগুন, শাল ও মেহগ্নি ইত্যাদি বৃক্ষের বাগান করা।

(৬) সর্ব্বপ্রকার ফলবান বৃক্ষের বাগান করা; সমতল ক্ষেত্র অপেক্ষা পাহাড়ে ফলের বাগান অধিক হয়। পাহাড়ের উর্ব্বরাশক্তি অধিক বলিয়া বৃক্ষাদি অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে বর্দ্ধিত হয় এবং শীঘ্রই ফলোৎপাদন করে। এখানে একজন সাহেব শুধু পাহাড়ের পেয়ারা বিক্রয় করিয়া বার্ষিক সহস্রাধিক টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। কাশী ও এলাহাবাদের পেয়ারার ন্যায় উৎকৃষ্ট ও বড় পেয়ারা এস্থানের পাহাড়ী বাগানে উৎপন্ন হয়।

(৭) সকল প্রকার সবজী বা তরি তরকারী ও রবি শস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কপি, শালগম, আলু, বেগুন, মূলা, মানকচু, সিম, অরহর, লঙ্কা, সরিষা, ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যই উৎপন্ন হয়।

(৮) কার্পাস, পাহাড়ের প্রধান কৃষিদ্রব্য।

(৯) ধান্ত।

(১০) পান—পাহাড়ের নিম্নদেশ পানের জন্ত বড়ই উপযুক্ত।

(১১) বাঁশ বিক্রয় করা।

(১২) ছাতার বাঁটের উপযোগী সরু বাঁশ স্থানান্তরে চালান দেওয়া।

(১৩) বাঁশের বাস্‌কেট প্রভৃতি নানাপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করাইয়া স্থানান্তরে প্রেরণ করা।

(১৪) গো, মহিষ, ছাগল ও মেষ পালনকরা, এই কাজের জন্ত পাহাড় বিশেষ সুবিধাজনক।

(১৫) ডেরি (Dairy) ফারম অর্থাৎ গো, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি পোষণ করিয়া একদিকে সে সকল বিক্রয় করা এবং তাহা হইতে দুগ্ধ, দধি, মাখন ও ঘৃত প্রস্তুত করা, ভেড়ার লোম কর্ত্তন করিয়া চালান দেওয়া যাইতে পারে।

(১৬) রবার উৎপাদক বৃক্ষের চাষ করা।

(১৭) মৎস্তের ব্যবসা করা।

(১৮) মুরগী ও হাঁস পালন করা।

(১৯) মুরগী ও হাঁসের ডিমের ব্যবসা করা।

(২০) "ছন" খড়ের ঘরের ছাউনী দিবার একপ্রকার ঘাস বিশেষ, ইহা অতি লাভজনক ব্যবসা। অল্পায়াসে বিনাখরচে এই ঘাস উৎপন্ন করা যায়। শুধু পাহাড়ের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া দিলেই ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

(২১) জাহাজে যে সকল রসি ব্যবহৃত হয় আনারসের গাছের ন্তায় একপ্রকার গাছ (Sesal plant) থেকে উৎপন্ন সুতা দ্বারাই তাহা প্রস্তুত হয়, পাহাড়ে তাহার ও চাষ করা যাইতে পারে।

(২২) আখ্ বা ইক্ষুর চাষ, পাহাড়ে ইক্ষুর চাষ প্রচুর পরিমাণে হয়। অনেক সাহেব শুধু ইক্ষুর চাষ করিয়াই ক্ষান্ত আছেন, কেহ শুধু জাহাজের রসির গাছের বাগান লইয়াই লিপ্ত আছেন। এরূপে পাহাড়ে এক স্থানে বসিয়া যে কত প্রকার ব্যবসা করা যায় এবং কতরূপে অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা করা যাইতে পারে তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। গো গাড়ীর সাহায্যে এ সকল দ্রব্য হাটে, বাজারে ও রেল ষ্টেসনে লইয়া যাওয়া যায়, তদ্ব্যতীত অধিকাংশ জিনিষ এমন কি কৃষিজাত যাবতীয় দ্রব্যই পাইকারগণ পাহাড়ের মধ্যে আসিয়া ক্রয় করিয়া লইয়া যায় স্থানান্তরে চালান করার প্রয়োজন হয় না। শুধু উৎপন্ন করিতে পারিলেই যথেষ্ট হয়।

তাই বলিয়াছিলাম, ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের পাহাড়ে জঙ্গলে রাশি

রাশি সোণা, চাঁদি, মণি, মুক্তা পড়িয়া রহিয়াছে ; দুঃখের বিষয় যে তাহা কুড়াইয়া লইবার লোক নাই ; সাতসমুদ্র তেরনদী পার হইতে আসিয়া বিদেশীরা আমাদের পাহাড় হইতে রাশি রাশি অর্থোপার্জ্জন করিয়া লইয়া যাইতেছে আর আমরা হা অন্ন! হা অন্ন! করিয়া চিৎকার করিতেছি।

এখনও আসাম, পার্ব্বত্য ত্রিপুরা ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে চেষ্টা করিলে সর্ব্বপ্রকার কৃষির উপযোগী পাহাড় লাভকরা যাইতে পারে। অবশ্য আজকাল সুবিধা অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। ইউরোপীয় কর্ম্মীপুরুষেরা এক এক জন বহু মাইল জুড়িয়া ভাল ভাল স্থানগুলি অধিকার করিয়া বসিয়াছেন ; দেশীয়দের হস্তে যাহা আছে তাহা অব্যবহার্য্য পড়িয়া আছে ; কেহ কেহ বা অন্য কোনও কর্ম্মীপুরুষের হাতে দিতেও অনিচ্ছুক। তাঁহারা নিজেরাও কিছু করিবেন না অন্যকেও কিছু করিতে দিবেন না।

যদি আমাদের শিক্ষিত যুবকমণ্ডলী উপযুক্ত মূলধন লইয়া বর্ণিতরূপ ব্যবসা করিতে ইচ্ছুক হন, তবে আমি তাঁহাদিগকে নির্ব্বাচন করিয়া দেওয়া সম্বন্ধে স্থানীয় জমীদারগণ যথাসম্ভব সাহায্য করিতে পারেন। চট্টগ্রামে বহুমাইল ব্যাপী, বর্ণিত রূপ সর্ব্বপ্রকার কারবারের উপযুক্ত যে পাহাড় আছে, উপযুক্ত কর্ম্মীলোক সুবিধামত বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারেন।

বাগানের মাসিক কার্য্য।

আষাঢ় মাস।

সব্জীবাগ।—শীতের চাষের জন্য এই সময় প্রস্তুত হইতে হইবে। আমন বেগুনের তলা ফেলিতে হইবে। এই সময় শাকাদি, সীম, লঙ্কা, শীতের শসা, লাউ, বিলাতি বেগুন, পাটনাই ফুলকপি, পাটনাই শালগম ইত্যাদি দেশী সব্জী বীজ বপন করিতে হইবে।

পালম্ শাক, টমাটোর জলদি ফসল করিতে গেলে এই সময় বীজ বপন করিতে হইবে। বিলাতি সব্জী বীজ বপনের এখনও সময় হয় নাই।

মকাই (ছোট মকাই) এবং দে-ধান চাষের এই সময়।

হলুদ, আদা, জেরুজালেম, আর্টিচোক, এরোরুট প্রভৃতির গোড়ায় মাটি দিয়া দাঁড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। দাঁড়া বাঁধিয়া দিলে গাছগুলির বৃদ্ধি হয় এবং গাছগুলি জলে গোড়া আল্গা হইয়া পড়িয়া যায় না।

ফুলবাগিচা।—দোপাটি, ক্লিটোরিয়া (অপরাজিতা) এমারন্থস, কক্সকোম্ব, আইপোমিয়া, ধুতুরা, রাধাপদ্ম (Sunflower) মার্টিনিয়া, ক্যানা ইত্যাদি ফুলবীজ লাগাইবার সময় এখন গত হয় নাই। ক্যানার ঝাড় এই সময় পাতলা করিয়া অন্যত্র রোপণ করা উচিত।

গোলাপ, জবা, বেল, যুঁই প্রভৃতি পুষ্প বৃক্ষের কাটিং করিয়া চারা তৈয়ার করিবার এই উপযুক্ত সময়।

জবা, চাঁপা, চামেলি, যুঁই, বেল, প্রভৃতি ফুলগাছ এই সময় বসাইতে হয়।

ফলের বাগান—বর্ষা নামিলে আম, লিচু, পিয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছ বসাইতে হয়। বর্ষান্তে বসাইলে চলে কিন্তু সে সময় জল দিবার ভালরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয়। এখন—ঘন ঘন বৃষ্টিপাত হওয়ায় কিছু খরচ বাঁচিয়া যায়, কিন্তু সতর্ক হওয়া উচিত, যেন গোড়ায় জল বসিয়া শিকড় পচিয়া না যায়। আম, লিচু, কুল, পিচ, নানা প্রকার লেবু গাছের গুল কলম করিতে আর কাল বিলম্ব করা উচিত নহে। লেবু প্রভৃতি গাছের ডাল মাটি চাপা দিয়া এই সময় কলম করা যাইতে পারে। এইরূপ প্রথায় কলম করাকে লেয়ারিং (layering) করা বলে।

আনারসের যোকা বসাইয়া আনারসের আবাদ বাড়াইবার এই উপযুক্ত সময়।

আম, লিচু, পিচ, লেবু, গোলাপজাম প্রভৃতি গাছের বীজ হইতে এই সময় চারা তৈয়ারী করিতে হয়। পেঁপে বীজ এই সময় বপন করিতে হয়।

আম, নারিকেল, লিচু প্রভৃতি গাছের গোড়া খুঁড়িয়া তাহাতে বর্ষার জল খাওয়াইবার এই সময়। কাঁঠালের গোড়া খুঁড়িয়া দিবার এখন একটু বিলম্ব আছে। ফল শেষ হইয়া গেলে তবে গাছের গোড়ার মাটি খোঁড়া উচিত, এই সময় ঐ সকল গাছের গোড়ায় গোবর দিলে বিশেষ উপকার পাইবার সম্ভাবনা। হাড়ের গুঁড়াও এই সময় দেওয়া যাইতে পারে।

আয়কর বৃক্ষ, যথা,—শিশু, সেগুন, মেহগ্নি, খদির, কৃষ্ণচূড়া, কাঞ্চন প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ এই সময় বপন করা উচিত।

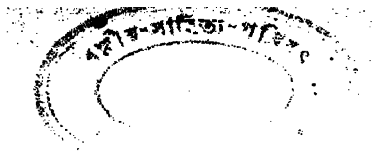
যাঁহারা বেড়ার বীজ দ্বারা বেড়া প্রস্তুত করিবেন, তাঁহারা এই বেলা সচেষ্ট হউন। এই বেলা বাগানের ধারে বেড়ার বীজ বপন করিলে বর্ষার মধ্যেই গাছ গুলি দস্তর মত গজাইয়া উঠিবে।

শস্যক্ষেত্রে—কৃষকের এখন বড় মরশুম, বিশেষতঃ বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা ও আসামের কতকস্থানে কৃষকেরা এখন আমন ধান্যের আবাদ লইয়া বড় ব্যস্ত। পাট বোনা প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে পাট তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। তথা হইতে নূতন পাট এই সময় বাজারে আমদানী হয়। দক্ষিণ-বঙ্গে পাট কিছু নাবি হয়, কিন্তু এখানেও পাট বুনিতে আর বাকি নাই। ধান্য রোপণ শ্রাবণের শেষে হইয়া যায়।

বর্ষাকালে ঘাস এবং আগাছা ও কুগাছার বৃদ্ধি হয় সুতরাং এখন সজী ক্ষেতে মধ্যে মধ্যে নিড়ানি দেওয়া উচিত। ক্ষেতে জল না জমে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখাও আবশ্যক।

পার্ব্বত্য প্রদেশে কপি চারা ক্ষেত্রে বসান হইতেছে। পূজার পূর্ব্বেই পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে কলিকাতায় কপি, কড়াইশুঁটী প্রভৃতি আমদানি হয়।

এই সময় পার্ব্বত্য প্রদেশে সূর্য্যমুখী, জিনিয়া, কক্সকোম্ব, কেপ গাঁদা, দোপাটী প্রভৃতি ফুল বীজ বপন করা হইতেছে।



কৃষক

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৪শ খণ্ড। } আষাঢ়, ১৩২০ সাল। { ৩য় সংখ্যা।

তেওড়া কলাই

শ্রীরাজ নারায়ণ বিশ্বাস লিখিত

আমাদের এখানে খেঁসারিকে তেওড়া বলিয়া থাকে। কলাই ভাঙ্গিয়া দাইল প্রস্তুত করিলে খেঁসারি, গোটা কলাইকে তেওড়া বলে। আমাদের দেশে খেঁসারির দাইলের তত আদর নাই। ইহার দাইল সচরাচর ব্যবহৃত হয় না। মসুর, মাসকলাই প্রভৃতি যেরূপ পুষ্টিকর ইহা সেরূপ পুষ্টিকরও নহে, কিন্তু পবিত্রতায় মসুর, মাসকলাই অপেক্ষা ইহা বিশেষ আদরণীয়। হিন্দু শাস্ত্র মতে মসুর মাসকলাই অপবিত্র, তজ্জন্য দেব বা পিতৃকার্য্যে উহা ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু পবিত্রতা গুণে খেঁসারির দাইল অবাধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হবিষ্যান্নে মসুর বা মাসকলায়ের দাইল আদৌ ব্যবহৃত হয় না, এমন কি যে সকল হিন্দু বিধবা হবিষ্যান্ন ভোজন না করিয়া নিরামিষ ভোজন করেন তাঁহারাও ঐ দুই প্রকার দাইল ভক্ষণ করেন না। কিন্তু খেঁসারির দাইল হবিষ্যান্নে অবাধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনেক চিকিৎসার মতে "প্রতি নিয়ত খেঁসারির দাইল ভোজন করিলে পক্ষাঘাত, রাত্র্যন্ধতা, কুষ্ঠ প্রভৃতি ব্যাধি উৎপন্ন হইয়া থাকে" ইহা কত দূর সত্য তাহা ঠিক বলিতে পারিনা। তবে মধ্যে মধ্যে কেবল খেঁসারির দাইল ব্যবহার করিলে বা অন্যান্য দাইলের সহিত ভক্ষণ করিলে কোন অনিষ্ট হয় না একথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। আমাদের চাষে এই কলাই উৎপন্ন হয়। আমরা মধ্যে মধ্যে ইহার দাল বা অন্য দালের সহিত খেঁসারির দাল মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকি। ইহাতে আমাদের কোন রূপ পীড়া বা অনিষ্ট হইতে দেখি নাই। অন্যান্য দাইল অপেক্ষা ইহা যে বেশ সুমিষ্ট ও সুখ

য়োচক তাহা অনেকেই জানেন। খেঁসারির দাইল অতিশয় রুক্ষ; তজ্জন্য প্রতিনিয়ত বা অধিক পরিমাণে খাইলে অনিষ্ট হইতে পারে। অন্যান্য দাইল অপেক্ষা ইহা সস্তা, তজ্জন্য দরিদ্র লোকে ইহার দাল অধিক পরিমাণে খাইয়া থাকে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে খেঁসারির দাইল বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। যদিও খেঁসারির দাইল অন্যান্য দাইলের ন্যায় উপকারী ও পুষ্টিকর নহে তথাচ ইহার চাষে লাভ নিতান্ত মন্দ হয় না। এ অঞ্চলে যে প্রণালীতে ইহার চাষ হয়, এই প্রবন্ধে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

তেওড়া কলায়ের চাষ এ প্রদেশে দুই প্রকারে সম্পাদিত হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ—

কার্ত্তিক মাসের প্রথম হইতে ২০ তারিখের মধ্যে হৈমন্তিক ধানের শীষ নির্গত হইয়া থাকে। ধানের শীষ বাহির হইলে জমিতে আর জলের আবশ্যক হয় না। ধানের শীষ বাহির হইলে জমিকে জল শূন্য করিতে হইবে। জমিতে জলও থাকিবে না, অথচ কাদা থাকিবে, এরূপ সময়ে বিঘা প্রতি দেড় সের হইতে দুই সের হিসাবে তেওড়া কলাই সমভাবে ছড়াইয়া দিবে। ধানের গোছ যতই বড় হউক না কেন, তথাচ জমির উপরিস্থ ধান ঝাড়ের মাঝে মাঝে বিস্তর ফাঁক থাকে। সেই ফাঁকের মাঝে মাঝে তেওড়া কলাই ছড়াইতে হয়। সরস মৃত্তিকায় বীজ উপ্ত হইলে, ঐ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া চারা বাহির হয়। অগ্রহায়ণ মাসে চারাগুলি একটু বড় হইলে ধান কাটিয়া লইবার সময় উপস্থিত হয়। ধান কাটিবার সময় বিশেষ সাবধানতা সহকারে ধান কাটিতে হয় বা কর্ত্তিত ধান রাখিতে হয়, নচেৎ তেওড়া কলাইয়ের অনেক চারা নষ্ট হইতে পারে। বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিলেও যে কিছু কিছু চারা নষ্ট না হয়, তাহা নহে। তবে বিশেষ সাবধানতা সহকারে চারাগুলিকে যথা সম্ভব রক্ষা করিবার চেষ্টা করা উচিত। অনেক তেওড়া কলাইয়ের চারার উপর কর্ত্তিত ধান গাছ রাখিতে হয়, এজন্য উহা অধিক দিন জমিতে থাকিলে, অনেক কলাই চারা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। এজন্য ৫ ৬ দিন মধ্যে ধানের আটি তুলিয়া লইতে হইবে। ধান গাছ তুলিয়া লইলে জমির উর্ব্বরতা অনুসারে কলাই চারা বেশ সতেজ হইয়া উঠে। তেওড়া গাছ উর্দ্ধে উত্থিত না হইয়া অল্প লতাইয়া পড়ে। পৌষ মাসের প্রথম হইতেই গাছগুলির বহু সংখ্যক শাখা প্রশাখা বহির্গত হইয়া পৌষ মাসের শেষেই বড় বড় ঝাড় হইয়া থাকে। যে জমিতে খুব ভাল গাছ জন্মে, সে জমির মাটি দেখিতে পাওয়া যায় না। জমির সমস্ত স্থানই গাছে পরিপূর্ণ থাকে। পৌষ মাসের শেষের ফুল ধরে, তৎপরে মাঘ মাসের শেষে কলাই পাকিয়া উঠে। সেই সময়ে গাছ উপড়াইয়া লইয়া আসিতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ—

আউশ ও কেলেস ধান ভাদ্র আশ্বিন মাসে কাটা হইয়া থাকে। ঐ সকল ধান কাটা হইবার পরেই জমিতে একটা কি দুইটা চাষ দিয়া ফেলিয়া রাখিতে হয়। ঐ কর্ষিত মৃত্তিকা বেশ শুষ্ক হইলে কার্ত্তিক মাসের প্রথমেই যদি বৃষ্টি না হয়, তবে ঐ জমিতে জল সেচন করিয়া দেওয়া আবশ্যক। সেচনের পর যো পাইলেই জমিতে একটা চাষ দিয়া কলাই বীজ ছড়াইয়া দিয়া মই দিতে হয় তৎপরে পুনরায় বিপরীত দিক (প্রথম চাষ যদি উত্তর দক্ষিণ মুখে দেওয়া হয়, দ্বিতীয় চাষ পূর্ব্ব পশ্চিম মুখে দিতে হয়) দিয়া চাষ দিয়া মই দেওয়া আবশ্যক। ২য় প্রকার চাষে ১ম প্রকার চাষ অপেক্ষা কিন্তু অধিক বীজ বপন করিতে হয়। বিঘা প্রতি দুই কি আড়াই সের বীজ বপন করা চাই। বীজগুলি সমভাবে ছড়ান কর্ত্তব্য। সরস মৃত্তিকায় বীজ ছড়ান আবশ্যক, নচেৎ সকল বীজ অঙ্কুরিত হইয়া চারা বাহির হয় না।

প্রথম প্রকার অপেক্ষা দ্বিতীয় প্রকারে ফসল অনেক বেশী হইয়া থাকে। আউশ ও কেলেস ধানের জমিতে এখানকার লোকে তেওড়া কলাই বপন না করিয়া, অধিকাংশ জমিতেই সর্ষপ ও মসুর বপন করিয়া থাকে। সামান্য জমিতে তেওড়া কলাই বপন করে মাত্র। তেওড়ার কম মূল্যই ইহার হেতু বলিয়া অনুমান হয়।

এখানকার হৈমন্তিক ধান্যের ক্ষেত্রে একমাত্র হৈমন্তিক ধান্যেরই চাষ হইয়া থাকে। ঐ জমিতে আর কোন ফসলই দেওয়া হয় না। সুচতুর কৃষক প্রথম প্রকারে তেওড়া কলাই বপন করিয়া অতিরিক্ত কিছু লাভ করিয়া লয়। এখানে সকল হৈমন্তিক ধানের জমিতে তেওড়া কলাই বপন করে না। ধান কাটার পর পৌষ মাসে ধান বাটীতে আনা হইলে, এখানকার গরু বাছুর মাঠে অবাধে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। গরু বাছুর ছাগলের উপদ্রব হইতে কলাই গাছ রক্ষা করা সুকঠিন। এজন্য সকল জমিতে তেওড়া কলাই দেওয়া হয় না। গ্রামের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী উচ্চ জমিতে আউশ ও কেলেস ধান দেওয়া হয়। ঐ ধান কাটার পর ঐ সকল জমিতে মসুর বা তেওড়া কলাই দেওয়া হইলে, ততটা গরু ছাগলের উপদ্রব থাকে না। গ্রামের দূরবর্ত্তী নিম্ন ভূমিতে হৈমন্তিক ধান জন্মিয়া থাকে। এজন্য গ্রামের দূরবর্ত্তী হৈমন্তিক ধানের জমিতে তেওড়া কলাই দেওয়া হয় না। যে সকল গ্রামের নিকটবর্ত্তী জমিতে হৈমন্তিক ধান দেওয়া হয়, সেই সকল জমিতেই কেবল তেওড়া কলাই দেওয়া হইয়া থাকে।

যে সকল জমিতে কলাই বপন করা হয়, সে সকল জমিতে ধান রোপনের পূর্ব্বে সার দেওয়া হইয়া থাকে। কলাই বপনের পূর্ব্বে পুনরায় সার দিবার

আবশ্যক হয় না। সকল উদ্ভিদই আপন আপন দেহের শ্রীবৃদ্ধি সাধন জন্য মৃত্তিকা হইতে আপনাদের খাদ্য দ্রব্য শোষণ করিয়া লয়। ভিন্ন ভিন্ন জন্তুগণের শরীরের পুষ্টি সাধন জন্য যেরূপ খাদ্যের ভিন্ন ভিন্ন উপাদান আবশ্যক, উদ্ভিদগণের পক্ষেও সেইরূপ। খাদ্যের যে যে উপাদান কোনও জন্তুর শরীরের পুষ্টি সাধন করিয়া অবশিষ্ট যাহা মল রূপে নির্গত হয়, তাহাই আবার কত জন্তুর পুষ্টিকর খাদ্য রূপে পরিণত হইয়া থাকে। খাদ্যের সকল উপাদান শরীরের পুষ্টি সাধন জন্য ব্যয়িত হয় না। যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই আবার অন্য জন্তুর পুষ্টি-সাধন করিয়া থাকে। উদ্ভিদের পক্ষেও সেই নিয়ম। ধান্য প্রভৃতি তৃণ জাতীয় উদ্ভিদের শরীর যে যে উপাদানে পুষ্ট ও বৰ্দ্ধিত হয়, শিম্বি জাতীয় উদ্ভিদের দেহ সেই সেই উপাদানে বৰ্দ্ধিত ও পুষ্ট হয় না। বরং সর্ব্ব প্রকার কলাই ধঞ্চে প্রভৃতি শিম্বি জাতীয় উদ্ভিদ নৈসর্গিক নিয়মানুসারে বায়ু হইতে তৃণ জাতীয় উদ্ভিদের পোষণোপযোগী উপাদান আকর্ষণ করিয়া জমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে। এজন্য একই জমিতে প্রতি বৎসর একই প্রকার ফসল না দিয়া ভিন্ন বৎসরে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ফসল দিলে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি শীঘ্র নষ্ট হয় না। এ প্রদেশে পর্য্যায় রোপনের রীতি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রতি বৎসর একই জমিতে একই প্রকার ফসল দিলে মৃত্তিকাস্থিত সেই উদ্ভিদের খাদ্যের উপাদান শীঘ্র নিঃশেষিত হইয়া যায়। সুতরাং সার দিয়া মৃত্তিকায় উদ্ভিদের খাদ্যের উপাদান সঞ্চিত করিয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হয়, তাহা না দিলে উদ্ভিদ নিস্তেজ ও ক্ষীণ হইয়া উঠে। ধানের জমিতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তেওড়া কলাই বপন করিলে, মৃত্তিকাস্থিত যে যে উপাদানে ধান গাছের দেহ পুষ্ট ও বৰ্দ্ধিত হয়, তেওড়া কলাই গাছ দেহের পুষ্টি সাধন জন্য সে উপাদানের কিছুমাত্র অংশ ব্যয়িত হয় না; বরং জমির ঐ উপাদান বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই প্রকারে ধানের জমিতে তেওড়া কলাই দিলে প্রায় বিনা পরিশ্রমে ৪।৫ মণ কলাই পাওয়া যায় এবং ধানের জমির উর্ব্বরতা শক্তি ও বৰ্দ্ধিত হয়। কৃষক মাত্রেরই এরূপ সুযোগ ত্যাগ করা উচিত্ নয়।

দোয়াঁস মৃত্তিকায় তেওড়া কলাই উত্তম রূপ জন্মিয়া থাকে। কেবল তেওড়া কলাই কেন, অধিকাংশ উদ্ভিদই দোয়াঁস জমিতে সতেজ ও ফলবান হইয়া থাকে। বিশেষতঃ রবিশস্য দোয়াঁস জমিতে ভাল রূপ জন্মিবার কারণ এই যে, দোয়াঁস মৃত্তিকার কৈশিক শক্তি অতিশয় প্রবল। শীতকালে যখন মোটেই বৃষ্টি হয় না, তখন কৈশিক শক্তির গুণে জমির অভ্যন্তরস্থ মৃত্তিকা বেশ সরস থাকে, তজ্জন্য রবি শস্য বেশ সতেজ হইয়া ফলশালী হয়। দোয়াঁসের কিছু ইতর বিশেষ অর্থাৎ কিছু এঁটেল বা বালুকার আধিক্য হইলে বিশেষ ক্ষতি হয় না।

রবিশস্য বপনের পর অধিক বৃষ্টি হইলে ফসলের বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে।

সামান্য বৃষ্টিতে ক্ষতি না হইয়া বরং উপকার হয়। অধিক বৃষ্টি হইয়া রবি শস্যের ক্ষেত্রে জল দাঁড়াইলে, গাছ ২।৪ দিনের মধ্যে হরিদ্রা বর্ণ ধারণ করিয়া শুষ্ক হইয়া যায়, মোটেই ফল হয় না। যাহাতে রবিশস্যের জমিতে জল দাঁড়াইতে না পায়, তাহার ব্যবস্থা করা নিতান্ত আবশ্যক। বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইলেই জমির আইল এরূপ ভাবে কাটিয়া দিতে হইবে যে, যেন জমির সমস্ত জল সেই স্থান দিয়া বাহির যায়। যদিও ইহাতে সম্পূর্ণ রূপে ফল লাভ করিতে পারা যায় না বটে, তথাচ জমির জল বাহির করিয়া দিয়া কিয়ৎপরিমাণে ফল লাভ করিতে দেখা যায়।

তেওড়া, মটর, মসুর প্রভৃতি রবি শস্য বপনের তিন মাসের কমে বেশ সুপক্ক হয় না। কার্ত্তিক মাসের ২০ তারিখে বপন করিলে, মাঘ মাসের ২০ তারিখের পর রবি শস্য বেশ সুপক্ক হইয়া থাকে। কলাই বেশ সুপক হইলে উপড়াইয়া আনিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হইবে। কলাই গাছ অল্প হইলে শুষ্ক হইবার পর বংশদণ্ড বা সরল কাষ্ঠ দণ্ড দ্বারা পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া শুঁটী হইতে কলাই বাহির করিয়া লইতে হইবে। গাছ অধিক হইলে গরু দ্বারা মাড়াইয়া বাহির করিয়া লইতে হয়। কুলা দ্বারা পাছড়াইয়া কলাই বাহির করিয়া লইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা গবাদি পশুর উত্তম খাদ্য।

উত্তম রূপে জন্মিলে প্রথম প্রকার চাষে প্রতি বিঘায় ৪।৫ মণ ও দ্বিতীয় প্রকার চাষে ৬।৭ মণ তেওড়া কলাই জন্মিতে পারে। অল্প পরিশ্রমে এরূপ লাভ চাষীর পক্ষে মন্দ নহে। এই চাষের খরচও যৎসামান্য বলিলে হয়।

পাট।

আমাদের দেশে পাট চাষ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। পাট সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে যে উদ্দেশ্যে এখন পাটের এত প্রসার বৃদ্ধি হইয়াছে, সে উদ্দেশ্য প্রথমে চাষীদের ছিল না। পাটের আঁশ অপেক্ষা পাট গাছের পাতার আদরই বেশী ছিল বলিয়াই বোধ হয়। শুধু বঙ্গ দেশে কেন সুদূর গ্রীস দেশেও লোকে পাট শাক বড় পছন্দ করিতেন। ভূমধ্যসাগরের নিকট-বর্ত্তী স্থানে pot herb উপাদেয় বলিয়া এখনও ব্যবহৃত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বোধ হয় পাট প্রথমে বিলাতে পাঠান হইয়াছিল। তখন ইহার নাম ইংরাজিতেও পাট ছিল। দেখিতে পাওয়া যায় যে ডাক্তার রক্সবার্গই ইষ্ট ইণ্ডিয়া

কোম্পানির ডাইরেক্টর মহোদয়গণের সহিত ইহার প্রথম পরিচয় করিয়া দেন। তাহার পর উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পাট নামেই পাট বিলাতে রপ্তানি হইত। পূর্ব্বে কটকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দড়ির কারখানা ছিল। সেই খানেই পাটের অধিক সমাবেশ হইত, আর কটক অঞ্চলের লোকেরা পাটকে ঝুট বা ঝট বলিত, ডাক্তার রক্সবর্গ তাহাদের দেওয়া নাম পছন্দ করিয়া পাটকে ইংরাজিতে জুট নাম দেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত পাট খুব সামান্য পরিমাণে বিলাতি রপ্তানি হইয়াছিল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার কষ্টম হাউস জুটের রপ্তানির প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাত করেন। ঐ বৎসর ৪৯৬ মণ পাট রপ্তানি হইয়াছিল। সেই সময় হইতেই পাটের একটি স্বতন্ত্র তালিকা প্রস্তুত আরম্ভ হয়। তাহার পর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া আমাদের দেশে কি পরিমাণে পাট চাষের উন্নতি হইয়াছে, আমরা ওয়াটস সাহেব কৃত Dictionary of Economic Products in Bengal এ সন্নিবেশিত নিম্নলিখিত তালিকা প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝিতে পারি।

	১৮৮৫	১৮৮৬	১৮৮৭	১৮৮৮	১৮৮৯
বর্ম্মা	১০,৫৭৯,৩০০	১২,১৯৩,৩০০	১২.৯৮১,৪০০	১৪,৭২৬,৭০০	১৩,১৬৩,০০০
ষ্ট্রেটস	৭,৭৪৮,৩০০	৭,৪৩৩,০০০	১১,৪১৩,৩০০	১৩,৮৮০,৬০০	১০,৫৩৬,৪০০
বঙ্গে	২২,৪৯৪,৭০০	১৭,৩৭৩,০০০	১৯,৫৭৮,৫০০	১৬,৯২৬ ৪০০	১৫,৭৬১,৪০০
উপকূলে	৮,৩৪৬,৩০০	৭,৩২৯,১০০	৬,০২৯,৪০০	৭,৬২৪,৫০০	৮,৬৯৯,৩০০
পশ্চিমে	৩৩,৮০১,৯০০	৩৬,৪৩৪,৫০০	৩৪,৬৫৮,৭০০	৩২,০৭৮,৬০০	২৮,০৫৭,৫০০
এসিয়াখণ্ডে ব্যবহৃত	৮২,৯৭০.২০০	৮০,৭৬২,৯০০	৮৪,৬৬১,৩০০	৮৫,২৩৬,৮০০	৭৬,২১৭,৬০০
অষ্ট্রেলিয়া	১২,৮১৩,৮০০	৬,১৯১,৮০০	১৬.৩৭২,৩০০	১৮,২৭৮,০০০	১৩,৬২০,৯০০
নিউজিলাণ্ড	৩,২৭৮,৫০০	২,৬১১,৪০০	৩,৯৭২,৩০০	৩,৯২৮,১০০	৬.৫৮৫,১০০
কেপ	১,৫১৯,০০০	২,০৯৫,৩০০	২,৫৮২,৯০০	২,৬৩৬,১০০	৪,২৮৪,৫০০
ইজিপ্ট	৪,৭২৬,৫০০	৩,৭৮৯,০০০	২,৬৯৪,৬০০	৩,১৩৫,৮০০	৪,১৮৯,৪০০
নিউ ইওর্ক	৭,৭১৪,৫০০	৬,৯৬৪,৯০০	৮,৭৩৬,৮০০	৬,৬২১,৪০০	২৪,২৪৪,৬০০
সান ফ্র্যানসিস্‌কো	১৫,৮২১,২০০	৩১,৫৯২,৭০০	২৪,৭৩৬,১৯০	৩৪,৪৮৪,৯০০	২৪,৫৪৭,৭০০
ইউরোপ	৯,১৫০,২০০	৮,৮৬৫,২০০	৪,৯৩৯,১০০	১০,৮৮৬,২০০	৩১.৬৩১,০০০
	৫৫,০২৩,৭০০	৬২,১০৯.৩০০	৬৪,০৩৫,১০০	৭৯,৯৭০,৫০০	১০৯,১০২,২০০
পাশ্চাত্য দেশ সমূহে ব্যবহৃত	১৩৭,৯৯৩,৯০০	১৪২,৮৭২.২০০	১৪৮,৬৯৬,৪০০	১৬৫,২০৭,৩০০	১৮৫,৩১৯,৮০০

তাহার পর থলে তৈয়ারী হইয়া, চাল, দাল গম, সরিষা, তিসি, হরিতকি প্রভৃতির সহিত যে কত পাট রপ্তানি হয় তাহা নিম্নলিখিত দুই সপ্তাহের হিসাব হইতে আমরা বুঝিতে পারি। এই বৎসর ২৫শে এপ্রিল হইতে ১লা মের মধ্যে ৪৫,৫০০৩ চাল, দাল, গম, যব, তিসি, হরিতকি প্রভৃতি রপ্তানি হইয়াছিল। এবং উহার সহিত ২২৭৫০১ থলে ছিল ও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে ঐ চাল, গম, কলাই প্রভৃতি ৪০৩৮১৪/০ রপ্তানি হইয়াছিল এবং উহার সহিত ২০১৯০৭ থলে ছিল। তাহা হইলে এ দুই সপ্তাহে ৫৯৬ গাঁট পাটের থলেও রপ্তানি হইয়াছে।

পূর্ব্বে প্রধানতঃ পূর্ব্ব বঙ্গে ও অন্যান্য স্থানে পাটের কাজ বহুল পরিমাণে চলিত। ঐ সমস্ত স্থানের অধিবাসীরা বিনা কল কব্জার সাহায্যে পাট হইতে দড়ি, মোটা কাপড়, থলে, ইত্যাকার অনেক দ্রব্য প্রস্তুত করিত। এখনও হাতে তৈয়ারী দড়ি প্রভৃতির আদর যথেষ্ট আছে। তাহাদের প্রস্তুত চটের থলের এত সমাদর ছিল ও ইহার এত প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়াছিল যে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে এক প্রকাণ্ড চটের কল এই দেশে প্রথম স্থাপিত হয় ও ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে আবার আর একটি পাটের কল স্থাপিত হইবার আবশ্যক হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে আরও অনেকগুলি কল স্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে ৭৫টি পাটের কল বেশ চলিতেছে।

আমরা দেখিতে পাই যে প্রথমে কার্পেট, থলে ও রজ্জু প্রস্তুত উদ্দেশে বিলাতে পাট রপ্তানি হইত। কার্কমায়ারের অন্তর্গত এ বি, ডনের শিল্পীরা পাট হইতে মোটা কাপড় তৈয়ারী করিবার প্রথম চেষ্টা করেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে এবিংডন হইতে রঙ্গীন কাপড় প্রথমে ডানডিতে প্রেরিত হয় ও তথায় ইহার যথেষ্ট সমাদর হয়। পরে ডানডির শিল্পীরা কলিকাতা হইতে নিজেরাই পাট আমদানি করিতে আরম্ভ করিলেন। মধ্যে কিয়ৎ দিনের জন্য কাপড় প্রস্তুত বিষয়ে ইঁহারা হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইঁহারা এত ভীত হইয়াছিলেন যে অখ্যাতির ভয়ে পাটকে আর তাঁহাদের গুদামে স্থান দিতেন না। যদি ১৮৫৪-৫৬ সালে রুষিয়ার সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইয়া রুষিয়ার মেস্তা বা মসিনার পাট প্রভৃতির বিলাতে রপ্তানি বন্ধ না হইত, ও আমেরিকায় গৃহ বিবাদ জনিত যথেচ্ছাচারিতার ফলে, তথাকার তুলার চাষ ধ্বংস প্রাপ্ত না হইত, তাহা হইলে বোধ হয় কাপড় প্রস্তুতের জন্য বিলাতে পাটের রপ্তানির কার্য্য একেবারে বন্ধ হইয়া যাইত। যে ডনডি পাটের দুর্ব্বলতা দেখিয়া মধ্যে ঘৃণায় ও ভয়ে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছিলেন, সেই ডনডিই অনন্যোপায় হইয়া অতি আগ্রহের সহিত পরিত্যক্ত পাটকে আবার সমাদর করিতে বাধ্য হইয়াছিল। পাটের এত সমাদর হইবার বিশেষ কারণ এই যে ইহা বড় সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। মেস্তা বা মসিনার পাট, তুলা প্রভৃতির দামের সহিত তুলনায়

ইহার মূল্য যৎসামান্য। আর মোটা কাজের পক্ষে ইহা বড়ই সুন্দর। থলে তৈয়ারী, কাপড়ের বা অন্যান্য দ্রব্যের গাঁট মোড়াই, ত্রিপল প্রস্তুত প্রভৃতি মোটা কাজের পক্ষে সস্তার পাট বড়ই প্রয়োজনীয়। ইহাতে রঙ বড় শীঘ্র ধরে। সুতরাং রঙ্গীন কার্পেট প্রস্তুতের বড়ই উপযোগী। সুক্ষ্ম কার্য্যেও ইহার আবশ্যকতা বেশ আছে। অল্প মূল্যের রেশমে পাটের ভেজাল খুব চলে এবং এই পাট মিশ্রিত রেশম হইতে সুন্দর ফিতা তৈয়ারী হইয়া রেশমী ফিতা বলিয়া সর্ব্ব স্থানে বেশ বিক্রয় হইতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ক্রশ, বিভেন এবং কিঙ মহোদয়গণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে পাটকে ঠিক তসর ও পশমের মত করা যায়। আমাদের বিশ্বাস আজ কাল কল কারখানার যেরূপ বহুল প্রচার হইতেছে, ভবিষ্যতে এমন উপায় উদ্ভাবন হইবে যাহা দ্বারা পাট হইতে উক্ত প্রকার অনেক দ্রব্য প্রস্তুত হইবে। সার জর্জ ওয়াটস সাহেব কৃত Dictionary of Economic Products এ লিখিত আছে যে সভ্যতার আলোক রশ্মি সাধারণের মনকে আলোকিত করিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমতঃ বিলাসিতার জন্য, পরে একান্ত প্রয়োজনীয়তা বশতঃ বস্ত্রের আবশ্যক হয়, পাট সেই বস্ত্র প্রস্তুত কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিল ও একমাত্র উপাদান বলিয়া গৃহিত হইয়াছিল। আর ইংরাজ সওদাগরগণের উদ্যোগে যখন ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম, চীন, আমেরিকা ও ইজিপ্ট প্রভৃতি দেশের সহিত স্বাধীন ব্যবসা চলিতে লাগিল তখন শস্য ধারণ করিবার জন্য চটের থলে আবশ্যক হইয়াছিল। বঙ্গ দেশের শিল্পীরা তখন হইতে থলে বয়ন করিত। সেই থলে অত্যন্ত অধিক মূল্যে উক্ত সওদাগরগণ ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ক্রমে কলিকাতায় ও বিলাতে ডানডি প্রভৃতি স্থানে পাটের কল স্থাপিত হয় ও পাট হইতে থলে ও চট (hessian cloth) প্রস্তুত হইতে লাগিল। পরে উদ্যোগী শিল্প চিন্তায় সুনিপুণ, বিজ্ঞানবিদ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পাট হইতে নানা প্রকার মূল্যবান বস্তু প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে তাহার কতকটা আভাস দিয়াছি। এইরূপে পাটের আবশ্যকতা এত বাড়িয়াছে ও পাট চাষের এত বিস্তৃতি হইতেছে।

মোটা মুটি দেখিতে গেলে পাট দুই প্রকার। গোল শুঁটি পাট ও লম্বা শুঁটি পাট। (Corchorons Capsularis and C. Olitorious); কিন্তু স্থান, ও সামান্য পরিমাণে আকার ভেদে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইহাদের ভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে। আঁস হিসাবে ভিন্ন জাতীয় পাটের মধ্যে পার্থক্য সামান্য। তবে গোলপাটের ফল গোলাকার ও দৈর্ঘ্যে ইহা অপরটী অপেক্ষা বড়। আর লম্বা পাটের ফল, লম্বা—পেনের ন্যায় গোল। পাটের ফুল স্বভাবতঃ শুভ্র ও সামান্য পীতাভ; লম্বা পাটের ফুল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র—তাদৃশ শুভ্র নহে। পীত বর্ণের ও গোল

পাটের ফলে বীজ অতি অল্প পরিমাণে থাকে; লম্বা পাটের ফলে অসংখ্য বীজ দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্য ও পূর্ব্ব বঙ্গে গোল পাটের চাষ খুব বেশী হয়। পরন্তু লম্বা পাটের চাষ কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে হইয়া থাকে। ঐ স্থানে পাট চাষের উপযুক্ত জমী খুব অল্পই আছে। ১৮৭২ সালে—যে বৎসর পাট চাষ তখনকার তুলনায় অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে হইয়াছিল—৯২১০০০ একর জমীতে পাট চাষ হয়। তন্মধ্যে পাবনায় ১,২২০০০, দিনাজপুরে ১,১৭০০০, ও রঙ্গপুরে ১০০০,০০০ একর জমীতে পাট চাষ হইয়াছিল। প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় বঙ্গ দেশের পাটই শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। মধ্যে চীন দেশের অন্তর্গত হঙ্কাউতে পাট চাষ হইয়াছিল, কিন্তু সুবিধা হয় নাই। আমেরিকাতেও পাট চাষের বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল বটে, কিন্তু আশাপ্রদ ফল হয় নাই। ইজিপ্টেও পাট চাষের চেষ্টা করা হইয়াছিল ও প্রথমে একটু সুবিধা বলিয়া বোধ হইয়াছিল। ইহাতে বিলাতের শিল্পীকুল আনন্দে অধীর হইয়াছিলেন। ১৮৮১ সালে ২৩শে মার্চ্চ তারিখে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল যে "হাতের কাছে যখন এমন পাট চাষ হইতেছে, তখন বেশী মাসুল দিয়া বঙ্গ দেশের পাট আনাইবার আর আবশ্যক হইবে না, বঙ্গ দেশের পাটও প্রতিদ্বন্দিতায় অগ্রসর হইতে পারিবে না।" কিন্তু কার্য্যতঃ এ ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হইয়াছে কিনা, তাহা এখন বেশ বুঝা যায়।

পূর্ব্ববঙ্গে লম্বা পাটের আদর বেশী। কারণ লম্বা পাকাটী হইতে ইহার আঁশ শীঘ্র বিচ্ছিন্ন করা যায়। পক্ষান্তরে গোল পাট অধিক শক্তিশালী। গাছগুলি ৩ হাত বড় হইলে আর অতি বৃষ্টিতে ইহাকে ধ্বংশ করিতে পারেনা, কিন্তু ফল পাকিবার পূর্ব্বে লম্বা লম্বা পাট গাছের গোড়ায় যদি জল জমে তবে ইহার রক্ষা পাওয়া বড় কঠিন।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় ও চাক চিক্যে গোল পাট, লম্বা পাট অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু দৈর্ঘে ছোট। লম্বা পাটের আঁশ রেশমী, পীতাভ, এবং বস্তে থলে প্রস্তুতকারীদের পসন্দ মত। গোল উত্তম পাট, লম্বা উত্তম পাট অপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়। গোল পাট ঘাসের রঙ অল্প সবুজ ও হরিদ্রা বর্ণের। ঘাসের রঙের সহিত পাটের রঙের প্রকৃত পক্ষে কোন সম্বন্ধ নাই। একই শ্রেণীর পাটের বীজ স্থান বিশেষে রোপনের ফলে ভিন্ন আকার ধারণ করে। তবে নিম্ন জমীতে উৎপন্ন পাট অপেক্ষা উচ্চ জমির পাট ভাল হইয়া থাকে। সিরাজ গঞ্জে ও নারায়ণ গঞ্জেই ভাল পাট জন্মায় এবং ঐ সমস্ত পাট উচ্চ জমীতে হয় বলিয়াই এত ভাল হয়। কাকিয়া বোম্বাই, বড়পাট, ধলেশ্বর, হিউতি, ফরিদপুরের আমোনিয়া, সিরাজগঞ্জের দেশাল, ফরিদপুরের লাল পাট, ঢাকার অগ্নিশ্বর, এইগুলি

সমস্ত গোল শুঁটি পাট ও বাজারে ইহার যথেষ্ট সুনাম আছে। লম্বা শুঁটি পাটের মধ্যে ফরিদপুরের তোশা ঢাকার দেওনলে, মৈমনসিংহের নালুতে পাবণায় তোশা, টিপারার হালবিলাতী, হুগলির দেশী লাল পাট, ফরিদপুরের পাট বাগ এইগুলিই উৎকৃষ্ট পাট।

বর্ষাকালে পাটের বীজ বপন করিবার উপযুক্ত সময়। যে মৃত্তিকাতে বীজ বপন করা হইবে, পূর্ব্বে দেখা উচিত সে মৃত্তিকা বালুকা সংযুক্ত কি না। কারণ আঁটাল মাটীতে পাট গাছ ভাল হয় না। পলিমাটি ও নূতন চরভরাটি জমিই পাট চাষের বিশেষ উপযুক্ত। জমিটি ঋতিমত কর্ষণ করা আবশ্যক। পরে উর্ব্বরতা বৃদ্ধির জন্য জমীতে সার ছড়ান উচিত। গোময় সারই পাটের পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। যদি গোময় পাওয়া সম্ভবপর না হয়, রেড়ীর খোল, নীলের সীটে প্রভৃতি সংযোগে জমীটী বেশ করিয়া কর্ষণ করিয়া তবে বীজ ছড়ান উচিত। যে জমিতে নদীর জল উঠিয়া প্রতি বৎসর পলি পড়ে তাহাতে বিনা সারে পাট চাষ হয়। লোনা জমিতে পাটের আবাদ হয় না, এই জন্য সুন্দরবনের জমি মাত্রেই পাট চাষের অনুপযুক্ত। জমী ভাল রূপ কর্ষিত না হইলে গাছ শিকড় সঞ্চালন করিতে সক্ষম হয় না বা শিকড়ের দ্বারা গাছগুলি বেশী পরিমাণে আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারে না। জমী কঠিন হইলে শিকড় সচ্ছন্দে আহার্য্য সংগ্রহ করিতে অক্ষম হইয়া গাছগুলি হীন তেজ হইয়া পড়ে। পাটের শিকড় প্রায় এক হস্ত পরিমিত হয়, সুতরাং যে জমীতে পাট চাষ করা হইবে, সে জমীটে অন্ততঃ পাঁচ পুয়া বা দেড় হাত গভীর করিয়া কর্ষণ করা উচিত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে বালুকা সংযুক্ত মৃত্তিকা পাট চাষের উপযোগী। ইহার কারণ মোটামুটি হিসাবে এই দেখিতে পাওয়া যায়, যে আটাল মাটিতে জল শীঘ্র ভিতরে প্রবেশ করেনা বা আটাল মাটির জল শীঘ্র সরিয়া যায় না। বালু সংযুক্ত মাটিতে বৃষ্টিপাত হইবামাত্র জল ভিতরে চলিয়া যায়। গাছের গোড়ায় আর অবদ্ধ থাকেনা।

বর্ষাকালে পাটের বীজ বপন করিবার উপযুক্ত সময় সন্দেহ নাই, কিন্তু অবিরল বৃষ্টিপাতে পাটের এক প্রধান শত্রুকে নির্ম্মূল করা যায় না। জমীতে যে নানা প্রকার কুগাছা ও ঘাস জন্মায় সেইগুলিই পাটের প্রধান শত্রু। এই জঙ্গলী গাছগুলি বড় শীঘ্র জন্মায় ও অতিশয় তেজস্কর হয়। জমীতে এইগুলি বর্ত্তমান থাকিতে পাট গাছ গুলিকে বর্দ্ধিত হইতে দেয় না। সেইজন্য আঁচড়ার দ্বারা এইগুলি সমূলে উৎপাটন করা উচিত। সব সময় কেবল আঁচড়া দিলেই কাজ হয় না, নিড়ানি দ্বারা নিড়াইতে হয়। পাট চাষ সম্বন্ধে আর একটী বিষয়ে যত্নবান হইতে হইবে। বীজ ছড়াইবার পর গাছ উৎপন্ন হইলে, ঐ গাছগুলিকে পাতলা পাতলা করিয়া দেওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক গাছটির মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিমিত স্থান ব্যবধান

থাকা বিধেয়। গাছ গুলি খুব ঘেঁস ঘেঁস হইলে বাড়ে না। আবার প্রত্যেক গাছগুলির মধ্যে বেশী স্থান পরিত্যক্ত থাকিলে, গাছগুলি ডাল পালা ছাড়িয়া উর্দ্ধে না বাড়িয়া পার্শ্বে বাড়িয়া থাকে। পাটের পক্ষে ইহা ভাল নহে। প্রথম বৃষ্টিপাত হইয়া জমি যেমন নরম হইবে, অমনি রীতিমত হাল দিয়া জমীটিকে আন্দাজ পাঁচপুয়া বা দেড়হাত গভীর করিয়া কর্ষণ করিতে হইবে—এ'কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পরে বীজ ছড়াইয়া তাহার পর মৈ দিয়া ঐ বীজগুলি ঢাকিয়া দেওয়া আবশ্যক। ঐরূপ ঢাকিয়া দিবার ফলে, প্রথমতঃ পশু পক্ষীতে বীজ নষ্ট করিতে পারে না, দ্বিতীয়তঃ রৌদ্রের তাপে বীজ শক্ত হয় না—বীজ কঠিন হইলে আর শীঘ্র অঙ্কুরিত হয় না—মৈ দিয়া ঢাকিয়া দিবার পর এক পশলা বৃষ্টি হইলে বীজ শীঘ্র অঙ্কুরিত হয়।

জমি কর্ষণ সম্বন্ধে এই স্থলে আমরা দুই একটী কথা বলা আবশ্যক বিবেচনা করি। ইহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক নহে। পাশ্চাত্য দেশ সমূহে ঘোঁড়ায় হাল টানে; আমাদের দেশে গরুতে সে কার্য্য করে। দুর্ভাগ্য বশতঃ এমন উপকারী, এত প্রয়োজনীয় এই গোজাতির প্রতি দৃষ্টি নাই। দুর্ব্বল হলবাহী, শকটবাহী বলদ লইয়া কতদিন কৃষিকার্য্য চলিবে? ধান চাষের জমি পূর্ব্বেও যাহা ছিল এখন প্রায় তাহাই আছে কিন্তু পাট, আখ, তুলা চাষের সঙ্গে সঙ্গে আবাদী জমির পরিমাণ দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। কর্ম্মোপযোগী বলদ অভাবে চাষের জমি পড়িয়া থাকিবে। আমাদিগকে এই কারণে উন্নত জাতীয় ষাঁড় পালিতে হইবে। গবাদি খাদ্যের সুব্যবস্থা করিতে হইবে। পশু বংশের উন্নতি হইলে তবে সবল সুস্থ বাচ্ছা জন্মিবে এবং তাহারা দীর্ঘজিবী ও বলিষ্ঠ ও কর্ম্মোপযোগী হইবে। তাহাদিগকে তেজস্কর, বল-বৃদ্ধিকর খাদ্য যথা, ভূট্টা, ছোলা, অড়হর প্রভৃতি খাইতে দেওয়া উচিত। নতুবা এই পরিশ্রম করিবার শক্তি তাহারা কোথা হইতে পাইবে!

শ্রীযুক্ত টি, এন, মুখার্জ্জি এম, এ, এম, আর, এ, সি, এম, আর, এ. এস, মহাশয় পাট-চাষের উন্নতির জন্য কয়টী অতি আবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে সার সংগ্রহের নিমিত্ত গোবংশ বৃদ্ধির কথা তিনি বিশেষ ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহাতে আমাদের দেশ হইতে গো বধ উঠিয়া যায়, তাহার আন্দোলন অনেক হইয়াছে, এখনও হইতেছে। লণ্ডনে একটী সমিতি স্থাপন পূর্ব্বক এই পুণ্য কার্য্যের সহায়তার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। বিলাতের মন্ত্রী সভার অনেক সদস্য এই সমিতিতে যোগ দান করিয়াছেন।

রীতিমত জমি কর্ষণ ও সার সংযোগ না করিলে জমির উর্ব্বরতা শক্তি বর্দ্ধিত হইতে পারে না। এই উভয়বিধ কার্য্যেই গোজাতির বিশেষ সহায়তা করে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে বীজ বপন করিয়া তাহার উপর মৈ দিয়া সেই

বীজগুলি ঢাকিয়া দিতে হইবে। বর্ষাকালে পাট বপন হয় বলিয়া দুই এক দিনের ভিতর এক পশলা বৃষ্টির আশা করা যাইতে পারে। তাহা হইলে ২।৩ দিনের ভিতর বীজ অঙ্কুরিত হইয়া গাছ বাহির হয়। তাহার পর ২।৩ বার আঁচড়া দেওয়ার ফলে গাছের গোড়া নরম হয় ও গাছগুলিও কতকটা পাতলা হয়। কিন্তু শুধু আঁচড়ার উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। গাছগুলি অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণ লম্বা হইলে, চারা ঘন হইয়া বাহির হইলে ৪ ইঞ্চি ফাঁক ফাঁক করিয়া পাতলা করিয়া দেওয়া উচিত। আর পাট ব্যতীত অন্য যে সমস্ত গাছ ঐ জমিতে থাকিবে, সেগুলি উৎপাটন করিয়া ফেলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কুগাছা মোটে যাহাতে না জন্মিতে পারে সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ রাখিতে হইবে। যত দিন গাছ বেশ বড় না হয়, তত দিন প্রতি মাসে তিন চারিবার কুগাছা তোলার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে যে গাছগুলি কৃষক অকেজো বলিয়া মনে করে সে গুলিও তুলিয়া ফেলা আবশ্যক। আমাদের নিম্ন লিখিত কার্য্যগুলি একটির পর একটি করিয়া করিতে হইবে।

১। জমীতে ঋতিমত হাল দিয়া জমী কর্ষণ করা

২। জমীতে মোটে মাটির চাপড়া বা ঢিল না থাকে। সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা

৩। বীজ নির্ব্বাচন পূর্ব্বক উত্তম বীজ বপন করা

৪। মৈ দিয়া বীজগুলি ঢাকিয়া দেওয়া

৫। গাছ বাহির হইবার পর ৩।৪ ইঞ্চি বড় হইলে আঁচড়া দেওয়া

৬। কুগাছাগুলি তুলিয়া ফেলা

৭। গাছগুলি ৪·৫ ইঞ্চি ফাঁক ফাঁক করিয়া দেওয়া

৮। আঁচড়া দেওয়া। কুগাছা তুলিয়া ফেলা

৯। অপেক্ষা কৃত রুগ্ন চারা থাকিলেও সমূলে উৎপাটিত করা

উল্লিখিত সকল কার্য্যেই কৃষকের বিশেষ যত্ন আবশ্যক। এই স্থানে আর একটী বিষয় বলা উচিত। যে জমিতে নদীর ধোয়াট জল আসে না, সে জমিতে প্রতি-বৎসর সার দিয়া জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করা একান্ত কর্ত্তব্য।

এক্ষণে কোন সময়ে পাট গাছ কাটা উচিত, আমরা সেই বিষয়ে আলোচনা করিব।

গাছগুলি বেশ বড় হইয়া দুটী একটী ফুল ধরিলে কেহ কেহ পাটগুলি উপযুক্ত বিবেচনায় কাটিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা উচিত নহে। গাছে যখন বেশ ঋতিমত ফল ধরিবে ও সেই ফল পুষ্ট হইবে তখন ঐ গাছগুলি কাটা উচিত। কোন কোন স্থানে এক মাসের মধ্যেই গাছগুলি কাটিবার অবস্থায় উপনীত হয় আবার কোন কোন স্থানে বা দেড়মাসেরও অধিক কাল অপেক্ষা করিতে হয়। তবে ফলগুলি বেশী পাকিতে দেওয়া উচিত নহে। তাহা হইলে পাটের আঁশ, অর্থাৎ পাটশক্ত

হয়। আর রঙ কতকটা লাল হইয়া যায়। নরম, সাদা পাটই উত্তম পাট, তাহার আদর বেশী।

বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া যায় যে পাটের অবস্থা ক্রমে হীন হওয়ায়, যাহারা পাটের ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট ছিলেন, ১৯০২ সালে তাঁহারা কৃষকদিগের বিপক্ষে অনেক অভিযোগ করিয়াছেন। এমন কি ডানডির সওদাগরগণ মহামান্য ভারত মন্ত্রীর নিকট পর্য্যন্ত, পাট চাষের অবস্থা তদন্ত করিতে অনুরোধ করিয়া আবেদন করিয়াছিলেন। উক্ত অভিযোগ ও আবেদনের ফলে মিঃ মলিসন ও সার চার্লস এলেন তদানীন্তন বর্দ্ধমান পরীক্ষাগারে কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে তদন্ত করিতে উপদেশ দেন, এবং তাঁহাদের আগ্রহে মিঃ বারকিল ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পাট গাছের পরীক্ষার ভার লইয়াছিলেন। অপর দিকে ঠিক এই সময়েই ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট পাটের অবনতির হেতু অনুসন্ধানের জন্য বিজ্ঞান সভাকে (Board of scientific advice) ভার দেন। উক্ত সভা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে

১। পাট গাছের কোনই অবনতি হয় নাই। শত বৎসর পূর্ব্বে উহা যেমন ছিল, এখনও সেইরূপ আছে।

২। পূর্ব্বের ন্যায় যত্নের সহিত পাটগাছ হইতে হইতে আঁশ বাহির করা হয় না, ইহারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

৩। তবে ওজনে পাটকে ভারি করিবার জন্য, উত্তম পাটে জল দেওয়া হয় বলিয়া পাট উত্তপ্ত হয় ও পাটের রঙ নষ্ট হইয়া যায়। পাটের অবনতির ইহা একটি বিশিষ্ট কারণ।

৪। পাটের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তা, পক্ষান্তরে পাটের অবনতির অন্যতম কারণ। পূর্ব্বে উৎকৃষ্ট বাছাই পাট ব্যতীত ডানডি ও কলিকাতার কলপরিচালকেরা অন্য কোন পাট কিনিতেন না। এক্ষণে ভাল মন্দ সমস্ত পাটই খরিদ করিয়া থাকেন। কারণ তাঁহারা বেশ জানেন, যে কোন মন্দ পাঠ একব্যক্তি না লইলে, পাটের এত আদর বেশী, অপরে তাহা সাগ্রহে গ্রহণ করিবে।

(ক্রমশঃ)

পাটনাই ফুলকপি

বপনের সময় আষাঢ় শ্রাবণ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত। চাষের পক্ষে দোয়াঁশ মাটি ইহার উপযুক্ত। ছায়া বিহিন স্থানে চাষের জমি নির্ব্বাচন করা উচিত। প্রথমতঃ বীজ-ক্ষেত্রে বীজ বপন করিয়া চারাগুলি তিন চারি ইঞ্চি বড় হইলেই উঠাইয়া ক্ষেত্রে বপন করিতে হয়। ক্ষেতে বসাইবার পূর্ব্বে আর একবার নাড়াইয়া বসাইয়া চারাগুলি একটু বলবান করিয়া লওয়া ভাল। পূর্ব্ব হইতে ঐ ক্ষেত্রের মাটি তৈয়ারি করা থাকিবে। চারাগুলি ক্ষেতে বসাইবার সময় কিঞ্চিৎ পচান খৈল দিয়া বসাইলে কপি আশানুরূপ বড় হয়।

বিশেষ সার। পুরাতন গোবর সার, ভেড়ার সার, কিম্বা শরিশার খৈল চূর্ণ করিয়া পচাইয়া প্রত্যেক গাছের গোড়ায় গাছ বসাইবার সময় একবার পরে গাছগুলি বেশ তেজাল হইলে নিড়াইয়া আর একবার সার দেওয়ার বিধি। সার দিবার পর বৃষ্টি হইলে ভাল হয় নচেৎ সেচ দিতে হয় নতুবা সার মাটির সহিত মিশিবে না। যে সারে পটাসের মাত্রা অধিক তাহাতে কপির অধিক উপকার হয়।

সেচের পর মাটিতে বেশ 'যো' হইলে কোদালির দ্বারা একবার মাটি উল্টাইয়া দিতে হইবে। এই সময় বৃষ্টির আশঙ্কা, সেই জন্য যাহাতে গোড়ায় না জল বসিতে পারে এমত উপায় করিতে হইবে কারণ গোড়ায় জল বসিলে শিকড় পচিয়া কপি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

ক্ষেত্র উচ্চ হওয়া চাই এবং জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত আবশ্যক। মাঝে মাঝে নিড়াইয়া দেওয়া ও নিড়ানিদ্বারা গোড়ার মাটি আলগা রাখা ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ পাইট নাই। কিন্তু বাঙলা দেশে খুব জলদী অর্থাৎ আশ্বীন মাসে ফুল কপি পাইতে হইলে একটু বিশেষ যত্নের আবশ্যক। বেহার ও কাশী অঞ্চলের টান মাটিতে আশ্বিনের প্রথমেই কপি উঠে। দার্জিলিঙে পাহাড় গাত্রে সর্ব্বদাই যো যুক্ত মাটি মিলে এই কারণে তথায় সর্ব্বাগ্রে কপির ফসল উৎপন্ন করা যায়। তথা হইতেই সর্ব্ব প্রথমে কলিকাতা বাজারে কপি আমদানী হয়।

বাঙলায় জলদি ফুল কপির জন্য জৈষ্ঠ মাসে বীজ বপন করিতে হইবে।

ঐ সময় প্রায়ই ঝড় বৃষ্টি হয় বলিয়া খোলা জমিতে বীজ বপন না করিয়া বাক্সে বীজ বপনের ব্যবস্থাই ভাল। বাক্সের তলায় ও পাশে অনেকগুলি ছিদ্র করিতে হইবে কারণ ঐ ছিদ্র দ্বারা জল ঢুকান কিম্বা বাহির করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। ঐরূপ সছিদ্র বাক্সে পাতা সার, গোবর সার, ও হাল্কা মাটি মিলাইয়া পূর্ণ করিতে

হইবে। পাতাসার কিছু অধিক দিলে ভাল হয়। ঐরূপ বাক্স অনেকগুলি কিম্বা আবশ্যক মত করিয়া তাহাতে বীজ বপন করিতে হইবে। চারাগুলি ঘন হইলে উঠাইয়া অন্য বাক্সে নাড়িয়া বসাইতে হইবে। বীজ বপন করিয়া বা চারাগুলি যখন ছোট থাকে তখন উপর হইতে জল দেওয়ার সুবিধা না হইলে কোন জল পূর্ণ পাত্রে ঐ বাক্স কিয়ৎক্ষণ বসাইয়া রাখিলে নিচের ছিদ্র দিয়া জল টানিয়া মাটি সরস হইবে। প্রত্যহ সকালে রৌদ্রে রাখিয়া চারাগুলিকে ক্রমশ শক্ত করিয়া লইতে হইবে। চারাগুলি মধ্যে একবার উঠাইয়া অন্য বাক্সে নাড়িয়া দিলে ভাল হয়। ক্রমশঃ এই প্রকারে যখন ৪।৫টি পাতা হইয়া গেল তখন বাক্স হইতে উঠাইয়া ক্ষেত্রে বপন করা যাইতে পারে। এই সময় চাষে বিঘ্ন অনেক। এক পসলা ভারি জলে সমুদয় ক্ষেতের চারা নষ্ট হইতে পারে। আবার নূতন চারা বসাইতে হয় বা যেটি মরিবে অন্য নূতন চারা বসাইয়া তাহার স্থান পূরণ করিতে হয়, তবে ফসল হয়। অবশ্য এই প্রকারে অনেক জমি চাষ করা কঠিন তবে দুই এক



পাটনাই ফুলকপি বিনা সারে

জমি চাষ করা যাইতে পারে। আশ্বিন মাসে কপি উঠাইতে পারিলে ঐ সময় অনেক দরে বিক্রয় করা যাইতে পারে, ঐ সময় প্রত্যেকটি ছোট ছোট ফুল কপির দাম চারি আনার কম নহে। বিদেশ হইতে রেল ভাড়া দিয়া তাহারা অনেক লাভ করে আমরা এখানে ঐ জিনিষ করিতে পারিলে উহা অপেক্ষা কম

দরে বিক্রয় করিলেও অনেক লাভ থাকিবে এবং পরিশ্রম সার্থক হইবে। দূর হইতে আমদানী কপি অপেক্ষা বাঙ্গালায় টাট্‌কা কপির যে অধিক আদর হইবে তাহা নিশ্চিত বলা যায়।

বীজের পরিমাণ—এক আউন্স বীজে এক বিঘা জমির চাষ চলে। খাসাকাট গাছের বীজ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। তাহার চারা অপেক্ষাকৃত দৃঢ় এবং কপি বড় হয়।

নিম্নের চিত্র দেখিলেই বুঝা যায় যে সার যুক্ত ক্ষেতের কপির পাতা চওড়া হইয়াছে, ফুল বড় হইয়াছে। পাটনাই ফুল কপির বর্ণ ঈষৎ হরিদ্রাভ কিন্তু সারের গুণে ইহা বেশ শাদা হইয়াছে। কপি চাষে পটাস সর্ব্বাধিক পরিমাণে আবশ্যক। নাট্রোজেন ও ফস্‌ফসিক অম্ল তদপেক্ষা কিছু কম। আটাল মাটিতে পাটাস অধিক পরিমাণে থাকে এই কারণে দোয়াঁশ মাটি অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত আটাল দোয়াঁশ মাটিতে কপি ভাল হয়। আটাল মাটির ফস্ফরিক অম্ল, নাট্রো-জেন, পটাস ও চুর্ণ প্রভৃতি রক্ষা করিবার একটি বিশিষ্ট ক্ষমতা আছে। এই কয়টিই কপির বিশেষ আবশ্যক সার মাটি অধিক আটাল বা শক্ত হইলে তাহাতে কপি প্রভৃতি সব্জি চাষের ব্যাঘাত হয়, কারণ এই সকল সব্জির নরম শিকড় শক্ত মাটিতে প্রবেশ করিতে পারে না আবার অল্প তাপে জমি টান হইয়া ফাটিয়া যায় ও শিকড় ছিঁড়িয়া গাছ মারা যায়। বেলে দোয়াঁশ মাটির ঐ সকল সার শীঘ্র জলে ধৌত হইয়া যায়। কপি ক্ষেতে পটাসের জন্য গোবর বা ঘুঁটের ছাই, নাট্রো-জেনের জন্য সোরা বা খৈল সার এবং ফস্ফরিক অম্লের জন্য বোন সুপার ব্যবহার করা উচিত। (কৃষি রসায়ণ দেখুন)। ভারতীয় কৃষি সমিতির মিশ্রিত-সার সকল সব্জী চাষেই ফলপ্রদ।



পাটনাই ফুল কপি সারযুক্ত ক্ষেতে

সরকারী কৃষি সংবাদ

রয়েল বোটানিক উদ্যান—

বর্ত্তমান বর্ষের বিবরণীতে প্রকাশ যে সম্প্রতি যে ঝড় ও শীলা বৃষ্টি হইয়াছিল তাহাতে উদ্যানস্থ কাচঘরের ১৫০ বর্গ ফিট কাঁচ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। শীলাগুলির আয়তন কিছু কম ১ ইঞ্চি। কিঞ্চিৎ অধিক কাল এই প্রকার শীলাপাত হইলে বাগানের সমূহ ক্ষতি হইত।

বাগানের নদীর ধার ক্রমশঃ ভাঙ্গিতে ছিল। বাগানে জল উঠা কিম্বা আরও ভাঙ্গন বন্ধ করিবার জন্য স্থানে স্থানে পাকা পোস্তা গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাগানের আর একটি উন্নতিও দেখা যায়। বাগানের ভিতর যে সকল রাস্তা আছে তাহা হইতে ধুলা উড়িয়া অনেক বৃক্ষ লতা পাতা খারাপ হইয়া যাইত। বর্ত্তমান কালে তাহার কথঞ্চিৎ প্রতিকার হইয়াছে। রাস্তাগুলিতে পেট্রোলিয়াম তৈল সিঞ্চনের ব্যবস্থা হইয়াছে। বাগানের পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তা সমূহ এবং অন্যত্র হইতে ধূলা আসার কসুর নাই, তথাপি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অত্যধিক ধুলার হাত হইতে বৃক্ষাদি নিস্তার পাইয়াছে।

বর্ত্তমান বর্ষে ২৬ জাতীয় ৮০টি গাছ বাগানের নানা স্থানে বসান হইয়াছে। ৭০টি গাছ জমিতে বসান হয় নাই গামলায় রক্ষা করা হইয়াছে। দেশ বিদেশ হইতে ৭১৫৭টি গাছ উক্ত বাগানে প্রেরিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কয়েকটি নূতন অর্কিড বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এই বাগান হইতে ৩৩ হাজার গাছ ইতঃস্ততঃ পাঠান হইয়াছে। এই ৩৩ হাজারের মধ্যে ১২০০০ গাছ লোকাল বোর্ড ও গভর্ণমেণ্ট পূর্ত্তকার্য্য বিভাগ রাস্তার ধারে বসাইবার জন্য লইয়াছেন।

অনেক গাছ ভারতীয় কিম্বা বৈদেশিক অন্যান্য বোটানিক বাগানে প্রেরিত হইয়াছে। ভুঁই চাঁপা, দোলন চাঁপা জাতীয় গাছ বিলাতের কিউ উদ্যানে পাঠান হইয়াছে। ঐ সকল উদ্ভিদপত্রে কাগজ হইতে পারে কিনা তত্রস্থ উদ্যানে তাহারই পরীক্ষা হইতেছে। বিভিন্ন তরুলতার বীজ ১, ৭২৬ প্যাকেট এই উদ্যান-কর্ত্তাগণ পাইয়াছেন এবং তদপরিবর্ত্তে ৫,৪১৯ প্যাকেট বীজ অন্যত্র পাঠাইয়াছেন।

উদ্যানতত্ত্ব শিক্ষার জন্য বৃক্ষ লতাদির শাখা প্রশাখা ফল, পুষ্প নমুনা রূপে কাগজে আঁটিয়া রক্ষা করা হয়। বর্ত্তমান বর্ষে প্রায় ১৪,০০০ কাগজের নমুনা জড়ান হইয়াছে। এই সমস্ত কাগজের যথাবিহিত শ্রেণী নির্ব্বাচন করিয়া তাহাতে নাম নম্বর দিয়া রক্ষা করা হয় এবং আবশ্যক মত যথা তথা বিতরণ করা হইয়াছে। সরকারী উদ্যান হইতে এমন সাহায্য লাভে অনেক শিক্ষাগার বিশেষ উপকার মনে করিয়া থাকেন।

এই বোটানিক উদ্যানের জন্য গভর্ণমেণ্টের লোকজনের মাহিনা ও অন্যান্য খরচ বাবত বৎসরে প্রায় ৭২ বাহাত্তর হাজার টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। কলিকাতা ইডেন উদ্যান ও সরকারী বাগান ও স্কোয়ারগুলি সংরক্ষণ জন্য ৪০ চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয় নির্দ্ধারিত আছে। আলোচ্য বর্ষে ইডেন উদ্যানের ঝিলটির সংস্কার করা হইয়াছে ও ব্যাণ্ড বাজনার মঞ্চটির সম্মুখের ময়দান ও রাস্তা সুসংস্কৃত হইয়াছে। ডেলাহাউসি ও অন্যান্য স্কোয়ারেগুলিও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখা যায়।

লয়েড বোটানিক উদ্যান—

এই উদ্যান দার্জ্জিলিঙে অবস্থিত। এখানে অতিবৃষ্টি ও তুষারপাত হেতু দার্জ্জিলিঙের অনেক বৃক্ষলতার অত্যন্ত অনিষ্ট হইয়াছে। এখানকার বোটানিক উদ্যানেরও কিছু কিছু ক্ষতি হইলেও মোটের উপর বাগানের কার্য্য সুচারুরূপে সংসাধিত হইয়া থাকে। বাগানের ঘাষ মাট, রাস্তা, নাচ ঘর সুন্দর অবস্থায় রাখা হইয়াছে। নূতন নূতন বৃক্ষ লতা বাড়াইবার চেষ্টার ক্রটি করা হয় নাই। গাছ ঘরে স্থান সঙ্কুলান হইতেছিল না বলিয়া ২২৪টি গাছ বাহিরে নির্দ্দিষ্ট স্থানে জমিতে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ২০,৮০৪টি গাছ, ৬,৪২৬ ডজন ছোট চারা, ৪,৪৬২টি মূল বা বাল্ব ১,৭৪৬ প্যাকেট বীজ লয়েড বোটানিক বাগান হইতে অন্যত্র পাঠান হইয়াছে।

পঞ্জাবে শস্যের অবস্থা—

এখানে শস্যের অবস্থা ভাল। জ্যৈষ্ঠের প্রথমে সুবৃষ্টি হওয়ায় সকল শস্যের বিশেষ উপকার হইয়াছে। কতক জমিতে এখনও আখ বসান হইতেছে। জলদি তুলার চাষ আরম্ভ হইয়াছে। গবাদির খাদ্য শস্য ওখানে প্রচুর পাওয়া যাইতেছে বলিয়া গবাদি পশুর অবস্থা ভাল।

ইজিপ্টে তুলা চাষের মহা উদ্যোগ—

ব্রিটিস তুলা চাষ সমিতি সুদানে তুলা চাষের কেন্দ্র নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন। এখানে তাঁহারা ৩,০০০,০০০ পাউণ্ড কর্জ্জ খুলিতেছেন। ব্রিটিশ সম্রাজ্য ঐ টাকায় শতকরা ৩॥০ সাড়ে তিন টাকা সুদের গ্যারাণ্টি দিতেছেন। এই মূল ধনের অর্দ্ধেক চাষের খরচে ব্যয় হইবে এবং অপর অর্দ্ধেক রেল বিস্তারে ব্যয় হইবে।

পঞ্জাবে গম—

১৮১২-১৩ সালে গমের আবাদী জমীর পরিমাণ অনুমান ৮,২১১,০০০ একর। বিগত বৎসর ও বর্ত্তমান বর্ষের আবাদী জমির হিসাবে নিম্নে দেওয়া গেল।

	সেচের জলে চাষ	কেবলমাত্র বৃষ্টি বারিতে চাষ	মোট
১৯১১-১২	৪,৫৪৪,৭০৩	৫,১৩৬,৬৭৫	৯,৬৮১৩২৯
১৯১২-১৩	৪,৬১১,০০০	৩,৬০০,০০০	৮,১১১,০০০
কমি বেশী	+৬৬,২৯৭	-১,৫৬৬,৬৭৭	-১,৪৭০,১৭৯

মোটের উপর উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ২,৬০৮ ৮৯৩ টণ। বিগত বর্ষ অপেক্ষা অনুমানে শতকরা ১২ ভাগ কম।

মধ্য প্রদেশে গম—

বর্ত্তমান বর্ষে এই প্রদেশে ৩,৩০১,৬৯১ একর পরিমাণ জমিতে গমের আবাদ হইয়াছে। আনুমানিক উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ৯৬১,৬৪৫ টনের কম হইবে না। বিগত পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা প্রায় শতকরা ২৫ অথবা ৩০গুণ অধিক গম জন্মিয়াছে—

মধ্য প্রদেশে তিসি—

বর্ত্তমান বর্ষে ১,৪০৯,২৬৮ একর জমিতে তিসির চাষ হইয়াছে। অন্য বৎসর অপেক্ষা ৮১,১৫৯ একর পরিমাণ কম জমিতে তিসির আবাদ হইয়াছে।

বোম্বায়ে তিসি—

এতদঞ্চলে কর্ণাটক ও দাক্ষিণাত্যে তিসির চাষ সমধিক পরিমাণে হইয়া থাকে আলোচ্য বর্ষে সুবৃষ্টি না হওয়ায় তিসির আবাদ কম হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণাংশে কোথাও আট আনা কোথাও বা তের আনা ফসল জন্মিয়াছে কিন্তু পূর্ব্বাংশে অনাবৃষ্টি হেতু চারি কিম্বা খুব অধিক হইলে ছয় আনার উপর ফসল হইতে দেখা যায় নাই।

শরিষা—

শরিষার চাষ মন্দ হয় নাই। বরদা রাজ্যে শরিষার চাষ অধিকতর হয়। এখানে সুবৃষ্টি হেতু ফসল সমধিক পরিমাণে হইয়াছে এমন কি ষোল আনা ফসল হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়।

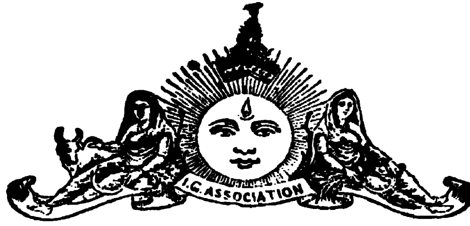
বর্ত্তমান বর্ষে দুইটি তৈল শস্যের পরিমাণ দেওয়া গেল

	তিসি	শরিষা
ব্রিটিস রাজ্যে	১৩,১০০ টন	৪,৪০০ টন
দেশীয় রাজ্যে	১.০০০ টন	১৯,৮০০ টন

বিহারে তৈল শস্য—

বর্ত্তমান বর্ষে তিল ব্যতীত অন্যান্য বিবিধ প্রকার তৈলশস্য অনুমান ১,৭৩৩,৭০০ একরে আবাদ করা হইয়াছিল। বিগত বর্ষে বিবিধ তৈল শস্যের আবাদী জমির পরিমাণ ১,৮৪৪,৫০০ একর।

একর প্রতি রাই শরিষা, ও তিসি ৬ মণ হিসাবে জন্মিয়াছে ধরিয়া লইলে এবং অন্য তৈল শস্য ৪।০ সোয়া চারিমণ উৎপন্ন হইয়াছে ধরিয়া লইলে বর্ত্তমান বর্ষে ৪১৫,৪০০ টন তৈল শস্য উৎপন্ন হইয়াছে। বিগত বর্ষ অপেক্ষা ৫৮৷৷ টন কম তৈল শস্য উৎপন্ন হইয়াছে।



আষাঢ়, ১৩২০ সাল।

আম্র মুকুলের সময়

ভারতে আম ফলের মধ্যে প্রধান বলিয়া গণ্য ; ইহাকে সেই জন্য অমৃত ফল বলা হয়। দক্ষিণ এসিয়া, মালয়া দ্বীপপুঞ্জে ও অন্যত্র আম জন্মিলেও ভারতবর্ষের জল, বায়ু ও মাটি আমের পক্ষে প্রধান উপযোগী বলিয়া মনে হয়। এখানে আমের আবাদের পূর্ণ পরিণতি হইয়াছে। ইজিপ্টে, মালটা দ্বীপে আম ফলাইবার চেষ্টা হইতেছে।

ইংলণ্ডে কিউ গার্ডেনে একটি আম গাছ আছে, তাহাতে সম্প্রতি ফল ফলিয়াছিল কিন্তু সে ফল ছোট, তাহাতে আঁশ অধিক এবং স্বাদে—ঝাল হইয়াছিল। ভারতে যেমন আম জন্মায় এমন বোধ হয় কোথাও জন্মায় না। আম বাগানের মাটি সরস হওয়া আবশ্যক ; আবহাওয়া আবার গরম না হইলে আমের ফল ভাল হয় না। জমির উপর নীচে জল নিকাশের পয়োনালা ভালরূপ থাকা চাই নতুবা আমের গাছে মুকুল হইবে কিন্তু ফল ফলিবে না। যেমন বাঙলার আম বাগানগুলি দেখিলে চক্ষু জুড়ায় কিন্তু ঐ সকল বাগানে কদাচিৎ দুই বা তিন বৎসর অন্তর মুকুল হয় অথবা মুকুল হইলেও মুকুল ঝরিয়া যাইতে অধিকক্ষণ লাগে না।

ভারতে মোগল অধিকারের সময় আমের আবাদের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে, পেশওয়ারা আমের উন্নতি কল্পে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। গোয়াতে পর্তুগিজরা আমের আবাদ করিয়াছিল এবং নূতন নূতন আমের সৃষ্টি করেন বলিলেও হয়। বোধ হয় তাঁহারা প্রথমেই আমের জোড় কলম করিতে আরম্ভ করেন।

দাক্ষিণাত্যে উড্রো সাহেব বাঙলায় মেরী সাহেব আমের জাতীয় উন্নতি করিবার নিমিত্ত বিস্তর খাটিয়াছেন। মেরী সাহেব ভারতের নানা স্থান হইতে অন্যূন পাঁচশত প্রকার আম সংগ্রহ করিয়া তালিকাভুক্ত করেন। তাঁহার পূর্ব্বে আর এতগুলি বিভিন্ন প্রকার আম কেহ সংগ্রহ করিতে পারে নাই।

ইহার তালিকা ভুক্ত আমগুলি প্রত্যেকটি স্বাদে, গন্ধে, আকৃতি, ওজনে, রঙে অপরটি হইতে পৃথক।

আম ভারতের ফল তাহা সাব্যস্ত করিবার জন্য এত কথা বলা হইল। শাস্ত্রকারেরাও এই সিদ্ধান্ত করিয়া আমের শাস্ত্রীয় নাম Mangifera indica রাখিয়াছেন। এখন আমের মুকুল কখন হয় দেখা যাউক। শীতের শেষে অর্থাৎ পৌষের শেষ ভাগে আম্র মুকুল হইতে আরম্ভ হয়। মাঘ মাসে প্রায়ই শ্রীপঞ্চমী হইয়া থাকে। এই দেবী আরাধনায় সেই কারণে নবোদ্গত আম্রমুকুল দিবার ব্যবস্থা আছে। পৌষে আমের মুকুল হইতে আরম্ভ হইলেও ফাল্গুন এমন কি চৈত্র মাস পর্য্যন্ত আম গাছ মুকুলিত হইয়া থাকে। ইহাই কিন্তু সাধারণ বিধি।

ইহা ছাড়া মালদা ও ত্রিহুতে ভাদ্রে ও কার্ত্তিকে আমের জ্যৈষ্ঠ মাসে মুকুল হয়, ফল পাকে আশ্বিনে অথবা কার্ত্তিক অগ্রহায়ণে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সব আমগাছ প্রতি বৎসর মুকুলিত হয় না। বাঙলার প্রায় অর্দ্ধেকের উপর আমগাছ দুই কিম্বা তিন বৎসর অন্তর মুকুলিত হয়। দাক্ষিণাত্যেও অধিকাংশ আমগাছ এক বৎসর অন্তর মুকুলিত হয়। বোধ হয় ভারতের সর্ব্বত্রই প্রতি বৎসর ফল প্রদান করে এমন আমগাছ খুব কম আছে। বিশেষতঃ বাঙলায় আমের ফল হওয়া বড়ই অনিশ্চিত। প্রথমতঃ দুই বা তিন বৎসর অন্তর কোন কোন গাছ যদি বা মুকুলিত হইল, নানা কারণে মুকুল ঝরিয়া গেল বা ফল ধরিয়া থাকিলে, ফল ঝরিয়া গেল। বাঙলা দেশে পোকার উপদ্রব অধিক এবং বাঙলার মাটি অতিশয় রসা বলিয়া গাছে অত্যধিক রস সঞ্চারিত হয়। সেই রস সহসা গরম বা ঠাণ্ডা হইয়া ফল ঝরার হেতু হয়। যে সব গাছে কোন বৎসর মুকুল হইল না তাহাতে কচিপাতা বাহির হইয়া পড়ে। প্রতিবৎর ফলে এমন আমগাছও আছে। তাহাদের মধ্যে কতকগুলির পৌষমাসে মুকুল হয় কতকগুলিতে দুই বার মুকুল হয়, একবার পৌষ মাসে, দ্বিতীয় বার শ্রাবণ ভাদ্রে। এরূপ আমের সংখ্যা কম। কতকগুলি আম বারমাস ফলে। পৌষ হইতে আরম্ভ করিয়া তিন মাস অন্তর মুকুল হয়। মহারাষ্ট্র দেশে আম খুব জলদি মুকুলিত হয়। সেখানে সাধারণতঃ বর্ষার শেষে কার্ত্তিক হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত মুকুল হইবার সময়। দক্ষিণ মহারাষ্ট্র দেশে এই আমের সংখ্যা অধিক।

যে সকল আম কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ বা পৌষমাসে ফলে তাহাদিগকে রবি আম বলা হয় এবং তাহা রবি খন্দের মধ্যে গণ্য। দোফলা তেফলা বা বারমেসে আম বাঙলা দেশেই দেখা যায়; অন্যত্র্য কচিৎ দৃষ্টি হয়। ষ্ট্রেট সেটেলমেণ্ট দ্বীপপুঞ্জে বৈশাখ জৈষ্ঠ মাসে আমের মুকুল হয়। সেখানে দোফলা আম দেখিতে পাওয়া যায়। একবার বৈশাখ জৈষ্ঠে এবং আবার কার্ত্তিক অগ্রহায়ণে মুকুল হয়।

মূল কথা যাহা বলা গেল তাহা হইতে এই বুঝা যায় যে, আমের মুকুলিত হইবার নির্দ্ধারিত সময় নাই। স্থান বিশেষে ও বৃক্ষ বিশেষে কোন আম গাছ পৌষ মাসে, কোনটি জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে, কোনটি কার্ত্তিক অগ্রহায়ণে, কতগুলি দুইবার, কতকগুলি তিন বার ফলে; কোনটি বা বারমেসে। কোন কোন আমগাছ এক বৎসর অন্তর কোন গাছ বা প্রতি বৎসর ফলিয়া থাকে। দুই বা তিন বৎসর অন্তর ফলিতেছে এমন আম গাছ অন্যত্র না দেখা গেলেও বাঙলায় বিরল নহে।

এই সকল আম গাছের শ্রেণী বিভাগ করিয়া একটা তালিকা করিতে পারা যায়—

১। এক বৎসর অন্তর ফলে
২। বৎসর ফলা
৩। দো-ফলা

দো-ফলা আম গাছের সংখ্যা খুব কম। তে-ফলার সংখ্যাও তদপেক্ষা কম।

ফসলের ক্ষেতে জল সেচন—

ক্ষেতে কোন সময় কি পরিমাণ জল সেচন আবশ্যক স্থির করা বড় কঠিন। শস্য ক্ষেত্রে অধিক জল সিঞ্চিত হইলে হয় ফসল পাকিতে বিলম্ব হয় নতুবা অকালে ফসল পাকিয়া যায়।

আলু পাকিবার মুখে অধিক জল পাইলে আলু দাগী হইয়া যায় এবং সে আলু অধিক দিন রাখা চলে না। তুলিয়াই বেচিয়া না ফেলিলে পচ ধরিয়া অনেক আলু নষ্ট হইয়া যায়। শস্য ক্ষেতে জল সেচন করিয়া জমির 'যো' হইলে জমির উপরটি খুসিয়া দিলে এবং উপরের মাটি গুঁড়াইয়া 'যো' বাধিয়া দিলে জমিতে অধিক কাল রস থাকে এবং শস্যের উপকার হয়। উদ্ভিদও মানুষের মত অধিক পানাহারে রত। উদ্ভিদ অধিক জল পাইলে অধিক রস নিজেদেহে টানিয়া লয় এবং অধিক আহার পাইলে অধিক আহার করে, তাহাতে তাহাদের কোন না কোন প্রকার অনিষ্ঠ হইয়া থাকে। এই জন্য জল পরিমিত ও সার ওজন করিয়া দেওয়াই ভাল।

উপরের মৃত্তিকা খুসিয়া দিলে জমিতে রস সঞ্চিত থাকে বলিয়াছি কিন্তু সকল মৃত্তিকার পক্ষে একথা খাটে না। কোন কোন মৃত্তিকায় চাষ দিলে আরও শিঘ্র শিঘ্র রস উড়িয়া যায়। বেলে মাটিই তাহার দৃষ্টান্ত। এঁটেল ও দোঁয়াস মাটিতে জল সিঞ্চনের পর চাষ দিয়া রাখিলে উপকার হয়। বেলে কিম্বা বেলে দোঁয়াস যাহাতে সহজে রস রক্ষা করা যায় না—তাহাতে গোময়, পাতা পচা সার বা

অন্যান্য উদ্ভিজ্জ সার মিশাইলে জমিতে রস রক্ষার সুবিধা হয়। জমিতে কোন বিশেষ সার প্রয়োগ করিলে জমিতে অধিক জল সেচনের আবশ্যক হয়। চুণ প্রধান সার প্রয়োগে জমিতে অধিক জল টানে। হাড়ের গুঁড়া সার দিলে, হাড়ের গুড়া পচাইবার জন্য অধিক জলের আবশ্যক হয়। রেড়ীর খৈল প্রদানেও জমিতে জলের অধিকতর আবশ্যকতা দেখা যায়। উদ্ভিদগণের প্রতি-পালন ও পরিপোষণের জন্য জমিতে রস রক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। তবে জল সাবধানতার প্রয়োগ করিতে হইবে। অধিক জল প্রদানের ফল অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। অত্যধিক জল সেচনের ফলে বৃক্ষের পাতা হলুদে হইয়া যায়, বৃক্ষ লতা শ্রীহীন হইয়া ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়ে। জল সেচনের একটা বাঁধা ধরা নিয়ম বলিয়া দেওয়া যায় না। উপযুক্ত রস রক্ষাই সুচাষের মূল সূত্র, যাহাতে রসের সমতা রক্ষা হয় তাহা সুচাষীর বিশেষ দ্রষ্টব্য।

পত্রাদি

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র দে, থাজি, বর্ম্মা।

আপানার পত্রের উত্তরে আপনাকে জানান যাইতেছে যে, কৃষকের কলেবর ও সৌষ্টব বৃদ্ধির কথা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। আমরা আগামী বর্ষে গ্রাহক বৃদ্ধির সঙ্গে কৃষকের কলেবর ও উহাতে চিত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিব। মলাটে যে চিত্রখানি দিবার আভাস দিয়াছেন, তাহা সুন্দর বটে, নূতন কলেবরের সঙ্গে ঐরূপ একখানি চিত্র দেওয়ার আমাদেরও ইচ্ছা আছে। কৃষকের মূল্য বৃদ্ধি করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। সাধারণে যাহাতে কৃষক পড়িতে পারে ইহাই আমাদের ইচ্ছা, মূল্য বৃদ্ধি করিলে সে সুযোগ সকলের ঘটিবে না।

কৃষকের গ্রাহকদিগকে ও ভারতীয় কৃষি-সমিতির সভ্যগণকে উপাধি দান সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাও আমাদের প্রস্তাবিত কার্য্যের মধ্যে ধরা আছে। আমরা সম্প্রতি ভারতীয় কৃষি-সমিতি কার্য্যালয়ে একটী কৃষি-পুস্তকালয় ও উদ্ভিদতত্ত্ব চর্চ্চার ও কৃষি-রসায়ন শিক্ষার একটী আগার খুলিতে চাই। তথায় যে কেহ আসিয়া কৃষি পুস্তকাদি পাঠ ও বিজ্ঞানসম্মত কৃষির চেষ্টা করিতে পারিবেন। একজন বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে এই শিক্ষাগার থাকিবে এবং প্রতি মাসে একবার কৃষকের গ্রাহক ও সমিতির সভ্যগণকে কৃষি-বিজ্ঞান চর্চ্চায় যোগদান করিতে আহ্বান

করা হইবে। অনন্তর আমরা সভ্যগণকে উপাধি দানের ব্যবস্থা করিব। সভ্যগণকে কার্য্যতঃ কৃষির সহায় করিতে না পারিলে বৃথা তাঁহাদিগকে উপাধি ভূষিত করিয়া কি ফল হইবে!

সার—সোরা—গুয়ানো

শ্রীঅরুণেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, জমিদার সিউড়ী, বীরভূম।

১। মোটা দানা হাড়ের গুঁড়া—Coarse Bone Mill এর যাহা ক্রমশঃ বহুদিন ধরিয়া গাছকে পোষণ করিতে সমর্থ হয় এবং মিহি হাড়ের গুঁড়া-Fine Bone Mill যাহা শীঘ্র মাটীর সহিত মিলিত হয়, কখন কি ভাবে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কৃষকে সন্নিবেশিত মূল্য তালিকায় দেখিলাম যে উৎকৃষ্ট সোরা সার ১০৲ দশ টাকা করিয়া মণ। ঐ সারে শতকরা কত ভাগ নাইট্রোজেন এবং কত ভাগ পটাশ পাওয়া যাইবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক লিখিবেন। কারণ উক্ত দ্রব্য দুইটীর পরিমাণ জানিতে না পারিলে কি পরিমাণ সারের আবশ্যক হইবে জানিতে পারিতেছি না।

২। পেরুর গুয়ানো—তাহাতে শতকরা নাইট্রোজেন, পটাশ, ফস্‌ফরিক এসিড প্রভৃতি বিভিন্ন বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইলে বিশেষ উপকৃত হইব। কারণ ফুল গাছের জন্যও কিছু সারের প্রয়োজন আছে।

উত্তর—

১। মোটা দানা হাড়ের গুঁড়া, সরু হাড়চূর্ণ অপেক্ষা বিলম্বে গলে ও মাটির সহিত ক্রমশঃ মিলিত হয়। দুই বা তিন বৎসরের কম সম্পূর্ণ মাটির সহিত মিলিত হইয়া যায় না। মিহি গুঁড়া সদ্য বৎসরেই মাটির সহিত মিলিয়া যাইতে পারে। বর্ষার প্রারম্ভে প্রয়োগ করিলে বর্ষার শেষ কতকটা এবং শীতে অবশিষ্ট কাজ পাওয়া যায়। এই কারণে ফলের বাগানে মোটা গুঁড়া ও সবজী ক্ষেতে মিহি গুঁড়া ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। হাড়ের গুঁড়ার সঙ্গে সোরা ব্যবহার করিলে হাড়ের গুঁড়া শীঘ্র শীঘ্র গলিয়া যায়। একমণ হাড়ের গুঁড়ার সহিত ৫ সের সোরা পর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হয়।

২। সারের জন্য যে সোরা ব্যবহার হয় তাহার ১নং সোরাতে ১০ ভাগ নাইট্রোজেন ও পটাস ২০ ভাগ থাকে। এই জন্যই সোরার অন্য নাম পোটাসিয়ম নাইট্রেট্।

৩। গুয়ানোতে শতকরা ১০ ভাগ নাইট্রোজেন ও ফস্‌ফরিক অম্ল ১০ ভাগ পাওয়া যায়। ইহাতে পটাসের মাত্রা কিছুই নাই বলিলেও হয়। ফুলগাছে গুয়ানো অল্প মাত্রায় ব্যবহার করিলে খুব ভাল ফুল হয়।

৪। বোন মিল অপেক্ষা বোন সুপার বাবহার করিলে আশু ফল পাওয়া যায়।

সার-সংগ্রহ

ভারতীয় শিল্প

লম্ব নামক এক ব্যক্তির চেষ্টায় বিলাতে কিরূপ রেশম বয়নের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল, সে কথা আমি গত বারে বলিয়াছি। নিজ ইতালী দেশেও রেশম উৎপাদনের কার্য্য এইরূপ একজনের চেষ্টায় হইয়াছিল। ইউরোপের কোন দেশে পূর্ব্বে রেশম কীটের চাষ হইত না। একজন পাদরি অতি কষ্টে ও অতি গোপনে চীন হইতে রেশম কীটের বীজ ইতালীতে লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় ইতালী ও ফরাসী দেশে এই নূতন অর্থোপার্জ্জনের পথ প্রস্তুত হইয়াছিল। এখন সেথা লক্ষ লক্ষ লোক সেই উপায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই দেশে রেশম কীটের এক প্রকার রোগ হওয়ায়, এ ব্যবসায় মাটি হইবার উপক্রম হইয়াছিল। এ ঘোর বিপদ হইতেও লোকে একজনের চেষ্টায় নিষ্কৃতি পাইয়াছে। সে ব্যক্তির নাম পাস্তিয়র। ইনি রেশম কীটের রোগ দূর করিবার নিমিত্ত বিজ্ঞানবলে এক আশ্চর্য্য উপায় উদ্ভাবিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঠিক যেন দেবতার কাজ। কোন একটা বিপদ পড়িলে এসকল দেশের লোক চুপ করিয়া থাকে না। কিরূপে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবে তাহার উপায় অনুসন্ধান করিতে থাকে। মানুষের মধ্যে ও বাহিরে এই বিশ্ব-সংসারে অদ্ভুত শক্তিসমূহ নিহিত আছে, সেই স্থানের লোকের এইরূপ বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস বলেই তাহারা রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি নানারূপ অদ্ভুত বিষয় আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে। আমাদের এই বঙ্গদেশেই অল্প দিন পূর্ব্বে রেশম ব্যবসায়ের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব ছিল। সে ব্যবসায় এক্ষণে মাটি হইয়াছে। দেশে শিক্ষিত লোক আছেন। কেহ কি এক দিনের জন্য একবার মনে ভাবিয়া দেখিয়াছেন যে, এ ব্যবসায় কেন মাটি হইল, আর ইহাকে পুনরুদ্ধার করিবার কোন উপায় আছে কি না।

নির্লোভ হইয়া, বল্কল পরিয়া বনে বসিয়া, এ দেশের লোক যদি তপস্যা করিত তাহা হইলে কাহাকেও আমি এরূপ চিন্তা করিতে বলিতাম না। কিন্তু লোক পনর টাকা বেতনের কেরাণীগিরির জন্য লালায়িত। অনেক শিক্ষিত দুঃখী লোক আমাকে পত্র লিখিয়া থাকেন। লোকের খেদোক্তি পাঠ করিয়া, অনেক সময় আমাকে অশ্রুপাত করিতে হয়। সেই জন্য আমি বলি যে, সম্পন্ন ব্যক্তিগণ যেন দেশের নিরন্ন ব্যক্তিগণের নিমিত্ত একটু চিন্তা করেন। বিশেষতঃ ভদ্র সন্তানদিগের জন্যই অধিক ভাবনা। পুরুষ পুরুষানুক্রমে ব্রাহ্মণ সন্তানগণ কখনও নীচ কাজ করেন নাই। আমি সেই কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। যদিচ সকল জাতির দুঃখ দেখিয়া কাতর হইতে হয়, তথাপি ব্রাহ্মণদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া কিছু বেশী কাতর হইতে হয়। পেটের দায়ে ব্রাহ্মণ-সন্তানগণকে যদি নীচ কুলবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়, তাহা হইলে দেশের কলঙ্ক! শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রের মনে যদি এইরূপ চিন্তার উদয় হয়, তাহা হইলে অনেক কাজ করিতে পারা যায়।

কিন্তু এক্ষণে উপায় কি? চাকরীর পথ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। তবে মানুষ করে কি? যে শিল্পকার্য্যে বিদ্যা ও বিজ্ঞানের প্রয়োজন হয়, ভদ্রসন্তানগণ এইরূপ শিল্প অবলম্বন করিলে দোষ হয় না। ভদ্র লোককে নিজে হাতে কুলির কাজ করিতে হইবে না। শিক্ষিত ভদ্র সন্তানগণ দিবেন বিদ্যা ও বুদ্ধি, দ্রব্য প্রস্তুত করিবে মজুরগণ। এইরূপ কার্য্যের সৃষ্টি করিতে হইবে।

ভারতে একদিন এমন সময় ছিল যে ব্রাহ্মণ পরিবার নানা প্রকার শিল্পকার্য্য লইয়া ব্যস্ত থাকিত।

এই ভারতে প্রকৃতজাত দ্রব্যের কথা ফল, ফুল, লতা, পাতা ইত্যাদি অনুকরণ করিয়াই শিল্পের এতদূর উন্নতি হইয়াছিল। কাশ্মীরের শাল এবং মুর্শীদাবাদের কিংখাব তাহার দৃষ্টান্ত। যত দিন লোকে প্রকৃতির অনুকরণ করিয়াছিল ততদিন শিল্প প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। ভারতে, আদর্শ প্রকৃতি হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রাপ্ত সুতরাং তাহা ইউরোপীয় আদর্শ অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ।

ভারতে স্বর্ণ, রৌপ্য এবং জহরতের কার্য্যে এতদূর উন্নতি কিরূপে হইয়াছিল এতক্ষণে তাহা দেখা যাউক। আর্য্যগণ এদেশে আসিয়া অনুকরণ করিবার যথোপযুক্ত আদর্শ প্রথমে পান নাই। তাঁহারা যে সমস্ত দ্রব্য প্রতিদিন ব্যবহার করিতেন তাহাদেরই ক্রমশঃ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ক্রমে আদিম অধিবাসীদের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া পঞ্চনদে এবং কল কল বাহিনী কুল কুল নাদিনী গঙ্গা যমুনার শস্যশ্যামলা নানা বৃক্ষরাজিশোভিতা মনোলোভা তীরভূমিতে বসতি করিতে লাগিলেন; এবং অনায়াসলব্ধ প্রাণধারণোপযোগী শস্য সংগ্রহ করিয়া শিল্পজাত নানাবিধ দ্রব্য উৎপাদন করিতে সচেষ্ট হইলেন। তাহার পর বাণিজ্যসূত্রে পারস্য, মিশর এবং অন্যান্য দেশের সংস্রবে আসিয়া শিল্পের বেশ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। এইরূপে হিন্দু রাজত্বে ভারতীয় শিল্প ক্রমশঃ প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল। ইহার ফলে হিন্দুরাজত্বের শেষে এবং মুসলমান রাজত্বের প্রথমে শিল্পজাত সামগ্রীর জন্য ভারতবর্ষ পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে দৈর্ঘে ৩০ হাত এবং প্রস্থে ২ হাত এক খণ্ড মসলিন ওজনে ৯০০ গ্রেণ (প্রায় ৫ তোলা) হইত এবং তৎকালে তাহার মূল্য ৬০০ টাকার কম নহে। এক্ষণে ঐ মাপের মসলিন ওজনে ১৬০০ গ্রেণ (প্রায় ৯ তোলা) হইবে এবং তাহার দাম ১৫০৲ টাকা; এরূপ মসলিন আবার সচরাচর পাওয়া যায় না। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তৎকালে যুবরাজকে—যিনি এক্ষণে আমাদের সম্রাট—৪০ হাত লম্বা এবং প্রস্থে ২ হাত তিন খণ্ড মসলিন দেওয়া হইয়াছিল; তাহাদের প্রত্যেকটির ওজন ১৬৮০ গ্রেণ (প্রায় ৯৷০ তোলা) হইয়াছিল। দিন দিন ইহার অত্যন্ত অবনতি হইতেছে; তাহার একমাত্র প্রধান কারণ এই যে আর পূর্ব্বের মত মসলিনের স্বদেশে কি বিদেশে আদর নাই, ইহার পরিবর্ত্তে তসর, বাপ্তা প্রভৃতির আদর হইতেছে। এইরূপ অবস্থায় এই মৃতপ্রায় স্বনাম প্রসিদ্ধ শিল্পকে রক্ষা করা আমাদের স্বদেশীয় নৃপতিবর্গের একান্ত কর্ত্তব্য, নচেৎ অচিরে ইহার স্মৃতি কালগর্ভে নিমজ্জিত হইবে। ইউরোপের সহিত প্রতীদ্বন্দ্বিতায় অসমর্থ হইয়া সম্প্রতি ভারতেও কল কারখানা স্থাপিত হইতেছে। ইহাতে আমাদের উচ্চ আদর্শ সমূহ চিরকালের জন্য যাইতে বসিয়াছে। কলে সমস্ত দ্রব্যই কম খরচে এবং অল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তুত হয় সত্য, কিন্তু তাহাতে সে রূপ সূক্ষ্ম কার্য্য দেখান যায় না; কাজে কাজেই উক্ত শিল্পের

ক্রমশঃ অবনতি হইতেছে। তবে কল কারখানার আর একটী ফল হইতেছে—ইহাতে সমাজের কোন বিশেষ সম্প্রদায়েরই লাভ হইতেছে। আহাম্মদাবাদ এবং বোম্বাই নগরীতে যে সমস্ত কুলীরা কাপড়ের কলে কাজ করে, তাহারা পূর্ব্বে ভিক্ষা করিয়া কালাতিপাত করিত, এক্ষণে সপরিবারে কলে কাজ করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছে। কিন্তু এই সমস্ত কলের জন্য ঐ প্রদেশের তন্তুবায়দিগকে বিষম বিপদগ্রস্ত হইতে হইয়াছে; তাহাদিগকে কলের সহিত প্রতিদ্বন্দীতা করিতে হইতেছে এবং অচিরেই তাহাদিগকে নিজ নিজ ব্যবসা পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে কল কারখানা স্থাপন করা উচিত। কারণ আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই দরিদ্র, তাহারা যে বেশী অর্থ ব্যয় করিয়া কলে প্রস্তুত দ্রব্যাদি না লইয়া হস্ত নির্ম্মিত দ্রব্য লইবে এরূপ আশা করা যায় না; কিন্তু যাঁহাদের অর্থ আছে, তাঁহাদের কিছু ক্ষতি স্বীকার করিয়া শিল্পীদিগকে রক্ষা করা উচিত।

এক্ষণে ভারতের কোন স্থানে কি পাওয়া যায় এবং তাহার পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি কি অবনতি হইয়াছে এবং যাহাদের অবনতি হইয়াছে তাহাদের কিরূপে উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে তাহা দেখা যাউক—

(১) কার্পাস বস্ত্র—

বোম্বাই প্রদেশ—বোম্বাই এবং আহাম্মদাবাদে অনেকগুলি কাপড়ের এবং সূতার কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাদের উৎপন্ন দ্রব্যাদির জাপানে এবং চীন দেশে বেশী কাটতি ছিল কিন্তু সম্প্রতি ভারতের সর্ব্বত্রই তাহাদের আদর বাড়িতেছে। দুঃখের বিষয় প্রায় সমস্ত কলেরই মূলধন বিদেশীয়দের; কেবলমাত্র মুটে মুজুরের ভাগটাই আমাদের। এতদ্ভিন্ন আহাম্মদাবাদের অন্তর্গত রানপুর এবং ফরারা জেলায় এখনও অনেক তন্তুবায় আছে, তাহাদের তাঁতে প্রস্তুত বস্ত্রাদি ঐ প্রদেশে এবং মধ্যভারতে যথেষ্ট বিক্রয় হয়। নাসিক, ইয়োলো, আহাম্মদনগর, কোলাপুর, খান্দেশ, কালাংগী, বেলগ্রাম, চিকোদি, বিদি এবং অন্যান্য অনেক স্থান কার্পাস বস্ত্রের জন্য এখনো প্রসিদ্ধ। Mr. Terry ৭৯,০০০ তন্তুবায় গণনা করিয়াছেন। মারগন্তি, মানোলী এবং আস্‌দী কাপড়ে রঙ করিবার জন্য বিখ্যাত। গুজরাট প্রদেশ কার্পাস কিম্বা রেশম বস্ত্রে স্বর্ণ রৌপ্যের কাজ করার জন্য প্রসিদ্ধ। এই প্রদেশে বস্ত্রে স্বর্ণ রৌপ্যের কাজ করিবার দুইটী প্রথা প্রচলিত আছে—

প্রথমতঃ একটী কাষ্ঠফলকে আদর্শানুযায়ী খোদাই করা হয়; তারপর যে যে স্থানে স্বর্ণ রৌপ্যের কাজ করিতে হইবে, সেই সেই স্থানে আঠা গলাইয়া তদুপরি বস্ত্রটী রাখিয়া চাপ দিতে হয়; ইহাতে বস্ত্রের আবশ্যকীয় স্থান সমূহে আঠা লাগিয়া যায়। ইহার পর স্বর্ণ কি রৌপ্যের সূক্ষ্ম পাত দ্বারা ঐ বস্ত্রটী রগড়ান যায়; ইহাতে বস্ত্রের উপরোক্ত স্থান সমূহে ঐ পাতগুলি সংলগ্ন হইয়া যায়। ঐ পাতগুলিকে তারপর ভালরূপে বসান হয়।

দ্বিতীয় প্রথাটী অপেক্ষাকৃত সহজ; ইহার নাম "বাঁধ্‌না"। কাপড়টী প্রথমতঃ একজন চিত্রকরের নিকট পাঠান হয়; সে ঐ কাপড়টীকে ছোট ছোট সমচতুর্ভুজে বিভক্ত করে। তারপর কাপড়টী "বাঁধনারী"র (সাধারণতঃ একজন কুমারী) নিকট পাঠান হয়; সে প্রত্যেক সমচতুর্ভুজের প্রত্যেক কোণে একটী

গ্রন্থি দেয়। ইহার পর ঐ গ্রন্থিযুক্ত কাপড়টী যে রঙ করিবে তাহার নিকট পাঠান হয়। কাপড়ে যে রঙ দিতে হইবে, সে সেই রঙে ঐ কাপড়টী চুবাইয়া লইয়া এবং তাহার পর শুকাইয়া ঐ গ্রন্থিগুলি খুলিয়া ঐ স্থান সমূহ হস্ত দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রঙে বা স্বর্ণে রৌপ্যে চিত্রিত করে।

মান্দ্রাজ প্রদেশ—

গোদাবরী, নেলোর, রায়পুর এবং গাঞ্জার বিভাগে অতি উৎকৃষ্ট কাপড় প্রস্তুত হয়। রাজমহেন্দ্রীর জেলে এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে তাম্বুর জন্য বেশ ভাল রকমের কাপড়; এবং কান্দাকারে ও ভিজিগাপটামে "পাল্লাম" একপ্রকার মোটা কাপড়; ইহা মান্দ্রাজে নীল রং করিয়া ব্রেজিল, ভূমধ্যসাগরের উপকূল সমূহে এবং দ্বীপপুঞ্জে, আমেরিকায় এবং ইংলণ্ডেও বহুল পরিমাণে প্রেরিত হয়। মছলিপটামের ভিন্ন ভিন্ন রকমের ছিট তাহাদের রঙে উজ্জ্বলতা এবং স্থায়িত্বের জন্য পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। কাচাইলে উহাদের রঙ আরও উজ্জ্বল হয়। উদয়-গিরি তালুকে এখনও অতি উৎকৃষ্ট মসলিন্ প্রস্তুত হয়। নেলোর এবং কাণ্ডাকার তালুকে কাপড়ে নানাপ্রকার রঙ করা হয়। মহীশূরের সর্ব্বত্রই কাপড় প্রস্তুত হয়। এক তামকুর জেলাতেই ৩৭৬৩ খান তাঁত এবং ২৪,৮০৯ সুতা কাটা যন্ত্র আছে। মাদুরাতে কাল এবং লাল রঙের মোটা কাপড় প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হয়। মান্দ্রাজ প্রদেশে এখনও বেশী কল প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; সেই জন্য এখানে এখনও তন্তুবায়েরা স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে।

মধ্য প্রদেশ—

মধ্যপ্রদেশে সর্ব্বত্রই কাপড় প্রস্তুত হয়। কেবলমাত্র নাগপুরে কল হইয়াছে, এবং কলে প্রস্তুত কাপড় সর্ব্বত্র বিক্রয় হইতেছে। নাগপুরে ১৫০৲ টাকা হইতে ১॥৵০ আনায় জোড়া পর্য্যন্ত কাপড় পাওয়া যায়। হোসেঙ্গাবাদ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাপড়ের জন্য বিখ্যাত ছিল, কিন্তু সম্প্রতি এই ব্যবসায় প্রায় লোপ পাইয়াছে। চান্দাতে এখনও নানাবিধ কাপড় প্রস্তুত হয় এবং এই সমস্ত কাপড় আরব এবং অন্যান্য দেশে প্রচুর পরিমাণে প্রেরিত হয়। ব্রাহ্মণপুরে এখনও কার্পাস এবং রেশমের কাজ, স্বর্ণের সুতা প্রস্তুতের কাজ, এবং কাপড়ে ঐ সমস্ত সুতার কাজ যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান আছে।

পঞ্জাব প্রদেশ—

পঞ্জাবের প্রায় সমস্ত স্থানেই কাপড় প্রস্তুত হয়; তবে কোথাও বা ভাল কোথাও বা মোটা কাপড় প্রস্তুত হয়। লাহোর, অমৃতসর, মুলতান, লুধিয়ানা, জলন্ধর দোয়াব এবং অন্যান্য স্থানে সূক্ষ্ম বস্ত্র পাওয়া যায়। লুধিয়ানার ছিট; চেক ও আলোয়ান এবং মুলতানের গালিচা চিরপ্রসিদ্ধ। জলন্ধর দোয়াবে এক-রকম মোটা কাপড় প্রস্তুত হয়, ইহা কাবুল, তুর্কিস্থান এবং অন্যান্য স্থানে প্রচুর পরিমাণে প্রেরিত হয়। পেশোয়ারের পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহে বৎসরে ৩৲ টাকা হইতে ২৬৲ টাকা মূল্যে ৫০০০ হইতে ৬০০০ জোড়া শাদা কাপড় এবং ৮০ হইতে ৫৲ টাকা মূল্যের ১৫০০ হইতে ২০০০ জোড়া পাড়বিশিষ্ট কাপড় প্রস্তুত হয়। একপ্রকার অপেক্ষাকৃত মোটা মসলিন্ এই স্থানে পাওয়া যায়। শিয়ালকোটে "দোসুতি," "তেসুতি," "চৌসুতি" কাপড় এখনও প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হয়। পঞ্জাবে এখনও কলের বেশী চলন হয় নাই।

রাজপুতানা—

এখানেও প্রায় সর্ব্বত্র কাপড় প্রস্তুত হয় ; জয়পুর এবং যোধপুরের চিত্রিত মসলিন্ এবং কাপড় হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্র এখনও গৃহিত হয়।

উত্তর পশ্চিম যুক্ত প্রদেশ এবং অযোধ্যা—

ভিন্ন ভিন্ন রঙের মসলিন্ ও মখমলের উপর সোণার কাজ করার জন্য কাশী চিরপ্রসিদ্ধ। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে কাপড় তত বেশী প্রস্তুত হয় না কিন্তু অনেক স্থানে কাপড়ে রঙ করা হয়। লক্ষ্নৌ জেলার কাপড় বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধ। এক সময়ে এখানে ১৪৭৫ খান তাঁত ছিল এবং তাহাতে প্রতি বৎসর ৮৯,১৫০ জোড়া কাপড় প্রস্তুত হইত। প্রত্যেক তাঁতে সম্বৎসরে প্রায় ২৫০ টাকার কাপড় উৎপন্ন হইত। কিন্তু দিন দিন এ ব্যবসায় অত্যন্ত কমিয়া যাইতেছে। লক্ষ্নৌএর ছিটের যদিও মেন্‌চেষ্টারের ছিটের অপেক্ষা দাম বেশী, তথাপি ভারতের সর্ব্বত্রই ইহার কাটতি যথেষ্ট।

বঙ্গদেশ—

এখানে এখনও তন্তুবায় কুল সজীব আছে। ঢাকা, চন্দননগর (ফরাশডাঙ্গা), শান্তিপুর, সিমলা (কলিকাতা), পাবনা, নোয়াখালী প্রভৃতি স্থানে এখনও নিত্য-ব্যবহার্য্যোপযোগী হইতে বহুমূল্য বস্ত্র প্রস্তুত হয়। সচরাচর ব্যবহার করিতে কম দামের কাপড় পাবনায় সর্ব্বাপেক্ষা ভাল পাওয়া যায়। এখানে ২।০ হইতে ১৬৲ টাকা পর্য্যন্ত জোড়া কাপড় পাওয়া যায়। এখানের কাপড় অপেক্ষাকৃত মোটা সূতায় প্রস্তুত হয়। বেশী দামের কাপড় কিনিলে ঢাকা কি শান্তিপুরই ভাল। এতদ্ভিন্ন নোয়াখালী, কুমিল্লা, পাবনা, কুষ্টিয়া এবং অন্যান্য স্থানে বেশ ভাল কোটের কাপড় এবং বিছানার চাদর ; বগুরে ভাল সতরঞ্চ এবং তাঁবুর কাপড় পাওয়া যায়। মধ্যে শুনিয়াছিলাম যে পাবনাতে আমেরিকা হইতে একটী হাতে চালান কলের তাঁত (hand-loom) আনান হইবে কিন্তু ইহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে কি না এখনও জানিতে পারি নাই। আমাদের বঙ্গদেশে এখনও যেরূপ প্রচুর পরিমাণে কাপড় প্রস্তুত হয় তাহাতে অন্ততঃপক্ষে আমেরিকা হইতে কয়েকটী hand loom আনাইলে বড় ভাল হয়। ইহার দামও তত বেশী নয় ; ৫০০৲ টাকা হইতে ১০০০৲ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়। এখানে অনেক ধনবান্ আছেন, তাঁহারা একটু মনোযোগ করিলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়। তাহা হইলে মেন্‌চেষ্টারের বস্ত্রে বাজার পরিপূর্ণ থাকিবে না। দেশের টাকা দেশেই থাকিবে। কিন্তু কেহ কি এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিবেন !

বাগানের মাসিক কার্য্য

শ্রাবণ মাস

সব্জীবাগান।—এই সময় শাকাদি সীম, ঝিঙ্গে, লঙ্কা, শসা, লাউ, বিলাতী ও দেশী কুমড়া, পুঁই, বরবটী, বেগুন, শাঁকালু, টেঁপারি প্রভৃতি, পাটনাই ফুলকপি, পাটনাই শালগম ইত্যাদি দেশী সব্জী ক্রমান্বয়ে বপন করিতে হইবে।

পালম শাক ও টমাটোর জলদি ফসল করিতে গেলে এই সময় বীজ বপন করিতে হইবে। বিলাতী সব্জী বীজ—বাঁধাকপি, ফুলকপি প্রভৃতি বপনের সময় হয় নাই।

এ বৎসর বর্ষা জলদি তথাপি মোকাই (ছোট) এবং দে-ধান চাষের এখনও সময় যায় নাই।

ফুল বাগিচা।—দোপাটী, ক্লিটোরিয়া (অপরাজিতা), এমারন্থাস, কক্সকোম, আইপোমিয়া, ধুতুরা, রাধাপদ্ম, (Sun-flower) মার্টিনিয়া, ক্যানা ইত্যাদি ফুল বীজ লাগাইবার সময় এখনও গত হয় নাই। ক্যানার ঝাড় এই সময় পাত্‌লা করিয়া তাহা হইতে দুই একটী গাছ লইয়া অন্যত্র রোপণ করা উচিত।

গোলাপ, জবা, বেল, যুঁই প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষের কলম অর্থাৎ ডাল, কাটিং করিয়া পুতিয়া চারা তৈয়ারি করিবার এই উপযুক্ত সময়।

জবা, চাঁপা, চামেলি, যুঁই, বেল প্রভৃতি ফুলগাছ এই সময় বসাইতে হয়।

ক্যানা, লিলি প্রভৃতির পট বদ্‌লাইবার সময় বর্ষারম্ভ, কেহ কেহ সময় না পাইলে আষাঢ় শ্রাবণ পর্য্যন্ত এই কার্য্য শেষ করেন। মূলজ ফুল গাছের মূল বর্ষায় বসাইয়া তাহাদের বংশবৃদ্ধি করিয়া লইতে হয়। কতকগুলির মূল বর্ষাকালে গামলায় তুলিয়া না রাখিলে জল বসিয়া পচিয়া যায়।

কলিয়স, ক্রোটন, আমারান্থাস্‌, একালিফা প্রভৃতির ডাল কাটিয়া পুতিয়া এই সময় বাড়াইতে পারা যায়।

ফলের বাগান।—আম, লিচু, পেয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছ এখন বসাইতে পারা যায়। বর্ষান্তে বসাইলে চলে, কিন্তু সে সময় জল দিবার ভালরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয়। এখন ঘন ঘন বৃষ্টিপাত হওয়ায় কিছু খরচ বাঁচিয়া যায়। কিন্তু সতর্ক হওয়া উচিত, যেন গোড়ায় জল বসিয়া মারা না যায়। আম, লিচু, কুল, পীচ ও নানাপ্রকার লেবু গাছের গুলকলম করিতে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে। লেবু প্রভৃতি গাছের ডাল মাটি চাপা দিয়া এখনও কলম করা যাইতে পারে। এইরূপ প্রথায় কলম করাকে লেয়ারিং (layering) করা বলে।

আনারসের গাছের কেঁকড়িগুলি ভাঙ্গিয়া বসাইয়া আনারসের আবাদ বাড়াইবার এই উপযুক্ত সময়।

আম, লিচু, পীচ, লেবু, গোলাপজাম প্রভৃতি ফল গাছের বীজ হইতে এই সময় চারা তৈরারি করিতে হয়। পেঁপের বীজ এই সময় বপন করিতে হয়।

ভরা বর্ষাতেই পেঁপে বীজ হইতে চারা প্রস্তুত করা যায়। কিন্তু চারা তৈয়ারি করিয়া ভাদ্রমাসের আগেই চারা নাড়িয়া না পুতিলে ভাদ্রের রৌদ্রে চারা বাঁচান দায় এবং জমিতে ঘাস পাতা পচানি হেতু জমি অম্লাক্ত হওয়ায় তখন চারার অনিষ্ট হয়। চারাগুলি তিন চারি পাতা হইলে যখন বৃষ্টি হইতে থাকে তখন নাড়িয়া বসান উচিত।

যাঁহারা বেড়ার বীজের দ্বারা বেড়া প্রস্তুত করিবেন তাঁহারা এই বেলা সচেষ্ট হউন। এই বেলা বাগানের ধারে বেড়ার বীজ বপন করিলে বর্ষার মধ্যেই গাছগুলি দস্তুরমত গজাইতে পারে।

শস্যক্ষেত্র।—কৃষকের এখন বড় মর্স্থম। বিশেষতঃ বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের কতক স্থানের কৃষকেরা এখন আমন ধান্যের আবাদ লইয়া বড় ব্যস্ত। পূর্ব্ববঙ্গে অনেক স্থানে পাট কাটা হইয়া গিয়াছে। বাঙলার দক্ষিণাংশে পাট নাবি হয়। ধান্য রোপণ শ্রাবণের শেষে শেষ হইয়া যাইবে। আষাঢ় মাসে বীজধান্য বপনের উপযুক্ত সময়।

আম, নারিকেল, লিচু প্রভৃতি গাছের গোড়া খুঁড়িয়া তাহাতে বৃষ্টির জল খাওয়াইবার এই সময়। কাঁঠালের গোড়া খুঁড়িয়া দিবার এখন একটু বিলম্ব আছে। ফল শেষ হইয়া গেলে তবে গাছের গোড়ার মাটি বিচালিত করা কর্ত্তব্য। সুপারী গাছের গোড়ায় এই সময় গোবর মাটি দিতে হয়। এই সময় ঐ সকল গাছের গোড়ায় সামান্য পরিমাণ কাঁচা গোময় দিলে বিশেষ উপকার পাইবার সম্ভাবনা। ফলের গাছে হাড়ের গুঁড়া এই সময় দেওয়া যাইতে পারে।

আয়কর বৃক্ষ যথা, শিশু, সেগুন, মেহগ্নি, খদির, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, কাঞ্চন প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ এই সময় বপন করা উচিত।

ক্ষেতে জল না জমে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা ও ক্ষেতের পয়নালা ঠিক করিয়া রাখা এই সময় বিশেষ আবশ্যক।

যদি দেখিতে পাও, কোন লতা বা গুল্মের গোড়ায় অনবরত অত্যধিক জল বসিয়া ক্ষতি হইতেছে, তাহা হইলে তাহার আইল ভাঙ্গিয়া দিয়া এরূপে নালা কাটাইয়া দিবে যেন শীঘ্র গাছের গোড়া হইতে জল সরিয়া যায়। কলার তেউড় এ মাসে পুঁতিলেও হইতে পারে। বেগুন, আদা ও হলুদের জমি পরিষ্কার করিয়া গোড়ায় মাটি ধরাইয়া দিবে। আখের গাছের কতকগুলি পাতা ভাঙ্গিয়া আর কতকগুলি তাহার গায়ে জড়াইয়া দিবে। গাছগুলি যখন বেশ বড় হইয়া উঠিবে তখন নিকটস্থ চারি গাছা আখ একত্রে বাঁধিয়া দিবে, নহিলে বাতাসে গাছ হেলিয়া পড়িবে কিম্বা ভাঙ্গিয়া যাইবে। যে স্থানে সর্ব্বদা রৌদ্র পায়, সেই স্থানের উত্তমরূপে চাষ দেওয়া জমিতে সারি করিয়া লঙ্কার চারা পুতিবে। এই মাসের প্রথম পনর দিনের মধ্যে লঙ্কা পুতিতেই হইবে, নচেৎ গাছ ও ফল ভাল হয় না। রৌদ্র না পাইলে লঙ্কার ঝাল হয় না। যে দোয়াঁস মাটিতে বালির অংশ কিছু বেশী আছে, সেইরূপ জমিতে এক কি দেড় হাত অন্তর দাঁড়া বাঁধিয়া ঐ দাঁড়ার উপর আধ হাত অন্তর দুইটী করিয়া শাঁকআলুর বীজ পুতিবে। শাঁকআলুর ক্ষেত সর্ব্বদা আলা ও পরিষ্কার রাখিবে। এই মাসের শেষ কিম্বা ভাদ্রের প্রথমে আউশ ধান কাটে।

বাগানের বেড়া—আষাঢ় মাসে বৃষ্টি আরম্ভ হইলেই ক্ষেতের বা বাগানের চারিদিকে বেড়ার বীজ বপন করিয়া বেড়া প্রস্তুত করিয়া লওয়া আবশ্যক। লোকে বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্র ঘিরিয়া রাখিতে পারে না। ক্ষেতে যখন ফসল থাকে তখন সকল চাষীই গরু বাছুর আটক করিতে চেষ্টা করে এবং গৃহস্থ গো মহিষাদি চরিতে ছাড়িয়া দিলে তাহাদের বিরুদ্ধে ঘোর আপত্য করে। কিন্তু সকলকেই বাগান ঘিরিতে হইবে নতুবা গো মহিষ ছাগলের উৎপাত হইতে রক্ষা হইবার কোন উপায়ান্তর নাই। চিরস্থায়ী বেড়ার জন্য অনেকে ডুরোণ্টা বা মেহদী, ত্রিপত্রা বা চিতার বেড়া দেন। ডাল পুতিয়া হউক বা বীজ ছড়াইয়া হউক বেড়া প্রস্তুত করিতে হইলে বর্ষাকালই উপযুক্ত সময়। জ্যৈষ্ঠ হইতে এই বিষয়ে যত্নবান হইতে হয় শ্রাবণ পর্য্যন্ত চেষ্টায় বিরত হইতে নাই। পচা ভাদ্রে বা নিতান্ত শীত কিম্বা গ্রীষ্মে বেড়া প্রস্তুত করা চলে না।



মালদহের ইক্ষুক্ষেত্রের বীজ হইতে উৎপন্ন ১ বৎসরের পুরাতন আখের ঝাড়
ইহা হইতে টুকরা কাটিয়া রোপণের জন্য বীজ ইক্ষু তৈয়ার করা হয়



প্রথম বৎসরে বীজ হইতে উৎপন্ন আখের ঝাড়। দ্বিতীয় বৎসরে ইহা হইতে কটিং করিয়া বীজ ইক্ষু উৎপন্ন হইবে।



প্রথম বৎসরে বীজ ইক্ষু হইতে উৎপন্ন আখের ঝাড়। দ্বিতীয় বৎসরে ইহা হইতে কটিং করিয়া বীজ ইক্ষু উৎপন্ন হইবে।



কৃষক

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৪শ খণ্ড। | শ্রাবণ, ১৩২০ সাল। | ৪র্থ সংখ্যা।

পাট।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পাটের উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণ—নানা কারণ বশতঃ বিজ্ঞানোপদেশ সমিতি শেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে ভাল পাট উৎপন্ন করিতে কৃষকগণকে প্রলুব্ধ করা ব্যতীত পাটের অবস্থার উন্নতি বিধানের আর অন্য কোন উপায় নাই। এক্ষণে কি প্রকারে ভাল পাট উৎপন্ন করা যায় তাহার আলোচনা আরম্ভ হইল। তাঁহারা প্রথমে কলিকাতার পাটের গাঁট ব্যবসায়ীগণকে (Baled Jute Association ভাল পাট কি, ও পাটের কি কি দোষ বর্ত্তমান আছে তাহা স্থির করিতে আদেশ দেন। উক্ত ব্যবসায়ী সম্প্রদায় নানা অবান্তর কথা আনিয়া ফেলিলেন, এবং সংশয় পুরণের কিছু ফল লাভ হইল না। তবে পাটে জল দিয়া পাটের ভার বৃদ্ধি করা পাটের অনিষ্টের একটী বিশেষ কারণ, এই বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত হইয়াছিলেন। কিন্তু ফড়িয়াগণকে যাহারা এই প্রতারণার জন্য দায়ী তাহাদিগের এই কার্য্যে বাধা প্রদান করিতে হইলে তাহাদিগকে কঠিন আইন পাশে বদ্ধ করা উচিত; ইহা ব্যতীত অন্য কোন উপায় সম্ভব পর নহে বলিয়া, মিষ্টার ম্যাডক্স বিশেষ তদন্তের পর উক্ত আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করাইবার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট পাঠাইলেন। গভর্ণমেণ্ট ভাবিয়া দেখিলেন, যে ঐ প্রকার কুঠোর আইনে রুসিয়ায় ও বোম্বাইতে কোন ফল লাভ হয় নাই, সুতরাং উক্ত আইন আর পাশ হইল না। কিন্তু পাটের উন্নতি কল্পে যদিও বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব হইতে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। উল্লিখিত আন্দোলনের জন্য আরও যত্নের সহিত সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই বর্দ্ধমান, রঙ্গপুর, ফরিদপুর, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি স্থানে গভর্ণমেণ্টের

কৃষিকার্য্যে উন্নতি বিধানের জন্য যে পরীক্ষাক্ষেত্র স্থাপন করা হইয়াছিল, তথায় রীতিমত পাট চাষ করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত বিষয়ের পরীক্ষা চলিতে লাগিল বর্দ্ধমান পরীক্ষাগারে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি ভাল পাট জন্মাইবার বিশেষ সাহায্যকারী বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল ঃ—

১। জমীতে বেশী দিন গাছ থাকিলে, পাট ওজনে বেশী হইবার সম্ভাবনা আছে সত্য, কিন্তু ইহার ফলে পাট শক্ত হয় ও রঙ লাল হইয়া যায়। সেই জন্য ফল পুষ্ট হইলেই গাছ কাটা উচিত।

২। চারি ইঞ্চির বেশী ফাঁক ফাঁক পাটের চারাগুলি যেন না থাকে। কারণ বেশী জায়গা পাইলে, গাছগুলি শাখা বিস্তার করিয়া থাকে। ফলে গাছ ঊর্দ্ধে ছোট হয়। ছোট গাছ হইতে কম পাট উৎপন্ন হয়। ডালপালা হইলে আঁস বাহির করিবার অসুবিধা হয়।

৩। গোময় সার ও রেড়ীর খৈল পাটের পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। যে জমীতে নদীর পলি মাটি সঞ্চিত হয় না, সে স্থানে ৭০/০ মণ গোময় সার বা ৭৷৷০ মণ রেড়ীর খৈল দিলে তিন বিঘা জমীতে ২০ কিম্বা ২৫ মণ পাট হইতে পারে।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রাদেশিক কৃষি বিভাগের উদ্যোগে উত্তম পাটের বীজ সংগ্রহার্থে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ডিপো খুলিয়া বীজ সংগ্রহ হইত। শুধু কৃষকদের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য ঐরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশের কৃষকেরা অশিক্ষিত। হিতাহিত বিবেচনা বড় তাহাদের নাই। শুধু পাট কেন, অন্যান্য সকল বিষয়েই বীজ রক্ষা কার্য্যে তাহাদের ঔদাস্য প্রায়ই দেখা যায়। স্বভাবতঃ যে ফলটী ছোট, যে ফলটী মন্দ যে ফলটী বিক্রয় করিলে অল্প মূল্য পাইবে, সেই ফলটিই বীজের জন্য তাহারা রাখিয়া থাকে। তাহারা জানেনা যে রুগ্ন, অপরিপক্ক, মন্দ ফলে, ফলের অনুযায়ী মন্দ বীজই পাওয়া যায়। আর সেই বীজ হইতে যে সমস্ত গাছ উৎপন্ন হয়, তাহা কখনই ভাল হইতে পারে না। শুধু মৃত্তিকার উর্ব্বরতাশক্তি বৃক্ষের জীবন ধারণে সহায়তা করে না। উত্তম বীজ হইতে উৎপন্ন সবলকায় বৃক্ষ অপেক্ষাকৃত রুগ্ন বৃক্ষাপেক্ষা অধিক পরিমাণে আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া অধিক শক্তিশালী হয়। উত্তম বীজ সংগ্রহ করিতে হইলে সবল সুস্থ গাছের সুপুষ্ট ফল নির্ব্বাচন করিতে হইবে। আমাদের দেশের কৃষকেরা ক্ষেত্রে যে গাছগুলি রুগ্ন, যে গুলি দুর্ব্বল নিস্তেজ সেই গাছ গুলিই বীজের জন্য ফেলিয়া রাখে। ফলে এই হয় যে ভাল বীজ অভাবে মন্দ গাছ জন্মায়। ভাল গাছ ক্রমে লোপ পায়। সেইজন্য সরকার গভর্ণমেণ্ট মনোযোগী হইয়া বীজ রক্ষা করিবার জন্য অনেকগুলি ডিপো খুলিয়াছিলেন। "১৯০৫ সালে গৌরীপুর, রাজবাড়ী, জলপাইগুড়ি এবং রঙ্গপুর হইতে ২৮/০ মণ উত্তম বীজ সংগৃহীত হইয়াছিল। পর বৎসর পূর্ণিয়া, বহরমপুর,

কৃষ্ণনগর এবং চুঁচড়া হইতে ২৭০/০ মণ এবং তৎপর বৎসর পূর্ণিয়া এবং বহরমপুর হইতে ২৩০/০ মণ বীজ সংগৃহীত হইয়াছিল। ঐ সমস্ত বীজ রায়তেরা অতি আগ্রহের সহিত কিনিয়াছিল। যে অবধি চুঁচড়ায় কৃষিক্ষেত্র খোলা হইয়াছে, সে অবধি আর স্বতন্ত্র ভাবে বীজ সংগ্রহ আবশ্যক করে নাই।"

আমরা বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের উক্ত রিপোর্ট হইতে অনেক বিষয় শিক্ষা লাভ করিতে পারি। এক্ষণে বেশ পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় যে পাটের অবস্থা হীন হইয়া আসিতেছে। আর তাহার একমাত্র প্রতিকার সমস্ত দিক বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করা ব্যতীত অন্য কিছুই নাই।

কিরূপে পাট গাছ করিতে হয়, আর কেমন করিয়াই বা সেই গাছ পচাইতে হয় এক্ষণে আমরা সেই বিষয়ের আলোচনা করিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি ও গভর্ণমেণ্টের রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, গাছ গুলিতে ফল পুষ্ট হইলে গাছ কাটা উচিত। ফল বেশী পাকিতে দেওয়া উচিত নহে, কারণ তাহা হইলে পাট শক্ত হয় এবং ধূসর বর্ণ হইয়া থাকে। গাছের ছালের সহিত পাট থাকে। ছাল হইতে যে আঁস বাহির করা হয়, তাহাই পাট! প্রথমাবস্থায় ঐ ছালে এমন এক আটা থাকে যাহা হইতে না পচাইয়া আঁস বাহির করা যায় না। সুতরাং, ঐ আটা দূর করিবার জন্য গাছগুলি পচাইতে হয়। গাছগুলি কাটিবার পর (যদি উচ্চ জাতীয় পাট হয়) বাণ্ডিল করিয়া সেই খানে সেইগুলি দুই তিন দিন ফেলিয়া রাখা আবশ্যক, কারণ গাছের পাতাও একটী উত্তম সার। গাছ শুকাইলে পাতা ঝরিয়া মাটীর উপর পড়ে, এবং তাহা সারের কার্য্য করে। বাণ্ডিলগুলি ছোট ছোট হইলে গাছগুলি শীঘ্র পচিয়া থাকে। পাট পচাইবার দোষে পাটের রং কালো হয়। সুতরাং কয়েকটী বিষয়ে বিশেষ লক্ষ রাখা আবশ্যক।

যেমন উত্তম বীজে উত্তম জাতীয় পাট উৎপন্ন হয়, সেই রূপ উত্তম জলে পাট পচান হইয়া থাকে। পরীক্ষা দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় যে একই পাট তাহাদিগের দুই প্রকার জলে পচিবার ফলে দুই রকম হইয়াছে। গভীর বদ্ধ, পরিষ্কার, স্বচ্ছজলে পাট পচাইলে পাটের রঙ সাদা হইয়া থাকে। আর স্রোতের জলে পচাইলে রঙ কালো হইয়া থাকে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, স্রোতের জলের সহিত ধোয়াট মাটী থাকে, সেই মাটি পাটের আঁসে প্রবেশ করিয়া আর পাটকেও মাটির রঙ করিয়া ফেলে। আর একটি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। আমাদের কৃষীরা পাট গাছগুলিকে জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিবার জন্য, বড় মাটির চাপড়া কাটিয়া তাহার ভারে গাছগুলিকে ডুবাইয়া রাখে। এই প্রথাটি একেবারে পরিহার্য্য। কারণ ঐ মাটি গলিয়া পাটের আঁসের মধ্যে প্রবেশ করে, ফলে রঙ কালো হয়। তদনুরূপ আর একটী বিষয়েও সবিশেষ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। জল যদি বেশী গভীর না হয়, এমন উপায় অবলম্বন করিতে

হইবে যে, গাছগুলি পচিবার সময় যেন সেই জলাশয়ের তলস্থ মাটির সংস্পর্শে না আসে, কারণ মাটির সহিত মিশিলে মাটির রঙ হওয়াই স্বাভাবিক। যদি ভারি কাঠ চাপাইয়া গাছগুলিকে ডুবাইয়া রাখা হয়, আর যদি বাঁশের ডগের মত কিছু করিয়া, বা মোটা গাছের গোড়ে তলায় রাখিয়া, তাহার উপর পাট পচান হয়, তাহা হইলে সব দিক রক্ষা হয়। ন্যূন সংখ্যায় ১২ দিন, ঊর্দ্ধ সংখ্যায় ২৫ দিনে সচরাচর পাট পচিয়া থাকে। তবে গাছগুলি যদি বেশী দিনের হয়, পচিতেও বেশী সময় লাগে। কিন্তু অন্ততঃ দশ দিনের মধ্যে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক যে গাছগুলি কতদূর পচিল। মধ্যে মধ্যে ঐরূপ পরীক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ নিয়ম মত না পচিলে আঁস বাহির করা যায় না। পক্ষান্তরে আবার যদি গাছগুলি বেশী পচান হয়, তাহা হইলে পাট কম মজবুত হয়। বদ্ধ জল অপেক্ষা স্রোতের জলে পাট পচিতে অধিক সময় লাগে। স্রোতের জলের আর একটী বিশেষ দোষ এই যে একটী বাণ্ডিলের সকল স্থানের গাছ সমান ভাবে পচেনা। কোন স্থানে অতিরিক্ত পচিয়া যায়, আবার কোন স্থানে মোটেই পচেনা। মধ্যস্থানের গাছগুলি জল অধিক লাগিবার ফলে অধিক পচিয়া যায়। আর উপরের গুলি অনেক দিন কাঁচা থাকে। সুতরাং বাণ্ডিল খুলিয়া, পচা গাছগুলি বাহির করিয়া, অপরগুলি পুনরায় পচিতে দেওয়া আবশ্যক। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে স্রোতের জলে পাট পচাইবার ফলে প্রথমতঃ কর্দ্দমময় জল পাটের উপর আধিপত্য বিস্তার করে ও পাটের উজ্জ্বলতা বিনষ্ট করিয়া তাহাকে মলিন করিয়া ফেলে।

দ্বিতীয়তঃ কৃষককে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হয়। কারণ এক সময়ের মধ্যে একই বাণ্ডিলের ভিতরে গাছ সমান ভাবে পচেনা। সুতরাং পচাগুলি বাহির করিয়া, অবশিষ্টগুলি আবার পচিতে দেওয়া হয়।

তৃতীয়তঃ বদ্ধ জল অপেক্ষা স্রোতের জলে পাট পচিতে অধিক সময় যায়। অন্যদিকে আবার বদ্ধ জলে পাট পচান সত্ত্বেও কতকগুলি অবশ্য পরিহার্য্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। সেইগুলি এই :—

১। গাছের পাতাগুলি যতদূর সম্ভব, অগ্রে ঝরাইয়া, পরে গাছগুলিকে জলে ফেলা উচিত।

২। মাটীর চাপড়া কাটিয়া উপরে ভার না দিয়া, মোটা গাছের গোড়া (আম কাঁঠাল বা এই প্রকার কোন গাছের গোড়া), অথবা অন্য কোন ভারি বস্তুর সাহায্যে গাছগুলিকে ডুবাইয়া রাখা উচিত।

৩। গাছগুলি যেন তলস্পর্শ না করে। নিম্নে বাঁশের মাচার দ্বারা বা অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিয়া সেইগুলি পচান উচিত।

সার প্রয়োগে আলু চাষ

এগ্রিকালচারাল পটাস সিণ্ডিকেট হইতে

মিঃ বি, সি, দত্ত লিখিত

যে সকল অত্যন্ত লাভজনক শস্য উৎপন্ন হয় আলু তাহাদের মধ্যে একটী। সমতল ভূমি ও বিনা জল সেচনে আলুচাষ হয় না, সেইজন্য আলু চাষোপযোগী জমি অধিক পাওয়া যায় না। এই কারণে আলু চাষের জমির পরিমাণ কখনও বৃদ্ধি হইতে পারে না ; কিন্তু আলুর অভাব অত্যধিক, একারণে আলুর মূল্যও সর্ব্বদা অধিক হইতে অধিকতর হইতেছে। অতএব আলু অধিক মাত্রায় উৎপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে যাহারা আলু চাষ করে তাহাদেরই লাভ হয়, এবং যথাযোগ্য সার প্রয়োগে কম জমিতে অধিক মাত্রায় আলু ফলান স্বল্প আয়াসেও হইতে পারে।

কৃষকেরা সাধারণতঃ যে সার ব্যবহার করিয়া থাকে তাহা এই—গোবর, খৈল এবং হয়ত কখনও কখনও সবুজ সার। কার্য্যতঃ জমি যেরূপই হউক না কেন এইরূপ ভাবে সার প্রয়োগ করিলে জমিতে অধিক মাত্রায় নাইট্রোজেন সার প্রদান করা হয়। এক একর অর্থাৎ ৩ বিঘা জমি হইতে আলু ফসল কি পরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদ খাদ্য আকর্ষণ করিয়া লয় জার্ম্মানির বারণবার্গ নামক কৃষিক্ষেত্রে তাহার পরীক্ষা অনেকবার করা হইয়াছিল। এই সকল পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে যে, ১০০ মণ আলুর কেবল মূল (Tabers) মৃত্তিকা হইতে ৯২ পাউণ্ড পটাশ, ১৬ পাউণ্ড ফস্ফোরিক এসিড্ এবং ৫৮ পাউণ্ড নাইট্রোজেন আকর্ষণ করিয়া লয়।

এই সকল অঙ্ক হইতে উপলব্ধি হয় যে, আলু উৎপাদন করিতে হইলে পটাশ কত প্রধান এবং কতদূর আবশ্যকীয় কার্য্য সাধন করে। আলুর উৎপত্তি ও পরিবর্দ্ধনের জন্য অধিক পরিমাণে পটাশ আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু আবশ্যকীয় পটাশ গ্রহণ সম্বন্ধে আলুগাছের বিশেষ অসুবিধাও আছে ; আলু গাছ যদৃচ্ছা পটাশ গ্রহণে সক্ষম হয় না। অতএব সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, উৎকৃষ্ট ফসল উৎপাদন করিতে হইলে গ্রহণোপযোগী পটাশ যথেষ্ট পরিমাণে জমিতে প্রদান করিতে হয়।

কার্য্যতঃ পরীক্ষার দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইয়াছে যে, সর্ব্বোত্তম শস্য পাইতে হইলে হিসাবমত "সম্পূর্ণ সার" (Complete manure) প্রয়োগ করা বিধেয়। নিম্নে পরীক্ষার যে সকল ফল প্রদর্শিত হইল তাহাতে প্রতীয়মান হইবে যে, আলুর পক্ষে একমাত্র খৈল সর্ব্বোত্তম সার নয়, কারণ প্রত্যেক পরীক্ষাটীতেই নাইট্রোজেনের সহিত ফস্ফোরিক এসিড্ এবং পটাশ মিশ্রিত সার প্রয়োগে একর প্রতি আলু উৎপন্ন ফসল অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে।

নিম্নে যে সকল পরীক্ষার ফল প্রদত্ত হইল, বঙ্গ দেশীয় কৃষকেরা সে সকল পরীক্ষাই করিয়াছে এবং আমরাও তাহাদের নিকট যে ঋণী তাহা সর্ব্বসমীপে প্রকাশ করিবার এই উত্তম সুযোগ বিবেচনা করি। আলুতে সচরাচর ব্যবহৃত কেবল যবক্ষারজান জনিত সার সকল অধিক মাত্রায় প্রয়োগের পরিবর্ত্তে হিসাবমত "সম্পূর্ণসার" মিশ্রণ ব্যবহার করিলে কৃষকদিগের যে যথেষ্ট লাভ হয় তাহা সাধারণের বোধগম্য করাই ঐ সকল পরীক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য। সকল পরীক্ষাতেই একখণ্ডে খৈল এবং অপর একখণ্ডে কৃত্রিম সার প্রায় সম মূল্যেরই প্রয়োগ করা হইয়াছিল। অতএব উভয় খণ্ডের উৎপন্নের যাহা বিয়োগ ফল তাহার মূল্যই ঠিক লাভ, কেননা সারের মূল্য ব্যতীত উভয় খণ্ডের চাষের খরচ একই। আলুর মূল্য মণ প্রতি ৩৲ টাকা হিসাবে গণনা করিলেও, দুই একটী পরীক্ষায় উৎপন্ন আলুর আধিক্যের দামে একর প্রতি ২০০৲ টাকার অধিক লাভ হইয়াছে। এইরূপে যদি খৈল সার ব্যবহারে লাভ হয়, তাহা হইলে এই সকল পরীক্ষায় যে যে মাত্রায় নাইট্রোজেন, ফস্ফোরিক এসিড্ এবং পটাশ বিশিষ্ট "সম্পূর্ণ সার" ব্যবহৃত হইয়াছিল সেই সেই মাত্রায় "সম্পুর্ণ সার" প্রয়োগ করিলে আরও কত অধিক লাভ হইতে পারে!

এই সকল পরীক্ষায় আর একটী বিষয় সপ্রমাণিত হইয়াছে যে. খণ্ডে "সম্পূর্ণ সার" প্রয়োগ করা হইয়াছিল সেই খণ্ডের আলু গাছের মূল (Tubers), যে খণ্ডে কেবল খৈল প্রয়োগ করা হইয়াছিল সেই খণ্ডের মূল অপেক্ষা আকারে অধিক বৃহৎ এবং প্রকারেও উত্তম। এস্থলে বলা যাইতে পারে যে, যখন যেখানে আলু চাষে পটাশ সার প্রয়োগ করিয়া পরীক্ষা করা গিয়াছে, তখন সেই খানেই প্রত্যক্ষ হইয়াছে যে, যে খণ্ডে পটাশ ব্যবহৃত হইয়াছে সেই খণ্ডের আলুর মূল সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুতরাং এ ক্ষেত্রেও আমরা ইহা অগ্রেই প্রত্যাশা করিয়াছিলাম।

পরীক্ষার ক্রমিক সংখ্যা	১ম খণ্ড	২য় খণ্ড	অধিক উৎপন্নের মণ প্রতি ৩৲ টাকা হইতে সারের মূল্য বাদ দিয়া একর প্রতি লাভ
	একর প্রতি ২০ মণ রেড়ীর খৈল মূল্য ৬০৲ টাকা	একর প্রতি ৬ মণ রেড়ীর খৈল ১১২পাঃ মিউরিয়েট্ অব্ পটাশ ১৬৮পাঃ সলফেট্ অব এমোনিয়া ১৬০পাঃ সুপার ফস্ফেট্ মোট মূল্য ৫৭।০ টাকা	
	একর প্রতি উৎপন্ন মণ হিসাবে		টাকা
১	১২০	২১০	২৭২৸০
২	৭২	১৪৪	২১৮৸০
৩	১০৫	১৬৫	১৮২৸০
৪	৫৩	৯৩	১১২৸০
৫	১৩২	১৮৬	১৬৪৸০
৬	১৩৫	১৮০	১৩৭৸০

ঔদ্ভিদ সৌন্দর্য্য

(শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র বিশ্বাস লিখিত)

বাল্যকালে পুস্তক বিশেষ পাঠে জ্ঞাত হইয়াছিলাম যে কোন কোন কীট বায়ুসাগরে জন্মগ্রহণ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই জীবলীলা সম্বরণ করে। এই বিশ্ব জগৎ প্রমাণে মানবও তদ্রূপ। জ্ঞান সমুদ্রের বেলা ভূমিতে কেহ উপলখণ্ড সংগ্রহ করিয়াছেন কেহ বা দূর হইতে উত্তাল তরঙ্গ দর্শনেই স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন। স্বল্প বুদ্ধি ও জ্ঞান, স্বল্প জীবন, বিশাল সৃষ্টি রহস্য ভেদ করিতে সক্ষম নহে। আকাঙ্ক্ষাও মিটে না সুতরাং জ্ঞান চর্চ্চার যতটুকু তথ্য আবিষ্কার হইয়াছে তাহাতেই জগৎ স্রষ্টার সৃষ্টি বৈচিত্রে যে লুক্কায়িত সৌন্দর্য্য রাশি প্রকাশ হইয়াছে

তাহারই অংশ বিশেষ ঔদ্ভিদ সৌন্দর্য্য। শস্য শ্যামলা বৃক্ষাদি পরিশোভিত ধরিত্রীর বক্ষে প্রত্যেক পদক্ষেপে সে সৌন্দর্য্য আমাদের দৃষ্টি পথে পতিত হয়। কিন্তু আমাদের চিন্তাস্রোত যে নিরবচ্ছিন্ন বিষয়াসক্ত আমাদের সে সৌন্দর্য্য দেখিবার শক্তি নাই, শক্তি থাকিলেও ইচ্ছা নাই এবং ইচ্ছা থাকিলেও উপভোগ করিবার সামর্থ নাই। সুতরাং সম্পাদক মহাশয়! আমার প্রবন্ধ লিখিবার ঔৎসুক্য এবং আপনার "কৃষক" কলেবরের পুষ্টি সাধন ভিন্ন আমাদিগের অন্য আশা করা বৃথা। প্রধানতঃ আমাদের বাঙ্গালী জীবনে ইহাই থাকে। এক্ষণে পাঠকদিগের অপেক্ষা না রাখিয়া আপনার প্রীত্যর্থে লেখনী "তাঁহার গুণানুকথনে" যৎসামান্য নিযুক্ত করিলাম।

প্রত্যেক পদ বিক্ষেপে, দুর্ব্বা হইতে বনস্পতি পর্য্যন্ত আমাদের নয়ন গোচর হয়, কিন্তু যে সমস্ত লতা, গুল্ম, বৃক্ষ অতি নিষ্প্রোয়জনীয় ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া সচরাচর জ্ঞান করিয়া থাকি, তাহারা যে সৃষ্টিকর্ত্তার অদ্ভুত রচনা [illegible] ও সৌন্দর্য্য লুক্কায়িত রাখিয়াছে সে সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা নাই। এই লুক্কায়িত সৌন্দর্য্যের সামান্য পরিচয় দেওয়া এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

পত্র—একটী সামান্য বৃক্ষের দিকে দৃষ্টি করিলে প্রথমেই তাহার পত্রের উপর দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। পত্রগুলি সচরাচর হরিদ্বর্ণ এবং বৃক্ষের বাহ্যিক সৌন্দর্য্য মাত্র সম্পাদন করা ইহাদিগের উদ্দেশ্য নহে। প্রথমতঃ আলোক ও বায়ু, পত্রের রঙ ও বৃক্ষের পুষ্টি সাধনের প্রধান উপাদান। পত্রের মসৃণ পৃষ্ঠ বায়ু ও আলোক গ্রহণ করে এবং সেগুলি শিরা দ্বারা বহন করিয়া বৃক্ষের পুষ্টি সাধন করে। এই কার্য্যের জন্য পত্রের শিরার উপর একখানি ত্বক দ্বারা আবৃত। এই ত্বক শিরাগুলিকে সম্পূর্ণ ভাবে রক্ষা করে এবং অসংখ্য ছিদ্র দ্বারা আলোক গ্রহণ করিয়া রঙের সজীবতা সম্পাদন করে। ত্বক গাত্রে এই ছিদ্র গুলির মধ্যে মধ্যে মানব অধরোষ্ঠের ন্যায় বিচিত্র ছিদ্র সমাবেশ। এই ছিদ্রগুলি বায়ুরাশি হইতে অঙ্গার বায়ু গ্রহণ পূর্ব্বক বৃক্ষের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। এই মুখ বিবরগুলিকে ইংরাজীতে Stomata বলিয়া থাকে। ইহার অদ্ভুত কার্য্যকারিতা ও বহির্জগত হইতে পুষ্টিকর পদার্থ গ্রহণের শক্তি সম্বন্ধে চিন্তা করিলে সৃষ্টিকর্ত্তার অযাচিত প্রেমের আভাস হৃদয়ঙ্গম হয় এবং তাঁহার রচনা কৌশল দেখিয়া তাঁহাকে "বিদ্যাময়োহয়ং পুরুষঃ" বলিয়াই যথার্থ জ্ঞান হয়। এ বিদ্যা পার্থিব বিদ্যা নহে ইহার কণামাত্র লাভেও মানব স্তম্ভিত হয়।

সচরাচর পত্রগুলি দুইভাগে বিভক্ত। ১ম-পত্রের মধ্য ভাগের শিরা হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরাগুলি সমান্তরাল ভাবে উর্দ্ধদিকে ঈষৎ বক্রাকারে প্রসারিত এবং অপর পক্ষে সেগুলি নিম্নদিকে একীভূত হইয়া "ডাঁটা" রূপে পরিণত হয়।

২য়—শিরা হইতে সূক্ষ্ম শিরাগুলি জালের সুতার ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত থাকে। পত্রগুলি আকার এবং প্রান্ত ভাগের "কাঁকরী কাটা" হিসাবে দুই ভাগে বিভক্ত। এই প্রবন্ধে তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ সম্ভব নহে। আমরা উদ্ভিদে যে সৌন্দর্য্য নিহিত আছে তাহারই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত। অপর এক প্রকার পত্রের আশ্চর্য্য স্বভাব উল্লেখ যোগ্য। ইহারা মাংসাশী এবং মক্ষিকা প্রভৃতি ইহাদের উপর উপবিষ্ট হইলে এই পত্রগুলি মুদ্রিত হয়। কতকগুলি পত্রের আকার ঢাক্‌নীযুক্ত ক্ষুদ্র পাত্রের ন্যায়। এই পত্রের মধ্যে এক প্রকার তরল পদার্থ সঞ্চিত থাকে। লোভ প্রযুক্ত মক্ষিকাদি ইহাতে আকৃষ্ট হইয়া জীবলীলা সম্বরণ করে। নানাবিধ ক্রোটন ও ফারণ্‌ পত্র রচনা কৌশলের অন্যতম অদ্ভুত প্রমাণ। ইহাদের বিচিত্র আকার ও বর্ণ, রেখা বিদ্যা ও চিত্র বিদ্যার সূক্ষ্মতম বিকাশ।

ফুল, ফল ও বীজ—ফুল ও পত্রের রূপান্তর মাত্র এবং ফুল ও ফল এ উভয়ের রচনা আবর্ত্তাকার (Spiral)। ফুল ও ফলের বাহ্যিক সৌন্দর্য্য এবং সুমিষ্ট গন্ধ ও স্বাদ সম্বন্ধে পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রোজন।

ফুল সাধারণতঃ চারি অংশে বিভক্ত। ১ম—বহিরাবরণ, ২য়—দল, ৩য়—পরাগ-কেশর এবং ৪র্থ—গর্ভ কেশর। ২য় অংশ ফুলের গন্ধ ও সৌন্দর্য্যের আধার। ৩য় অংশে রেণু বা পরাগ নিহিত থাকে। সাধারণতঃ ৩য় ও ৪র্থ অংশ এরূপ ভাবে স্থাপিত যে ৪র্থ অংশ ৩য় হইতে সহজে রেণু গ্রহণ করিতে পারে। কোন কোন স্থানে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে তখন পুং ও স্ত্রী পুষ্প ভেদে রেণু বায়ু দ্বারা কখন বা ভৃঙ্গ ও মক্ষিকাদি দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। আধুনিক উদ্ভিদ বিদ্যা কৃত্রিম উপায়ে রেণু পরিচালিত করিয়া নানা প্রকার ফুল ও ফল উৎপাদন করিতে সক্ষম হইয়াছে। যে পুষ্পে কেবল পরাগকেশর থাকে সেই গুলি পুংপুষ্প এবং যে গুলিতে কেবল গর্ভকেশর বিদ্যমান সেগুলি স্ত্রীপুষ্প। সাধারণতঃ একই পুষ্পে উভয়বিধ কেশর বিদ্যমান থাকে।

গর্ভকেশরের (pistil) মধ্যে বীজ কোষ (ovary)। এই বীজ কোষের মধ্যে বীজ (ovules) থাকে। রেণুগুলি যদিও সাধারণ চক্ষে বৃত্তাকার কিন্তু বাস্তবিক ইহাদের আকার নানা প্রকার এবং অণুবৎ। এই অণুবৎ রেণুর মধ্যে এক প্রকার আটার ন্যায় পদার্থ থাকে ইহাই ovulesএ লিপ্ত হইয়া ফল উৎপাদন করে। পাঠক ! একটী রেণুর পরিমাণ কত এবং তন্মধ্যে যে আটার ন্যায় পদার্থ থাকে তাহারই বা পরিমাণ কত ? এ আশ্চর্য্য রচনা আলোচনা করিলে প্রাণে যে মাদকতা আসিয়া উপস্থিত হয় তাহার সংজ্ঞা কি ?

উল্লিখিত পরাগ কেশরের মধ্যগত বীজকোষে এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুর ন্যায় বীজগুলি সজ্জিত। একটী সূক্ষ্ম ছিদ্র (রেণুনাল) বীজকোষে রেণু আনয়ন

করে। গর্ভকোষের বহিরাবরণ অনুসারে ফলের আকার ও নাম। সুপক্ক ফল হইতে বীজ এবং বীজ হইতে পুনরায় বৃক্ষে পরিণত হয়। ডুম্বুর জাতীয় ফলের কিঞ্চিৎ আভাস আবশ্যক। এই ফলগুলি প্রকৃত পক্ষে স্ত্রী ও পুংপুষ্প উভয় সম্মিলিত এবং ক্ষুদ্র কীটাণু দ্বারা ইহাদের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কীটাণুগুলি ফল বা হরিদ্বর্ণ আবরণের মধ্যে, বাহির হইতে গমনাগমন করে এবং কখন কখন উক্ত আবরণের মধ্যে কালগ্রাসে পতিত হয় এবং এইরূপ অবস্থায় মধীবর্ণ গুঁড়ার ন্যায় তন্মধ্যে থাকিয়া যায়। ডুম্বুর জাতীয় বৃক্ষে ফুল দেখিতে পাওয়া যায় না তাহার কারণ হরিদ্বর্ণ আবরণ (sac) মধ্যে ফল (যাহা আমরা বীজ বলিয়া থাকি) সৃষ্টি হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজগুলিই বাস্তবিক এক একটী ফল।

প্রকৃতি নির্ম্মাণ কৌশলে যে কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্য্য সন্নিবেশ করিয়াছেন তাহা নহে। তাঁহার রচনা ও নির্ম্মাণ কৌশলে গভীর শিল্প বিদ্যা, অঙ্ক ও রেখা বিদ্যা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিদ্যা নিহিত রহিয়াছে এবং এই বিদ্যাগুলি কার্য্যকরী জীবনী শক্তি বিশিষ্ট। কি এক অনির্ব্বচনীয় কৌশলে বাহ্য জগত হইতে উপ-যোগী পদার্থ আহরণ পূর্ব্বক উদ্ভিদ শরীরে বিস্তার ও পরিপোষণ সম্পন্ন হইতেছে তাহা অবিজ্ঞেয়। আমরা কেবল আহরণ, বিস্তার ও পরিপোষণ বহির্জগতে পুনঃ প্রক্ষেপকারী যন্ত্রগুলির পরিচয় পাইয়া আশ্চর্য্য হইতেছি। ক্ষুদ্র উদ্ভিদে যাহার মহিমা ও অবিজ্ঞেয় শক্তি বিরাজিত থাকিয়া হিত সাধন করিতেছে এই মনুষ্যে এবং এই বিশ্ব জগতে তাহাই বিরাজিত। তিনি সর্ব্বভূতের সুহৃদ আমরা তাঁহাকে প্রণাম করি।

খেজুর

(কর্ণেলের কৃষি সদস্য শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার উকীল লিখিত)

(৩)

খেজুর গাছ অন্ততঃ চতুর্দ্দিকে ১২ ফুট জমি রাখিয়া রোপণ করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ ৬০০ ফিট লম্বা ও ২৪০ ফিট প্রস্থ জমিতে ১২ ফিট অন্তরে গাছ পুতিলে অন্যূন এক সহস্র গাছ বসিতে পারে। আরব, মিশর, ও পারস্য উপকূলে তথাকার খেজুর চাষীগণ পুং পরাগ স্ত্রীপুষ্প ফুটিলে পর তদুপরি বাঁধিয়া রাখিয়া স্ত্রীপুষ্প ফলবতী করার (fertilize) চেষ্টা করিয়া থাকে। পারস্য উপকূলে বাস্‌রা, এল্‌, হাসা প্রভৃতি স্থান হইতে খালাস জাতীয় অত্যুত্তম ফলগুলি বহুল পরিমাণে বাক্সে বন্ধ করিয়া বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। মুর্দ্দাসাঙ এবং খানায়েজী জাতীয় খেজুরের খুর্‌মা শিরা প্রস্তুত হইয়া বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। খুর্‌মা সেহ্‌-রোজা নামক খুর্ম্মার প্রস্তুত খেজুর তৈয়ারির তৃতীয় দিবসে ভুক্ত হইয়া থাকে বলিয়া এইরূপ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। স্ত্রীপুষ্পগুলি গর্ভবতী (fertilization) হইলে গাছটিতে ৬ বা ৮ সপ্তাহ কাল জল সেচন রহিত করিবে। খুর্‌মাসেহ্‌রোজা কিশ্‌মিশ্‌ আদার কুঁচি, মোনক্কা, পেস্তাদি উপাদেয় সামগ্রী দিয়া প্রস্তুত হয় বলিয়া অত্যন্ত মুখরোচক এবং তেজস্কর। হালুই, দেগ্‌লেৎনুর আদি প্রথম শ্রেণীর অত্যুৎকৃষ্ট খেজুর আজ দুই বৎসর হইল মদ্‌বন্ধু মহম্মদ সুলতান আলম, হাইকোর্টের খ্যাতনামা সলিসিটার এবং মাননীয় মৌলভী আবদুল জোয়াদ্‌ উকীল সাহেব হজ্‌ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমাকে দিয়াছিলেন। ঐ খেজুর খাস মেদিনার সন্নিকটস্থ খালিফ্‌ মিনাব নামক ওয়েশিষের খেজুর গাছ। জাত গাছ, পাকা হালুই এবং দেগ্‌লেৎনুর জাতীয় ফল। ঐ খেজুর পাকা "রুতব্‌" অবস্থাপন্ন ফল। এরূপ ফল কখন বিগত ৩০ বৎসরের মধ্যে ভারতভূমের মধ্যে আস্বাদন করি নাই। ছেলে বেলায় পূজনীয় ৺ পিতাঠাকুর মহাশয়ের সহিত যখন একবার পেরিম উপকূলে আদালতী কার্য্যোপলক্ষে গিয়াছিলাম, তখনই ঐরূপ খেজুর ভোজন ভাগ্যে ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। চুশ্‌রা, মিনাব ও মেহেম্মরা নামক স্থান গুলির জলবায়ু এবং মাটী খেজুর চাষের বিশেষ উপযোগী। ঐরূপ স্থান ভারতে অনেক আছে। সেই সেই স্থানে খেজুর চাষ করিলে মন্দ হয় না। কিন্তু আমাদের দেশের বাঙ্গালি চাষীরা পাটের মোহিনী মন্ত্রে পড়িয়া সবই হারাইতেছে এবং বিহার বা ছোট নাগপুর প্রদেশের প্রজারা তাড়ির কুহকে পড়িয়া আত্মহারা হইয়াছে। প্রত্যেক গাছ ১২ ফিট ব্যবধানে রোপন করা বিধি। জল সেচনের জুলি সকল গাছের গোড়ায় থাকা চাই।

এখন রস হইতে গুড় প্রস্তুতের বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন। তাহা ক্রমশই পরে বিবৃত হইতেছে। খেজুর গাছ হইতে জিরান রস কাটিয়া টাট্‌কা রস উনানে জ্বাল দিয়া রস জমাট বাঁধিয়া আসিলে বীজ দিয়া নাগরীতে রক্ষা করিলে বসিয়া গিয়া উত্তম খেজুর গুড় হয়। ১৮৫০ সালে গুড় প্রস্তুত সম্বন্ধে রবিন্সন্ সাহেব এক প্রবন্ধ লিখেন। তখন খেজুর গুড় বার আনা মন দরে বিক্রীত হইত, এখন সেই গুড় ৫৷৷০ টাকা হইতে ৬৲ মণ দরে বিক্রীত হইয়া থাকে। এহেন লাভ জনক চাষ ও ব্যবসা মরিতে বসিয়াছে,—সে দিকে আমাদের কাহারও দৃষ্টি নাই এই আমাদের আক্ষেপ !!!

ইক্ষুরস এবং খেজুর রসের জলীয় অংশটি অগ্নির উত্তাপের দ্বারায় ঘন করিলে তাহা "শিরায়" (syrup) পরিণত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় চিনি এবং চিটে একসঙ্গে ঘন আকারে ঝুলিতে থাকে। এই ঘন রসে জ্বাল দিলে তাহা পোলা-রাইজ হইয়া দানায় পরিণত হয় এবং জমিয়া যায়। ড্রি বা অপর কোন অধ্যা-পকের চিনি প্রস্তুত সম্বন্ধীয় আধুনিক পুস্তক দেখিয়া জানা যাইবে যে কিরূপ উত্তাপ প্রয়োগ করিলে রস হইতে গুড় প্রস্তুত হইতে পারে। সে বিষয় পাঠক কোন বিশিষ্ট পুস্তকালয় হইতে পাঠ করিয়া লইবেন।

আমাদের দেশে গুড় প্রস্তুতের প্রণালী স্বতন্ত্র। অত্রদেশে সবই সেই মান্ধাতার আমলের প্রণালী প্রচলিত আছে। কোন রূপ বৈজ্ঞানিক নুতন নিয়ম আমাদের দেশে প্রচলন করা দুষ্কর। প্রথমতঃ চাষীগণ অজ্ঞ। দ্বিতীয়তঃ তাহার নিকট নুতন প্রণালী প্রচারিত করিলেও তাহারা তাহা সহজে অনুসরণ করিবে না। লম্বা বাণ কাটিয়া আট বা ১০টি তোলো হাঁড়ী উনানের উপর বসাইয়া টাট্‌কা রস জ্বাল দিয়া তাহা ঘন করা হয়। যখন তেতারা* অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন বীজ মারিয়া তাহা মাটীর নাগরীতে ঢালা হয়। তাহা অল্পক্ষণ বাতাসে থাকিলেই জমিয়া বসিয়া যায় এবং ব্যবসায়ের উপযোগী গুড় প্রস্তুত হয়। কোয়াসাযুক্ত রাত্রের রস ঘোলাটে হয় এবং তাহার প্রস্তুত গুড় অতি উৎকৃষ্ট না হইয়া কিছু অপকৃষ্টতা হেতু নিরেশ বলিয়া বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। খেজুর রস যত পরিমাণ ওজন জ্বালে চড়ান হয় তাহার দশমাংশ গুড় পাওয়া গিয়া থাকে। যশোর, খুলনা, মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা, নদীয়া, ডায়মণ্ডহার্বার প্রভৃতি জেলাও মহকুমার চাষীগণ বৃহৎ গুড় প্রস্তুতের আড়ঙ রাখিয়া থাকে।

ভারতের সর্ব্বদেশেই খেজুর গাছ আছে কিন্তু উপরোক্ত কয় জেলা ছাড়া কোন খানেই গুড় প্রস্তুত হয় না। বিহার অঞ্চলে বহু শত সহস্র খেজুর গাছ

* ঘন রস আঙুলের আগায় তুলিয়া লইয়া দুইটি আঙুল দ্বারা পরিক্ষা করিলে যদি দুই আঙুলের মধ্যে সুতা কাটিতে থাকে তবেই জানিবে যে তেতারা অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

আছে। সেখানে গুড় প্রস্তুতের ব্যবসা প্রচলিত করিলে কম লাভ হয় না। আশাকরি বিহারী জমিদার সম্প্রদায়ের এবিষয় দৃষ্টি পড়িবে। নদীর ধার, আহর, পীণ্ড, পাইন পার্ব্বত্য অনুর্ব্বর ভূমি যেখানে-কোন ফশল উৎপন্ন হইবার আশা নাই, সেই সেই স্থানে খেজুর গাছ রোপন করিলে সাত হইতে দশ বৎসরের মধ্যে বেশ এক লাভবান ব্যবসায়ের ভিত্তি স্থাপিত হইতে পারে তাহা বিহারী জমিদারদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। বৃহৎ মাত্রায় গুড় প্রস্তুত করিতে হইলে কলের সাহায্যে তাহা করা ভাল এবং তাহাতে সস্তা হয়। তজ্জন্য নিম্নলিখিত স্থানে লিখিলে খুব ভাল কল পাওয়া যায়; তাহাদের নাম ও ঠিকানা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

1. A. & P. W. Meduie, Cessnock Eugine Works,
   Govwn, Glassgow.
2. H. N. Aitken 147 Bath Street, Glassgow.
3, Mirrlees Watson Co. Ld., Glassgow.
4. Bylmer Iron Works Co.,
   Cincinnati, Ohio. U. S. A.
5. Alexander Penny & Co.,
   107, Fenchurch Street, Lodon E. C.
6. John Macneel & Co.,
   Coloniel Iron Works, Govan, Glassgow.
7. Watson Laidlaw & Co.,
   Glassgow, Scotland.
8. Harney Engineering Co.,
   224, West Street, Glassgow.

সরকারী কৃষি সংবাদ

চুঁচড়া কৃষিক্ষেত্রে গোময় রক্ষা—

পাকা চৌবাচ্ছা গাঁথিয়া এবং উপরে রৌদ্র বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য আচ্ছাদন করিয়া দিলে গোময়ের নাট্রোজেন ভাগ এমোনিয়া আকারে উবিয়া যাইতে পারে না বা গোময় রস মাটিতে শোষিত হইয়া যাইতে পারে না। কিন্তু এই প্রথায় সার রক্ষা করা ব্যয়সাধ্য সুতরাং সাধারণ চাষীতে এই প্রথা অবলম্বন করিতে পারে না। এই কারণে চুঁচড়া ক্ষেতে বিগত বর্ষে কাঁচা গর্ত্তে সার রক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছিল। গর্ত্তটি ২০'×২০'×৪' পরিমাণে। ২০' ফিট লম্বা চওড়া গর্ত্ত কাটিয়া তাহা হইতে ২'

ফিট মাটি তুলিয়া লইয়া চারিদিকে দুই ফিট উচ্চ আইল বাঁধিয়া দিলে গর্ত্তটিতে ৪' পরিমাণ সার ধরিবার স্থান হইল। গর্ত্তটি বাঁশের মাচান বাঁধিয়া খড় পাতা দ্বারা ছায়িয়া রাখা হইয়া ছিল। এই রূপ গর্ত্তের সার বিশ্লেষণ করিয়া দেখা হইয়াছে। ইহাতে শতকরা ৮৮ ভাগ নাইট্রোজেন বিদ্যমান। সাধরণতঃ চাষীরা যে অনব-ধানতার সহিত সার রক্ষা করে, এই সার তাহা অপেক্ষা অনেক ভাল তাহাতে সন্দেহ নাই। চাষীরা মনে করিলে এই রূপ সুবন্দোবস্তে অনায়াসে সার রক্ষা করিতে পারে।

চুঁচড়া ক্ষেত্রে ধান—

দাদখানি, বাদসা ভোগ, বাঁক তুলসী, হাতিশাল, নাগরা এই কয়েক প্রকার ধান লইয়া পরীক্ষা তিন বৎসর যাবৎ চলিতেছে। এতদঞ্চলে নাগরারই চাষ অধিক। নাগরা ফলনে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। চাউল মাঝারি, রঙ শাদা। হাতিশাল ও বাঁকতুলসী নাগরা অপেক্ষা মিহি, ফলনে কিছু কম, দামে নাগরা অপেক্ষা ✓০ দুই আনা চড়া, দাদ্‌খানি, বাদসা ভোগ আরও মিহি। মিহি চাউল মাত্রেই ফলনে কম। প্রায়ই দেখা যায় যে চাউল যত মিহি হয় ততই ফলনে কম হইয়া থাকে। দাদ্‌খানি ও বাদসা ভোগের দাম নাগরা অপেক্ষা।০ চারি আনা চড়া। সুবৎসরে ইহাদের নিম্নলিখিতানুরূপ ফলন হইয়া থাকে।

গড়ে প্রতি একরে ফলন

	ধান	খড়
	মণ	মণ
দাদখানি	১৯৸০	২৪
বাদসাভোগ	২০।৩	৩৫
বাঁকতুলসী	১৮।৩	২৯॥০
হাতিশাল	১৯	২৬
নাগরা	৩৯॥০	৩২।০

সার পরীক্ষা—

এই ক্ষেত্রে ধানের ক্ষেতে সার পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে ধানে গোময় সারই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। একর প্রতি ১০০ মণ গোময় সার দিলে ৩১॥০ মণ

ধান, ৪৭৷৷৹মণ বিচালি পাওয়া যায়। একরে ৫০মণ গো ময়. ৫মণ সুপার, ১মণ সোরা দিলে ফলন আরও বাড়ে। ইহাতে ৩৩ মণ ধান ও ৫২ মণ খড় উৎপন্ন হয়। খরচ হিসাবে ধরিতে গেলে একরে ১০০ মণ গোময় ব্যবহারই ভাল। তবে গোময় সর্ব্বত্র মিলে না, সেখানে অন্য সার ভিন্ন উপায় নাই। ধান ক্ষেতে সবুজ সার মন্দ নহে, ইহাতেও ধানের ফলন বাড়ে। ধানের ক্ষেতে ধঞ্চে বুনিয়া চষিয়া দিয়া ধান রোপণ করিলে একরে ৩০ মণ মিহি ধান উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। বিগত বর্ষে এই ক্ষেত্রে ধঞ্চে অসময় বোনা হইয়াছিল সুতরাং বিশেষ ফল হয় নাই। একরে ২৬ মণ মাত্র ধান উৎপন্ন হইয়াছে।

ধান্য চারা রোপণের সংখ্যা—

এত দিন পরে সরকারী কৃষিবেত্তারা চাষীদের মতের সমর্থন করিতেছেন। চাষীরা বহুকাল হইতেই জমির অবস্থা বুঝিয়া ও সময়ের আগুপিছু ধরিয়া দুই চারি বা ততোধিক বীজ (চারা) রোপণ করিয়া থাকে। খুব তেজের জমি হইলে তাহারা দুই তিনটির অধিক বীজ কখন রোপণ করেনা। প্রত্যেকটির গোড়া হইতে নূতন চারা বাহির হইয়া খুব ঝাড় বাঁধিয়া যায়। জমি নিস্তেজ হইলে বা সময় অতিক্রম হইয়া গেলে বেশী চারা নির্গত হওয়ার আশা করা যায় না, যে কয়টা বীজ রোপণ করা যায় তাহারই মাথায় সম্ভবতঃ শীষ হইয়া থাকে। এমন অবস্থায় যত অধিক বীজ রোপণ করা যায় ততই ভাল। চাষীরা কিন্তু কখন কেবল একটি মাত্র বীজ রোপণ করে না।

পাটের আবাদ—

বর্ত্তমান বর্ষে ফাল্গুন চৈত্র মাসে খুব বৃষ্টি হইয়া গেল কিন্তু বৈশাখে পাট বোনার সময় বৃষ্টি নাই সুতরাং পাট বুনিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। বৈশাখের শেষে বৃষ্টি হইলে জ্যৈষ্ঠের প্রথম পর্য্যন্ত আবহাওয়ার অবস্থা পাটের আবাদের অনুকূলই ছিল। কিন্তু জ্যৈষ্ঠে মাঝামাঝি যে বৃষ্টি আরম্ভ হইল তাহা অতিরিক্ত ও তাহার আর বিরাম নাই। কোথায় পাটের নবোদ্গত চারা গোড়া পচিয়া গিয়া খারাপ হইল, কোথায় পাটের ক্ষেত নিড়ান হইল না. কোথাও পাটের ক্ষেত জলে ডুবিয়া গেল। এই বৃষ্টিতে পশ্চিমাঞ্চলের পাটই বেশী নষ্ট হইল। পশ্চিমাঞ্চলের পাট বুনিতে দেরী হইয়াছিল। ছোট চারা জলের চাপে মরিয়া গেল। পূর্ব্ব বঙ্গে পাট খুব জলদি বোনা হয়। সেগুলি একটু বড় হইলে তাহার গোড়ায় জল জমিলেও মরে না। পূর্ব্ব বঙ্গের যে জাতীয় পাট জন্মে তাহা জলা জমিতেও হয়। পূর্ব্ব বঙ্গে পাটের আবস্থা এই কারণে নিতান্ত খারাপ নহে।

বর্ত্তমান বর্ষে পাট চাষের খবর লইবার একটু সতন্ত্র ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে থানাদার ও চৌকিদারগণ জেলার মেজিষ্ট্রেটের নিকট পাটের আবাদের

খবর যোগাইত। বর্ত্তমান বর্ষে প্রত্যেক মহকুমার প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েতগণকে পাটের আবাদের খবর পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। এই নিয়ম কতকটা আশাপ্রদ বলিয়া মনে হয়, কারণ পঞ্চায়েতগণ মনে করিলে সঠিক খরচ যোগাইতে পারেন।

বিগত বর্ষে ২,৬২০,৭৮৬ একর জমিতে পাটের আবাদ হইয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষের হিসাবে পাটের আবাদী জমির পরিমাণ ২,৭৮২,৯৪৩ একর। প্রায় শতকতা ৬.২ ভাগ অধিক জমিতে পাটের আবাদ হইয়াছে। ইহার সহিত বিহার ও উড়িষ্যা বিভাগের আবাদী জমির পরিমাণ যোগ করিয়া লইলে দেখা যায় যে পাটের জমির পরিমাণ বর্ত্তমান বর্ষে ৩,১৯১,১৭৮ একর, বিগত বর্ষে ৩,০১৪, ৭৭৭ একর। বিহারে আবাদী জমির পরিমাণ শতকরা ৩ ভাগ ও আসামে ৫.৪ ভাগ বাড়িয়াছে।

সরকারী বিবরণীতে প্রকাশ যে, বিগত বর্ষের পাট কিছু মজুত নাই।

আসামে ধানে পোকা—

এই পোকার স্থানীয় নাম পাইনটাফি (Paintaphih) খাসিয়ারা তাহাদের ধানের ক্ষেতে কখন কখন দেখিতে পায় যে কতকগুলি শিঙের আকারের খোল ভাসিতেছে। এই খোলের ভিতর পোকার ডিম থাকে। ডিম ফুটিয়া ঈষৎ সবুজ রঙের কীড়া উৎপন্ন হয়। কীড়ারা তাহাদের বাসস্থানের জন্য এই খোলগুলি নির্ম্মাণ করে। ইহারা জলজ উদ্ভিদ ও ঘাষের শিকড় ও কচি চারা খাইয়া জীবন ধারণ করে। শীতকালে কোন পয়োনালা কিম্বা আর্দ্র স্থানে থাকে। বর্ষাগমে ধান ক্ষেতে জল ঢুকিবার সময় জল স্রোতে ভাসিয়া ক্ষেতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ধানের চারা বাহির হইলেই কচিধান গাছ ও তাহার শিকড় ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করে। ধানগাছ বড় হইলে ইহারা কোন অপকার করিতে পারে না। বৈশাখের শেষ ভাগে কীড়াগুলি পতঙ্গ আকার ধারণ করে এবং জ্যৈষ্ঠ আষাড়ে সবুজ রঙের ক্ষুদ্র মক্ষি ধানক্ষেত ছাইয়া ফেলে।

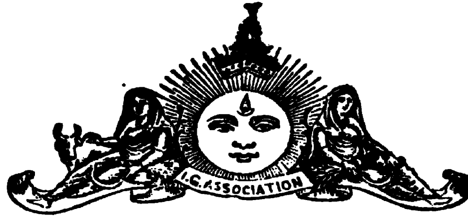
প্রতিকার—

১। ধান ক্ষেতের জল বাহির করিয়া দিয়া পোকাগুলি ধরিয়া মারা ব্যতীত অন্য উপায় নাই। জল বাহির করিলে পোকাগুলি পয়োনালা বা গর্ত্তে একত্রিত হয় তখন উহাদের সবংশে মারিবার সুবিধা।

২। ধান ক্ষেতে জল ঢুকাইবার সময় সুক্ষ্ম তারের জাল প্রবেশের পথে আটকাইয়া দিলে জলের সঙ্গে পোকার চোঙগুলি ভাসিয়া আসিতে পারে না।

৩। পোকা যখন পতঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন পোকা গুলিকে হাতজাল বা থলে দ্বারা ধরিয়া মারা যাইতে পারে।

৪। ধান কাটিয়া লইবার পর ক্ষেতটি ভাল করিয়া লাঙ্গল মৈ দ্বারা চষিলে পোকার উপদ্রব নিবারিত হইতে পারে। নিকটবর্ত্তী পয়োনালা বা আর্দ্র ভূমিতে অনুসন্ধান করিয়া পোকার জড় মারিতে হইবে।



শ্রাবণ, ১৩২০ সাল।

ভারতীয় কৃষির উন্নতি

ভারতীয় কৃষির উন্নতি কিম্বা অবনতি এক্ষণে অল্পবিস্তর পুষা তত্ত্বানুসন্ধানাগারের কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট। কারণ কৃষি বিষয়ক কার্য্যকলাপের নূতন বিধি বিধানের পুষাই এখন প্রধান কেন্দ্র। সমগ্র ভারতের কৃষি পরিচালনার ভার পুষা তত্ত্বানুসন্ধানাগারের ডিরেক্টার মিঃ বার্ণার্ড কভেন্টি সাহেবের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। ইহাঁর ভারত গভর্ণমেণ্টের কৃষি উপদেষ্টা এই নূতন উপাধি হইয়াছে (The Agricultural adviser to the Government of India)। তিনি এতাবৎকাল ভারতীয় কৃষি পরিদর্শকগণের প্রধানতম রাজপুরুষ ছিলেন। (The Inspector General of Agriculture)। এই পদ এখন হইতে উঠাইয়া দেওয়া হইল। পুষাতে কতকগুলি কৃতবিদ্য বিশেষজ্ঞ একত্রিত হইয়াছেন, তাঁহারা ভারতীয় কৃষিকে যে পথে চালাইবেন, সে সেই পথে চলিবে। অতএব এখন দেখা উচিত তাঁহারা কি কার্য্যে লিপ্ত আছেন। তাঁহারা কৃষি সম্বন্ধীয় কোন কার্য্য বাদ দেন নাই, কৃষির যতগুলি বিভাগ আছে, সব বিভাগেই নানা তত্ত্বানুসন্ধান হইতেছে এবং প্রত্যেক বিভাগের ভার এক একজন বিশেষজ্ঞের উপর ন্যস্ত।

ক্ষেত্রজ শস্য উৎপাদন—অভিনব লাঙ্গল, মৈ, বিদে ও কোদাল দ্বারা সুকৌশলে কম খরচে জমির চাষাবাদ করা, সার প্রয়োগ দ্বারা অল্প জমি হইতে অধিক শস্য উৎপাদন করা, সুবীজ সঞ্চয় ইত্যাদি এই বিভাগের প্রধান কার্য্য।

কৃষি রসায়ন—এই বিভাগের কার্য্য গুরুতর ও অনন্ত প্রসারিণী। মৃত্তিকা-তত্ত্ব বলিয়া দেওয়া, সার নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া, গবাদির খাদ্য নির্দ্ধারণ করা, কোথায় কোন কৃষিজাত দ্রব্য অযত্নে নষ্ট হইতেছে তাহার প্রতিবিধান করা, এক কথায় কৃষি-শিল্পের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া দেওয়া ইত্যাদি কত কি এই বিভাগের

কার্য্য। কোথায় ভারতের এক কোণে পুষাতে এই কৃষি-রসায়নের চর্চ্চা হইতেছে কিন্তু তাহাতে কি হইবে, ভারতের মত বৃহদায়তন ভূখণ্ডে দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে কৃষি-রসায়নের চর্চ্চা হইলে তবে যদি কিছু ফল হয়। কিন্তু একা গভর্ণমেণ্ট কি করিতে পারেন। আমাদের দেশের নিশ্চেষ্ট জমিদারদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে; পুষার রসায়নতত্ত্ববিদ মিঃ এনেট খর্জ্জুরচিনি আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে ভারতে অযত্নে খর্জ্জুর বৃক্ষ হইতে বৎসরে ৫ লক্ষ টন খেজুর চিনি উৎপন্ন হয়। যত্নপূর্ব্বক খেজুর বৃক্ষের আবাদ করিলে বা অভিনব উন্নত প্রণালী মত খেজুর রস হইতে চিনি বাহির করিলে কত অধিক মাত্রায় খেজুর চিনি উৎপাদিত হইত তাহা সহজেই অনুমেয়। এমেরিকায় মেপল নামক এক প্রকার বৃক্ষ আছে। তাহার রস হইতে আমেরিকানেরা চিনি প্রস্তুত করে। খেজুর রসে যত চিনির ভাগ বোধ হয় মেপল রসে তাহার ⅙ অংশও নাই। অধ্যবসায়ী আমেরিকানগণ সেই মেপল রসও বাদ দিতেছেন না।

উদ্ভিদতত্ত্ব—উদ্ভিদবিচার বা উদ্ভিদতত্ত্বই কৃষির মূলতত্ত্ব। উদ্ভিদের আকার গঠন কি প্রকারে সম্পাদিত হয়। কি প্রকারে উদ্ভিদের উৎপত্তি শ্রীবৃদ্ধি ও পরিণতি হয় তাহা জানা বিশেষ আবশ্যক। মিঃ হাওয়ার্ড পুষাতে উদ্ভিদতত্ত্ব বিচারে নিযুক্ত আছেন। গম ও তামাক সম্বন্ধীয় পুস্তকে তিনি এই দুই খন্দের উন্নতি বিষয়ক অনেক বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। বীজ নির্ব্বাচনদ্বারা ছোলা চাষের উন্নতি ও সঙ্কর উৎপাদিত বীজ দ্বারা উন্নত জাতীয় বীজের সংস্থান করিয়াছেন।

বেলুচিস্থানে তিনি একটি আদর্শ ফলের বাগান রচনা করিয়াছেন এবং নানা পরীক্ষাদ্বারা বিবিধ জাতীয় ফলের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতেছেন। প্রত্যেক বিষয়ে কিছু না কিছু চেষ্টা হইতেছে সত্য, হয়ত ইহাতে সুদূর ভবিষ্যতে আশাপ্রদ কার্য্যও হইতে পারে কিন্তু সাধারণে প্রত্যেক কার্য্যের তন্ন তন্ন বিবরণ প্রচারিত না হইলে অনেকদিন আমাদের আশা, আশামাত্রে পর্য্যবসিত থাকিবে তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

পুষায় অন্যতম প্রধান কার্য্য—কীটতত্ত্ব, ছত্রকতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করা, ইহারই আয়োজন কিছু বেশী বলিয়া মনে হয়। প্রায় ৩০০ প্রকার বিভিন্ন ছত্রকের পরীক্ষা করা হইয়াছে। ধানের পোকা, পাটের পোকা, আখের পোকা তামাকের পোকা, চুরুটের পোকা, আমের পোকা, কাঁটালের পোকা বলিতে গেলে যত প্রকার ফল শস্যের পোকা আছে সকলগুলির পরীক্ষা পুষাতে হইতেছে। কি ছত্রক, কি কীট সমুদয়ের জীবনীর আদ্যোপান্ত আলোচনা করিয়া কিসে তাহাদের প্রতিকার, কিসে তাহাদের দমন হইবে তাহার বিহিত চেষ্টা সত্ত্বেও কত শস্যই

প্রতি বৎসর পোকায় নষ্ট করিতেছে। অনেক প্রতিকার প্রণালী ব্যয়সাধ্য, তাই আমাদের চাষীরা প্রতিকার প্রণালী জানিলেও হতবুদ্ধির মত বসিয়া নিজের সর্ব্বনাশ দেখিতে থাকে। ভারতের মত দেশে পোকা নিবারণের সহজসাধ্য উপায় উদ্ভাবিত হওয়া উচিত, নতুবা সাধারণ চাষীতে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি পোকার স্বাভাবিক শত্রুর উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিবে। কীটতত্ত্ব আলোচনায় যে কোন ফল নাই এ কথা কেহ বলিতে পারিবে না। বর্দো মিশ্রণ ব্যবহার করিয়া যদি ১০,০০০ হাজার বিঘায় আলু পোকার হস্ত হইতে রক্ষা পায়, বিষ মিশ্রণ আরোকের পিচকারী দিয়া যদি কতকগুলি আখ বাঁচাইতে পারা যায় তবে মন্দের ভাল বলিতে হইবে। এখানে সুধু পোকার উপদ্রব নিবারণের উপায় বলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। গভর্ণমেণ্ট ও জমিদারগণকে পোকা নিবারণের নিমিত্ত সাহায্য করিতে হইবে এবং চাষীগণকে দলবদ্ধ হইয়া পোকা নিবারণার্থে চেষ্টা করিতে শিখাইতে হইবে। যাঁহারা ভূমির উপসত্ব ভোগ করিবেন তাঁহারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রস্থ ফসল রক্ষা না করিবেন কেন! পুষাতে কয়েকটি বিশেষ চাষ লইয়া তাহার উন্নতি কল্পে বহুবিধ চেষ্টা হইতেছে—

তুলা—ক্রমশঃ ভারতে ভাল তুলার আবাদ লোপ পাইতে বসিয়াছিল। ভারতের মত ভূখণ্ডে তুলা চাষের জমি নাই এ কথা কেহ বলিবে না। নিজ বাঙলায় তুলা ভাল না জন্মিলেও বম্বে, মান্দ্রাজ, মধ্য প্রদেশ, পঞ্জাবে তুলার আবাদ চলিতে পারে। হইতেছেও তাই, সুরাটে ব্রোচ তুলা জন্মিতেছে। খান্দেশে এক প্রকার ছোট আঁইসের তুলা হইতেছে তাহার ফলন অত্যন্ত অধিক। প্রায় ১,৩০০০০০০ একর জমিতে (একর-৩ বিঘা) ইহার চাষ হইতেছে। দক্ষিণ মহারাষ্ট্রেতেও ব্রোচ তুলার চাষ বিস্তার লাভ করিতেছে।

ধারওয়ায় জেলায় কাম্বোডিয়া তুলা আধিপত্য লাভ করিয়াছে। মান্দ্রাজে বিগত বর্ষে ৮০,০০০ বেল তুলা উৎপন্ন হইয়াছে। মধ্যে প্রদেশে বুড়ী তুলার একাধিপত্য। ইহা কাম্বোডিয়া তুলার প্রায় সমতুল্য। যুক্ত প্রদেশে এক প্রকার তুলা আছে। ইহার শাদা ফুল হয়। এই তুলা বুড়ীর মত দেশী হইলেও মন্দ নহে। ইহার আরও উন্নতির চেষ্টা হইতেছে। লিক সাহেবের, এখানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে তুলার আবাদ করিয়া তুলার ফলন বৃদ্ধি, ও সঙ্কর দ্বারা তুলার বংশোন্নতি করিবার প্রয়াস প্রশংসনীয় বলিতে হইবে। এই সম্বন্ধে তাঁহার পুস্তক সাধারণ চাষী যাহারা মাঠে তুলা চাষ করিয়া তুলা উৎপন্ন করিবে তাহাদের দ্বারা চিরকালই বোধগম্য নয় বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে। তুলা চাষের সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি পঞ্জাবে। লয়ালপুর বাজারে আমেরিকান তুলা দেশী তুলা অপেক্ষা মণ প্রতি ১৲ টাকা মূল্য অধিক। ভারতের সৌভাগ্য বশতঃ বিদেশীয় বাজারে ভারতীয়

তুলার আমদানী আবশ্যক হওয়ায় ভারতে তুলার আবাদ উন্নতি মার্গে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে।

গম—তুলার পরই গম চাষের কথা উল্লেখ করা উচিত। গম চাষের উন্নতি বলিতে সাধারণে কি বুঝিবে তাহা অগ্রে একটু বিশদ করিয়া বলা কর্ত্তব্য। যে গমের ফলন অধিক হয়, যাহাতে রষ্ট (পোকা) সহজে ধরেনা, যাহা অনাবৃষ্টি সহ, যাহার দানা ভাল হয় সেই গমই ভাল। এই সকল গুণের সহিত আবার দেখিতে হইবে যে কোন্ গম, ময়দা কলওয়ালারা অধিক আদর করে। যে গমে শাদা ভাল ময়দা হইবে, যাহার ময়দার থাসায় লাসা অধিক, যে গম সহজে চূর্ণ হয় ইত্যাদি গুণ যোগ হইলে তবে ভাল গম হইল সুতরাং গম চাষ করিয়া তাহার গুণ নির্ণয় পূর্ব্বক বীজ নির্ব্বাচন করা নিতান্ত সহজ নহে। হাওয়ার্ড দম্পতি নানা প্রকারে গমের চাষাবাদ করিয়া নানা প্রকার বিচার দ্বারা পুষার এক প্রকার গম নির্ব্বাচন করিয়াছেন। ইহাই পুষার গম নং ১২। ইহারই বীজ চাষীগণের মধ্যে পরীক্ষার্থ বিতরিত হইতেছে। মোটের উপর তাঁহাদের মতে এই কার্য্য নিতান্ত সহজ নহে। যুক্ত প্রদেশে মজঃফরনগরে গমের আবাদ হইতেছে। অভিজ্ঞেরা ইহাও ভাল গম বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন।

ইক্ষু—বীজ হইতে ইক্ষু উৎপাদন করা পুষায় বর্ত্তমান অন্যতম কার্য্য। ইক্ষু হইতেই সাধারণতঃ বীজ-ইক্ষু প্রস্তুত করিয়া লওয়া হয়। আখের পাপ বা টুকরা পুতিলেই তাহা হইতে আখের ঝাড় উৎপন্ন হয়। অধুনা ভারতে যে সমস্ত আখের চাষ হইতেছে তাহারা গুণে ক্রমশঃ হীন হইয়া পড়িতেছে। অনেক আখ আছে যাহাতে পোকা-ত লাগিয়াই আছে, না হয় তাহাতে রস অধিক হয় না, কিম্বা রসে চিনির মাত্রা কম, কিম্বা রসের বিশুদ্ধতার অভাব হেতু নিকৃষ্ট চিনি উৎপন্ন হইল। এই সকল দোষ নিরাকরণ জন্য মান্দ্রাজে বীজ-ইক্ষু উৎপাদন জন্য একটি ক্ষেত্র স্থাপিত হইয়াছে। আখের ফলন অধিক হইবে, আখে বিশুদ্ধ রস হইবে, উৎকৃষ্ট চিনি উৎপন্ন হইবে এবং রসে চিনির মাত্রা অধিক হইবে ইহাই চাই, ইহার চেষ্টা এখানে হইবে। বারবার সাহেব এই চেষ্টা করিবেন। কলম করিয়া বা সঙ্কর দ্বারা সুবীজ উৎপন্ন করিয়া অভিপ্রায় মত ফসল উৎপন্ন করা যায়। স্বভাবে এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এই গোলাপের কথা লইয়া বিচার কর, দেখিবে জাইগানসিয়া গোলাপের কটিং হইতে কি তেজস্কর গাছ হয়। কতিপয় জাইগানসিয়ার কটিং বাঙলার মাটিতে বসাইলে তাহারা মনে করে যে তাহারা এক বর্ষায় বাঙলার এক অংশ ছাইয়া ফেলিবে। অন্য ভাল গোলাপ হয়ত বৎসরে অতি কষ্টে একটি ডাল ছাড়ে কিন্তু ঐ সকল গোলাপ রূপে, গুণে, গন্ধে বাগান আলো করিয়া

থাকে। জাইগানসিয়ার জোর ও ভাল গোলাপের রূপ গুণ একত্র করিতে পারিলে উদ্যান জগতে একটী বিশেষ কার্য্য সাধিত হইল। সেই রকম যদি যে আখ খুব তেজের সহিত হয় ও দৃঢ় ইক্ষু দণ্ড উৎপন্ন পরে, পোকায় যাহাতে দাঁত ফুটাতে পারে না .এমন আখের সহিত বিশুদ্ধ রসের, শর্করার মাত্রাধিক কোন আখের সহিত সঙ্কর ঘটাইতে পারা যায় তবেত কৃষি-জগতে একটা অভিষ্ট সিদ্ধ হইল। সঙ্কর দ্বারা সুবীজ উৎপন্ন করিয়া নুতন নুতন বীজ-ইক্ষু ভারতে প্রবর্ত্তণ করিতে পুষা-কৃষিশালা কৃত সঙ্কল্প হইয়াছেন। মান্দ্রাজ ব্যতীত যুক্ত প্রদেশেও বীজ-ইক্ষু প্রস্তুতের একটা আড্ডা হইয়াছে। আসামে গোয়ালপাড়া ও কামরূপ জেলাদিতে ইক্ষু চাষের মত বেশ ভাল জমি আছে তথায় ঐ রূপে ইক্ষু চাষের বন্দোবস্ত হইলে মন্দ হয় না।

মাট বাদাম—কৃষি-বিভাগের চেষ্টায় মাট বাদামের চাষের প্রসার বৃদ্ধি হইতেছে। বাঙলা হইতে ইহার চাষ উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। শুকর ও শিয়ালের উৎপাত ইহার প্রধান কারণ। অস্ত্র শস্ত্র হীন বাঙলার চাষী এই দুষ্ট কৃষি-শত্রুকে কিছুতেই দমনে রাখিতে পারে না। কিন্তু মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও মধ্য প্রদেশে ইহার চাষ বাড়িতেছে। ১৯০৫।৬ সালে ৬০ হাজার একরে মাট বাদামের চাষ হইত কিন্তু সেই মাট বাদামের জমির পরিমাণ ১৯১১।১২ সালে ১,২০০,০০০ একরেরও অধিক হইয়াছে। ব্রহ্মদেশে ১৪০,০০০ একর জমিতে মাট বাদামের চাষ হয়। আবাদী জমির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ফলনও সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ইংলণ্ড, আমেরিকা, জার্ম্মনি প্রভৃতি স্বাধীন দেশে ছোট ছোট পল্লি-শিল্প, ছোট খাঁট ব্যবসা, ক্ষুদ্র কৃষি-ক্ষেত্রগুলি চালাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের সমুচিত সহানুভূতি ও সাহায্য বিধানের ব্যবস্থা আছে। সরকারী বিশেষজ্ঞগণ ক্ষুদ্র কৃষি-ক্ষেত্রগুলি ও শিল্পালয়গুলি যথারীতি পরিদর্শন করেন, ক্ষেত্রস্বামী ও শিল্প ব্যবসায় নিরত ব্যক্তিগণকে যথোপযুক্ত সময়োচিত শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। কৃষি শিল্প পরস্পরের সাহায্যে কি প্রকারে ব্যবসায়ের উন্নতি বিধান করা যাইতে পারে তাহার অনুসন্ধান করেন ও সুমতলব সাধারণে জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। সরকারী কর্ম্মচারীগণের উপদেশে ও উৎসাহে কৃষক ও শিল্পী মহলে যেন এক নুতন উদ্দীপনা আসে এবং তাহাদের উদ্যম শতধা বাড়িয়া যায়। এখানেও কৃষির উন্নতি কামনা করিলে গবর্ণমেণ্টকে ঐ প্রকার কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে হইবে এবং দেশীয় রাজা রাজোয়াড়া জমীদারগণকে সদৃষ্টান্ত দেখাইয়া কৃষি শিল্পের কর্ম্মক্ষেত্রে নামাইতে হইবে, তবে এবং তখন যথার্থই ভারতীয় কৃষি শিল্পের বাস্তবিকই শুভদিন আরম্ভ হইবে।

বিজ্ঞান সম্মত কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা—এখানে নিতান্ত কম—গবর্ণমেন্ট বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র ব্যতীত সবে মাত্র ৩টি বেসরকারী ছাত্র পুষাতে উন্নত কৃষি-বিদ্যার চর্চ্চা করিতেছে। মান্দ্রাজে ১০টি ছাত্র কলেজ হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি পাইয়াছে। পুষা ও সাবরেও ছাত্র সংখ্যা কম। মধ্য প্রদেশে, যুক্ত রাজ্যে, পুনা, সাবর, মান্দ্রাজ সর্ব্বত্রই কৃষক সন্তানগণকে ছয় মাসে হাতে হাতিয়ারে কৃষি-শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, কিন্তু অনেক ছাত্রকে একসঙ্গে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা কোথাও নাই—

কৃষি-জ্ঞান বিস্তারের চেষ্টা—হইতেছে সত্য কিন্তু তাহা যে পর্য্যাপ্ত বলিয়া আমাদের কিছুতেই মনে হয় না। ইংরাজী ভাষায় লিখিত কৃষি-বিবরণী পত্রিকা, পুস্তকাদি অতি অল্পসংখ্যক লোক দ্বারা পঠিত হয় এবং যাঁহারা পাঠ করেন তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি সাধারণে সেই জ্ঞান প্রচার করিয়া থাকেন।

কচিৎ স্থানীয় ভাষায় পুস্তিকা প্রণয়ন ও প্রচার হয় বটে তাহারও সংখ্যা এত অল্প যে তাহাতে বিশেষ কোন কাজ হয় না বলিলেই হয়। কৃষি-পরীক্ষা ক্ষেত্রের সহিত পূর্ব্বাপেক্ষা সাধারণ চাষীর কিছু কিছু ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত হইতেছে বটে কিন্তু তাহার সংখ্যা এত অল্প যে তাহা কার্য্য কালে গণনার মধ্যে না ধরিলেই ভাল। যৌথ ঋণ-দান-সমিতির সহিত কৃষি-বিভাগের সংস্রব সংঘটন কতকটা প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়া দেয় বটে কিন্তু তাহাও বহুল নহে। কৃষি-তত্ত্বের বহুল প্রচার করিতে হইলে, গ্রাম্য চাষীদিগকে শিখাইতে হইলে রাজাও জমীদারগণকে আরও অধিকতর উদ্যোগী হইতে হইবে। যাহারা জমীদারের কর ও রাজার রাজস্বের যোগাড় করিয়া দিতেছে তাহাদের জন্য মোটে ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় না করিয়া ৮ কোটী ব্যয় করা কি কর্ত্তব্য নহে!

দেশের উন্নতি কামনা করিলে কৃষির উন্নতির দিকে লক্ষ্য স্থির করিতে হইবে। কৃষির অবনতি ঘটিলে দেশ উৎসন্ন যাইবে। সহর নগর জঙ্গলে পরিণত হইবে। কৃষির অবনতি ঘটিলে কামার, কুমার, ছুতর, শিল্পী, ছোট বড় কারখানার মালিকগণের আপনার বলিতে কিছু থাকিবে না। রাজার উপরও কৃষকের স্থান এবং তাহার তদপেক্ষা অধিক আদর হওয়া উচিত। দেশের ধনোৎপাদন করে তাহারা, দেশ রক্ষা করে তাহারা; রাজা একজন, দশ বিশ, পঁচিশ কিম্বা পঞ্চাশ জন মাত্র জমিদার; চাষা, মজুর লক্ষ লক্ষ অগণিত। কৃষির উন্নতি মানে কৃষকের উন্নতি, যৌথ ঋণদান সমিতির সাহায্যে তাহাদিগকে ঋণদায় হইতে বাঁচাইতে হইবে। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হইলে তাহাদিগকে অনশন, অর্দ্ধাশন হইতে বাঁচাইতে হইবে এবং তাহাদের হাল গরু বীজ কিনিয়া দিয়া তাহাদিগের কৃষির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া দিতে হইবে। তাহাদিগকে স্বত্ব জোত জমীতে

প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হইবে। তাহাদিগের দারুণ কর ভার লাঘব করিতে হইবে। তাহাদিগের সুবীজ সংগ্রহের উপায় করিয়া দিতে হইবে। বর্ত্তমান ঘোর প্রতিদ্বন্দিতায় ও জীবন সংগ্রামের দিনে তাহাদিগকে ব্যয় ও সময় সংক্ষেপকারী উন্নত কৃষি-যন্ত্র ব্যবহারে উৎসাহিত করিতে হইবে। তাহাদিগকে বিশেষ সার প্রয়োগের ফল ও কৃষি-রসায়নতত্ব, তাহাদিগের স্বক্ষেত্রে যাইয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। পোকার ও অন্য জন্তু জানোয়ারের উপদ্রব হইতে তাহাদিগের ফসল রক্ষা করিতে হইবে এবং পোকার প্রতিকারের সুকৌশল ও সহজসাধ্য উপায়গুলি তাহাদিগকে শিখাইয়া দিতে হইবে। অসময়ের জন্য তাহাদের শস্য রক্ষার সুবিধি ব্যবস্থা করিতে হইবে। এক কথায় দেশের প্রাণরক্ষার জন্য যাহা করা আবশ্যক তাহা করিতেই হইবে। গভর্ণমেণ্ট একার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন এখন দেশের ধনী ও রাজা জমিদারগণের সাহায্য আবশ্যক নতুবা দেশের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। ভারতের রাজস্বের যে সামান্য অর্থ এই ভারতের কৃষি উন্নতির জন্য ব্যয় হইতেছে তাহাতে বিশেষ কোন ফল হইবে না।

লিচুর কোঁকড়া রোগ—লিচু গাছের বড় একটাবেশী রকমের রোগ দেখা যায় না। কোঁকড়া নামে যে এক প্রকার ব্যাধি আছে, তাহাই, ইহার পরম শত্রু। উক্ত রোগের লক্ষণ এই যে, গাছের পাতা কুঞ্চিত হয় ও পত্রের নিম্ন বা পশ্চাদ্ভাগ ইষ্টক বর্ণের অতিক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেণুতে পরিবৃত হইয়া যায়, এবং মনে হয়, যেন কেহ উক্ত পদার্থ দ্বারা পাতায় প্রলেপ দিয়াছে। এই প্রলেপ অতিশয় স্থূল হইয়া থাকে এবং অতি দৃঢ় ভাবে উহাতে সংলিপ্ত হইয়া যায় যে, ছুরি দ্বারা চাঁচিলেও উঠান যায় না। ইহা যে একটী রোগ এবং ইহার প্রতীকার করা বিশেষ প্রয়োজন, তাহা লোকের মনে আদৌ স্থান পায় না। অনেকের বাগানেই লিচু গাছের এই রোগ দেখিতে পাই; কিন্তু প্রতিবিধানের কোন ব্যবস্থা দেখিতে পাই না; এই কারণে গাছ ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়ে গাছের পত্রসংখ্যাও হ্রাস হইয়া যায় এবং ফলের মধ্যে কীট প্রবেশ করিয়া ফলগুলিকে অব্যবহার্য্য করিয়া ফেলে।

লিচু গাছ সকল কোন্ সময়ে যে এই কোঁকড়া রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহার বিশেষ কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই; তবে যতদুর দেখিতেছি, তাহাতে মনে হয়, বর্ষাকালে এই রোগের বড় একটা প্রাদুর্ভাব হয় না। মাঘ মাসের শেষাংশ হইতেই গাছে এই কোঁকড়া রোগ ধরিতে আরম্ভ হয়। রোগের সূত্রপাত হইতেই যদি কোন প্রতি বিধানের উপায় না অবলম্বন করা যায় তাহা হইলে অতি অল্প দিনের

মধ্যেই উহা গাছের চারিদিকে ব্যাপিয়া পড়ে; গাছের তাবৎ পত্র ক্রমে কুঞ্চিত হইয়া যায় এবং তাহার পশ্চাদ্ভাগে লালবর্ণের প্রলেপ পড়ে।

বিগত শীতকালের শেষভাগে আমাদিগের লিচু বাগানে এই রোগের আবির্ভাব হয়। পাতা ভাঙ্গিয়া তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিলাম, একটিও কীট দেখিতে পাইলাম না; তবে উহা যে কোন কীটেরই কার্য্য, তাহা আমার বিশেষ ধারণা ছিল। এই রোগ হইতে অব্যাহতি পাইবার পক্ষে এক মাত্র সহজ উপায়,—আক্রান্ত পত্রগুলিকে বৃক্ষ হইতে ভাঙ্গিয়া আনিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ফেলা। উল্লিখিত স্থানে যে সময়ে রোগ আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তখন ফলের সময়;—গাছে রাশি রাশি লিচু ধরিয়াছে; কাজেই তখন আর পাতা ভাঙ্গা হইল না। তবে রোগাক্রান্ত কয়েকটী পাতা ঘরে আনিয়া, নানা উপায় অবলম্বন দ্বারা উহা হইতে কীট উপৎপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু তখনও শীতের প্রাখর্য্য থাকায় ৫।৭ দিবসেও কীট জন্মিল না দেখিয়া, আর সে বিষয়ে লক্ষ করি নাই। সম্প্রতি পূর্ব্ববৎ কয়েকটী রোগগ্রস্ত পত্র আনিয়া এক খণ্ড লিণ্টের মধ্যে তিন চারি দিন রাখিয়া দিই। এক্ষণে গরম দিন পড়িয়াছে এবং লিণ্টেরও নিজের একটা উত্তাপ আছে; সুতরাং তাহার মধ্যে থাকিয়া দুই তিন দিন মধ্যে বিস্তর কীট জন্মিল। পূর্ব্বে যে ইষ্টক বর্ণের প্রলেপবৎ পদার্থের উল্লেখ করিয়াছি, উহা কীটগণের ডিম্বাবস্থা। কীট অতিশয় ক্ষুদ্র এবং ফিকে সবুজ বর্ণের। ইংরাজিতে এইরূপ পোকাকে মাইট বলে। কীটতত্ত্ববিদগণ ইহাকে আকারিনা জাতিভুক্ত করিয়া, আবাকৃনিদা শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

কোঁকড়া রোগ গাছের সকল অংশকে আক্রমণ করে না; শাখা প্রশাখার উপরভাগের কিয়দংশকে আক্রমণ করে মাত্র। সুতরাং কোঁকড়াগ্রস্ত তাবত ভাগই ভাঙ্গিয়া বিগদ্ধ করিয়া ফেলিতে পারিলে মঙ্গলের বিষয়। প্রতিকার করিতে যত বিলম্ব হইবে, ততই উহা বিস্তৃত হইয়া পড়িবে; তখন আর তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া সহজ হইবে না।

পত্রাদি

গোলাজাত শস্যের পোকা নিবারণ—কার্ব্বণ ডাইসলফাইড

শ্রীযুত সোণারাম কাকতি, কস্থান গ্রাম, টেঙলা পোঃ, আসাম।

নূতন আমন ও আউশ ধান্যের প্রস্তুত আতপ চালে Carbon disulphide মিশাইলে কত দিন পর্য্যন্ত ঐ মিশ্রিত চাল পোকায় নষ্ট করিতে পারে না বা চালে গুঁড়া জমিতে পারে না ?

কার্ব্বণ ডাইসালফাইড—Carbon disulphide যে কোন সিদ্ধ চালে মাখাইয়া রাখিলে আতপ চাল অপেক্ষা কত দিন পর্য্যন্ত পোকায় নষ্ট করিতে পারে না ?

বপন জন্য যে বীজ রক্ষিত হয় ঐ বীজে Carbon disulphide মাখাইয়া রাখিলে ঐ বীজ অঙ্কুরোদ্গম হইবে কি না ?

Carbon disulphide চাল এবং শস্যাদিতে কিরূপ ভাবে মিশাইতে হয় এবং এই পদার্থের প্রতি পাউণ্ডে বা মণে কি দামে কাহার নিকট কোন ঠিকানায় পাওয়া যায়, ইত্যাদি নিবেদন ইতি।

উত্তর--

কার্ব্বণ ডাইসলফাইড ছেঁড়া কাপড়ের ছোট ছোট পুঁটালি করিয়া চালের উপর রাখিয়া দিতে হয়। ইহা এক সঙ্গে অধিক ব্যবহারের আবশ্যক নাই। যে পাত্রে বা জালাতে ৪ কিম্বা ৫ মণ চাউল ধরে তাহাতে একটি বা দুইটি পুঁটালি রাখিলেই যথেষ্ট। প্রত্যেক পুঁটালিতে ১ তোলা কার্ব্বণ ডাইসলফাইড থাকিলেই যথেষ্ট। যে শস্য-গোলাতে তিনশত মণ চাউল ধরে তাহাতে এক পাউণ্ড কার্ব্বণ ডাইসলফাইডের কতকগুলি পুঁটালি করিয়া ইতস্ততঃ রাখিয়া দিতে হয়। ইহা কর্পূরের ন্যায় উবিয়া যায়, এক বার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলে না। যত দিন শস্যের ভিতর কার্ব্বণ ডাইসলফাইডের তেজ ও গন্ধ থাকিবে তত দিন তাহার ঝাঁজে তাহাতে পোকা লাগিবে না। এই জন্য ইহা উবিয়া যাইলে পুনরায় দিতে হয়। চাউল বা শস্য কার্ব্বণ ডাইসলফাইড দ্বারা যতদিন ইচ্ছা পোকার হাত হইতে রক্ষা করা যায়।

বীজ শস্যের একটি খোসা বা আবরণ থাকায় তাহাতে কার্ব্বণ ডাইসলফাইড চূর্ণ বা ন্যাপথালিন প্রভৃতি মিশাইলে তাহার ভিতরের অঙ্কুর নষ্ট হয় না।

কার্ব্বণ ডাইসলফাইডের দাম কত জানা নাই। বড় বড় ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকট পাওয়া যায়।

খাদ্যার্থ পক্ষীপালন

শ্রীতারিণীপদ সিংহ, রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া।

তাঁহার হাওড়া টাউনের নিকটবর্ত্তী স্থানে একটি বিস্তৃত বাগান ও জমি আছে, তিনি তথায় কৃষিকর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে হাঁস, মুর্গী প্রভৃতি খাদ্যার্থ পক্ষীপালন করিতে চান। কোন জাতীয় মুর্গী পোষণ লাভজনক জানিতে ইচ্ছা করেন।

তদুত্তরে তাঁহাকে জানান যায় যে, ইউরোপীয় প্রথানুসারে কৃষিক্ষেত্র রচনা করা মন্দ নহে। ইউরোপ, আমেরিকায় কৃষিক্ষেত্রে ও পক্ষীপালনের এমন কি মৌমাছি পালনের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল দেশের কৃষকপরিবারগণ সকলেই ক্ষেত্রকর্ম্মে রত। তাহাদের বেশ কাজের শৃঙ্খলা আছে, কাজ ভাগ করিয়া লইয়া ছোট বড় সকলেই আপন আপন কাজে রত। আলস্য কাহাকে বলে তাহারা জানে না। কিন্তু এখানে যে ক্ষেত্রস্বামী তাহার যেন যত দায়, সে যাহা না দেখিবে তাহা হইবে না, তাই কতকগুলি কাজ জড়াইলে কোন কাজই সুসম্পন্ন হয় না। সুতরাং অবস্থা বুঝিয়া আপনিই সুব্যবস্থা করিয়া লইবেন।

মুর্গীর ভালমন্দ সম্বন্ধে আপনাকে বলা যায় যে, আমাদের দেশের চট্টগ্রামের মুর্গী ভাল ও বড়। ছোটনাগপুর, পুরুলিয়া, মানভূমে যথেষ্ট মুর্গী পাওয়া যায়—সে গুলি আকারে কিছু ছোট কিন্তু দামে খুব সস্তা, এমন কি টাকায় ষোলটা মুর্গী পাওয়া যায়। চাটগাঁয়ের মুর্গীর দাম কিছু বেশী। এই দুই জাতীয় মুর্গীর সঙ্কর হইলে ভাল ফল হইতে পারে। বিলাতী বা অষ্ট্রেলিয়ান মুর্গী দুই চারিটি আনাইয়া ক্রমশঃ ইহাদের বংশোন্নতির চেষ্টা করিলে আরও ভাল ফল হইবে। পাতিহাঁস ও রাজহাঁস দুই প্রকার হাঁসই পালন করা উচিত। ডিম বিক্রয়ে খুব লাভ আছে।

কাট তিল

শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ সিংহ, মজঃফরপুর, লিখিতেছেন যে, কৃষ্ণতিল অপেক্ষা কাটতিলের ফলন অধিক। তিনি জানিতে চাহেন, কাটতিল ও কৃষ্ণতিলে কোন প্রভেদ আছে কি না ও অন্য কোন প্রকার তিল আছে কি না এবং তাহাদের চাষ প্রণালী কিরূপ। তদুত্তরে লেখা যায় যে, তিল সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ না লিখিলে তাঁহার প্রশ্নের সম্যক উত্তর হয় না। ভবিষ্যতে সুবিধা মত তৈলশস্য সম্বন্ধে আমরা কয়েকটি প্রবন্ধ কৃষকে বাহির করিতে ইচ্ছা করি। এক্ষণে সংক্ষেপে জানান যায় যে, কৃষ্ণতিল খুব কৃষ্ণবর্ণ কিন্তু কাটতিল তত কাল নহে, কতকটা পাটলবর্ণ বলা যায় তাহাতে কালর আভা আছে। এক প্রকার খুব শাদা তিল আছে, আর এক প্রকার তিল আছে তাহাকে কার্ত্তিকে তিল বলে, তাহার একই গাছে শাদা কাল দুই রকম তিলই হয়। কিন্তু কৃষ্ণতিলের মত কাল নহে বা

শ্বেত তিলের মত অত শাদা নহে। কৃষ্ণতিল শ্রাবণ মাসে বোনা হয়, শাদা তিল বা কার্ত্তিকে তিল তাহার আগেই বোনা হইয়া যায়—আষাঢ়ের শেষে এই দুই তিলের বপন কার্য্য আরম্ভ হয় এবং শ্রাবণের প্রথমেই শেষ না হইলে ফসল ভাল হয় না। কাটতিল বুনিতে হয় মাঘ মাসে। কেবল লোণা জমিতে তিলের আবাদ হয় না, দোয়াঁশ ও মেটেল জমিতে তিল বেশ হয়। ধান ক্ষেতের জল শুকাইয়া গেলে, নরম ভিজা মাটির উপর ধান গাছের ফাঁকে ফাঁকে তিল বুনিবার প্রথা অনেক স্থানে আছে। এক বিঘা জমিতে বুনানির জন্য আড়াই হইতে তিন পোয়া বীজের আবশ্যক। কাটতিলেরই ফলন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, এক বিঘায় ৩/ মণ বা তাহার অধিক তিল জন্মায়। অন্য তিল ২/ মণ কিম্বা ২॥০ আড়াই মণের অধিক হয় না।

সার-সংগ্রহ

বাণিজ্য সংবাদ

যশোহর, কোম্ব, বটন ও ম্যাট ম্যানুফেক্চারিং কোম্পানী— নড়াইলের উৎসাহী জমিদার শ্রীযুক্ত ভবেন্দ্রচন্দ্র রায় এই কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্ট এবং শ্রীযুক্ত এম, এন, ঘোষ এস, সি, ই ইহার কার্য্যপরিচালক। এই কোম্পানীর চিরুণী দেখিয়া সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এই কোম্পানীর ১৯১২-১৩ সালের কার্য্যবিবরণ পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। গত বৎসর ১০৬৫৩/৫ আয় ও ৮৯৯০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। পূর্ব্বের লোকসান বাবতে ৩২৩৩ টাকা না দিতে হইলে গত বৎসর শতকরা ১৫ টাকা লাভ হইত, কিন্তু পূর্ব্বের ঋণ শোধ করাতে ৪ টাকা লাভ দেওয়া হইয়াছে। এই কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্ট ও কার্য্য পরিচালক উভয়েই সৎ ও কর্ম্মশীল, সুতরাং দিন দিন যে ইহার উন্নতি হইবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

এলুমিনিয়ামের ব্যবসায়— ভারতবর্ষে দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। ১৯০৪-৫ খ্রীষ্টাব্দে বিদেশ হইতে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার এলুমিনিয়াম ধাতু আমদানি হইয়াছিল, ১৯১২-১৩ সালে ২৫॥ লক্ষ টাকার ধাতু আমদানি হইয়াছে। এই ধাতু হইতে মান্দ্রাজ অঞ্চলে নানা প্রকার বাসন তৈয়ার হইতেছে। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সে বাসনের কাটতি দিন দিন বাড়িতেছে। মিঃ চেটার্টনের যত্নে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট তথাকার কতিপয় লোককে ক্রোম লেদার ও এলুমিনিয়ামের বাসন তৈয়ার শিখাইয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট কতগুলি লোককে এই ব্যবসায় শিক্ষা দিয়া এখন তাহার ভার সাধারণ লোকের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট,

বিশেষতঃ মিঃ চেটার্টন, এই নূতন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার জন্ম ভারতবাসীর বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। মিঃ চেটার্টন সম্প্রতি এই প্রস্তাব করিয়াছেন যে ভারতবর্ষে এলুমিনিয়াম ধাতু নির্ম্মাণের সমস্ত উপাদান পাওয়া যায়, এই ধাতুর সমাদর ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইবে, অতএব এই ধাতু নির্ম্মাণের যন্ত্রাদি আনিয়া ভারতবর্ষেই উহা তৈয়ার করা কর্ত্তব্য।

বাতির কারখানা—বোম্বাইয়ের অন্তর্গত বিলিমোরা নামক স্থানে এক বাতির কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কারখানাটির ক্রমেই উন্নতি হইতেছে।

ধান

ধানই বাঙ্গালার প্রধান শস্য, ধানই বাঙ্গালীর প্রাণ। চাষবাসের কথা বলিলেই আগে ধানের কথা মনে হয়। বঙ্গদেশে যে ধান জন্মে তার বার আনা ভাগ আমন বা শালি ধান, বাকী চারি আনা আশু বা আউশ। সমস্ত বাঙ্গলার মধ্যে কেবল নদীয়া জেলায় আমন অপেক্ষা আউশের চাষ বেশী। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমন ধানের কথাই বলা যাইতেছে।

পশ্চিম বঙ্গ অপেক্ষা পূর্ব্ববঙ্গে বৃষ্টি অনেক বেশী। বর্দ্ধমান বা বাঁকুড়া অপেক্ষা মৈমনসিংহ বা ঢাকায় প্রায় দেড়গুণ বেশী বৃষ্টি হয়। বরিশাল, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, জলপাইগুড়ী প্রভৃতি স্থানে বৃষ্টির পরিমাণ আরও বেশী। আমন ধানের জন্ম পূর্ব্ববঙ্গে জলের বড় কখনও অভাব হয় না। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গে অনেক সময়ে বৃষ্টির অভাবে ধান মারা যায়। প্রাচীন পুষ্করিণী ও বাঁধ অনেকস্থলে ভরাট হইয়া গিয়াছে ও তাহাদের পাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অনেক স্থলে প্রাচীন দাঁড়ার চিহ্ন নাই। সুতরাং বৃষ্টির অভাবে ক্ষেতে জল দেওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বাগ্রে ইহারই ব্যবস্থা প্রয়োজন। যাঁহারা গয়া জেলায় ক্ষেতে জল দিবার বন্দোবস্ত একবার দেখিয়াছেন, তাঁহারা অনুভব করিবেন জমীদার ও প্রজা মিলিত হইলে এ বিষয়ে কতদুর কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভব। জেলার কালেক্টার ও মহকুমার ডেপুটি কালেক্টারগণ এ বিষয়ে মনোযোগী হইলে পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার, ভাঙ্গা বাঁধের সংস্কার ও বিলুপ্ত প্রায় দাঁড়া প্রভৃতির পুনঃ খনন বিষয়ে জমীদার ও রাইয়তদিগকে মিলাইয়া অনেক কাজ করিতে পারেন। বর্দ্ধমান বিভাগ সম্বন্ধেই এই বিষয়টী বিশেষ প্রয়োজন। প্রেসিডেন্সী বিভাগের জমীর প্রকৃতি স্বতন্ত্র, সেখানে ক্ষেতে জল দেওয়া চলে না।

অনেকের বিশ্বাস যে, সরকারী কৃষি পরীক্ষাক্ষেত্রে প্রমাণ হইয়াছে যে, ধানের জন্য গোবর সার না দিয়া হাড়ের গুঁড়া দিলে ভাল হয়। সরকারী রিপোর্টে ত এ কথা নাই। এ কথা কোথা হইতে উঠিয়াছে জানি না, কিন্তু কথাটী সম্পূর্ণ

ভূল। চীন ও জাপানে মানুষের মলমূত্র ফসলের সাররূপে ব্যবহার করা হয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে গোবরই চাষের প্রধান সহায়। ইউরোপ ও আমেরিকায় বিশেষতঃ ইংলণ্ডে মাংসার্থে পশুপালন কৃষির একটী অঙ্গ। সুতরাং সেখানে গোবরও যথেষ্ট। বাঙ্গলায় ক্ষেতে দিবার মত যথেষ্ট গোবর নাই। সামান্য যে গোবর আছে, তাহারও অধিকাংশ ঘুঁটে করিয়া জ্বালান হইয়া থাকে। ধানের জন্য বিঘা প্রতি (৮০ হাত × ৮০ হাত) দু গাড়ী অর্থাৎ ১৫/০। ২০/০ মণ গোবর জমীতে দেওয়া উচিত—সরকারী রিপোর্টে ইহাই বলা হইতেছে। তবে অভাব পক্ষে, অর্থাৎ যেখানে সে পরিমাণ গোবর দেওয়া যাইতে পারে না, সেখানে বিঘা প্রতি ১/০ এক মণ হাড়ের গুঁড়া দিতে পারা যায়। বেশী দিলেও ক্ষতি হয় না, উহা ধান, রোপণের পূর্ব্বে যখন খুসী তখনই জমীতে দেওয়া যাইতে পারে, উহা রৌদ্রে উড়িয়া যাইবে না, বা বৃষ্টিতে ধুইয়া যাইবে না। উহার শক্তি বা তেজ অনেক বৎসর ধরিয়া জমীতে থাকিবে, সুতরাং প্রতি বৎসর না দিলেও চলিবে। হাড়ের গুঁড়া দেওয়াতে কোন জমীর বা কোন ফসলেরই ক্ষতি হইবে না, তবে কোন কোন অঞ্চলের জমীতে হাড়ের গুঁড়ায় বেশী, আর কোথাও কোথাও বা কম উপকার হয়। এইটীই বিবেচনার বিষয়। ইহার জন্য একটী সহজ পরীক্ষা করা যাইতে পারে। যে জমীতে কয়েক বৎসর গোবর একেবারেই দেওয়া হয় নাই, বা যথেষ্ট পরিমাণে দেওয়া হয় নাই, সেই জমীর খানিকটা জায়গায় হাড়ের গুঁড়া দিয়া দেখ ফল কি প্রকার হয়। অর্থাৎ দেখ সে স্থানের ফসলই বা কেমন হয় আর জমীটার যে অংশে হাড়ের গুঁড়া পড়িল না, সেখানে ফসল কেমন হয়। কাদা করিবার সময়ে দিলেও চলিতে পারে।

গোবর আবার হইলেই হয় না। গরুকে যত ভাল খাইতে দিবে, ততই তার গোবরে বেশী তেজ হইবে। রৌদ্র বৃষ্টিতে খোলা পড়িয়া থাকিলে গোবরের সার ভাগ প্রায় সমস্তই উড়িয়া যায় ও ধুইয়া যায়। একটা গর্ত্তের মধ্যে খুব চাপিয়া চাপিয়া গোবর রাখা উচিত, শুকাইয়া না যায় সেজন্য মাঝে মাঝে জল দেওয়া উচিত ও গর্ত্তটার উপরে একটা চাল বাঁধিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ইংলণ্ডে যে সকল গরুকে বাঁধিয়া খাওয়ান হয় তাহাদের গোয়াল হইতে প্রতিদিন গোবর বাহির করা হয় না। দুই তিন মাসে, কি আরও বেশী, বিলম্বে এক এক বার গোবর পরিষ্কার করা হয়। গরুকে পরিষ্কার রাখিবার জন্য গোশালার মধ্যে গোবরের উপরে প্রায় প্রত্যহ কিছু কিছু বিচালী ছড়াইয়া দেওয়া হয়। এই প্রকার গরুর পায়ে মাড়ান ও গোশালায় জমা হওয়া গোবরই শ্রেষ্ঠ। এদেশেও পরীক্ষা দ্বারা ইহা প্রমাণ হইয়াছে। গোয়াল প্রতিদিন পরিষ্কার না করাতে এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া গোবর গরুর পায়ের নীচে জমিতে থাকায় গরুর কোনও অনিষ্ট

হয় না। কাঠ বা ঘুঁটের ছাইও অতি উৎকৃষ্ট সার। প্রতিদিন রান্নাঘরে যে ছাই হয় তাহা গোয়ালে ছড়াইয়া দেওয়া উচিত, এবং গোয়াল যদি প্রতিদিন পরিষ্কার করাই ব্যবস্থা হয় তবে গোবরের সহিত উহা সারের গর্ত্তে রাখা উচিত। বৃষ্টিতে ছাইয়েরও সার ভাগ (অর্থাৎ ক্ষারাংশ) ধুইয়া যায়, যাহা পড়িয়া থাকে তাহা তাহা অত্যন্ত অসার। পাথুরিয়া কয়লার ছাইয়ে কোন উপকার নাই, উহা সারই নহে।

আমাদের এই বাঙ্গলা দেশে অনেক রকমের ধান আছে। তাহার মধ্যে প্রায় ১৫০ রকমের ধান লইয়া ঢাকা সরকারী কৃষি ক্ষেত্রে পরীক্ষা চলিতেছে। সর্ব্বদাই দেখা যায় যে পাশাপাশী জমীতে কেহ এক ধান, কেহ অন্য ধান করিতেছে। আমার প্রতিবেশীর ধানের ফলন যদি বিঘায় এক কি আধ মণও বেশী হয়, আমি তাহাই করি না কেন ? করি না, তাহার কারণ এই যে ঠিক জানি না, তার ধান ফলে বেশী কি আমার ধান ফলে বেশী। বিষয়টী পরীক্ষা সাপেক্ষ। আর এক কথা এই যে, গম অপেক্ষা চাউল (অর্থাৎ রুটী অপেক্ষা ভাত) খাদ্য হিসাবে নিকৃষ্ট। কিন্তু আবার সব গমও একরূপ নহে, সব চাউলও একরূপ নহে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার চাউলের মধ্যে উপকারিতা ও পুষ্টিকারিতায় গুরুতর প্রভেদ আছে। কোন্ ধানের ফলন বেশী, আর কোন্ ধানের চাউল বেশী পুষ্টিকর বা উপকারী ইহাই ঢাকা কৃষিক্ষেত্রের পরীক্ষার বিষয়। অল্পদিন হইল পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছে, আজ পর্য্যন্তও কোন কথা স্থির হয় নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা যাদুঘরের অধ্যক্ষ হুপার সাহেব বঙ্গদেশের প্রায় ৩০ রকম চাউল পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি দেখাইয়াছিলেন যে. এই ৩০ রকমের মধ্যে কাজলা সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর ও দাদখানি চাউল সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। সেই জন্যই দাদখানি রোগীর পথ্য। অধিকাংশ স্থলেই গুণের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। কোন ধানের ফলন বেশী, তাহা তাঁহার পরীক্ষার বিষয় ছিল না।

আমি যে ধানই করি না কেন, যদি বীজের জন্য বাছিয়া বাছিয়া ভাল শীষ রাখি, সে বীজ হইতে উৎপন্ন ফসল ভাল হইবেই হইবে। ধান পাকিলে কাটিবার ঠিক পূর্ব্বে এইরূপ শীষ বাছাই করা কর্ত্তব্য। কাজটা কিছুই কঠিন নহে, তবে পরিশ্রম সাপেক্ষ। ক্রমে ইহাতে বিশেষ ফল লাভ হইবে।

আমন ধান অবশ্য দুই প্রকারে উৎপাদন করা হয়। নীচু জমীতে ক্ষেতেই বীজ ছড়াইয়া বুনা হয়, আর অপেক্ষাকৃত উচ্চ জমীতে অন্যত্র চারা তৈয়ারী করিয়া রোপণ করা হয়। যেখানে বুনিয়া দেওয়া হয়, সেখানে প্রতি বিঘায় দশ হইতে পনর সের বীজ ব্যবহার করা হয়। যেমন প্রচলিত নিয়ম আছে, সেই মত বুনিয়া গাছ বাহির হইলে ক্ষেতের মধ্যে খানিকটা জমীর গাছ পাতলা

করিয়া দাও। বুদ্ধিমান চাষী চোখে দেখিয়াই কিছুদিন পরে বুঝিবে যে ফল কি হইল। যদি ফল ভাল নাই হয়, লোকসান অতি সামান্যই হইবে। কিন্তু ফল ভালই হইবে ও ভবিষ্যতে অনেক বীজ বাঁচিবে।

ধান রোপণ সম্বন্ধে পূর্ব্ববঙ্গের ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে নিয়ম এই যে, এক একটী করিয়া চারা রোপণ হয়। বাঙ্গলার অন্যান্য জেলায় ৫ কিম্বা ৬টী হইতে ১০।১২টী বা ততোধিক চারা একসঙ্গে (অর্থাৎ এক এক গুছিতে) রোপণ করাই প্রচলিত। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এবং চীন জাপান প্রভৃতি দেশেও ১০।১২টী বা ততোধিক চারা একত্রে রোপণই নিয়ম। কিন্তু চুচুঁড়া, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানের সরকারী কৃষিক্ষেত্রে পরীক্ষায় দেখা যাইতেছে যে ২।১টী চারা রোপণই শ্রেষ্ঠ। ইহাতে ফলনও কিছু বাড়ে, বীজ ত অনেক বাঁচেই। গরীব চাষীর পক্ষে তাই বা মন্দ কি? এ বিষয়ে মান্দ্রাজ ও সিংহলের সরকারী কৃষি-ক্ষেত্রেও পরীক্ষা হইয়াছে ও ২।১ চারা হইতেই ভাল ফল দেখা গিয়াছে। আমাদের চাষীরা সহজেই নিজেরা এ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে। যেমন নিয়ম আছে, সেই মত ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া দু একটী সারি মাত্র এই প্রকার ২।১টী চারা দিয়া রোপণ কর। কিছুদিন পরেই দেখিবে এগুলি হইতেই বা কিরূপ ঝাড় বাঁধে, আর প্রচলিত নিয়ম অনুসারে রোপিত চারা হইতেই বা কিরূপ ঝাড় বাঁধে। যদি ফল ভাল নাই হয়, সমস্ত ক্ষেত্রের কিছু হানি হইবে না। লোকসান হইলেও অতি সামান্যই হইবে, কিন্তু লোকসান হইবে না ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

আমাদের দেশে অনেক ভদ্রলোকের চাষ আছে। শেষোক্ত কয়েকটী বিষয়ে তাঁহারা একটু অগ্রসর হইলে ভাল হয়। নিতান্ত নিরক্ষর চাষীরা ইহাতে অগ্রসর হইবে না।

বাগানের মাসিক কার্য্য

ভাদ্র মাস

কৃষিক্ষেত্র।—যে সকল জমিতে শীতকালের ফসল করিতে হইবে, তাহাতে এই মাসে গোময়াদি সার প্রয়োগ করিয়া চষিয়া ঠিক করিয়া লইতে হইবে।

সার মিশ্রিত গামলা বা কাঠের বাক্সে কপিবীজ বপন করিয়া এই সময় চারা তৈয়ারি করিতে হয়। মৃত্তিকার সমপরিমাণ পাতাসার মিশ্রিত করিতে পারিলে ভাল হয়। জলদি ফসলের জন্য ইতিপূর্ব্বেই চারা প্রস্তুত হওয়া উচিত। আর একটি কথা এস্থলে বলা আবশ্যক যে, অধিক জমিতে চাষ করিতে গেলে বাক্সে বা গামলায় বীজ বপন করিয়া পোষায় না। উচ্চ জমিতে চারিদিকে আইল বাঁধিয়া

বীজ বপন করিতে হয়। বীজতলা আবশ্যক মত চোগলা দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হয়। কোন কোন সুনিপুণ চাষী খেঁতো বাঁশের মাচান করিয়া তাহার উপর ৬।৮ ইঞ্চি পুরু মাটি ছড়াইয়া বীজ বপন করে।

অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট বোমা বা বিচালি গুচ্ছের অগ্রভাগ দ্বারা বীজক্ষেত্রে জল ছিটাইতে হয়।

আশ্বিন কিম্বা কার্ত্তিক মাসে যাহাতে আলু বসাইবে, সে সকল জমিতেও এই সময় উত্তমরূপ চাষ দিতে হইবে ও সার ছিটাইতে হইবে।

শীতকালের জন্য লাউ, কুমড়া বীজ এই সময় বসাইবে। লাউ, কুমড়া বীজ ৩।৪ দিন হুকার জলে ভিজাইয়া বপন করিলে বীজগুলি পোকায় নষ্ট করিতে পারে না।

ওল ও মানকচু তুলিবার এই সময়। এই সময় তাহারা খাইবার উপযুক্ত হয়।

এই মাসের প্রথমেই, উত্তর-পশ্চিম, বেহার প্রভৃতি স্থানে কপির চারা ক্ষেতে বসান শেষ হইয়া যাইবে। বাঙ্গালা প্রদেশে এই মাসের শেষে কার্য্য আরম্ভ হইবে। পাটনাই ফুলকপির চারা ক্ষেতে বসান এতদিন হইয়া যাওয়া উচিত।

সেলেরী (Celery), এসপারেগস (Asparagus) ও দুই এক জাতীয় টমাটোর (Tomato) চাষ এই সময় হওয়া উচিত।

লাউ, কুমড়া, শাঁকালু, বীট, পাটনাই শালগম ও গাজর, পালম, নটে প্রভৃতি নানাপ্রকার শাক সব্জী, শসা প্রভৃতি দেশী সব্জী তৈয়ার করিতে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

মূলা, মটর প্রভৃতির জন্য জমিতে গোবর সার দিয়া ভাল করিয়া চষিয়া তৈয়ারি করিয়া রাখিতে হইবে।

ফলের বাগান।—লিচু, লেবু প্রভৃতি ফলগাছের যাহাদের গুল কলম করিতে হইবে তাহাদের গুল কলম করা শেষ হইয়াছে, কিন্তু আম প্রভৃতির জোড়কলম বাঁধা এখনও চলিতেছে।

বীজ নারিকেল, হইতে চারা করিবার জন্য এই সময় মাটিতে বসাইতে হইবে।

যে সকল নারিকেল গাছ হইতে পাকিয়া ও শুকাইয়া আপনি পড়ে, তাহাদিগকে গলন নারিকেল কহে। একটী শীতল স্থানে কাদা করিয়া তাহাতে গলন নারিকেল এক পাশে হেলাইয়া বোঁটার দিক উপরে রাখিয়া বসাইতে হয় ও আবশ্যক মত জল সিঞ্চন করিতে হয়।

ফুলের বাগান।—বালসম (Balsam), জিনিয়া (Zinnia), কনভলভিউলাস মেজর (Convolvulus Major), আইপোমিয়া (Ipomœa) প্রভৃতি ফুল গাছ তৈয়ার করিবার এই সময়। কতকগুলি জাপানী লিলি আছে সেগুলি জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় মাসে বসান উচিত, কারণ সেগুলির বর্ষাতেই ফুল ফুটিতে আরম্ভ হয়। এই সময় প্যান্সী এষ্টার, মিগ্নোনেট বীজ প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে বপন করা উচিত।

কৃষক

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৪শ খণ্ড। | ভাদ্র, ১৩২০ সাল। | ৫ম সংখ্যা।

কৃষি-সূচনা।

(কৃষিবিদ্যার প্রসার সম্বন্ধীয় প্রাচীন ইতিহাস)

শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দেব বি,এস,সি, লিখিত।

পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট হইতে আমরা যে সমস্ত অমূল্য সম্পত্তি "উত্তরাধিকার সূত্রে" "পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিবার স্বত্বে" লাভ করিয়াছি তাহার মধ্যে কৃষিবিদ্যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু উত্তাল তরঙ্গমালা বিক্ষোভিত এ কালসাগরের তীরে দাঁড়াইয়া আজ বলা কঠিন কে কবে কোন দেশ হইতে এ অমূল্য রত্নমেরু প্রথম সন্ধান দিয়াছিল। নানা দেশের প্রাচীনকালের কাব্যনিবদ্ধ কিম্বদন্তী সমূহ আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে প্রাচীনেরা কৃষিবিদ্যার সূচনা ও নব নব হিতকারী উদ্ভিদের প্রবর্ত্তন প্রভৃতি ব্যাপার দৈব উপায়ে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, অথবা উক্ত ব্যাপার সমূহ কোন প্রবল প্রতাপান্বিত ভূস্বামী বা বিশেষ শক্তিশালী ব্যক্তির দ্বারা সংসাধিত হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেন। আমাদের দেশেও কিম্বদন্তী আছে যে ভিষগ্‌শ্রেষ্ঠ দেবাদিদেব মহাদেবই ঔষধি সমূহের সৃষ্টি করেন। মুনিপ্রবর বিশ্বামিত্রই নাকি নারিকেলের সৃষ্টিকর্ত্তা। এরূপ আরও কত শত কিম্বদন্তী এদেশে প্রচলিত আছে তাহা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্যকরূপে উল্লেখ করা সম্ভবপর নহে, কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে উক্ত বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্য হওয়া কতদূর অসম্ভব। বিশেষতঃ আজ ও যে সমস্ত জাতি বর্ব্বর অবস্থায় রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে কৃষিবিদ্যার প্রসারের চেষ্টা দেখিলেও বুঝিতে পারা যায় যে প্রাচীনদিগের ধারণা বাস্তবিক পক্ষে ঠিক নহে।

এতদ সম্বন্ধে প্রাচীন কিম্বদন্তী।

ঐতিহাসিক জগতে কৃষিবিদ্যা মানব সভ্যতার সহিত অপরিহার্য্যভাবে একসূত্রে

মানব সভ্যতার সহিত কৃষিবিদ্যার অপরিহার্য্য সম্বন্ধ।

গ্রথিত। অর্থাৎ যে যে জাতি যত সভ্য হইয়াছে কৃষিবিদ্যা ও তাহাদের মধ্যে তত বহুলভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু সভ্যতার ক্রমোন্নতির ইতিহাসের ধারা স্বভাবতঃই অতিশয় ক্ষীণ এবং পুণ্যতোয়া ফল্গুনদীবৎ অবসন্ন। সুতরাং কৃষি-বিদ্যার ইতিহাসের ধারাও যে খুব সুস্পষ্ট হইবে বলিয়া আশা করা যায় না এ কথা বলাই বাহুল্য। মানুষ যখন প্রথমে জীবজগতের উপর প্রাধান্য লাভ করিয়া অরণ্যানী মধ্যে সুদৃশ্য সুমিষ্ট ফল মূল কাণ্ড দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছিল, তখন অনায়াসলব্ধ ফল মূল ইত্যাদি আহরণ করাই তাহাদের অভ্যাস হইয়া পড়িয়াছিল। যাহা অনায়াসে পাওয়া যায় তাহা পরিত্যাগ করিয়া কেহ আয়াস স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। সুতরাং সুপ্রাপ্য ফল মূল আহরণ এবং কষ্ট সাধ্য কৃষিকার্য্য এই দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান অনেক এবং এই ব্যবধানের মধ্যে অনেক বিস্ময়কর তথ্য নিহিত আছে।

স্বচ্ছন্দ বনজাত ফল মূল আহরণের পরিবর্ত্তে মানুষকে কৃষিকার্য্যে নিয়োজিত

প্রাচীন মানব কৃষিকার্য্য প্রবৃত্ত হইল কেন?

করিবার জন্য এমন বিশেষ কতকগুলি গুণাবলী উদ্ভিদ বিশেষে বর্ত্তমান ছিল, যে ঐ সমস্ত গুণাবলীর দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া মানুষ কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথমতঃ উদ্ভিদ বিশেষের কোন উপকারিতা না থাকিলে এবং উহা সহজপ্রাপ্য না হইলে কেহ কষ্ট স্বীকার করিয়া উহা রোপণ করিত না। আজও দেখা যায় যাহারা সভ্যতার নিম্নস্তরে অবস্থিত তাহারাও নিজ নিজ বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী উদ্ভিদ সমূহের সহিত পরিচিত থাকা সত্বেও বিশেষ ফলবস্তু বা অনায়াসলভ্য না হইলে ঐ পার্শ্ববর্ত্তী উদ্ভিদসমূহকে স্ব স্ব অধিকৃত স্থানে রোপণ করিতে বা কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার দিতে সম্মত হয় না। এতদ্ব্যতীত নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, পরিমিত কালব্যাপী বর্ষা, প্রজাগণের হৃদয় বদ্ধমূল নিরুদ্বেগ ভাব এবং স্বচ্ছন্দবনজাত খাদ্যের দুষ্প্রাপ্যতা প্রভৃতি কারণ মানুষকে প্রকৃতিদত্ত ফলমূল আহরণের কার্য্য হইতে বিরত করিয়া কষ্টকর কৃষিকার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিল। মানুষের স্বভাবই এই যে পরিশ্রম লাঘবের উপায় থাকিলে তাহারা পরিশ্রম স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। সুতরাং কৃষিকার্য্যে নিয়োজিত করিবার জন্য বিশেষ আশা, উৎসাহ এবং বলেরও প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল।

অসভ্য সমাজে কৃষি প্রণালীর প্রসার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাহারা

অসভ্য সমাজে কৃষি প্রণালীর প্রসার।

সাধারণতঃ স্ব স্ব অধিকৃত ভূমিতে যে সমস্ত উদ্ভিদ স্বল্প আয়াসে জন্মাইতে পারে তাহাই

রোপণ করে, অথবা তাহাদিগের অপেক্ষা যাহারা অধিকতর প্রাকৃতিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে, তাহাদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া অধিকতর লাভবান হইবার প্রত্যাশায় নূতন উদ্ভিদ রোপণ করিতে আরম্ভ করে।

কৃষিক্ষেত্রে সুপরিচিত অতি প্রাচীন কতিপয় উদ্ভিদ।

ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে পূর্ব্বোক্ত কারণে যব, আলু, ধান্য এবং তামাক প্রভৃতি বর্ষৈক জীবি কতিপয় উদ্ভিদ ঐতিহাসিক কালের পূর্ব্বে হইতেই মানব সমাজের নিকট পরিচিত ছিল। এই পরিচয়ের ফলে মানব সমাজ ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অল্প আবশ্যকীয় উদ্ভিদ সমূহকে কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার দেয় নাই।

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন।

অবশেষে অত্যাবশ্যকীয় উদ্ভিদের আবশ্যকতা যতই উপলব্ধি করিতেছিল, ততই অল্প আবশ্যকীয় বা অনাবশ্যকীয় উদ্ভিদের স্থানে অত্যাবশ্যকীয় উদ্ভিদসমূহের প্রচলন আরম্ভ হইয়াছিল। আজও অধিক লাভজনক বা অধিক আবশ্যকীয় উদ্ভিদের দ্বারা অল্প লাভজনক বা অল্প আবশ্যকীয় উদ্ভিদের স্থানচ্যুতি ঘটিতেছে এরূপ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়। অল্প শ্রমে ও অপেক্ষাকৃত অল্প স্থানে চাষ করিয়া অধিকতর অর্থলাভ হয় বলিয়া আজকাল বহুস্থানে ধান্যের বদলে পাটের চাষ হইতেছে, যৈয়ের বদলে যবের চাষ বৃদ্ধি পাইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই সমস্ত ব্যাপারের মধ্যেও মহর্ষি ডারুইনোক্ত প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের (Natural Selection) প্রভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

স্থানভেদে কৃষিজীবিদিগের সংখ্যার তারতম্য হয় কেন ?

পৃথিবীতে কৃষিজীবিদিগের সংখ্যা সর্ব্বত্র সমান নহে। কোন্ কোন্ বিশেষ স্থানে কৃষিকার্য্যের পক্ষে কি কি সুবিধা এবং অসুবিধা আছে, এই প্রশ্নের উত্তরের উপর স্থানভেদে কৃষিজীবিদিগের সংখ্যার তারতম্য নির্ভর করে। যে যে স্থলে কৃষিকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে এবং যে সমস্ত স্থান বেশ উর্ব্বর অথচ লোকালয় হইতে নিতান্ত দূরে নহে, এমত স্থানেই কৃষিজীবিদিগের সংখ্যা অধিক দেখা যায়।

নানাদেশে প্রাথমিক কৃষিকার্য্যের সূচনা।

এসিয়া মহাদেশের দক্ষিণ ভাগের (ভারতবর্ষ ও এই ভাগেই অবস্থিত) জলবায়ু ধান্য ও দাইলজাতীয় উদ্ভিদের পক্ষে উপযোগী বলিয়া এবং তদ্দেশবাসীগণের উক্ত ধান্যাদি উপযুক্ত খাদ্য বিধায় এসিয়ার দক্ষিণ ভাগে কৃষিজীবিগণ প্রথমতঃ ধান্য ও দাইলজাতীয় উদ্ভিদের কৃষি আরম্ভ করিয়াছিল বলিয়া ধারণা হয়। তদ্রূপ মেসোপটেমিয়া এবং মিসরদেশে বার্লি ও যবের, আফ্রিকায় ধান্যের এবং আমেরিকায় বনজ আলু, ভুট্টা প্রভৃতির প্রথম চাষ আরম্ভ হইয়াছিল। কালক্রমে এই সমস্ত কেন্দ্র হইতেই এই উদ্ভিদগুলি নানাদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু

এসিয়া, ইয়ুরোপ ও আমেরিকার উত্তরভাগের প্রদেশসমূহের জলবায়ু কৃষিকার্য্যের পক্ষে তত সুবিধাজনক নহে বিধায়, এবং তত্তদ্দেশে মৃগয়া ও বন্য ফলাদি আহরণ দ্বারা স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারিত বলিয়া, কৃষিকার্য্য বহুদিন পর্য্যন্ত উক্ত প্রদেশসমূহে অজ্ঞাত ছিল। এদিকে অষ্ট্রেলিয়া, পেটাগোনিয়া এবং এমন কি দক্ষিণ আফ্রিকার অংশ বিশেষের অবস্থা আলোচনা করিলে অনুরূপ ব্যাপার লক্ষিত হয়। অত্যধিক উষ্ণতা এবং গমনাগমনের যৎপরোনাস্তি অসুবিধা বর্ত্তমান থাকায় এ সমস্ত প্রদেশে বহুদিন পর্য্যন্ত বা আদৌ অন্যদেশের উদ্ভিদ সমূহের প্রবর্ত্তন ঘটিতে পারে নাই। দুঃখের বিষয় ঐ সমস্ত প্রদেশ-সুলভ উদ্ভিদসমূহের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প। অনেকে মনে করিতে পারেন, হয়ত অষ্ট্রেলিয়াবাসীদিগের নিশ্চেষ্টতাই এই দৈন্যতার কারণ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তদ্দেশ-সুলভ উদ্ভিদসমূহের প্রকৃতি, জলবায়ু ও মৃত্তিকার উপরেই ইহা স্থূলত নির্ভর করিতেছে। ইংরাজ ঔপনিবেশিকগণ ঐদেশে শতাধিক বৎসরকাল বসতি করা সত্ত্বেও এ পর্য্যন্ত (Tetragonia) নামক এক প্রকার উদ্ভিদ ভিন্ন অন্য নূতন কিছু রোপণ করিয়া সফলকাম হইতে পারেন নাই। স্বনামধন্য উদ্ভিদশাস্ত্রবিৎ বিখ্যাত স্যার জোসেফ হুকার (Sir J. D. Hooker) তাঁহার (Flora of Tasmania) নামক গ্রন্থে তিনি নানা কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে এরূপ একশত উদ্ভিদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু এতদসত্ত্বেও আজ পর্য্যন্ত ঐগুলি কৃষিক্ষেত্রে বিশেষ আদর লাভ করিতেছে না। বোধ হয় অল্পলাভ এবং কষ্টসাপেক্ষ প্রতিপালনই এই অনাদরের কারণ।

পূর্ব্বে যে সমস্ত বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে কোন্ বিশেষ দেশে কোন্ বিশেষ সময়ে কৃষিকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এ বিষয় জানিবার পক্ষে ইতিহাস বিশেষ সাহায্য করে না। কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে সকল দেশে কৃষিকার্য্য এক সময়ে প্রারব্ধ হয় নাই। কৃষি সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যত পৌরাণিক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে মিসরদেশস্থ Gizeh নামক স্থানের চতুষ্কোণ সূক্ষ্মাগ্র স্তূপ বা পিরামিডের অভ্যন্তরে ডুমুর ফলের যে ছবি পাওয়া গিয়াছে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই পিরামিড কত কালের তাহা আজও নির্ণীত হয় নাই। কাহারো কাহারো মতে ইহা খৃষ্টপূর্ব্ব ৪২০০ বৎসর পূর্ব্বেকার, আবার কেহ কেহ ইহা খৃষ্টপূর্ব্ব ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তুত হইয়াছিল, বলিয়া ধারণা করেন। ইহার বয়স যাহাই হউক কিন্তু ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, যে লোক-সমষ্টি ঐ প্রাচীনকালে এরূপ বিরাট স্থাপত্য শিল্পের পরিচয় দিয়াছিল, তাহারা নিশ্চয়ই সভ্যতার উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং নিশ্চয়ই তাহাদের মধ্যে কৃষিবিদ্যা প্রভৃত উন্নতি লাভ

কৃষি সম্বন্ধীয় প্রাচীন নিদর্শনসমূহ।

গিজের পিরামিড।

করিয়াছিল, কারণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে কৃষিবিদ্যা ও সভ্যতার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। এতদ্ব্যতীত Bretschneider's Chinese Botanical Works নামক গ্রন্থে জানা যায় যে, খৃষ্ট পূর্ব্ব ১৭০০ বৎসর পূর্ব্বে চীনদেশীয় সম্রাট চেন্‌মিং এক বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে ধান্য, যব, আলু ও দুইটী বিভিন্নজাতীয় ভুট্টা রোপণ করার প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এ স্থানে বলা আবশ্যক যে যদিও সম্রাটের আজ্ঞায় এই প্রথামত ধান্যাদি পঞ্চশস্য রোপিত হইত বটে, কিন্তু ইহাতে কৃষিবিদ্যার যেটুকু সহায়তা হইয়াছিল সে জন্য ধন্যবাদ সম্রাটের প্রাপ্য কি তাঁহার পূর্ব্বে যে সমস্ত সাধারণ ব্যক্তি পরীক্ষাদ্বারা ঐ সমস্ত উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া সম্রাটকে পর্ব্ব প্রচলন বিষয়ে প্রণোদিত করিয়াছিল তাহাদের প্রাপ্য—তাহা অগ্রে বিচার্য্য। যাহা হউক ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে সম্রাট চেন্‌মিংএর পূর্ব্বেও কৃষিবিদ্যা অজ্ঞাত ছিল না। অতএব চীনদেশেও মিসরদেশের প্রায় সম সময়ে কৃষিকার্য্য আরব্ধ হইয়াছিল বলিয়াই ধারণা হয়। নানা বিষয়ে মিসরদেশের সহিত মেসোপটেমিয়ার সংস্রব ছিল বলিয়া শেষোক্ত প্রদেশেও মিসরের সমকালেই কৃষিবিদ্যার অভ্যুদয় হইয়াছিল।

Bretschneider's Chinese Botanical Works.

আমাদের বেদ ও উপনিষদ।

আমাদের বেদসমূহ অপৌরুষেয় হউক বা না হউক, অন্ততঃ ইহাদের সবিশেষ প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই। এমতাবস্থায় উপনিষদে কৃষিবিদ্যার অন্তর্গত উদ্ভিদাদির যে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে ভারতের সিন্ধু ও গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থানসমূহে যে বহুকাল হইতেই কৃষিবিদ্যা প্রচলিত ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

এসিয়াবাসী আর্য্যগণ কর্ত্তৃক ইয়ুরোপে কৃষিবিদ্যার প্রচলন।

খৃষ্ট পূর্ব্ব ২৫০০—২০০০ বৎসর পূর্ব্বে কেন্দ্রস্থল মধ্য-এসিয়া হইতে আর্য্যগণ ইয়ুরোপে গিয়া তথায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই উন্নত মিসরীয় ও ভিনিসীয়গণ ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী প্রদেশসমূহে অনেক নূতন উদ্ভিদের রোপণ ও প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সুতরাং মধ্য-এসিয়া হইতে ইয়ুরোপ গমন সময়ে আর্য্যগণ ভূমধ্যসাগর সন্নিহিত পশ্চিম এসিয়া খণ্ড হইতে ঐ সমস্ত নূতন উদ্ভিদের অনেকগুলি সঙ্গে করিয়া ইয়ুরোপে লইয়া গিয়াছিলেন। এসিয়া ইয়ুরোপকে শুধু সভ্যতালোকে আলোকিত করে নাই, এককালে কৃষিবিদ্যাও দান করিয়াছিল।

অতএব উপসংহারে ইহা বলা যাইতে পারে যে মিসর ও চেল্‌ডিয়া প্রভৃতি দুই একটী অতি প্রাচীন সভ্যদেশ ব্যতীত অন্যান্য প্রায় সমস্ত দেশই এসিয়া মহাদেশ (এবং পরোক্ষভাবে ভারত) হইতেই কৃষিবিদ্যা লাভ করিয়াছে। সমর্থনার্থ মহর্ষি ডারুইনের প্রধান শিষ্য প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাক্তার ওয়ালেসের "Darwinism" নামক গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তিনি উক্ত গ্রন্থের ৯৭ পৃষ্ঠায় (Macmillan Co. 1912 Edition) লিখিয়াছেন "Most of our domesticated animals and cultivated plants have come to us from the earliest seats of civilisation in western Asia or Egypt" অর্থাৎ আমাদের (ইয়ুরোপীয়দের) অধিকাংশ গৃহপালিত পশু ও রোপিত উদ্ভিদ সভ্যতার আদি নিকেতন পশ্চিম-এসিয়া অথবা মিসর হইতে আসিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে তিনি স্পষ্ট বাক্যে পশ্চিম-এসিয়া ও মিসর দেশের কথা স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু অতি প্রাচীনকালে মিসর ও চেল্‌ডিয়া প্রভৃতি স্থান যখন প্রাচীন সভ্যতার আদর্শভূমি ছিল, তখনও ভারতের সূক্ষ্মবস্ত্রাদি পণ্যরূপে সে সমস্তদেশেও প্রেরিত হইত বলিয়া ভারতবর্ষ তাহাদের নিকট পরিজ্ঞাত ও আদৃত ছিল। তাই আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে তখন ভারতবর্ষও নিশ্চয়ই বিশেষ উন্নত ছিল এবং কৃষিবিদ্যার প্রসার বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল।

উপসংহার
এসিয়া ও ভারতবর্ষের দান।

পাট

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পাটের জমিতে পাল্‌টি আবাদ—প্রতিবৎসর একই জমিতে পাটের আবাদ না করিয়া, ঐ জমিতে অন্য কিছু চাষ করা উচিত। এক ঘেয়ে চাষে জমির অবস্থা ভাল থাকে না। অবশ্য যদি নিচু জমি হয়, আর নিকটে নদী থাকে ও সেই নদীর জল যদি বর্ষাকালে ঐ জমিতে আসা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে সে জমিতে প্রতি বৎসর পাট চাষ চলিতে পারে। কারণ বর্ষার জলের সহিত ঘোরাট পলিমাটি আসিয়া প্রকারান্তরে নূতন করিয়া জমি গঠন করে। নূতন জমির তেজ বেশী। ভাল চাষ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু যদি উচ্চ জমি হয়, আর প্রতি বৎসর সেই জমি ভিন্ন অন্য জমিতে পাট চাষ করা সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে গোময় সার, খৈল ও শণ পাতার সার নীলের সিটে, প্রভৃতি সংযোগে জমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করিয়া তবে প্রতিবৎসর তাহাতে পাট চাষ করা উচিত। আবার অনেক জমীতে এক বৎসরের ভিতর দুইটি বড় বড় চাষ করা হয়। ইহা বড়ই অনিষ্টকর, এবং কোন মতে এই রূপ ভাবে জমি ব্যবহার করা উচিত নহে। ইহাতে জমির উর্ব্বরতা শক্তি অত্যধিক কম হয়। এক বৎসরের ভিতর একই জমিতে দুইটি বৃহৎ চাষ করিতে হইলে, যেমন প্রথমটি শেষ হইবে অমনি নূতন মাটী কাটিয়া সেই জমিতে ছড়াইয়া, জমিটিকে অন্ততঃ ১॥০ হাত গভীর করিয়া কোপাইয়া তাহাতে বেশী পরিমাণে সার দিয়া জমির পুষ্টি সাধন করিয়া তবে দ্বিতীয় চাষে হাত দেওয়া উচিত। আমাদের কৃষকদের সে সঙ্গতি নাই, থাকিলেও তাহারা ঐরূপ করে না, সুতরাং ঐ প্রথা একেবারে বর্জ্জন করাই ভাল। জমির অবস্থা ভাল থাকিলে, ভাল ফসল হয়। যদি জমির অবস্থা ভাল রাখিয়া প্রচুর পরিমাণে পাট উৎপন্ন করিতে হয়, তাহা হইলে যে বৎসর পাট চাষ করা হইবে, তাহার পরবর্ত্তী বৎসরে খেঁসারী, মটর প্রভৃতি ঐ চাষ করিয়া, তাহার পরবর্ত্তী বৎসরে ধান বা সরিষা চাষ করিয়া, মধ্যে পাট চাষ ফাঁক দিলে, প্রতি তৃতীয় বৎসরে দ্বিগুণ পাট হইতে পারে। ফরিদপুর অঞ্চলে এক বৎসরের ভিতর একই জমিতে পাট ও যব চাষ চলিতেছে। ইহার ফলে পাটও খারাপ হইতেছে। আর যবেরত কথাই নাই। অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমিত একটি যবে তিন ইঞ্চি লম্বা শুঁড় হয়। ভাল যব উৎপন্ন করিতে পারিলে ৩৲ হইতে ৩॥০ টাকা মণ দরে তাহা বিক্রয় হয়, আর পাতলা, ছোট দীর্ঘ শুঁড় সংযুক্ত যব কেহ ১।০ টাকাতে কিনিতে চাহে না।

এক্ষণে মৈমনসিং, ত্রিপুরা ও পূর্ণিয়া এই তিনটি জেলায় অধিক পরিমাণে পাট চাষ হয়। মৈমনসিঙেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পাট উৎপন্ন হয়। বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া যায় যে ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাস হইতে ১৯০৬ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত, ফিনলো সাহেব ভারতের সর্ব্বত্র প্রায় পরিভ্রমণ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে বঙ্গদেশের মত পাটের উপযোগী জমি আর কোথাও নাই। পূর্ব্ব বিহারের উপর প্রথমে তিনি সামান্য আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন। তথায় নীলকরেরা পাট জন্মাইবার অনেক চেষ্টা করিয়া যখন সম্যক কৃতকার্য্য লাভে অক্ষম হইল, তখন তিনি সে আশা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমরা অনুসন্ধানের দ্বারা অবগত হইয়াছি যে বিহার অঞ্চলে নিম্নলিখিত স্থানে এক্ষণে বেশ পাট চাষ হইতেছে। মজঃফরপুর, পুলিস ষ্টেসন, কাতরা। মহারাজা সার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুরের জমিদারী। এই স্থানে পাট বেশ জন্মাইতেছে। গাছগুলি প্রায় ৬।৭ হাত লম্বা হয়। তবে পাট কাচিবার দোষে রঙ একটু কালো হইয়া থাকে। তাহার বিশেষ কারণ বোধ হয় এই স্থানের পাট লকনদীর স্রোতের জলে কাচা হয় বলিয়া।

হাজিপুর সবডিভিসনে লালগঞ্জ; ঐখানেও পাট মন্দ হয় না। গাছগুলি প্রায় ৫।৬ হাত লম্বা হইয়া থাকে। যদিও এখানে বদ্ধ জলে পাট কাচা হয়, তথাপি পাট কালো হইয়া থাকে। বারুরাজ থানার অন্তর্গত, বেঙ্গল নর্থওয়েষ্টারণ রেলওয়ের, মতিপুর ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী দেউরিয়া নীল আবাদের নিকট মোটের উপর বেশ পাট জন্মায়। গাছগুলি প্রায় ৫।৬ হাত লম্বা হয়, তবে কাচিবার দোষে রঙ কালো হয়।

মৈগরণ জেলায়, বথিয়া বড় চাকিতে পাট যথেষ্ট জন্মায়। সেখানে বদ্ধজলে পাট কাচা হয়, তথাপি রঙ কালো হয়।

টাটিরিয়া নীল আবাদের নিকট পাট বেশ হয়। তথায় গণ্ডকের জলে পাট কাচা হইয়া থাকে।

মতিহারি পুলিস ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী স্থানে ও বেতিয়া সবডিভিসনে বেশ পাট চাষ হইতেছে। এই স্থানে বদ্ধ জলে পাট কাচা হয়। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নীলকুটি টুকটিয়া নীল আবাদের নিকটবর্ত্তী স্থানে যথেষ্ঠ পরিমাণে পাট জন্মিয়া থাকে।

দারভাঙ্গার ভিতর, জালে পুলিস ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী স্থানে রায় গঙ্গাপ্রসাদ সিংহ বাহাদুরের জমিদারিতে উত্তম পাট চাষ হইতেছে।

মধুবানি সবডিভিসনে দারভাঙ্গার মহারাজের জমিদারিতে বাহিকা সারকেলের ভিতর ও বেশ পাট জন্মাইতেছে। বেহারা থানায়, হাতোরিয়া নীল আবাদের নিকটবর্ত্তী স্থানে বেশ পাট চাষ হইতেছে।

দারভাঙ্গার মহারাজার জমিদারীর ভিতর আলাপুর গারকেলে, শুনা যায় পাট মন্দ হইতেছে না।

বেণিপাটি পুলিস ষ্টেসনের এলাকায় কম্পাউণ্ডের নিকটবর্ত্তী স্থানে পাট জন্মায়। দারভাঙ্গার ভিতর উল্লিখিত সমস্ত স্থানেই পাট বদ্ধ জলে কাচা হয়।

মুঙ্গেরের ভিতরে, বেগুসরাই সবডিভিসনে, চেরিয়া বারিয়ারপুরে, খজরিপুর পুলিশ ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী স্থানে, মাজহোল নীলকুঠির কাছেও বেশ পাট হয়।

ভাগলপুরের ভিতরে, সুপউল ওমদেপুর সবডিভিসনে বেশ পাট জন্মায়।

পূর্ণিয়ার ভিতরে প্রায় সকল স্থানেই পাট হয়। তন্মধ্যে কসবা আরোরিয়া সবডিভিসন এবং ফরবেশগঞ্জ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নেপালের দক্ষিণ তরাইয়ে বেশ পাট হইতেছে।

কিরূপে পাটের জমির পাইট করিতে হয়। কিরূপ জমি পাট চাষের পক্ষে উপযোগী। কোন সময়ে বীজ বপন করিতে হয়। কিরূপে গাছগুলিকে রক্ষা করিতে হয়, কিরূপে পাট প্রস্তুত করিতে হয়, ইত্যাকার সমস্ত আবশ্যকীয় বিষয়েই আলোচনা করিয়াছি। এক্ষণে কিসে পাট গাছ ধ্বংস হয়, আর কিরূপেই বা বৃক্ষগুলিকে রক্ষা করা যাইতে পারে সেই বিষয়ে আলোচনা করিব। অতিবৃষ্টি পাটের এক প্রধান শত্রু। এই শত্রু হস্ত হইতে গাছগুলিকে রক্ষা করা মনুষ্য শক্তি দ্বারা সম্ভব নহে। দেবতার অনুগ্রহই কৃষকদের একমাত্র সম্বল। ইহা ছাড়া পাটের আর এক ভীষণ শত্রু আছে। বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের ১৯১২ সালের ৩ নং লিফলেটে প্রকাশ যে এক প্রকার পোকা—যশোহর অঞ্চলে যাহাকে ঘোড়া পোকা বলে, এবং অন্যান্য স্থানে যাহাকে দকরা, তিরিং, ছাট পোকা, বাগ্দী পোকা প্রভৃতি নাম দেওয়া হইয়াছে তাহারাই পাটের প্রধান শত্রু। ইহারা পাটের ফুলের ক্ষুদ্র কুঁড়িগুলি খাইয়া ও ছোট ছোট কচি ডালের সবুজ অগ্রভাগগুলি খাইয়া প্রাণ ধারণ করে। ইহার ফলে গাছগুলি শুকাইয়া যায়। ইহারা রাত্রিকালে গাছের পাতার নিম্নভাগে প্রায় দেড় শত হইতে দুই শত ডিম পাড়ে। ঐ ডিমগুলি ছোট ও গোলাকার ঠিক জলের ফোঁটার ন্যায় দেখিতে। দুই তিন দিনের মধ্যেই ডিমগুলি ফুটিয়া সবুজ রঙের ছোট কীড়া হয়। ইহারা সবুজ বলিয়া, সবুজ পাতার ভিতরে, পাতার সহিত এমনি মিশিয়া থাকে যে, ইহাদের সহজে বাহির করা কঠিন হইয়া পড়ে। প্রায় ১৫ দিনের মধ্যে পূর্ণাকৃতি প্রাপ্ত হয়, তখন ইহা প্রায় ১½ ইঞ্চি লম্বা হয়। তাহার পর পাট কাটা হইলে ইহারা মাটির ভিতরে বাসা করে, এবং যতদিন না পাট চাষ আরম্ভ হয় ও গাছ বাহির হয়, ততদিন ইহারা মাটির মধ্যেই থাকে, এবং পরবর্ত্তী পাট চাষের সময় পুনরায় বাহির হইয়া গাছের পাতায় আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহারা পাট গাছ ব্যতীত অন্য কোন গাছের বড় ক্ষতি করে না। ইহাদের

হাত হইতে পাট গাছকে রক্ষা করিবার অন্য কোন উপায় বড় দেখা যায় না, তবে দেখিতে পাইলেই মারিয়া ফেলা উচিত। এক গাছি দড়ি, কেরোসিন তৈলে ভিজাইয়া, গাছের উপর দিয়া, ক্ষেতের দুই পার্শ্বে, দুইজন লোক ধরিয়া যদি এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত টানিয়া গাছের পাতাগুলি কেরোসিন তৈলে সিক্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে পোকাগুলি উড়িয়া পালায়। ইহাদের একেবারে যদি বিনষ্ট করিতে হয়, তাহা হইলে পাট চাষের পর জমিটিকে হাল দিয়া রীতিমত কর্ষণ করিলে পোকাগুলি বাহির হইয়া পড়ে, তখন পাখীতে উহাদিগকে খাইয়া ফেলে।

আমরা এই প্রবন্ধের প্রথমে বলিয়াছি যে, পাট চাষের ন্যায় লাভবান চাষ আমাদের দেশে আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যদি শৃঙ্খলার সহিত সমস্ত দিক বিবেচনা পূর্ব্বক কেহ এই চাষের প্রতি মনোযোগী হন, তিনি অল্প আয়াসে সামান্য ব্যয়ে, বিশেষ লাভবান হইতে পারেন।

আমরা মোটামুটি এক বিঘা জমিতে পাট চাষ করিতে কত ব্যয় হয়, এবং ঐ এক বিঘা জমিতে কত পাট উৎপন্ন হইতে পারে, এবং কত মূল্যেই বা ঐ পাট বিক্রয় হয়, নিম্নে তাহার একটি তালিকা দিলাম। উহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, পাট কিরূপ অল্প আয়াসে ও সামান্য উদ্বিগ্নে চাষ হইতে পারে এবং কত উচ্চ দরে বিক্রয় হইয়া ব্যয়িত অর্থের কতগুণ কৃষকের হস্তে আনিয়া দেয়।

জমির খাজনা	২।০
২/ মণ গোময় সার	॥০
১।০ মণ খৈল	৩৵০
১০ খানি লাঙ্গল ৸০ হিসাবে	৭॥০
/১॥০ সের বীজ	।৵০
বীজ ছড়াইয়া মৈ দেওয়ার খরচ	।৵০
নিড়াইবার জন্য ৬টা জন ।/৫ হিসাবে ...	১৸৶১০
দ্বিতীয়বার নিড়াইবার খরচ ৩টী জন ।/৫ হিঃ ...	৸৶১৫
গাছ কাটিবার, নিকটস্থ জলাশয়ে লইয়া পচাইবার খরচ ১০টা জন ।/৫ হিঃ	৩।১০
পাট ছাড়াইবার মণ প্রতি ১৲ হিঃ ৭/ ...	৭৲
বাধাই খরচা ১টা জন ।/৫ হিঃ ...	।/৫
	২৭॥৶০

যদ্যপি ৯৲ মণ হিসাবে বিক্রয় হয়, তাহা হইলে ৭/=৬৩৲—২৭॥৶০=৩৫।/০ প্রতি বিঘায় লাভ হইতে পারে।

শ্রীযুক্ত এন, এন, ব্যানার্জি বি, এ, এম, আর, এ, সি, মহাশয়ের রিপোর্ট হইতে আমরা কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি যে, পাট চাষ দ্বারা আমাদের দেশের কৃষকগণ কিরূপ লাভবান হইতেছে। উক্ত রিপোর্টে প্রকাশ যে লণ্ডনের বিখ্যাত টাইমস পত্রিকায় এক সময়ে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধকার অতি কৌশলে বুঝাইয়া ছিলেন যে ভারতরাজ্যে পাট ব্যবসা অত্যন্ত লাভবান। ইহার চাষ যদিচ ক্রমান্বয়ে বর্দ্ধিত হইতেছে, তথাপি অভাব মত সরবরাহ হইতেছে না। পুরাতন স্থানে ত আমদানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। পরন্ত আবার অনেক নুতন বাজারেও স্থাপিত হইতেছে। ফলে পাটের মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। গভর্ণমেণ্টের ট্রেড্‌স রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, ভারতবর্ষ হইতে যত মাল অন্যান্য দেশে রপ্তানি হয় পাটই সকলগুলির সমষ্টির একের পঞ্চমাংশ। মাত্র শুদ্ধ পাট চাষ করিয়া আমাদের দেশের কৃষকেরা বৎসরে ২১ কোটী টাকারও অধিক পাইয়া থাকে।

এইরূপ লাভের চাষকে তাচ্ছিল্য করা বা অবজ্ঞা করা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নয়। যাহাতে এই চাষের উন্নতি হয়, স্বয়ং বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী। কিন্তু আমাদের দেশের জমিদারগণ এ বিষয়ে তেমন যত্ন লয়েন না। ফলে পাটের ব্যাপারী ও ফড়িয়াগণ মফঃস্বলে গিয়া কৃষকগণকে সামান্য দাদন দিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করে। আমরা পুর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পাট অধিক চাষ হইতেছে বটে কিন্তু উত্তম পাট অত্যন্ত কম পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য ডানডি ও কলিকাতার সওদাগরগণ অনেক অভিযোগ করিয়াছিলেন। এখনও তাঁহাদের অভিযোগের মাত্রা কমে নাই। গভর্ণমেণ্ট অনেক তদন্ত করিয়াছেন। পাট চাষের উন্নতি বিষয়ক অনেক আবশ্যকীয় উপায় যাহা সকলের অবশ্য জ্ঞাতব্য তাহাও প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত অবনতির কারণ, যদিও তাঁহারা জানিতে পারিয়াছিলেন সত্য, এবং তাহা দুর করিবার জন্য যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে, দুঃখের বিষয় সে কারণ এখনও বর্ত্তমান। আমাদের বিবেচনায় জমিদারগণ ও গভর্ণমেণ্টের সমবেত চেষ্টা ব্যতিরেকে ইহার প্রতিকার সম্ভাবনীয় নহে।

উদ্ভিদে অস্ত্রাঘাত।

তখন বিজ্ঞানাচার্য্য বসুমহাশয়ের উদ্ভিদ সম্বন্ধীয় নূতন আবিষ্কার জানিতে পারি নাই। মানুষের ন্যায় গাছ গাছড়ার সুখ দুঃখ বোধ আছে, ভয় ভীতি আছে, উদ্ভিদের হাসি কান্নার ভাষা আছে, এসব জানিতাম না। সেবার শীতের সময় রাঢ় দেশে যেখানে আমি অধিক সময় থাকি, এক খানি ঘর প্রস্তুত করিবার জন্য একটী ফলবান কাঁঠাল গাছের বড় একটী ডাল কাটিয়া ফেলিয়াছিলাম। কিছু দিন পরে দেখি বৃক্ষটীর কএকটী ডাল শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছে। অনুসন্ধানে দেখিতে পাইলাম পূর্ব্বে ঘর তৈয়ার করিবার সময় গাছের যে শাখাটী কাটিয়া ফেলা হইয়াছিল, সেই স্থানে বৃক্ষের হাড়ে অর্থাৎ গুঁড়ির কাঠে পোকা লাগিয়াছে। সমস্ত স্থান ভুয়া ধরা হইয়া গিয়াছে।

একটী শক্ত কাঠি দিয়া যত খোঁচাইতে লাগিলাম তত ছাইয়ের মত কাঠের গুঁড়া ঝুর ঝুর করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। অবশেষে কাঠের গুঁড়ির মধ্যে কাঠি চালাইয়া দেখি প্রায় মোটা গুঁড়ির বার আনা পচিয়া ছাইয়ের মতন গুঁড়া হইয়া গিয়াছে। উদ্ভিদ বিদ্যায় আমার অভিজ্ঞতা নাই, আমি এক জন Botanist ও নহি। একটী ফলবান বৃক্ষ আমারই কৃত কর্ম্মের জন্য মরিয়া যাইতেছে দেখিয়া মনে ভারি কষ্ট হইল। অনেকে আসিয়া এজন্য আমাকে নিন্দাও করিল, কারণ আমি যেখানকার কথা বলিতেছি সেখানে কাঁঠাল গাছ বেশী বড় হয় না, অধিক জন্মায়ও না। সে দেশে কাঁঠাল ও কাঁঠাল গাছের কদর খুব বেশী। যাই হউক বৃক্ষের এইরূপ ব্যায়রাম আমি উদ্ভিদের এক প্রকার Bono-dislax বলিয়া মনে করিলাম এবং ডাক্তারগণ দাঁতের Carries সারাইতে যে পথ অবলম্বন করেন, আমার মনে হইল যদি সেইরূপ কোন উপায়ে বৃক্ষ কাণ্ডে diseased heart কুরিয়া ফেলিয়া antiseptic কিছু দিয়া ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে বৃক্ষটী বাঁচিয়া যাইতে পারে। এই পন্থা আমার মনে আসায় আমি এক দিন ছুতার বাড়ি হইতে এক নিন? ও মুগুর আনিয়া উদ্ভিদে অস্ত্রাঘাত আরম্ভ করিলাম। সে সময় ভয়ঙ্কর গ্রীষ্ম, বিশেষতঃ রাঢ় দেশের গরম আমাদের যশোহর খুলনা জেলা হইতে অনেক বেশী।

বড় বড় গাছ গুলিতে গ্রীষ্মের সময় জল সেচন না করিলে মরিয়া যায়। দারুণ গ্রীষ্মের সময় আমি গাছ কাটিতেছি দেখিয়া সকলেই আমাকে নানা ভাষায় উপহাস করিতে লাগিল। গ্রীষ্মকে সে দেশে 'খরা' কহে। খরার সময় আমার খেয়াল দেখিয়া নীচ জাতিরাও পর্য্যন্ত আমাকে কিছু না বলিতে ছাড়িল না। কেহ কেহ বলিল এমন খেয়ালী লোকও ত কোথাও দেখি নাই, অজবল খরায় কাটিয়া কাটিয়া

ফলন্ত গাছটার জিউ মারিয়া ফেলিল। স্থানীয় লোকের সমালোচনায় আমার মনে একটু লজ্জা আসিল। মনে হইল গাছত নিশ্চয়ই মরিত, আমি কেবল বৃক্ষে অস্ত্রাঘাত করিয়া বদনামের ভাগি হইলাম মাত্র।

আমি পরিষ্কার করিয়া গুঁড়ির ভুয়াধরা কাঠ অর্থাৎ গুঁড়ির যে অংশ বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল নিন দিয়া সমস্ত কুরিয়া ফেলিয়া দিলাম। গুঁড়ির প্রায় বার আনা কাটা পড়িয়া গেল। সামান্য কাঠ ও ছাল একপাশে থাকিল মাত্র। জীবদেহে অস্ত্রাঘাত করিয়া এলোপ্যাথিক ডাক্তারগণ বিবিধ প্রকার antiseptic ঔষধ ব্যবহার করিয়া থাকেন কিন্তু উদ্ভিদের antiseptic কি হইতে পারে ভাবিতে মনে পড়িল গোবর যখন বহু প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমানের ঘরে ঘরে দুর্গন্ধ নাশক, বীজাণুনাশক, উদ্ভিদ জাতির উত্তম আহার বলিয়া চলিয়া আসিতেছে, তখন গোবরই আমার কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিবে ভাবিয়া এক তাল গোবর আনিয়া বৃক্ষটীর সমস্ত কোঠর (Cavity) ভর্ত্তী করিয়া airtight করিয়া চটের Bandage বাঁধিয়া দিলাম এবং বৃক্ষমূলে গোবর গোলা জলে ৩।৪ দিন অন্তর ভরিয়া দিতে লাগিলাম। ভরা চৈত্রে তিগ্মাংশু তপনের তপ্ততাপে রাঢ়ের কর্কশ মাটী কাঁকুড় ফাটা হইয়া ফাটিয়া যাইতেছে সেই সময়ই বৃক্ষের উপর আমার পাশব অত্যাচার। প্রথম ১ মাসের মধ্যে গাছের পাতা সব শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িয়া গেল। আমিও হতাশ্বাস হইয়া পড়িলাম।

নিরাশায় একদিন বৃক্ষ কাণ্ডের ছাল তুলিয়া দেখি গাছটী বেশ তাজা আছে ক্রমশঃ বৃক্ষে নূতন পল্লবের সঞ্চার হইল। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে আর সে বৃক্ষ চিনিবার উপায় রহিল না। দিব্বি শ্যামল শাখা পল্লব বিস্তৃত করিয়া একটী কুঞ্জের ন্যায় বিহার করিতে লাগিল। তখনও আমার সেই চটের ব্যাণ্ডেজ বৃক্ষ গাত্রে আবদ্ধ ছিল। খুলিয়া দেখি আনাড়ির অত বড় অমানুষিক অস্ত্রাঘাতের কোন চিহ্ন তাহাতে নাই, ত্বকে সমস্ত কাণ্ড আবৃত হইয়া গিয়াছে। কেবল আহত স্থানে বড় বড় গাঁট পড়িয়া উঁচু নিচু হইয়া আছে মাত্র। এবার সেই কাঁঠাল গাছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাঁঠাল ধরিয়াছে। বাগানের অন্যান্য বৃক্ষে পোকা লাগিয়া অনেক ফল অপক্ক অবস্থায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আমার সেই অস্ত্রাহত মরণাপন্ন কাঁঠাল গাছ পুষ্ট ফল ভরে নত হইয়া দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। পাদপ, বিটপী, মহীরুহ প্রভৃতি অনেক গুরু-কাণ্ড তরু এই প্রকার পচা ক্ষতে অকালে কাল কবলিত হয়। আমার বিশ্বাস এইরূপ ভাবে কোন উপযুক্ত উপায়ে অস্ত্রকার্য্য করাইয়া antiseptic Bandage করিয়া দিতে পারিলে গৃহস্থের অনেক আয়কর বৃক্ষের জীবন রক্ষা হইতে পারে।—শ্রীজগৎ প্রসন্ন রায়।

সরকারী কৃষি সংবাদ

বর্দ্ধমানে ভীষণ জলপ্লাবন—

দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ভীষণ বন্যায় বহুসংখ্যক গ্রাম জল মগ্ন হইয়াছে, সহস্র সহস্র লোক গৃহহীন হইয়াছে, তাহাদের গরু বাছুর সব ভাসিয়া গিয়াছে, কত শত লোক প্রাণ হারাইয়াছে। ই, আই, আর রেল লাইন স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়াছে, লাইনের উপর জল। বর্দ্ধমান হইতে খানাজংসন পর্য্যন্ত গাড়ী চলাচল বন্ধ ছিল। গৃহহীন খাদ্যাভাবগ্রস্ত সহস্র সহস্র নর নারী সাধারণের সাহায্যে প্রাণ বাঁচাইয়া অতি কষ্টে দিন যাপন করিতেছে। চারি দিক হইতেই বন্যার সংবাদ আসিতেছে।

সরকারী সংবাদ।—হাওড়ার জেলা—মাজিষ্টর মিঃ প্যাটারসন সাহায্য কেন্দ্র সমিতির সম্পাদক রায় শ্রীযুক্ত রাধাচরণ পাল বাহাদুরকে লিখিয়াছেন,—হাওড়া জেলার দুইশত হইতে তিনশত বর্গ মাইল পরিমিত স্থানের গ্রামসমূহ প্লাবিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে জল কোথাও নয় ফুট, কোথাও চারি ফুট হইয়াছিল। দামোদরের কয়েকটি খাল দিয়া এখন এই সকল স্থানের জল নামিয়া যাইতেছে; কিন্তু এখনও এক সপ্তাহেয় পূর্ব্বে যে সকল জল চলিয়া যাইতে পারিবে, এরূপ মনে হয় না। আমতা অঞ্চলে জল আরও বেশী দিন থাকিবে বলিয়াই বুঝা যায়।

কালেক্টরের কথা।—বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে বন্যায় যে অনিষ্ট ঘটিয়াছে, পাটনার কালেক্টর মিঃ ওয়েষ্টন স্বচক্ষে দেখিয়া তাহার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—"পশ্চিমে বাঁকিপুর হইতে পূর্ব্বে মরুফগঞ্জ পর্য্যন্ত আমি স্বচক্ষে দেখিয়া বুঝিয়াছি, বন্যার ফলে এই স্থানের অধিবাসীদের অশেষ কষ্ট হইয়াছে, চেয়ারম্যানের সঙ্গে আমি গত ১২ই আগষ্ট বাঁকীপুর সহরের ভিতর দিয়া বরাবর বেড়াইয়া দেখিয়াছি। দেখিলাম,—বাঁকীপুর হইতে পাটনা রেল ষ্টেসন পর্য্যন্ত সারা পথের দুই ধারেই সমুদ্রের ন্যায় লহরী তুলিয়া বিপুল জলরাশি খেলা করিতেছে। দামারিয়া ঘাট পর্য্যন্ত এইরূপ। এই বিস্তীর্ণ এলাকার অন্তর্গত সমুদায় বাড়ী ঘর জনশূন্য; তাহার আবার কতকগুলি পতনোন্মুখ, কতকগুলি পড়িয়াও গিয়াছে।

উড়িষ্যা সংবাদ।—বিহার ও উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্ট রাঁচীতে গত সপ্তাহের বুধবার উড়িষ্যার বন্যা সম্বন্ধে এইরূপ সংবাদ পাইয়াছেন,—বৈতরণীর বন্যায় দুইটা বড় বড় বাঁধের কয়েক স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং হাই লেভেল ক্যানালের প্রায় ৬০ যাট ফুট স্থান ভঙ্গ হইয়াছে। বাহাওয়েরের প্রায় তিন শত ফুট আন্দাজ ভাসিয়া

চলিয়া গিয়াছে। বালেশ্বর জেলায় প্রায় সকল শস্যক্ষেত্রই জলমগ্ন হইয়াছে, সকল চারা নষ্ট হইয়ছে। তবে, পুনরায় রোপণ করিবার সময় এখনও যায় নাই। অন্যান্য জেলার অবস্থাও সম্ভবতঃ এইরূপ। গ্রামের লোকের ঘরবাড়ী জিনিস-পত্র বেশী নষ্ট হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই; তবে, অনেক ঘর বাড়ীই যে পড়িয়া গিয়াছে এবং অনেকেরই যে অশেষ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সুনিশ্চিত।"

মেদিনীপুর ব্যারিষ্টারের বিবরণ।—মেদিনীপুরের ব্যারিষ্টার মিঃ বি, এন, শাশমল কাঁথি হইতে গত ১৪ই আগষ্ট তারিখে এইরূপ লিখিয়াছেন,—"জলপ্লাবনের পর পনের দিন অতীত হইয়াছে। তথাপি এখনও ৪০ মাইল দীর্ঘ এবং ২৪ চব্বিশ মাইল বিস্তৃত ভূভাগ জলমগ্ন। এই জলমগ্ন ভূভাগ পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে বালীঘাই হইতে রসুলপুর পর্য্যন্ত এবং উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে হালদী নদী হইতে চাঁদপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই সুবিস্তীর্ণ ভূভাগের মধ্যে কয়েকখানি মাত্র উচ্চ পাকা বাড়ী একগলা জলের ভিতর হইতে উঁকি দিতেছে; ইহা ব্যতীত আর কোন বাড়ীই নাই। এই জলমগ্ন ভূভাগে প্রায় ১২০০ এক হাজার দুই শত খানি গ্রাম ছিল এবং তিন চারি লক্ষ নরনারী বাস করিত। গ্রাম জলে ত ডুবিয়াছেই; লোকাল বোর্ডের এবং জেলাবোর্ডের রাস্তা পর্য্যন্তও ডুবিয়া গিয়াছে। যে সকল পথে উটের গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী বা মোটর গাড়ী চলিত, এখন সেই সকল পথে ডিঙ্গি নৌকা চলিতেছে।

হুগলি-আরামবাগ—আরামবাগ হইতে একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন,—"বর্দ্ধমান হইতে আমতা পর্য্যন্ত দামোদরের দক্ষিণভাগের গ্রামগুলির প্লাবনের কথাই সকলে আলোচনা করিতেছেন; কিন্তু দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত গ্রামগুলির—বিশেষতঃ হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার অধীন পল্লীগ্রাম সমূহের কথা কেহ বলিতেছেন না। দামোদরের দক্ষিণভাগের এই গ্রামসমূহ প্রতি বৎসরই প্লাবিত হইয়া থাকে; যে বৎসর খুব সামান্য বন্যা হয়, সে বৎসরও বেগুয়ার হানার সহিত গ্রামগুলি প্লাবন হইতে রক্ষা পায় না—বহু ব্যক্তি নিরাশ্রয় হয়; বহু শস্যহানি হয়, নানা প্রকারে এই মহকুমার অধিবাসীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। এবারের ঘোরতর প্লাবনে যে এই সকল গ্রামের কিরূপ অনিষ্ট হইয়াছে, তাহা আর বলিবার নহে।"

বাঁকুড়া—৭০ খানি গ্রাম বিধ্বস্ত।—একজন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন,—দামোদরের সহিত বাঁকুড়া জেলার এক অংশ বন্যায় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ই,আই, রেলের পানাগড়, পারাজ এবং মানকর ষ্টেসন হইতে পাঁচ মাইলের মধ্যবর্ত্তী প্রায় ৭০ খানি গ্রাম বিধ্বস্ত। এই সকল গ্রামের অধিবাসীদের ঘর বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে এবং মজুত খাদ্য শস্য ও গরু বাছুর ভাসিয়া গিয়াছে। সরকারী সংবাদে

প্রকাশ,—কেবল বেশিয়া নামক একটি গ্রামে ২১ একুশ জন নরনারীর মৃত্যু হইয়াছে, ৩০০ তিনশত গবাদি পশু মারা পড়িয়াছে এবং একখানি বাড়ীও দাঁড়াইয়া নাই।

গুজরাটে ভীষণ বন্যা, শস্যহানি ও গরু বাছুরের জীবন নাশ।—গত ৭ই আগষ্ট গুজরাট হইতে ভীষণ বন্যার খবর আসিয়াছে। ব্রোচ জেলায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বন্যা হইয়াছে, কিন্তু এবারকার বন্যা তদপেক্ষা ভীষণ। বাড়ীঘর ভূতলশায়ী হইয়াছে, শস্য নষ্ট হইয়াছে, শত শত গরুবাছুর বন্যায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। বিগত ২৭শে জুলাই তারিখে বন্যা আরম্ভ হয়। নর্ম্মদা নদী অকস্মাৎ স্ফীত হইয়া সাধারণ নিম্নতল হইতে ত্রিশ ফুট উচ্চে ফাঁপিয়া উঠায় এই বন্যা হইয়াছে।

কেন্দ্রাপাড়া।—কটক-কেন্দ্রাপাড়ার সংবাদে প্রকাশ,—ব্রাহ্মণী এবং মহানদীর বন্যায় কেন্দ্রাপাড়ার বহুগ্রাম ভাসিয়াছে। প্রফুল্লবাবু এবং মিঃ ইগারটন বিপন্ন ব্যক্তিগণকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন। কটক হইতেও চারিজন কর্ম্মচারী আসিয়াছেন, গত ১৪ই আগষ্ট মিঃ ইগারটন এবং এসিষ্টাণ্ট কলেক্টর মিঃ সোয়ানসি জলপ্লাবিত গ্রামসমূহ দেখিতে বাহির হইয়াছিলেন। ফসল মরিয়াছে, দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা।

পাতামুণ্ডাই।—"ষ্টার অব উৎকল" পত্রে প্রকাশ,—পাতামুণ্ডাই এবং চাঁদবালীর মধ্যস্থিত সমুদয় গ্রাম ভাসিয়াছে। লোকের দুর্দ্দশার অবধি নাই। জেলা মাজিষ্টর এবং কেন্দ্রাপাড়ার মহকুমা মাজিষ্টর উভয়েই বিপন্ন অধিবাসিগণের সাহায্যের ব্যবস্থা করিতেছেন। চাউল, চিঁড়া, দাইল প্রভৃতি বিতরণ চলিতেছে।

গভর্ণমেণ্টের তদন্ত।—গভর্ণমেণ্ট নিশ্চেষ্ট নহেন; কোথায় কোন্ প্রজার কিরূপ অনিষ্ট হইয়াছে, সে সমুদয় তথ্য সংগ্রহের জন্য এবং সাহায্য দানের জন্য বন্যাপ্লাবিত সকল স্থানেই সরকারী কর্ম্মচারীগণকে প্রেরণ করা হইয়াছে। তথ্য সংগ্রহের সুবিধার জন্য দুই প্রকার 'ফরম্' অর্থাৎ তালিকাপত্র ছাপা হইয়াছে; একখানিতে এই কয়টি বিষয়ের তথ্যের জন্য পৃথক্ পৃথক্ স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে,—(১) গ্রামের নাম ও গৃহস্থের নাম, (২) কয়খানি ঘর; (৩) কয়খানি ঘর নষ্ট হইয়াছে, (৪) কয়টি গাভী, (৫) কয়টি বৃষ, (৬) কয়টি মহিষ, (৭) কয়টি মহিষী, (৮) মন্তব্য।

শুধু তথ্যসংগ্রহ নহে; বিপন্ন অধিবাসীদিগকে প্রধানতঃ চাউল, দাইল এবং লবণ দিয়া সাহায্যও করা হইতেছে। ইহারও এক তালিকা-পত্র মুদ্রিত হইয়াছে; তাহাতে এই কয়টি তথ্যের স্বতন্ত্র স্থান আছে,—(১) গ্রামের নাম, (২) গৃহকর্ত্তার

নাম, (৩) কয়জন পূর্ণবয়স্ক পুরুষ, (৪) কয়জন পূর্ণবয়স্ক স্ত্রীলোক, (৫) কয়জন শিশু, (৬) কি পরিমাণ চাউল দেওয়া হইল, (৭) কি পরিমাণ দাইল দেওয়া হইল, (৮) কি পরিমাণ লবণ দেওয়া হইল এবং (৯) মন্তব্য।

রঙপুর, দিনাজপুর, ঢাকা—ঢাকা হইতে জনৈক সংবাদদাতা লিখিতেছেন—"ঢাকায় এবার জলাভাব। খাল বিল, নদী নালা, পূর্ণ হইয়া খুব ভাসা হইয়া গেলে এখানকার স্বাস্থ্য ভাল হয়, কিন্তু এ বৎসর তাহা ঘটে নাই। যে সকল জমিতে ১০হাত ১৫হাত জল হয় সেই সকল জমিতে বোরোধান, জলী ধানের চাষ, জল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধান গাছও দশ পনেরো হাত বাড়িয়া উঠে, এবার ঐ সকল ধান জলাভাবে নষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, বোধ হয় ফসল তাদৃশ ভাল হইবে না। বরিশালে চাষের অবস্থা এক্ষণে তাদৃশ খারাপ নহে, কিন্তু শুনা যাইতেছে যে জলাভাবে রঙপুর, দিনাজপুরে কিছু ক্ষতি হইতেছে।"

দামোদরের বাঁধই অনর্থের মূল—বর্দ্ধমান হইতে জনৈক সংবাদদাতা লিখিতেছেন যে "যখন দামোদরের বাঁধ ছিল না, তখন বন্যায় অনিষ্ট হইত বটে, কিন্তু বন্যা তখন এমন ভীষণাকার ধারণ করিতে পারিত না। জল দুকুল প্লাবিত করিয়া গ্রামে গ্রামে বানের জল প্রবেশ করিয়া খাল, বিল, মাঠ, ঘাট পুরাইয়া ফেলিত, অবশেষে ঘরের উঠানেও জল উঠিত, কিন্তু তাহা এত অধিকক্ষণ স্থায়ী হইত না বা সে বন্যায় এতাদৃশ খরস্রোত বহিত না। এখন বাঁধবদ্ধ জলস্রোত নির্দ্দিষ্ট নদীগর্ভ দিয়া চলিতে চলিতে যে খানে বাঁধ ভাঙ্গিতে পারিবে সেখান দিয়া এমন প্রবল বেগে প্রবাহিত হয় যে, তাহার সম্মুখে হাতী পড়িলেও ভাসিয়া যাইবে। প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় যে এই বাঁধ হইয়া রেলপথ গুলির অনিষ্টের আশঙ্কা দূর হইয়াছে, সহর, বন্দর, বাজারের দোকানী, পসারী ও কতিপয় ধনাঢ্য ব্যক্তি কতকটা নির্ব্বিঘ্ন হইয়াছেন, কতকগুলি রাস্তা, পথ ভাল হইয়াছে, কিন্তু সাধারণ চাষী প্রজার আশঙ্কা শতগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। তাহারা এখন যেন ঠিক তোপের মুখে বাস করিতেছে। একবার বাঁধ ছুটিলে আর নিস্তার নাই। আগে দামোদরের প্লাবনে অনেকে ঘর, বাড়ি, গরু, বাছুর, খাদ্যদ্রব্য, বীজধান বাঁচাইতে পারিত এবং বন্যার জল চলিয়া গেলে তাহারা দশগুণ অধিক ফসল পাইয়া তাহাদের বন্যা পীড়ার কথা ভুলিয়া যাইত। এখনকার অবস্থার সহিত তখনকার অবস্থার তুলনা হয় না। এ ভীষণ বন্যার কথা শুনিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইবে।"



ভাদ্র, ১৩২০ সাল।

উদ্ভিদের আহার

মনুষ্য ও জীবজন্তুর যেমন আহারের প্রয়োজন হয়, উদ্ভিদেরও তদ্রূপ আহারের আবশ্যক। মূল, কাণ্ড, পত্র ও পুষ্প এই চারিটি উদ্ভিদের অঙ্গ। মুল মৃত্তিকা হইতে আহার সংগ্রহ করে। উদ্ভিদের মূলই তাহার মুখ। মূল মৃত্তিকা হইতে আহার আহরণ করে, কাণ্ড তাহা বহন করিয়া পত্রে লইয়া যায়, পত্রে সেই আহার্য্য পদার্থের পরিপাক কার্য্য সম্পন্ন হয়।

মৃত্তিকায় উদ্ভিদের আহার সঞ্চিত থাকে। উদ্ভিদের আহারোপযোগী সার বিশেষতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যেমন নাইট্রোজেন প্রধান, ফস্ফরাসপ্রধান, পটাসপ্রধান ও চূর্ণপ্রধান সার। পটাসিয়ম্ নাইট্রেট, অ্যামোনিয়ম্ ক্লোরাইড প্রভৃতি ধাতব পদার্থ, মৎস্য, রক্ত প্রভৃতি জান্তব পদার্থ, খৈলাদি উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে উদ্ভিদের আহারোপযুক্ত নাইট্রোজেন সংগ্রহ হয়।

হাড়চূর্ণ, হাড়ভস্ম অথবা এপেটাইট ও সুপার প্রভৃতি ধাতব পদার্থ কিম্বা গুয়ানো হইতে ফস্ফরাস সংগ্রহ হয়। গোময়, কাষ্ঠ কিম্বা চারা গাছ ভস্ম অথবা কাইনাইট, পোটাসিয়ম্ সালফেট বা মিউরিয়েট প্রভৃতি ধাতব পদার্থই পটাস প্রাপ্তির উপায়। এতদ্দেশীয় মৃত্তিকায় চূণও অল্পবিস্তর বিদ্যমান আছে। বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ তাহাদের নিজ প্রয়োজন অনুরূপ দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া জীবন ধারণ করে। অনাহারে বা অল্লাহারে মানুষের যেমন কষ্ট হয়, উদ্ভিদেরও, তদ্রূপ কষ্ট হয়। অল্লাহারে তাহারা ক্ষীণ হয় এবং অধিককাল অনাহারে তাহারা বিনষ্ট হয়।

কিন্তু কি প্রকারে উদ্ভিদ তাহাদের আহার সংগ্রহ করে,—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, তাহারা মূলদ্বারা আহার করে। মনুষ্য ও অধিকাংশ জন্তু যেমন মুখদ্বারা তাহাদের খাদ্য ভাল করিয়া চর্ব্বণ করে ও লালা প্রভৃতি রস মিশ্রিত

করিয়া তাহাদের খাদ্যবস্তু পোষণোপযোগী করিয়া লয়, উদ্ভিদ তাহা পারে না। উদ্ভিদ মূলদ্বারা কেবল মাত্র মৃত্তিকাস্থিত রসাকর্ষণ করিতে সক্ষম। সুতরাং উদ্ভিদের পোষণোপযোগী সমুদয় খাদ্য এই রসে বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। জলই উদ্ভিদের খাদ্য সমূহ দ্রব করে! জলদ্বারা দ্রব না হইলে উদ্ভিদ তাহা কখনই গ্রহণ করিতে পারে না। সুতরাং জল যে উদ্ভিদের আহারের এক প্রধান সামগ্রী তাহা অনায়াসে বুঝা যায়। যথোপযুক্ত আহার বিদ্যমান থাকিলেও উদ্ভিদ জল বিনা অনাহারে মরিতে পারে। জল উদ্ভিদের আহারের প্রধান উপাদান। মৃত্তিকা নিহিত কঠিন পদার্থ সমূহ সহজ অবস্থায় উদ্ভিদাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না, প্রথমে সেগুলি জলের সাহায্যে তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এবং তৎপরে উদ্ভিদ মূল দ্বারা নিজাভ্যন্তরে টানিয়া লয়, সুতরাং জলই উদ্ভিদের কেবলমাত্র আহার নহে, উদ্ভিদের আহার বহন করিবার আধার। এইজন্য প্রায়ই দেখা যায় জল না পাইলে উদ্ভিদ ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং অবশেষে মরিয়া যায়। ধান, যব প্রভৃতি গুচ্ছ মূলধারী শস্যের মূল মৃত্তিকার নিম্নে অতিদূর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে না, তাহাদের ভাসা শিকড়, জল না পাইলে শীঘ্র মরিয়া যায়। বড় লম্ব-মূলধারী উদ্ভিদ মৃত্তিকার নিম্নদেশ ভেদ করিয়া জল সংগ্রহ করে, সেই জন্য অতি রৌদ্রের সময়েও তাহাদের বিশেষ ক্ষতি হয় না।

উদ্ভিদ মূলদ্বারা রসাকর্ষণ করে বটে, কিন্তু মূলের সকল অংশ জল শোষণে সক্ষম নহে, কেবলমাত্র মূলাণুদ্বারা এই কার্য্য সংসাধিত হয়। মৃত্তিকাস্থিত রস মূলাণু কোষের প্রাচীর ভেদ করিয়া কোষাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। মূল এবং কাণ্ড অসংখ্য কোষে গঠিত, মূল এবং কাণ্ড কোষ সমষ্টি মাত্র। রস মূলাণুকোষে প্রবেশলাভ করিয়া কোষ হইতে কোষান্তরে নীত হয়, অবশেষে কাণ্ডের নবজাত অংশপথ বহিয়া পত্রে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। মনুষ্য শরীরে যেমন শোণিত প্রবাহ, উদ্ভিদ শরীরে জল প্রবাহও প্রায় তদনুরূপ।

উদ্ভিদ মানুষের ন্যায় যেমন মূলদ্বারা আহার গ্রহণ করে, পত্রের দ্বারা তেমনি তাহার শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সংসাধিত হইয়া থাকে। বায়ুস্থিত অক্সিজেন শ্বাস, প্রশ্বাসে গ্রহণ না করিলে কোন প্রাণীই জীবিত থাকিতে পারে না। প্রচুর আহার সত্বেও জলাভাবে যেমন প্রাণী বাঁচে না, বায়ু অভাবেও কোন প্রাণী বাঁচিতে পারে না। বিশুদ্ধ অক্সিজেন কিন্তু আমাদের শ্বাস, প্রশ্বাস গ্রহণের উপযোগী নহে। অক্সিজেন সকল বস্তুকে দগ্ধ করে কিন্তু অক্সিজেন বাষ্প, বায়ুমণ্ডলস্থিত নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসে মিশ্রিত থাকায় উহা প্রাণীমাত্রেরই গ্রহণোপযোগী। পত্রান্তর্গত রস ও পত্রাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট অক্সিজেন বাষ্প এতদুভয়ের মিলনে উদ্ভিদের দেহ নির্ম্মাণ উপকরণ সমূহ উৎপন্ন হয়। জল ও বায়ুর ন্যায় উদ্ভিদজীবনে আর একটি

অত্যাবশুক পদার্থের প্রয়োজন, সেটি সূর্য্যালোক, ইহা দ্বারাই উদ্ভিদের পরিপাক ক্রিয়ার পরিসমাপ্তি হয়। উদ্ভিদের পত্রকোষে এক প্রকার হরিদ্বর্ণ পদার্থ দৃষ্ট হয়। এই হরিদ্বর্ণ খণ্ডগুলি দ্বারা উদ্ভিদের পরিপাক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এই হরিদ্বর্ণ খণ্ডগুলির অভাব হইলে পরিপাক কার্য্যের ব্যাঘাত হয়। সূর্য্যালোকের অভাব হইলে হরিদ্বর্ণ খণ্ডগুলি শাদা হইয়া যায়, তখন আর সেগুলি পরিপাক কার্য্যে সহায়তা করিতে পারে না। সূর্য্যালোকেই হরিদ্বর্ণ খণ্ডগুলির জন্ম এবং সূর্য্যালোকই তাহার কার্য্য করিয়া থাকে।

প্রাণীমাত্রেই যেমন জীবিত থাকিয়া সন্তুষ্ট নহে, নূতন জীবন উৎপাদনে তাহারা ব্যগ্র। উদ্ভিদেও সে প্রবৃত্তি বিদ্যমান আছে। সেই কারণে তাহারা তাহাদের অঙ্গ বিশেষে পুষ্টিকর পদার্থ সমূহ সঞ্চিত করিয়া রাখে। ধান, যব, গম, মটর, মসুর প্রভৃতি ও অধিকাংশ ফলের গাছের বীজে এই পুষ্টিকর পদার্থ সঞ্চিত হয় এবং সেই সকল বীজ হইতে পুনরায় আবার গাছ হয়। কতকগুলি মূলজ খন্দ যথা—গোল আলু, লাল আলু, মূলা, সালগম, বীট, গাজর প্রভৃতির পুষ্টিকর পদার্থ মূল কিম্বা কাণ্ডে সঞ্চিত হয়। এই জন্য এই জাতীয় কয়েকটির মূল কিম্বা কাণ্ড হইতেও গাছ জন্মিয়া থাকে।

উদ্ভিদের আহার ও পরিপাক ক্রিয়ার বিষয় অবগত হইলে আমাদের এই সুবিধা হয় যে, আমরা মৃত্তিকায় উদ্ভিদের আহারোপযোগী কি কি পদার্থ আছে তাহা দেখিতে চেষ্টা করিব, কোন্ উদ্ভিদের কি আহার আবশুক তাহার বিচার করিব, জমিতে রসাভাব না হয় তাহার ব্যবস্থা করিব এবং অবস্থা বুঝিয়া জল সেচনের ব্যবস্থা করিব, ক্ষেতে বা বাগানে কখন বায়ু চলাচলের পথ রোধ না হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিব এবং উদ্ভিদ কখন সূর্য্যালোকের অভাব অনুভব না করে, তাহার যথাসম্ভব বন্দোবস্ত করিব কিন্তু ছোট ছোট কচি গাছগুলিকেও প্রচণ্ড সূর্য্যাতপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ছায়া প্রদান করিব। তবেই উদ্ভিদের পরিপাক ও পোষণ সম্পূর্ণ হইবে, তবেই উদ্ভিদ পরিপুষ্ট হইবে এবং যথোপযুক্ত ফল ফুল প্রদান করিবে।

বাঙলার গাভী, ষাঁড়, বলদ।

বাঙলার গাভীগুলি সাধারণতঃ ১ সেরের অধিক দুধ দেয় না। বাঙলার বলদগুলি কাঁচা রাস্তায় ১৬ মণ এবং পাকা পাথর বা ইটের রাস্তায় বড় জোর ২০ মণ বোঝা টানিয়া লইয়া যাইতে পারে।

বাঙলার পশুচিকিৎসা বিভাগের উপদেশ এই যে বাঙলার বিভিন্ন জাতীয় গবাদির যাহাতে মৌলিকত্ব রক্ষা হয় তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে গবাদির অতিশয় হীনাবস্থা হইয়াছে, তখন এই হীন পশুগুলির মৌলিকতা রক্ষার আবশ্যকতা বিশেষ দেখা যায় না। বাঙলার গাভী মাত্রেই অতি অল্প দুধ প্রদান করে, বলদ মাত্রেই হীনবল, তখন তাহাদের উন্নতি না হইলে আর উপায়ান্তর কি আছে! অষ্ট্রেলিয়া দেশ হইতে বাচ্ছা ষাঁড় আনাইয়া পালিতে আরম্ভ করিলে এবং আমাদের চিরন্তন প্রথানুসারে ষাঁড় গুলিকে বাঁধিয়া না রাখিয়া গ্রামময় চরিয়া খাইয়া বেড়াইতে দিলে বাঙলার গবাদির কিছু উন্নতি হইতে পারে। উপকার হইলে লোকে একটু ক্ষতিও সহ্য করে। ষাঁড় গুলি দ্বারা গ্রামের লোকে তাহাদের গাভীর পাল ধরাইয়া লইবার সুবিধা পাইলে তাহারা ষাঁড়গুলিকে অবাধে চরিতে এবং কিছু কিছু ক্ষতি খ্যাসারত করিতে দিতে কুণ্ঠিত হইবে না।

প্রথমতঃ এই সকল ষাঁড় দ্বারা এবং দেশী গাভীর গর্ভে যে সকল বাচ্ছা জন্মিবে, তাহারা হয়ত এ দেশের জল হাওয়া সহিতে না পারিয়া মরিয়া যাইতে পারে। বুঝা উচিত যে ইহাদের একটু বিশেষ যত্ন আবশ্যক এবং খাওয়ার তদ্বিরের প্রয়োজন, তবে বাছুরগুলিকে বাঁচান সহজ হইবে। দেশীয় গাভীর গর্ভে এই ষাঁড়ের দ্বারা যে সকল বলদ জন্মিল, সেগুলি না হয় অধিকতর বোঝা টানিতে সক্ষম হইল। দেশী বলদ ২০ মণ বোঝার অধিক টানিতে পারে না। কিন্তু ইহারা পাকারাস্তায় ৪২ মণ টানিতে লাগিল। বোকনা বাছুর গুলি হয়ত তাদৃশ দুগ্ধবতী হইল না। তাহাদের দুই তিন সেরের অধিক দুধ যদি না হয়—তাহা হওয়া কিছু বিচিত্র নহে; কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে রীতিমত খাওয়ার তদ্বির করিলে তাহারা ৮ কিম্বা ৯ সের দুধ প্রদান করিতে পারে। তাহাদের দুধে মাটা অধিক হইবে। এই রূপে সঙ্করভাবে উৎপাদিত বোকনা গুলি বিলাতী আমদানী গাভী অপেক্ষা অনেকাংশে ভাতবাত কষ্ট সহিষ্ণু, কিন্তু নিভাঁজ দেশী গরুর মত তাহারা তাতবাত বা কষ্ট সহ্য করিতে পারে না, দেশী গরুর এক প্রধান গুণ এই যে তাহারা মাঠে চরিয়া খাইয়া এবং দিনান্তে খৈল, ভুষি ও খড় মিশান একটি জাব বা কখন তাহা না

খাইয়া ও দুধ দেয়, এই সকল সঙ্কর গাভী গুলি তাহা দেয় না। দেশী গরুর মত অবস্থায় রাখিলে অনুরূপ আহার না পাইয়া ও অযত্নে মরিয়া যায়। ভাল করিয়া খাওয়াইতে পারিলে বা পালন করিলে তাহারা ভাল থাকে।

অষ্ট্রেলিয়ার ষাঁড় এবং দেশী গাভীর দ্বারা যে সকল সঙ্কর বলদ উৎপন্ন হয় তাহাদের আর একটী দোষ এই দেখা যায় যে তাহাদের ঝুটন বড় নহে। দেশী কৃষকগণ মনে করিয়া থাকে যে তাহারা গাড়ী টানিতে তাদৃশ মজবুত হইবেনা, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহারা গাড়ী টানাতে দেশী বলদকে হারাইয়া দিতে পারে এবং এই সকল বলদ লাঙ্গল টানিতেও খুব মজবুত এবং দেশী গরু অপেক্ষা কিছুতেই হীন নহে বরং তাহাদের অপেক্ষা অনেকাংশে ভাল।

এই সকল বিষয় দেখিয়া আমার এই ধারণা জন্মিয়াছে—যদি অষ্ট্রেলিয়া হইতে ষাঁড় আনাইয়া বাঙলায় গরুর উন্নতি করা যায়, তাহা হইলে আমাদের দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

আমরা কিন্তু বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি যে, দেশী গরুর অনেক গুণ আছে যাহা বিলাতী আমদানী গরুতে নাই। আমাদের দেশের গরু তাতবাত সহিষ্ণু, অল্পাহারে টিকিতে পারে, মশামাছির উপদ্রবে নিতান্ত ক্লিষ্ট হয় না! আবাস স্থান তাদৃশ পরিষ্কার না হইলেও অসুস্থ হইয়া পড়ে না। বিলাতি ষাঁড় ও ভাগলপুর গরুতে যে ষাঁড় উৎপন্ন হয় সেই ষাঁড় বাঙালায় আনিয়া তাতবাত সহিষ্ণু করিয়া লইতে পারিলে সঙ্কর উৎপাদনের অধিকতর উপযোগী হয়।

আমরা বাঙলার বলদের সহিত ভাগলপুরী বলদের তুলনা করিয়া দেখিয়াছি। ভাগলপুরী বলদ গুলিকে বাঙলা দেশে পশ্চিমা বলদ বলে। এই সকল বলদ আকারে বড় ও বলিষ্ঠ। তাহারা বাঙলার বলদ অপেক্ষা অধিক বোঝা টানিতে পারে, কিন্তু বাঙলার বলদের মত কষ্ট সহিষ্ণু নহে। পাকা বা পাথরের রাস্তায় ভিন্ন গাড়ী টানিতে পারে না এবং বাঙলার রসাজমিতে তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে না। সহর নগরেই ভাল থাকে। তাহাদিগকে খৈল, ভুষি, ছোলা বা ভুট্টা না খাইতে দিলে তাহারা টিকে না। বাঙলার বলদগুলিকেও বলিষ্ঠ রাখিতে হইলে তেজস্কর আহার দেওয়া দরকার, কিন্তু তাহাদের আহার পশ্চিমা বলদের অপেক্ষা অনেক কম।

বাঙলার গাভী যত্ন পাইলে সচরাচর /৩ কিম্বা /৪ সের দুধের অধিক্ দেয় না, কিন্তু ভাগলপুরী গাভী ও মুলতানী গাভী ১২, ১৪ কিম্বা ১৬ সের দুধ অনায়াসে দেয়। এই সকল গাভীর দুধ কিন্তু বাঙলার গাভী অপেক্ষা পাতলা, এবং দুধের আস্বাদনও মিষ্টতা বাঙলার গাভীর দুধ অপেক্ষা অনেক কম। তাহার প্রধান কারণ যে ঐ সকল গাভী অধিক জল খায়, বাঙলায় যে গাভী অধিক জল খায় বা কাঁচা ঘাস

খায় তাহার দুধ পাতলা হয়, এমন কি দেখা যায় যে ভাতের মাড় বা খুঁদের যাউ খাইয়া যে গাভীর দুধ বাড়ান হয় তাহার দুধ স্বাভাবিকই পাতলা ও খাইতে সুস্বাদু নহে। কেবল খৈল, ভুষি, অরহরের চোণা খাইয়া যে দুধ দেয় তাহাদের দুধ কমহইলেও ঘন, মিষ্ট ও সুস্বাদু। বাঙলার বলিষ্ঠ গাভী, ষাঁড় ক্রমশঃ নির্ব্বাচন করিলে ও বলিষ্ঠ বাচ্ছা পালন করিয়া ক্রমশঃ তাহাদের উন্নতি করিতে পারিলে আমরা অচিরে সুন্দর সুন্দর গাভী বলদের অধিকারী হইতে পারি। স্বভাবতঃ কষ্ট সহিষ্ণু, অল্পহারী, সহজে রোগাক্রান্ত হয় না বা বিশেষ রকম যত্নের আবশ্যক হয় না অথচ কর্ম্মঠ ও পরিমিত দুগ্ধ দায়ী এমন বলদ গাভীর আবশ্যক।

বাঙলার ষাঁড়, বলদ চাষের প্রধান অবলম্বন। কেবল বাঙলা কেন ভারতের মত কৃষি প্রধান দেশে, যথায় রাজস্বের সমধিকাংশ চাষ হইতে উৎপন্ন হয়, তথায় গবাদি পশুকুলই মেরুদণ্ড স্বরূপ। গোময় স্যার সারের মধ্যে উৎকৃষ্ট, জলে কাদায় লাঙল টানিতে বলদ অপেক্ষা আর উচ্চতর পশু মিলে না, কি কাঁচা কি পাকা রাস্তায় গাড়ি টানিতে গোকুল অদ্বিতীয়, তাহারা পিঠে ছালা বাঁধিয়া ক্ষেত পাথার হইতে শস্য আনিয়া গৃহজাত করিতেছে এবং শকট বহিয়া সেই শস্য হাটে বাজারে লইয়া যাইতেছে। ভারতের বন্দর সমূহে বিদেশীয় জাহাজ দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের সেই বিপুল আয়তন খোল গুলি বলদগণ শকটে বহিয়া পণ্য সম্ভার আনিয়া ধীরে ধীরে পুরাইতেছে, আবার দেখ আমাদের রাজার গোলাগুলি বারুদের প্রকাণ্ড গাড়ী গরুতে টানিতেছে, যেখানে ঘোড়া হারিয়া যায়, সেই গাড়ীতে গরু কাঁধ দেয়, পশ্চিমে সুগভীর কুপ হইতে জল তোলা গরুর সাহায্য ভিন্ন হয় না, আখের কল, তৈলের কল চালাইতে গরু যেমন অন্য কোন জানোয়ার তেমন স্থির, ধীর শান্তভাবে চালাইতে পারে না, দেখ তোমার খামারের ধান, কলাই, সরিষা কেমন হাপসি গাঁথা পাঁচ কিম্বা সাতটা গরুতে মাড়িয়া দিতেছে। যেখানে জ্বালানি কাষ্ঠের অভাব গোময়ে ঘুটে প্রস্তুত হইয়া সে অভাব পূরণ হয়, গোময় ব্যতীত অন্য কোন পশুবিষ্ঠা এত নির্ব্বিঘ্নে ঘাঁটাঘাঁটি করা যায় না। ধনী তোমার অট্টালিকা নির্ম্মাণ হইবে—গরুই তোমার ইট, কাট, মাল, মসলা তোমার দরজায় আনিয়া যোগাইবে, ভারতে রেল বিস্তার হইতেছে, গরু কিন্তু সুদুর পল্লী অভ্যন্তর হইতে মালপত্র রেলের ষ্টেসনে আনিয়া না যোগাইলে বোধ হয় খরচের দায়ে বিকাইয়া যাইত। আবার এত ত রেল, ইলেক্‌ট্রিক ও মোটর গাড়ীর ছড়াছড়ি হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু এখনও গ্রাম্য রাস্তায় গোজানে মানুষ যাতায়াত করিতে বাধ্য। এমন স্থান এখনও অনেক এবং চিরদিনই থাকিবে বলিয়া মনে হয়, যেখানে গো, মহিষ ভিন্ন অশ্বজান কখন চলিবে না। বড় বড় রাজা জমিদারের ইন্দ্রের রথের ন্যায় সুন্দর সুচিত্রিত গাড়ী গুলি কেমন সবল দেহ

শ্যামল ধবল বলদে টানিতেছে। এতক্ষণ আমরা গরুর ভার বহনের কথাই বলিলাম, কিন্তু গাভীগণের মানুষের খাদ্য যোগাইবার কথা ভুলিবার নহে। অরণ্যচারী আর্য্য ঋষী গণ ফলমূল আহার করিতে করিতে যে দিন হইতে শান্ত শিষ্ট গোকুলের সন্ধান পাইলেন, সেই দিন হইতে তাঁহারা গোমাতার স্মরণ লইলেন। এমন করিয়া খৈল, খোসা, ভুষি খাইয়া কে বল এমন অমৃতবৎ দুগ্ধধারা দান করিবে। ইহা বালক, বৃদ্ধ, ধনী, দরিদ্র সকলেরই মৃতসঞ্জীবনী সুপেয় সুপথ্য। একপোয়া খাঁটি দুগ্ধ পান আড়াই সের চাউলের অন্ন ভোজনের সমান। ভারতের গোবংশের উন্নতি হইলে ভারতের চাষ, চাষী, ধনী, জমিদার সকলেই রক্ষা পাইবেন। একের উচ্ছেদে এতগুলি উৎসন্ন যাওয়া অবশ্যম্ভাবী।

কলিকাতায় ক্ষুদ্র শিল্প—শ্রীযুত নলিনান্দ চট্টোপাধ্যায় অমৃতবাজার পত্রিকায় কাঁচের বাসন ও দেশী পেরেক এই ক্ষুদ্র শিল্পের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, এই দুইটী শিল্পের সমধিক উন্নতি করা যাইতে পারে এবং ইহাদের উন্নতি হওয়াও নিতান্ত আবশ্যক।

সকলেই দেখিয়াছেন যে হ্যারিসন রোডে কয়েকটি খোলার ঘরে ফুঁকাশিশি প্রভৃতি কাঁচের বাসন প্রস্তুত হয়। এই সকল দোকানের সাজ সরঞ্জম সবই সামান্য। মাটির উনান সাধারণ মাটিতেই প্রস্তুত, কুত্রাপি দশ পাঁচ খানা অগ্নির উত্তাপ সহিষ্ণু ইট ব্যবহার করা হয় মাত্র, লাল, নীল, সবুজ, হলদে ও শাদা নানা রঙের ভাঙ্গা কাঁচের বাসন কিনিয়া আনিয়া সামান্য কাটের মুগুর দ্বারা গুঁড়া করা হয়। সেই গুঁড়াগুলি কাঠের জ্বালে গলান হয়। বাবলা কাঠের আগুনের একটু তেজ বেশী, সেই কারণে বাবলা কাঠই প্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একটা সছিদ্র লম্বা নলের মুখে সেই গলিত কাঁচ সংলগ্ন করিয়া লইয়া তাহাতে ফুৎকার দিয়া মধ্যস্থল শূন্য গর্ভ করিয়া লইতে হয়, অবশেষে ছাঁচে ফেলিয়া শিশি, দোয়াত, গঁদাধার প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া লওয়া হয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খোলার ঘরে এই সকল কারখানা অবস্থিত এবং নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানগণ এই কার্য্যে লিপ্ত। তাহাদের তোড়জোড় কোন রকমে কাজ চালাইবার মত। সৌখিন, টেঁকসই জিনিষ তাহাদের দ্বারা প্রস্তুত সম্ভব নহে, অথচ তাহারা যে জিনিষ গুলি তৈয়ারি করে সেগুলি অকাজের নহে, সে গুলির বিশেষ আবশ্যক আছে।

নলিনান্দ বাবুর এই কথার অবতারণা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, যখন ১॥০ ক্রোর টাকার কাঁচের দ্রব্য প্রতি বৎসর ভারতে আমদানী হইয়া থাকে, তখন কাঁচের কারখানার উন্নতির বিশেষ চেষ্টা হওয়া নিতান্তই আবশ্যক। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে ইউরোপীয় কারখানার অনুকরণে এখানে কাঁচের দ্রব্য

নির্ম্মাণের কয়েকটি কারখানা স্থাপিত হইল কিন্তু কোনটি চলিল না। ইহার সঠিক কারণ যে কি তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে এই সকল সামান্য অবস্থার মুসলমানগণ সামান্য মাত্র সাজ সরঞ্জমে এই কারখানা চালাইতেছে, তখন উন্নত কল কব্জা লইয়া উন্নত প্রণালীতে প্রস্তুত উনানে এই প্রকার কাঁচের দ্রব্য প্রস্তুতের প্রয়াস বৃথা হইবে কেন,—অপিচ ইহাতে আশানুরূপ কার্য্য হওয়াই সম্পূর্ণ সম্ভব এবং সম্ভব হইলে দেশের কত পয়সা দেশে রাখিতে পারা যাইবে।

যাহা কাঁচের কারখানার পক্ষে সম্ভবপর তাহা পেরেক প্রস্তুতের কারখানার পক্ষে অধিকতর সম্ভব। হাওড়ায় কোন একটি অপ্রশস্ত গলির ভিতর পশ্চিম দেশীয় সামান্য ব্যক্তিগণ পরিচালিত একটি পেরেকের কারখানা দেখিলে একথা স্বতঃই মনে আসে। তাহারা সরু, মোটা নানা মাপের লোহার তার ক্রয় করিয়া তাহা আবশ্যকমত ছোটকরিয়া কাটিয়া পুড়াইয়া পেরেক তৈয়ারি করিতেছে, গোল তার গুলি উত্তপ্ত করিয়া পিটিয়া চেপ্টা করিতেছে, এক অগ্রভাগ পুড়াইয়া লাল করিয়া হাতুড়ি দ্বারা সরু করিতেছে।

তামাকের চাষ—রঙপুর গভর্ণমেণ্ট কৃষি পরীক্ষা-ক্ষেত্রের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত যামিনীকুমার বিশ্বাস, বি, এ, প্রণীত মূল্য ১।৷০ টাকা। পুস্তক খানি সচিত্র, ১৩৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

ইতিপুর্ব্বে তামাক সম্বন্ধে যামিনী বাবু লিখিত অনেক প্রবন্ধ কৃষকে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধগুলি সারগর্ভ, সেই কারণে আমরা আশা করিয়াছিলাম যে, প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে অচিরে প্রকাশিত হইবে; গ্রন্থকর্ত্তা আমাদিগকে সে আশ্বাস দিয়াছিলেন, বহুদিন পরে তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে দেখিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি, কেননা বাঙলা ভাষায় এরূপ একখানি পুস্তকের আবশ্যক। ইংরাজী ভাষায় তামাক চাষ ও তামাক ব্যবসা সম্বন্ধে অনেকানেক পুস্তক থাকিলেও বাঙলা কিম্বা ভারতে কোন তামাকের চাষ প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত। কিরূপ জল হাওয়া, কেমন মাটিতে তামাক চাষে লাভ হইতে পারে, ঠিক এদেশের প্রয়োজনানুরূপ বিষয় গুলির সমাবেশ বিদেশীয় পুস্তকাদিতে থাকা সম্ভব নহে।

গ্রন্থকার৹ প্রথমতঃ তামাক কি প্রকারে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিল তাহার ইতিবৃত্ত দিয়াছেন। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে প্রথমে ইহা কিউব নগরীতে আবিষ্কৃত হয়, তারপর ক্রমশঃ ইউরোপে ও এসিয়া ভূখণ্ডে ইহার ব্যবহার বিস্তার লাভ করে। অতঃপর তিনি দেখাইয়াছেন যে বোম্বাই, মান্দ্রাজ, যুক্তরাজ্য ও পঞ্জাব, এবং বঙ্গদেশে স্থানীয় লোকের চেষ্টায় ও গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে তামাকের চাষ ও

তামাক পাতার সংস্কারকার্য্য ক্রমশঃ কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে। বাঙলা, বিহারে প্রায় ১৫০০০০০ বিঘাতে, মান্দ্রাজে ৩৯০০০০, বোম্বায়ে ৩০০০০০, ব্রহ্মদেশ, যুক্তরাজ্য ও পঞ্জাবে ১৮০০০০ বিঘাতে প্রতি বৎসর তামাক চাষ হইতেছে। রঙপুরে বুড়ীরহাট তামাক-ক্ষেত্র সিগারেট ও চুরুটের বিলাতী নূতন নূতন তামাকের চাষে ও তামাক পাতা জাত দেওয়া ও সংস্কার কার্য্যে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

বিভিন্ন মৃত্তিকায় তামাক জন্মে, কিন্তু তাহাদের গুণ বিভিন্ন রকম হয়। সছিদ্র বালিয়াঁশ মৃত্তিকায় উৎকৃষ্ট চুরুট ও সিগারেটের তামাক জন্মিয়া থাকে। ভাল তামাকের জমিতে ৮ কিম্বা ১০ ভাগের অধিক আঁটাল মাটি থাকিলে তামাক মনোমত হয় না। নদীর পলি মাটিতে তামাক ভাল হওয়া সম্ভব। তামাকের পটাসই প্রধান সার। সোরাতে পটাস মাত্রা অধিক আছে, নাইট্রোজেনও (যবক্ষার জান) আছে। এদেশের লোকে তামাকে কিন্তু সোরা ব্যবহার করে না, গ্রন্থকার সোরা ব্যবহার করিতে বলিতেছেন। কোন গাছের ছাইয়ে কত ভাগ পটাস তাহা বলিয়া দিয়াছেন; আমরা দেখিতে পাই সীমের গাছের ছাই ভাল, কারণ তাহাতে শতকরা ৪০ ভাগ ছাই। পটাসের জন্য সলফেট অব পটাস ব্যবহার করা যায়, তাহাতে শতকরা ৫০ ভাগ পটাস আছে; কিন্তু তাহার দাম অধিক। আমেরিকার আদর্শ তামাক-ক্ষেত্রে সবুজ সার প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল হইয়াছে।

আমাদের দেশে তামাক চাষের অনেক জমি মিলিতে পারে। শস্য পর্য্যায় অবলম্বন করিয়া চাষ করিলে ও ফস্ফরিক এসিড, পটাস ও যবক্ষার জান উপযুক্ত অনুপাতে ব্যবহার করিলে, একই ক্ষেতে বহুকাল ধরিয়া তামাক চাষ করা যায়। তৃণ জাতীয় কিম্বা কলাই জাতীয় শস্যের সহিত তামাকের পালটি চাষ ভাল।

তামাক জাত করণ, তামাক পাতা সংস্কার কার্য্য গ্রন্থকার সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। সিগারেট ও চুরুটের উপযোগী তামাকের গুণাগুণ বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত চুরুটের তামাকের চাষ, মার্কিন দেশীয় সিগারেট তামাকের চাষ, তুরস্ক দেশীয় সিগারেটের তামাকের চাষ, মান্দ্রাজী চুরুটের তামাকের চাষ, বর্ম্মা চুরুটের তামাকের চাষ বর্ণনা করিয়া এদেশের তামাকের ব্যবসায়ের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। তামাক ক্ষেতে ও গুদামে পোকার উপদ্রব হইলে কি ক্ষতি দেখাইয়াছেন ও তাহার প্রতিকার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বীজ ভাল বা মন্দ হইলে ফসল ভাল বা মন্দ হয়। সুতরাং গ্রন্থকার সর্ব্বাগ্রে সুবীজ সংগ্রহের পরামর্শ দিয়াছেন—সবল, সুস্থ গাছ হইতে সুপুষ্ট বীজ সংগ্রহ করা বিধেয়: বিদেশী বীজ হইলেও এদেশের জল হাওয়ার উপযুক্ত বীজ নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। বিদেশী বীজ হইতে এদেশের অনুকূল জল হাওয়ায় মাটিতে গাছ জন্মাইয়া

ভাল বীজ সংগ্রহ করিতে পারিলে ভাল। ভাল মন্দ তামাকে সাঙ্কর্য্য না ঘটে তজ্জন্য পাতলা থলি দ্বারা পুষ্প দণ্ডটি মুকুল সমেত ঢাকিয়া রাখিবার বিধি ব্যবস্থা বিশেষ আবশ্যক।

তামাকের গুণানুসারে কি দর, আমদানী রপ্তানির হিসাব প্রভৃতি ব্যবসায়ীর জ্ঞাতব্য, অনেক বিষয় ইহাতে পাওয়া যায়। রঙপুর ক্ষেত্রে গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন যে প্রতি একরে ১৫ হইতে ২০মণ তামাক উৎপন্ন হয়। এই হিসাবে দেখা যায় যে প্রতি বিঘায় ১০ হইতে ১২ কাহন তামাক পাওয়া যায়, একরে ৩২ কাহন। প্রতি কাহন ৬৲ টাকা দরে বিক্রয় হয়। ইহার সহিত রদি পাতাগুলি ২৲ টাকা কাহন দরে যে মূল্য হয় যোগ করিলে, এক একরে মোট ১৯৫, টাকা মূল্য পাওয়া যাইতে পারে। একরে খরচ ১১৯ টাকা, একর প্রতি লাভ ৭৮৲ টাকা। পুস্তক খানির স্থানে স্থানে শাস্ত্রীয় ভাষা প্রয়োগ হেতু ভাষা সমগ্র প্রাঞ্জল হয় নাই ও পৌন্য পুন্য দোষে দুষ্ট হইয়াছে। এই টুকু দোষ না থাকিলে পুস্তক খানি সর্ব্ব সুন্দর হইত। বিষয় বিশেষ লিখিত পুস্তকে অনেক সময় এরূপ দোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে, পরন্তু পুস্তক খানিতে যে সমুদয় জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহাতে তামাক চাষে বা ব্যবসায়ে লিপ্ত ব্যক্তির পক্ষে পুস্তক খানি বিশেষ আদরের হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

গোপাল-বান্ধব—প্রথম ভাগ,—হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার বি, এল প্রণীত। **বর্ণ চিত্রণ**—ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। **আতঙ্ক নিগ্রহ ফার্ম্মাসির এলবাম**—শ্রীযুক্ত মণীশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী প্রেরিত। আমরা উল্লিখিত কয়েক খানি পুস্তকের স্থানাভাব প্রযুক্ত সমালোচনা প্রকাশ করিতে পারিলাম না, বারান্তরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

পত্রাদি

গোলাজাত শস্যের পোকা নিবারণের জন্য—কার্ব্বণ বাইসালফাইড।

শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জ বিহারী দত্ত, সম্পাদক কৃষক, আলমোরা হইতে লিখিতেছেন যে "আমার অনুপস্থিত কালে কৃষকে যে পত্রাদির উত্তর দিতে বলিয়াছিলাম তাহাতে তিনি কার্ব্বণ বাইসালফাইড সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে লোকের ভ্রম হইতে পারে। কার্ব্বণ বাইসালফাইড তরল পদার্থ, ইহা ছেঁড়া কাপড়ে ঢালিয়া তাহার পুঁটুলি করিয়া ব্যবহার করা চলে, কিম্বা তুলার মত এক প্রকার নরম কাগজ চূর্ণ পাওয়া যায় তাহাতে ভিজাইয়া তাহার পুঁটুলি করিয়া ব্যবহার করা চলে বটে, কিন্তু তিনি যেরূপ সংক্ষেপে লিখিয়াছেন তাহা সহজে লোকে বুঝিবে না।

ইহা তুলা ভিজাইয়াও শস্যের উপরে রাখিয়া দিলে হয়। পত্র প্রেরককে ইহার ব্যবহার স্বতন্ত্র পত্র লিখিয়া জানাইবেন এবং কৃষকেও ভ্রম সংশোধন করিয়া লইবেন।"

এই সম্বন্ধে আমরা দ্বিতীয় পত্র পুসা অনুসন্ধানালয়ে কীট তত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ঘোষের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। কৃষক পত্র এবং এসোসিয়েসনের প্রতি তাঁহার সর্ব্বদা এতাদৃশ সযত্ন দৃষ্টি দেখিয়া বড়ই প্রীতি অনুভব করি। এই সম্বন্ধে ইহার বিশেষ আলোচনা আছে, সেইজন্য কার্ব্বণ বাইসালফাইড সম্বন্ধে তাঁহার পত্রখানি আমরা সমগ্র কৃষকে প্রকাশ করিলাম।

কার্ব্বণ বাই-সালফাইড ও গোলাজাত শস্যের পোকা নিবারণ

১৩২০ সালের শ্রাবণ সংখ্যার "কৃষকে" গোলাজাত শস্যের পোকা নিবারণ করিবার জন্য কার্ব্বণ বাই-সালফাইড ব্যবহার করিবার যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ভুল। উত্তর প্রদান কালে লেখক কর্পূরের বা ন্যাপ্‌থালিনের কথা ভাবিতেছিলেন। কার্ব্বণ বাই-সালফাইড জলের মত তরল পদার্থ। অতএব কর্পূর বা ন্যাপ্‌থালিনের মত ইহা ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটালিতে বাঁধা যায় না।

গোলাজাত বা হাঁড়িতে শস্য রক্ষা করিবার কথা "ফসলের পোকা" নামক পুস্তকের উনবিংশ পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে। কতক অংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

যে কোন উপায়েই শস্য রাখা হউক পোকারা যদি আসিয়া ডিম পাড়িতে পারে তবে সে শস্যে পোকা লাগিবেই। এমন জায়গায় রাখিতে হয় যেখানে পোকা ঢুকিতে পারে না। এক দিন খোলা জায়গায় পড়িয়া থাকিলে কখন পোকা আসিয়া ডিম পাড়ে—জানিতে পারা যায় না। হাঁড়িতে বা জালাতে নিচে উপরে নিমপাতা বা রসুন রাখিলে পোকা ধরে না বলিয়া শুনা যায়। যেখানেই রাখা হউক মাঝে মাঝে শস্যাদি বাহির করিয়া পাতলা করিয়া বিছাইয়া রৌদ্রে দিলে উপকার হয়। এমন ভাবে বিছাইতে হয় যেন যেন নীচের শস্যও গরম হয়। রৌদ্রে দিলে পোকারা পালায়। যদি বেশী গরম হয় তাহা হইলে ডিম এবং শস্যের ভিতরের কীড়াও নষ্ট হওয়া সম্ভব। বেশী গরম না হইলে ডিম ও কীড়া যেমন তেমনই থাকিয়া যাওয়া সম্ভব। পোকা হইলে ঘন ঘন রৌদ্রে দিয়া পোকা তাড়াইতে হয়। পোকা দিগকে যদি মারিতে পারা যায় তাহা হইলে ভাল হয়। কারণ ঘরের দরজায় বা অঙ্গনে শস্য শুকাইতে দেওয়া হয়; না মারিলে পোকারা শস্য ছাড়িয়া ঘরেই আশ্রয় লয়। পোকা বেশী হইলে চালুনী দ্বারা চালিয়া কেরোসিন মিশ্রিত জলে ফেলিয়া মারিতে হয়। শস্য রৌদ্রে দিলে যখন পোকারা শস্য ছাড়িয়া পালায় তখন ঝাঁটা দ্বারা জড় করিয়াও মারা যায়।

আগুনের উত্তাপে যদি কলাই ইত্যাদি গরম করা যায় তাহাহইলে ডিম, ভিতরের কীড়া এবং পতঙ্গ সমস্তই মরিয়া যায়। কিন্তু বীজকে এইরূপ আগুনে গরম করিলে সে বীজে গাছ হয় না। যে শস্য বীজরূপে ব্যবহৃত হইবে না তাহাকেই আগুনে গরম করা চলে।

কার্ব্বণ বাই-সালফাইড্ নামক এক প্রকার তরল পদার্থের গ্যাস দ্বারা বীজ ইত্যাদি যে কোন গোলাজাত জিনিষ শুদ্ধ করিয়া লইলে পোকা ডিম, কীড়া ইত্যাদি সমস্ত মরিয়া যায়। মূল্য বান দুষ্প্রাপ্য বীজ ইহা দ্বারা শুদ্ধ করিয়া রাখা ভাল। শুদ্ধ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে এমন জায়গায় রাখিতে হয়, যেখানে পোকা পৌঁছিতে পারে না। শুদ্ধ করিলেও যদি খোলা জায়গায় রাখা হয় তাহাহইলে আবার পোকা লাগিতে পারে। এই গ্যাসে বীজ নষ্ট হয় না এবং যে শস্যে ঐ গ্যাস লাগান হইয়াছে, তাহা খাইলে কোন ক্ষতি হয় না।

হাঁড়ি কিম্বা জালা কিম্বা কাঠের বাক্স কিম্বা গুদাম ঘর যাহা এমন করিয়া বন্ধ করিতে পারা যায় যে, কোন রকমেই হাওয়া বাহির হইতে পারে না তাহাতেই এই গ্যাস দেওয়া চলে।

১ মণ ১০ সের বীজ বা শস্যের জন্য এক আউন্স বা অর্দ্ধ ছটাক কার্ব্বণ বাই-সালফাইড আবশ্যক হয়। হাঁড়িতে বা জালাতে এই হিসাবে ব্যবহার করিতে হয়।

১৫ ঘন ফুট স্থানের জন্য এক আউন্স বা অর্দ্ধ ছটাক কার্ব্বণ বাই-সালফাইড ব্যবহার করিতে হয়। বড় ঘরে, বাক্সে বা টীনে ব্যবহার করিতে হইলে এই হিসাবে ব্যবহার করিতে হয়। ২৭৷৷০ মণ বীজ বা শস্যের জন্য ১২ ছটাক কার্ব্বণ বাই-সালফাইডের দরকার।

হাঁড়ি বা জালার গলা পর্য্যন্ত ও বাক্সের মুখ পর্য্যন্ত শস্য বা বীজ ভরিয়া উপরে কতকটা তুলা রাখিতে হয়। উপরে যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে, সেই হিসাবে যত কার্ব্বণ বাই-সালফাইড আবশ্যক মাপিয়া লইয়া তুলাতে ঢালিয়া দিতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখ বন্ধ করিতে হয়। ২৪ ঘণ্টা এই রূপ বন্ধ থাকিবে। হিসাবের বেশী কার্ব্বণ বাই-সালফাইড লইতে নাই কিম্বা ২৪ ঘণ্টার বেশী বন্ধ রাখিতে নাই। ২৪ ঘণ্টার পরে ঢাকা খুলিয়া পোকা শূন্য পরিষ্কার জায়গায় একবার শস্য ঢালিয়া দিতে হয়। থলের মধ্যে যদি থাকে তবে ঢালিবার আবশ্যক নাই। থলে হাওয়াতে থাকিলেই হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে গ্যাস উড়িয়া যায়, তখন শস্য উঠাইয়া পুনরায় বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। গোলা বা গুদাম ঘরও এই রূপে কার্ব্বণ বাই-সালফাইড দিয়া ২৪ ঘণ্টা বন্ধ রাখিতে হয়। তারপর দরজা ইত্যাদি খুলিয়া দিলে গ্যাস উড়িয়া যায়। গোলা গুদামের শস্যাদি এইরূপে পোকা শূন্য করিয়া ভাল করিয়া

বন্ধ রাখিলে পোকা লাগিতে পারে না। গোলা বা গুদাম বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একবার পরিষ্কার করা উচিত। আর গোলার ভিতর ভুষি, তুঁষ ইত্যাদি রাখা উচিত নয়। ইহা খাইয়াও পোকারা বাঁচিয়া থাকিতে পারে এবং ইহাদের বংশ বাড়ে।

কার্ব্বণ বাই-সালফাইড বিশেষ সতর্কতার সহিত ব্যবহার করা উচিত। (১) ইহা বিষ। ইহার গ্যাস একটু শুঁকিলে জ্ঞানলোপ হয়। (২) ইহার গ্যাস সহজেই জ্বলিয়া উঠে এবং কামানের মত আওয়াজ হয়। অতএব ইহার কাছে আলো বা আগুন লইয়া যাওয়া উচিত নয়। (৩) কাঁচের ছিপিওয়ালা শক্ত বোতলে কার্ব্বণ বাই-সালফাইড রাখিতে হয়। সোলার ছিপি হইলে গ্যাস বাহির হওয়া সম্ভব। বোতল রৌদ্রে বা গরম জায়গায় রাখিতে নাই, তাহা হইলে ফাটিয়া যায়। বোতল সকল সময়ই তালাচাবি বন্ধ করিয়া রাখা উচিত। (৪) ইহার গ্যাস দুর্গন্ধময়, যেখানে বোতল থাকে সেখানে যদি গন্ধ পাওয়া যায় তবে কোন রকম আলো বা আগুন লইয়া সেখানে যাওয়া উচিত নয়।”

কার্ব্বণ বাই-সালফাইড কলিকাতা মেঃ ডি, ওয়ালডি কোম্পানির দোকানে পাওয়া যায়। দাম প্রতি পাউণ্ড ১৲ টাকা।

আজকাল প্রায়ই বাঙ্গালা পত্রিকা ইত্যাদিতে কার্ব্বণ বাই-সালফাইড ব্যবহার করিতে উপদেশ দেওয়া হয়। ইহা অতি সহজ দাহ্যমান পদার্থ অতএব বিপজ্জনক। সাধারণ লোককে ইহা ব্যবহার করিতে বলার সঙ্গে সঙ্গে বিপদ না ঘটে তাহার জন্য সতর্ক করিয়া দেওয়া উচিত।

সাধরণ গৃহস্থের বা কৃষকের পক্ষে হাঁড়িতে বা জালাতে শস্য রাখিয়া কার্ব্বণ বাই-সালফাইড দিয়া শোধন করাই সুবিধা জনক। শস্য ভরিয়া কার্ব্বণ বাই-সালফাইডে তুলা ভিজাইয়া উপরে রাখিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে মুখে ঢাকা দিতে হয় এবং কাদা দিয়া ঢাক্‌না এরূপে বন্ধ করিতে হয় যেন গ্যাস বাহির হইয়া না যায়। ২৪ ঘণ্টা পরে ঢাক্‌না খুলিয়া শস্য একবার পরিষ্কার জায়গায় ঢালিয়া দিতে হয়। বিছাইয়া দিলে অতি শীঘ্রই গ্যাস উড়িয়া যায়। তখন পুনরায় শস্য সেই জালাতেই ভরিয়া রাখা যায়। কিন্তু ঢাক্‌না পুনরায় কাদা দিয়া এমন ভাবে বন্ধ করিয়া রাখিতে হয় যেন অতি ক্ষুদ্র পোকাও প্রবেশ করিতে না পারে। এইরূপে রাখিলে যত দিনই থাকুক শস্যে পোকা লাগিবে না। ২৪ ঘণ্টার বেশী,—বীজ শস্যের সহিত গ্যাস বন্ধ রাখিলে সেই বীজের অঙ্কুর নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

সার-সংগ্রহ

শিল্প শিক্ষা

কলিকাতায় একটি শিল্প-শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পূর্ব্ব হইতেই চলিয়াছে। এ সম্বন্ধে মাননীয় মিষ্টার আর, এন, ওয়াথান, মিষ্টর জি, ডবলু, কুকলার ও বঙ্গীয় শ্রম-শিল্প বিদ্যালয়সমূহের ইন্সপেক্টর মিষ্টর ডবলু, এইচ এভারেট আলোচনা করিয়া যে মন্তব্য ও বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সম্প্রতি তাহা সাধারণে প্রকাশিত হইয়াছে। ইঁহারা অনুমান করিয়াছেন যে, যে প্রণালীতে এই শিল্প-শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠার কল্পনা করা হইয়াছে, তাহাতে এককালীন ব্যয় দশ লক্ষ টাকার অধিক এবং বাৎসরিক ব্যয় ২৯৩০০০৲ টাকা আবশ্যক হইবে। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে এই কয়টি শাখা থাকিবে,—(১) এপ্রেনটিস অর্থাৎ শিক্ষানবিস শ্রেণী (তিন ভাগে বিভক্ত যথা মিকানিকেল, ইলেকট্রিকেল ও সিভিল); (২) উচ্চতর শ্রেণী (দুই ভাগে বিভক্ত, মিকানিকেল ও ইলেকৃট্রিকেল); (৩) নৈশ শ্রেণী (তিন বিভাগেরই কার্য্য শিক্ষার জন্য)। ইহা ছাড়া শিল্প বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও তাড়িত বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের শিক্ষার নিমিত্ত বিশেষ বিশেষ শ্রেণী খোলা হইবে।

শিবপুরে মিকানিকেল ও ইলেকৃট্রিকেল ইঞ্জিনিয়ারদিগের নিমিত্ত এপ্রেনৃটিস শ্রেণী আছে। কিন্তু তথায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগেরই প্রাধান্য অধিক। শিবপুরে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদিগেরও একটি বেশ উন্নতিশীল এপ্রেনটিস ক্লাস আছে, ইহাকে কতকাংশে পরিবর্ত্তন করিয়া কলিকাতার নূতন বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে মিকানিকেল ও ইলেকট্রিকেল ইঞ্জিনিয়ারি বিভাগে এপ্রেনটিস শ্রেণীতে ঊর্দ্ধসংখ্যা ২৫ জন এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ৪০ জন ছাত্রকে ভর্ত্তি করা হইবে। যত সংখ্যক লোকের চাকুরি পাওয়ার সম্ভাবনা তদতিরিক্ত লোককে এপ্রেনৃটিস শ্রেণীতে প্রবেশাধিকার দেওয়া সঙ্গত নয়। ভর্ত্তির বয়স ১৫ হইতে ১৮ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট রাখা যাইতে পারে। যে বয়সে শিক্ষাবিষয় বোধগম্য করার সামর্থ্য জন্মে সেই বয়সে ছাত্রদিগকে ভর্ত্তি করা হইবে। ছাত্রগণকে শিক্ষাস্থানেই বসবাস করিবার ব্যবস্থা আবশ্যক।

উচ্চতর শ্রেণীর উভয় বিভাগে যাহাতে প্রতি বৎসর ১০টির অধিক ছাত্র ভর্ত্তি না হয় তাহার বিধান করাই রিপোর্টদাতাগণের অভিমত। কলিকাতা বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এস-সি পরিক্ষোত্তীর্ণ বা তদনুরূপ যোগ্যতাশালী, ১৮ বা ১৯ বৎসর বয়স্ক বালক এই শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইতে পারিবে। রিপোর্টদাতাদিগের মতে এই শ্রেণীর ছাত্রদিগকে উপাধি প্রধান করার ব্যবস্থা বিহিত হইতে পারে।

বয়ন বিভাগ।

এই বিভাগে তাঁতে ও কলে উভয় প্রকারে কার্পাস সূতায় বয়ন শিক্ষা দেওয়া হইবে। সম্প্রতি শ্রীরামপুরে একটি বয়ন বিদ্যালয় আছে, এখানে হাতে কিরূপে বস্ত্র বয়ন করিতে হয় তাহাই শিক্ষা দেওয়া হয়। এই বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর লোককে শিক্ষা দেওয়া হয়,—(১) যাহারা মধ্যমরূপ সাধারণ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া বয়ন ব্যবসায়ের প্রবর্ত্তক বা পরিচালকরূপে কার্য্য করিবার জন্য শিক্ষিত

হইতে ইচ্ছুক, (২) যাহারা তন্তুবায়রূপে তাঁতে কার্য্য করিতে ইচ্ছুক। এই বিদ্যালয় হইতে ১০।১২ জন ছাত্র শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানে কারখানা স্থাপন করিয়াছে। যাহাতে ছোট ছোট বস্ত্রবয়নের কারবার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে প্রস্তাবিত নূতন বিদ্যালয়েও তদুপযোগী শিক্ষা প্রদত্ত হউক ইহাই রিপোর্টদাতাদিগের অভিমত।

শিক্ষার জন্য দশলক্ষ টাকা দান।

আমরা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল রাসবিহারী ঘোষ মহোদয় শিক্ষার নিমিত্ত দশলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। বিজ্ঞান কলেজে অধ্যয়নার্থী ছাত্রবর্গের সুবিধা সমুৎপাদনার্থ কতকগুলি বৃত্তি প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে এই টাকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে দেশের অন্যতর গৌরবসন্তান স্যার তারকনাথ পালিত এইরূপ মহনীয় দানের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া অক্ষয় যশোকীর্ত্তির অধিকারী হইয়াছেন।

বাগানের মাসিক কার্য্য

আশ্বিন মাস

সব্জীবাগান।—এই সময় শীতের আবাদ ভরপুর আরম্ভ হয়। ইতিপূর্ব্বেই জলদি জাতীয় কপি, টমাটো, বিলাতি লঙ্কা প্রভৃতি বপন করা হইয়া চারা তৈয়ারী হইয়াছে। এই সময় নাবীজাতীয় বীজ বপন করিতে হয়। মূলজ সব্জীর চাষ এই সময় হইতে আরম্ভ। মূলা, সালগম, বীটের এই সময় চাষ আরম্ভ করিবে। বেগুন চারা ইতিপূর্ব্বেই ক্ষেত্রে বসান হইয়া গিয়াছে, সেগুলি এক্ষণে দাঁড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। সীম, মটর বীজ এই সময় বপন করিতে হইবে। জলদি কপিচারা যাহা ক্ষেত্রে বসান হইয়াছে, তাহাতেও এই সময় মাটি দিতে হইবে ও পাকা পাতা গুলি ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। আলুও এই সময় বসাইবে, পিঁয়াজ চাষেরও এই সময়।

ফুলের বাগান।—এই সময় এষ্টার, প্যান্সি, ভার্ব্বিনা, ডালিয়া, ক্লিয়াস্থাস, পিটুনিয়া প্রভৃতি মরসুমী ফুলবীজ বপন করিতে আরম্ভ করিবে।

পার্ব্বত্যপ্রদেশে এই সময় বেগোনিয়া, জেরিনিয়ম প্রভৃতি কোমল গাছগুলির বিশেষ পাট করিতে হয়। এই সকলের কাটিং বসাইতে পারা যায়, কিন্তু পাহাড়ে অত্যন্ত অধিক বৃষ্টি হয়—সুতরাং সার্সি দ্বারা আবৃত স্থানে সে সকল কাটিং পোতা উচিত। গোলাপের কলম (Budding) এখন করা যাইতে পারে—বিশেষতঃ হাইব্রীড পারপেচুয়াল জাতীয় গোলাপের বডিং হইবে। চীনা, টি, বুরবন জাতীয় গোলাপের কাটিংও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে এখন করা যাইতে পারে। বৃষ্টির সম্পূর্ণ অবসান না হইলে পার্ব্বত্যপ্রদেশে সব্জী তৈয়ারী করা হইয়া উঠে না। তবে আচ্ছাদনের ভিতর যত্ন করিয়া করিলে কিছু কিছু হইতে পারে। পর্ব্বতে দ্রাক্ষালতার এই সময় বড় বাড় হয়। সেগুলি কাটিয়া, ছাঁটিয়া, গোড়া খুঁড়িয়া, একটু বাড় কমাইতে হইবে।

পশ্চিম ভারতে যেখানে বৃষ্টির আতিশয্য আদৌ নাই, তথায় গোলাপ হাপর হইতে নাড়িয়া বসাইতে পারা যায়। এই সময় উক্ত প্রদেশে ফুলকপি চারা ক্ষেতে বসান হইতেছে। আশ্বিন মাসের শেষে কার্ত্তিকের প্রথমেই তথায় ফুলকপি তৈয়ারী হইয়া উঠিবে।

কৃষক।

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৪শ খণ্ড। | আশ্বিন, ১৩২০ সাল। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

পাট ও পাত।

(শ্রীজগৎ প্রসন্ন রায় লিখিত।)

আমরা 'পাত ও পলু' শীর্ষক প্রবন্ধে রেশম পোকার সহিত পাতের কিরূপ সম্বন্ধ ও ঘনিষ্ঠতা তাহা দেখাইয়াছি। পাতের অপর নাম তুঁত। মালদহ, রাজসাহী, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি রেশম প্রধান জেলা সমূহের বার আনা ডাঙ্গার জমিতেই তুঁতের চাষ হয়, কারণ তুঁত পাতা না খাইলে রেশম কীট (পলু) বাঁচেনা। পূর্ব্বে প্রতি বিঘা তুঁতের জমিতে খরচ খরচা বাদে মোটের উপর ২০০ শত টাকা কৃষাণের লাভ থাকিত। কিন্তু সেদিন এখন চলিয়া গিয়াছে।

রেশম হইতে এই সমস্ত জেলার চারি পাঁচ সম্প্রদায় প্রতিপালিত হইতেছে, কেহ পলু পোকার খাদ্য তুঁতগাছের আবাদ করে, কেহ রেশম পোকা প্রতিপালন করিয়া কোয়া তৈয়ার করে, কেহ রেশমের কোয়া খরিদ করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে, আবার কেহ বা রেশমের সূতার ব্যবসা করে। এই রূপে অনেক সম্প্রদায় ইহা হইতে অন্নের সংস্থান করিয়া লয়। এতদ্ভিন্ন এই চারি জেলায় ৫।৬ টি বড় বড় সাহেব কোম্পানীর কুঠী ছিল, এই সমস্ত কুঠীয়াল সাহেবগণের অত্যাচার ও জবরদস্তির অংশটা বাদ দিয়া উপকারের দিকটা আলোচনা করিলে জানা যায় যে, প্রত্যেক কোম্পানীর কুঠী গুলিতে গড়ে প্রায় ৩০০ শত করিয়া লোক প্রতিপালিত হইত, এবং কোম্পানীর নিকট হইতে কৃষাণগণ সময়ে অসময়ে আবশ্যক মতন যথেষ্ট টাকা দাদন পাইয়া নির্ব্বিঘ্নে পাত ও পলুর চাষ করিতে পারিত, এবং জমীদারেরও খাজনা পরিশোধ করিত। এই সমস্ত কোম্পানী ছাড়া গবর্ণমেণ্টেরও স্বতন্ত্র কৃষিবিভাগ আছে। ফারগুশন সাহেবের কুঠী ফেল হইলে রাইট এণ্ড এণ্ডারসন কোম্পানীর কুঠী চলিল, এই কোম্পানীর ব্যবসা মন্দা পড়ায় বেঙ্গল

সিল্ক কোম্পানীর অভ্যুদয় হইল ; বেঙ্গল সিল্ক কোম্পানীর কুঠী উঠিয়া গেলে লুইপ্যান কোম্পানী সেই স্থান দখল করিলেন, বিদেশী বণিকদিগের সর্ব্বাপেক্ষা বড় ধনী এই লুইপ্যান কোম্পানীও সম্প্রতি ফেল হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা তাঁহাদের প্রভূত জমীদারি ও আসবাব পত্র বিক্রয় করিয়া গৃহে ফিরিতেছেন। বিদেশী বণিকগণ যখন অগ্রে দাদন দিয়া, পৃথক পাহারা বসাইয়া, পাতের আবাদ করাইয়া, পলু পুষিয়া সর্ব্বশেষে চড়া দরে কোয়া খরিদ করিয়াও ব্যবসা চালাইতে পারিলেন না, তখন অন্যান্য ছোট ছোট স্বদেশী কারখানা গুলি যে ২৪ বৎসরের মধ্যেই লয় প্রাপ্ত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

বৈদেশিক রেশমই যে ভারতীয় রেশম নষ্ট করার একমাত্র কারণ তাহাও ঠিক নহে, কুঠিয়াল সাহেবগণ রেশম ব্যবসাটী একচেটিয়া করিয়া, দাদন দিয়া, জবরদস্তি করিয়া কৃষকগণকে পাতের চাষ করাইতে লাগিলেন, আপন ইচ্ছামত রেশম গুটির দর কমবেশী করিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন, প্রজা উৎপীড়িত হইয়া ক্রমশঃ পাত ও পলুর আবাদ কৌশলে পরিত্যাগ করিয়া অন্যপন্থা অবলম্বন করিতে লাগিল। এই জন্যই ত লুইপ্যান কোম্পানীর বড় সাহেবকে, ভারত হইতে ফিরিয়া যাইবার সময় দুঃখ করিয়া বলিয়া যাইতে হইতেছে—"আমাদের ফ্রান্সে ধনীর ঘরে ২।৩ হাজার তাঁত চলে। আমি গত বৎসর হইতে বহু চেষ্টা করিয়াও সেই সকল তাঁত চলিবার উপযুক্ত পরিমাণ রেশম বাঙলা হইতে সরবরাহ করিতে পারিলাম না, কাজে কাজেই আমাকে কোম্পানী তুলিয়া দিতে হইল, কুঠিয়াল সাহেবের ম্যানেজার সাহেবগণ যদি পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়া একটু সাবধান হইতেন, তাহা হইলে এক্ষণে আর বেশী দর দিয়াও রেশম কোয়া মিলান তাঁহাদের পক্ষে এত কষ্টকর হইয়া পড়িত না"। কেবল কুঠিয়াল সাহেবগণের উৎপীড়নেই অনেক রেশম চাষী ক্রমেই পাতের জমী ভাঙ্গিয়া ধানের জমি করিয়া ফেলিয়াছে ; কাজে কাজেই, উৎপন্ন গড়পড়তাতে ও কম হইয়া দাড়াইয়াছে। যে দরে সে সময় কোয়া খরিদ করিলে কোম্পানীর কোন লোকসানের সম্ভাবনা ছিল না, তাঁহারা নিজেদের খেয়াল বশতঃই সে সময় পাত ও পলুর চাষকে পাকে ফেলিয়া অনেক স্থলে অত্যন্ত অল্প মূল্যে কোয়া খরিদ করিয়াছেন। প্রজাদিগের অবস্থা তত সচ্ছল নহে যে তাহারা একবৎসর কোয়া ঘরে বাঁধিয়া রাখিতে পারে, বিশেষতঃ অধিকাংশ হিন্দু কৃষাণই পলুপোকার জীবন বিধ্বংস করিয়া রেশম গুটী ঘরে বাঁধিয়া রাখা ধর্ম্ম বিগর্হিত বলিয়া মনে করে, আবার রেশম কীট উত্তাপে মারিয়া না রাখিলে ও কোয়া ভাল থাকে না, কোয়া কাটিয়া পোকা পাখা সমেত বাহির হইয়া পড়ে।

ভাগীরথীর পশ্চিম তীর মুর্শিদাবাদে বা পূর্ব্ব রাঢ়ের পাতের জমী এখন কি করিয়া পাট অধিকার করিয়া বসিয়াছে এই বার তাহাই বলিব। মুর্শিদাবাদ

লাইন খোলার পর হইতে গঙ্গার পূর্ব্বধারে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে [পাট জন্মাইতেছে। কিন্তু গঙ্গার পশ্চিমধারে পশ্চিম মুর্শিদাবাদে পাটের চাষ আদৌ ছিল না, কি করিয়া পাট বুনিতে হয় তাহাও কৃষাণেরা ভাল জানিত না। কচিৎ কোথাও কেহ সামান্য এক আধ কাঠা পাট বুনিত বটে কিন্তু কাচিতে না জানায় তাহা নষ্ট হইয়া যাইত। রাঢ়ের দক্ষিণ ভাগে কোন কোন চাষা শণ কাচার ন্যায় পাট পচাইয়া ঘরে তুলিয়া আনিয়া এক একটি করিয়া বাছিয়া লইত। একজনে একদিনে যে পাট কাচিয়া ১॥০ হইতে ২৲ টাকা পর্য্যন্ত উপায় করিতে পারে একথা তাহাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

গঙ্গার পশ্চিম ধারকেই আমি রাঢ় কহিতেছি, প্রকৃত রাঢ়ের মাটী অত্যন্ত কর্কশ ও এঁটেল। অতিরিক্ত পরিমাণ গোবর সার দিয়া দোয়াঁশ করিতে না পারিলে মধ্য রাঢ়ে পাটের গাছ লম্বা হয় না।। কিন্তু পূর্ব্ব রাঢ় বা পশ্চিম মুর্শিদাবাদের ডাঙ্গার মাটী মধ্য বঙ্গের মৃত্তিকার ন্যায় বেলে ও সরস। গঙ্গার বালি ও পলিতে অবশ্য এইরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। এই পূর্ব্ব রাঢ়ের মধ্য দিয়াই এবার B. N. R. Railway Line প্রস্তুত হইল এবং রেল রাস্তার দুই পার্শ্বে পাট পচার উপযুক্ত সুন্দর সুন্দর খাদও প্রস্তুত হইয়া আসিল।

এদিকে সাহেব দিগের কুঠীও ফেল হওয়ায় কৃষাণগণ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতেছে কি করিয়া তাহাদের জীবিকা অর্জ্জন হইবে। যে পাতে বিঘা প্রতি বৎসরে প্রায় দুইশত টাকা আয় হইত সেই পাত এক্ষণে গরু ও ছাগল দিয়া খাওয়াইতে হইতেছে। এখানকার এক এক কৃষকের আবাদের অর্দ্ধেকই প্রায় তুঁতের জমী, তাহারা এই সমস্ত আয়কর ডাঙ্গায় কিরূপ ফসল উৎপন্ন করিয়া দিন গুজরাণ করিবে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছে না। এখনও যে সমস্ত ছোট ছোট কারখানা আছে সেখানকার প্রস্তুত রেশম মাড়োয়ারি মহাজনে খুব কম মূল্যে খরিদ করিতে আরম্ভ করায় সে গুলিও দিন দিন ফেল হইয়া যাইতেছে। গঙ্গার পূর্ব্ব ধারে পাটের আবাদ দেখিয়া পশ্চিম ধারের রাঢ়ের কৃষাণ পাতের জমিতে পাটের আবাদ হয় কি না তাহাই পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। গত বৎসর কেহ কেহ পাতের জমী ভাঙ্গিয়া তাহাতে পাট বুনিয়া বিস্তর ফসল পাইয়াছে। এক্ষণে গ্রামের মধ্যদিয়া রেল চলিল, মৃত্তিকাও পাটের উপযুক্ত, আবার এদিকে তাহাদের চিরগৌরবের পাত পলুর চাষও দিন দিন লোপ পাইতে-চলিল, কাজেই রাঢ়ের কৃষাণ যে, পাটই জীবনের একমাত্র সম্বল ভাবিয়া পাটের চাষেই জীবন উৎসর্গ করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! তাই তাহারা আজ মধ্য বঙ্গের কৃষাণের ন্যায় আপাতঃ মধুর কিন্তু জীবন-নাশক পাটের আবাদ দিন দিন বাড়াইবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছে। বিদেশীর চক্রে নীলের ন্যায় পাট ও

বাঙ্গালা হইতে হয় ত একদিন অবসর গ্রহণ করিবে, কিন্তু পাট ছাল ভোজী মশক বাহিনী ম্যালেরিয়া চিরদিনের জন্য রাঢ়ের সুস্থ জীবন ধ্বংস করিতে তিল মাত্রও পরাঙ্মুখ থাকিবে না।

জমী সাধারণতঃ গরু ছাগল হইতে রক্ষা করিবার জন্য অনেক উঁচু পগার দিয়া পাতের ডাঙ্গা তৈয়ার করা হয়। এই সমস্ত ডাঙ্গার যেরূপ মাটী তাহাতে উত্তমরূপ পাট জন্মাইতে পারিবে এবং গঙ্গার বানে এই সকল ডাঙ্গা ডুবিয়া যাইবে না।

আমি সম্প্রতি প্রাচীন গুপ্ত রাজদিগের রাজধানী কর্ণসুবর্ণের রাক্ষসী ডাঙ্গা, রাজবাড়ী ডাঙ্গা প্রভৃতি দেখিতে চাঁদপাড়া রাঙ্গামাটী আসিয়াছিলাম। গঙ্গার শাদা চরের মধ্যে চাঁদপাড়া রাঙ্গামাটীর তুঙ্গ গোলাপী মৃত্তিকা স্তূপ দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। রাজবাড়ীর ডাঙ্গা লইয়া সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর ও জেমোরাজাদিগের সহিত বিশেষ বিবাদ চলিতেছে। প্রভূত ধনসম্পত্তি রাজবাটির ডাঙ্গায় নিহিত আছে সন্দেহে কেহই নিজেদের অংশ ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নহেন।

এই পূর্ব্বরাঢ় রাঙ্গামাটীতে আসিয়া শুনিতে পাইলাম, রেশম কুঠীর বড় কোম্পানী লুইপ্যান কোম্পানীও এবার ফেল হওয়ায়, পাতের কৃষাণগণ আগামী সন হইতে সকলেই পাটের চাষ আরম্ভ করিবে এইরূপ কল্পনা করিতেছে।

বেহার পৃথক হইয়াছে, বাঙলা প্রদেশের মধ্যে পূর্ব্ব রাঢ়ের এই কান্দী মহকুমাই রাজকর্ম্মচারীদিগের একটি স্বাস্থ্যকর সব-ডিবিসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। রাঢ়ের পূর্ব্বাংশে যদি শীঘ্রই পাটের আবাদ বিস্তৃত হইয়া পড়ে তাহাহইলে এ অঞ্চলও যে, ম্যালেরিয়ার আকর ভূমি হইয়া পড়িবে কান্দীর 'Non-malarial Subdivision' নাম ঘুচিয়া যাইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে কান্দীর অনেক স্থানে ম্যালেরিয়া দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে, পাট আসিলে যশোহরকেও রাঢ়ের নিকট হার মানিতে হইবে।

মশক বাহিনী ম্যালেরিয়ার সহচর পাট এইরূপে রাঢ়ের পাতের জমীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে। এ অঞ্চলে পাতের জমিতে সুন্দর কার্পাস আবাদ হইতে পারে। এজন্য কাশীমবাজারের মহারাজ যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। যদি স্থানীয় অন্যান্য জমীদারগণ এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে তাঁহার সহিত যোগদান করেন তাহাহইলে তুলার চাষটা এদিকে সহজেই বিস্তৃতিলাভ করিতে পারে।

মৎস্য রক্ষা

(শ্রীনিবারণ চন্দ্র চৌধুরী লিখিত)

রৌদ্রে কিম্বা ধুম্রে শুষ্ক করিয়া মৎস্য অনেক দিন পর্য্যন্ত রক্ষা হইয়া থাকে। সদ্য ধৃত মৎস্যের অভাবে এই মৎস্য গ্রহণ এবং সহজে এই মৎস্য দেশ দেশান্তরে রপ্তানি করিয়া অর্থলাভও করা যাইতে পারে। অনেকের বিশ্বাস যে শুষ্ক মৎস্য রন্ধন করিলেও ইহার দুর্গন্ধ যায় না কিন্তু ইহা ভুল। বিহিত প্রণালী মত শুষ্ক করিলে মৎস্যের গন্ধ মোটেই থাকে না এবং রন্ধন করিলে তো ইহা অতিশয় সুস্বাদু হইয়া থাকে। আমরা মৎস্য শুষ্ক করিবার বিহিত প্রণালী নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

রৌদ্রে শুষ্ক করা—মৎস্য প্রথমতঃ পৃষ্ঠে বা বুকে চিরিয়া নাড়ী পিত্তকোষ প্রভৃতি ফেলিয়া দিতে হইবে। যে মৎস্যের পৃষ্ঠদেশ গোল তাহার পৃষ্ঠ চিরিতে হয়, আর যার বুক গোল তাহার বুক চিরিয়া নাড়ী বাহির করিতে হয়। মৎস্য চিরিবার পূর্ব্বে ইহার মস্তক কাটিয়া ফেলিয়া দিবে। তৎপরে মৎস্য শুষ্ক বস্ত্র বা বুরুষ দ্বারা পুঁছিয়া লইবে। পরে পরিষ্কার জলে এই মৎস্য উত্তম রূপে ধৌত করিবে অথবা চিরিয়া প্রথমেই পরিষ্কার জলে ধৌত করিয়া লইবে। ইত্যবসরে একটা মাটির গামলায় জলের সহিত লবণ মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। জলে এইরূপে লবণ দিতে হইবে "যেন ইহাতে আলু ফেলিয়া দিলে আলু জলের উপরে তৎক্ষণাৎ ভাসিয়া উঠে। এই লবণ জলে পূর্ব্বোক্ত মৎস্য ১২ ঘণ্টা রাখিয়া দিবে। মৎস্য অনেক দিন রাখিতে হইলে দুই বা তিন দিন পর্য্যন্ত ঐ লবণ জলে রাখিয়া দিবে। তৎপরে ঐ মৎস্য তুলিয়া লইয়া, রৌদ্রের মৃদু উত্তাপে রাখিয়া সাত বা আট দিন পর্য্যন্ত শুষ্ক করিবে। জল বৃষ্টি না হইলে তিন বা চারি দিনেই শুষ্ক হয়। প্রখর রৌদ্রের উত্তাপে মৎস্য উত্তমরূপে শুষ্ক হয় না। লবণ জলে না রাখিয়াও মৎস্য চিরিয়া ও ইহার নাড়ী ফেলিয়া দিয়া পরে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া লইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করা যায়। কিন্তু এই প্রণালী মত শুষ্ক করিলে মৎস্য অনেক দিন রক্ষা করা যায় না।

অধিক পরিমাণে মৎস্য শুষ্ক করিতে হইলে মৎস্য লবণ জলে না রাখিয়া কেবল শুষ্ক লবণে লবণাক্ত করিতে হয়। এই প্রণালী মত, মৎস্য চিরিয়া ধৌত করিয়া লবণের স্তরের উপরে মৎস্য এক একটা করিয়া পাতিয়া রাখিয়া লবণ দ্বারা ঢাকিবে। পরে ইহার উপরে আবার আর এক স্তরে মৎস্য পাতিয়া লবণ দ্বারা ঢাকিবে। এইরূপে স্থানের পরিমাণ অনুসারে যত ইচ্ছা মৎস্য লবণাক্ত করা যায়।

পাঁচ দিন পর্য্যন্ত লবণের মধ্যে রাখিয়া মৎস্য বাহির করিয়া লইয়া পরিষ্কার জলে ধৌত করিবে ও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শুষ্ক করিবে। শুষ্ক করিবার সময়ে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে মৎস্য স্তরে স্তরে ইহাদের পিঠ নীচের দিকে রাখিয়া ঢিপী করিয়া সাজাইয়া রাখিবে এবং প্রাতে সূর্য্যের মৃদুতাপে শুষ্ক করিবে। পরের দিন সন্ধ্যা বেলা মৎস্য তুলিবার সময় দেখিতে হইবে যে যাহাতে তলার ও চতুষ্পার্শ্বের মৎস্য মধ্যস্থলে থাকে ও মধ্যস্থলের মৎস্য চারিধারে অবস্থিতি করে। এইরূপে সমস্ত মৎস্য একরূপ আকৃতি ও গুণপ্রাপ্ত হয়। জল বৃষ্টির সময়ে মৎস্য ঘরের মধ্যেই শুষ্ক করিতে হয়। ঘরে অগ্নি জালিয়া ঘর উত্তাপযুক্ত করা যাইতে পারে। ইহাতে ও প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে মৎস্য স্তরে স্তরে সাজাইয়া রাখিতে হইবে, এবং পরদিন প্রাতে পুনঃ একটা একটা করিয়া মৎস্য শুষ্ক হইতে বিছাইয়া দিবে। যতদিন পর্য্যন্ত মৎস্য উত্তমরূপে শুষ্ক না হইবে ততদিন এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়।

ধূম্রে শুষ্ক করা—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মৎস্য লবণাক্ত করিয়া ধৌত করিয়া একটা বাক্সের মধ্যে লোহার শলাকায় মৎস্য ঝুলাইয়া ইহাতে ধূম্র দিবে। করাতের গুঁড়া কিম্বা তুঁষ যাহাতে আগুন দিলে জ্বলিয়া উঠিবে না, কেবল ধুঁয়া হইবে, এইরূপ জিনিষ কোন পাত্রে বাক্সের মধ্যে, মৎস্যের নীচে রাখিয়া ধূম্র উৎপাদন করিয়া বাক্সের মুখ বন্ধ করিয়া দিবে। দুই দিবস এইরূপ সর্ব্বদা মৎস্য ধূম্রের মধ্যে রাখিবে। মোটামুটি একটা বাক্স চার ফিট লম্বা দেড় ফিট চওড়া হওয়া আবশ্যক। বাক্স লম্বা দিকে দাঁড় করাইয়া রাখিতে হয়। ইহার একদিকে একটা কপাট করিতে হইবে, এই কপাট খুলিয়া মৎস্য বাক্সের মধ্যে রাখা ও বাহির করা যাইবে। শুষ্ক হইয়া রক্তিমাভ প্রাপ্ত হইলে, মৎস্য বাহির করিয়া লইবে। এইরূপ বৃহৎ বাক্সে স্তরে স্তরে লোহার শলাকা বিদ্ধ করিয়া অনেক মৎস্য শুষ্ক হইতে পারে। ধূম্রে শুষ্ক মৎস্য রৌদ্রের শুষ্ক মৎস্য অপেক্ষা অধিক দিন রক্ষা করা যায়। মৎস্য ধূম্রে শুষ্ক করা অপেক্ষাকৃত সহজ সাধ্য, কারণ রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হইলে চিল, বাজ প্রভৃতি পক্ষীরা বড়ই উৎপাৎ করে।

রন্ধন প্রণালী—শুষ্ক মৎস্য নিম্ন লিখিত প্রণালী মত রন্ধন করিলে অতিশয় সুস্বাদু হইয়া থাকে। তাহা বলিয়া অধিক পরিমাণে এই মৎস্য গ্রহণ করা উচিত নয়। কারণ ইহা অতিশয় গুরু পাচ্য। মৎস্য রন্ধন করিবার পূর্ব্বরাত্রে জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। উষ্ণজলে ভিজাইলে আরও ভাল। পরে ধৌত করিয়া লইয়া মসলাদি সহ রন্ধন করিতে হইবে। মৎস্য রন্ধনের পূর্ব্বে সিদ্ধ করিয়া লইয়া ইহার কাঁটা ফেলিয়া উত্তপ্ত তৈলে কষিয়া তরকারী সহ রন্ধন করিলে অতিশয় উপাদেয় ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয় এবং এমন মুখরোচক হয় যে ইহা প্রাপ্ত হইলে অন্য ব্যঞ্জন গ্রহণ করিতে

ইচ্ছা হয় না। কিন্তু সুস্বাদু বলিয়া অধিক পরিমাণে কখনও শুষ্ক মৎস্য গ্রহণ ব্যবস্থা করা যায় না। পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে শুষ্ক মৎস্য গ্রহণ অবিধি। শুষ্ক মৎস্য জীর্ণ হইতে প্রায় চারি ঘণ্টা অতিবাহিত হয়, পক্ষান্তরে তাজা মৎস্য দুই হইতে তিন ঘণ্টার মধ্যে জীর্ণ হইয়া থাকে।

উপসংহার—বঙ্গদেশের মধ্যে চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও নোয়াখালী জেলার কোন কোন স্থলে মৎস্য রৌদ্রে শুষ্ক করা হইয়া থাকে। তথাকার লোকেরা এই মৎস্য আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে। শুষ্ক মৎস্য ব্রহ্ম দেশের লোকদের নিকট অতিশয় প্রিয়। সময়ে সময়ে ঢাকা, ফরিদপুর বরিশাল, খুলনা ও সুন্দর বনে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে মৎস্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল স্থানে মৎস্য শুষ্ক করিবার প্রণালী প্রবর্ত্তন করিতে পারিলে বঙ্গ দেশের হিতসাধন হইতে পারে। সংপ্রতি বঙ্গীয়-কৃষিবিভাগ মৎস্য শুষ্ক করিবার প্রণালী কৃষি-প্রদর্শনীতে শিক্ষা দিতেছে। ইহা দ্বারা মৎস্য শুষ্ক করিবার প্রণালী সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইবে আশা করা যায়। বঙ্গ দেশে দিন দিন মৎস্যের যেরূপ অভাব হইতেছে তাহাতে মৎস্য শুষ্ক করিবার প্রণালী শিক্ষা ও শুষ্ক মৎস্য গ্রহণ অতিশয় আবশ্যক বোধ করিতেছি।

আম্রের ব্যবসা।

(মালদহী প্রথানুযায়ী শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত লিখিত)

ইতি পূর্ব্বে "কৃষকে" মালদহের আম্র সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধই আমি লিখিয়াছি। ঐ প্রবন্ধ গুলিতে কলম ও গুটীর আম্রের বিস্তৃত বর্ণনা, কলম করিবার প্রণালী, রোপণ প্রথা, সার প্রদান ইত্যাদি বহুতর বিষয়েরই আলোচনা করা হইয়াছে। এক্ষণে এই আম্রের ব্যবসা সম্বন্ধে কিছু লিখিবার মানস করিয়া প্রবন্ধের অবতারণা করা হইল।

আমচুর (আমসী)—অসময়ে আম্ররক্ষার জন্য আমচুরের আবশ্যক। ইহাকে কোন কোন স্থানে আমসীও বলিয়া থাকে। তেঁতুল, কাগজী লেবু, করঞ্জা, কামরাঙ্গা, জলপাই, আমড়া প্রভৃতি ও অম্লস্বাদের অভাব পূর্ণ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু ঐ সকল এই প্রবন্ধের আলোচ্য নহে। আম্রের অম্লই আলোচ্য বিষয়।

যখন আম্র গুলি কচি অবস্থায় থাকে অর্থাৎ ভিতরে আঁটী হইবার পূর্ব্বে আম্র গুলির খোসা ছাড়াইয়া চারি খণ্ড করিতে হয়, ভিতরের কেশীটী ফেলিয়া দিবে। এইরূপে কতকগুলি আম্র খুব শুষ্ক করিয়া নীরস করিয়া লইলেই আমচুর প্রস্তুত

হইল। ইহাতে আর কোনই পরিশ্রম নাই, বৈশাখ মাসেই সাধারণতঃ এই কার্য্য করিতে হয়। আমচুর প্রস্তুতের জন্য বৃক্ষ হইতে টাটকা আম্র তুলিবার কোনই আবশ্যক নাই। ঐ সময়ে প্রায়ই মধ্যে মধ্যে ঝড় বৃষ্টি হইয়া থাকে এবং পশ্চিমে বাতাসও প্রবাহিত হইতে থাকে। সুতরাং তাহাতেই বৃক্ষ তলে বিশুদ্ধ আম্র পতিত হয়। ঐগুলি পরিশ্রম পূর্ব্বক কুড়াইয়া সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারিলেই অনায়াসে আমচুর প্রস্তুত হইতে পারে। ইহাতে বৃক্ষের আম্রেরও ক্ষতি করা হইল না। অথচ অকেজো যে গুলি ঝরিয়া পড়িল, তাহাতেই অন্য একটী কার্য্য সাধিত হইল। কিন্তু গাছ হইতে টাট্‌কা আম পাড়িয়া আমচুর যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয় তাহা বলা বাহুল্য, জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত যে অবধি আম্র না পাকিয়াছে, সেই পর্য্যন্ত আঁটী যুক্ত আম্রেরও আমচুর হয়, কিন্তু তাহাতে চতুঃপার্শ্বের শাঁস গ্রহণ করিয়া আঁটী ফেলিয়া দিতে হয়, এস্থলে বলা আবশ্যক যে আঁটির বা গুটির গাছের সকল প্রকার আম্রেরই আমচুর হইয়া থাকে। কলম আম্র মধ্যে কেবল ফজলী আম্রের আমচুর হয় না। তদ্ব্যতীত মোহন ভোগ, লম্বা ভাদুরে, কুয়া পাহাড়ি, জালি বাক্সা ইত্যাদি যত প্রকার আম্র আছে, সকলেরই হইতে পারে। ফজলীর না হইবার কারণ, ফজলী আম্র কাঁচাবস্থায়ও কাঁচা মিঠা আম্রের তুল্য কিছু মিষ্ট, তবে কাঁচা মিঠা আম্রে দাঁত টকেনা, ফজলীতে দাঁত টকিয়া যায়। অন্যান্য আম্র সমস্তই অম্লাস্বাদ। সুতরাং ফজলীতে আমচুর প্রস্তুত করিলে অম্লের অভাব তো পূরণ হয় না। অধিকন্তু বর্ষার সময় আপনা হইতেই উহাতে এক প্রকার শাদা পোকা জন্মিয়া আমচুর গুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলে ও দুর্গন্ধময় হইয়া উঠে।

আমচুর গুলি রৌদ্রে খুব উত্তম রূপে বিশুষ্ক হইলে তাহাতে অতি সামান্য পরিমাণ সর্ষপ তৈল মাখাইয়া পুনরায় রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া একটী মৃত্তিকার বড় পাত্রে রাখিবে, ও উহার মুখে সরা দিয়া ঢাকিয়া বস্ত্র খণ্ড দ্বারা মুখ বান্ধিয়া দিবে। পরে প্রতি মাসেই একবার করিয়া বাহির করত রৌদ্রে শুকাইয়া রাখিবে। তাহাহইলে আমচুর গুলিতে কোনরূপ দুর্গন্ধ অনুভূত হইবে না, বা আস্বাদনেরও কোন ইতর বিশেষ হইবে না। পরে ইচ্ছামত ইহা বিদেশেও চালান দেওয়া যাইতে পারে।

পাকা আম্রেরও আমচুর হয়, কিন্তু তাহাতে অম্লাস্বাদের অভাব পূরণ হয় না, ইহা মধুর স্বাদই হয়, খুব সুপক্ক আম্রের আমচুর হয় না। কারণ উহার খোসা ছাড়াতেই গলিয়া যায়। সুতরাং দেখিতে হইবে, যে আম্রটী টিপিলে কিছু শক্ত বোধ হয়, অথচ বার আনা রকম পাকিয়াছে সেই অবস্থায় খোসা ছাড়াইয়া চতুপার্শ্বের শাঁস কর্ত্তন করিয়া লইয়া রৌদ্রে উত্তম রূপ শুকাইতে হয়। পরে কাঁচা আম্রের আমচুরের প্রক্রিয়ানুযায়ী রাখিতে হয়।

আম্র হইতে আরও এক প্রকার অম্লাস্বাদ প্রস্তুত করা হয়, তাহাকে আম্রের আচার বলে। ইহার প্রস্তুত প্রণালী নিম্ন লিখিতানুযায়ী—কচি অবস্থাতেই কতকগুলি আম্র যখন আঁটী বান্ধে নাই, অথচ আঁটীর খোসা কিছু শক্ত হইয়াছে। উপরের খোসা সমেত চারি খণ্ড করিয়া ও কেশী ফেলিয়া একটী বড় পাথরের পাত্রে লবণ মাখাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। যখন দেখিবে উপরের খোসা গুলি সহ শাঁস চুপসিয়া বসিয়া গিয়াছে ও শক্ত হইয়াছে, তখন তাহাতে অল্প সর্ষপ বাটা ও এলাচ, দারুচিনি ইত্যাদি কিছু মশলা বেশ উত্তম রূপ মাখাইয়া আবার রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। পরে একটী মৃৎপাত্রে এরূপ পরিমাণে সর্ষপ তৈল ঢালিয়া দিবে যেন তন্মধ্যে আচার গুলি বেশ নিমজ্জিত হইয়া থাকে। পাত্রের মুখ একটী সরা দিয়া ঢাকিয়া বস্ত্র খণ্ড দ্বারা বান্ধিয়া রাখিলে ও মধ্যে মধ্যে রৌদ্রে দিলে অনেক দিন অবিকৃতাবস্থায় থাকে, তখন ইচ্ছামত ব্যবহার বা বিক্রয় করা যায়।

আম সত্ত্ব—আম সত্ত্ব প্রস্তুত করিতে বেশ সুপক্ক ও সুমিষ্ট আমের প্রয়োজন। টক আম্রের আমসত্ত্ব কোন কাজেরই নহে। অনেকে টক আম্রে গুড় বা চিনি মিশ্রিত করিয়া আমসত্ত্ব করে, কিন্তু তাহা তত দূর ভাল হয়না, এবং আস্বাদনেও কিছু অম্লমিষ্টস্বাদ যুক্ত হয়, সুতরাং উৎকৃষ্ট আম্রেরই আমসত্ত্ব সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও বেশী দরে বিক্রয় হয়। আঁটির বা গুটীর, আম্রেরই আমসত্ত্ব হয়। কলম আম্র মধ্যে কেবল গোপাল ভোগের হয়। গুটীর আম্রগুলি ও গোপাল ভোগ সাধারণতঃ শেষ জ্যৈষ্ঠ হইতে পাকিতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত আষাঢ় মাস থাকে। কিন্তু কলম আম্র শ্রাবণ মাসে পাকে। আর গুটীর আম্রে যেমন রস নির্গত হয়, কলমে তত সুবিধা হয় না। বিশেষতঃ তখন বর্ষাকাল পড়িয়া যায়, প্রখর রৌদ্রোত্তাপ না হইলে আমসত্ত্ব হয় না। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ।—

প্রথমে বাঁশের কিম্বা নলের ছোট ছোট চেটায়ের (অন্ততঃ ৩ হাত দীর্ঘ ২ হাত প্রস্থ হইলেই ভাল হয়, কারণ তোলা তুলির পক্ষে সুবিধা হয়) চতুষ্কোণে শক্ত করিয়া বাঁশের বাখারি বান্ধিবে, যেন উঠাইতে হেলিয়া না যায়, তৎপরে উহার উপরে একখণ্ড পরিষ্কার অথচ মোটা রকম বস্ত্র খণ্ড বিছাইয়া দিবে, এবং তাহাতে সামান্য পরিমাণ সর্ষপ তৈল মাখাইয়া লইবে। অনন্তর কতকগুলি সুমিষ্ট ও সুপক্ক আম্রের খোসা ছাড়াইয়া রস গালিয়া লইয়া সরু চালুনীতে উক্ত রস ছাঁকিয়া লইবে। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, যে সকল আম্রের রস ঘন তাহারই আমসত্ত্ব শীঘ্র শীঘ্র পুরু হয়। পাতলা রস যুক্ত আম্রের বেশী বিলম্ব লাগে। তৎপরে উক্ত চেটাই গুলি কোন একটী উচ্চস্থানে (যেমন কোন বাঁশের মাচায় ইত্যাদি) স্থাপিত করিয়া তদুপরি অল্প রস ঢালিয়া দিয়া হস্ত দ্বারা সমান করিয়া রৌদ্রে খুব শুষ্ক

করিবে। * যখন দেখিবে বেশ শুষ্ক হইয়াছে, তাহাতে হাত দিলে হাতে লাগিতেছেনা, তখন পুনরায় কিছু রস ঢালিয়া দিবে ও রৌদ্রে শুকাইবে। এইরূপ প্রতিদিন ৩৪ বার করিয়া রস ঢালিবে ও শুকাইবে। রৌদ্রের তেজ বেশ প্রখর থাকিলেই এইরূপ রস দিবে, যে দিবস সূর্য্য মেঘাবৃত হইয়া থাকে সে দিন রস দিবেনা। বরং পূর্ব্ব দিনের যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহাই বাহিরে রাখিয়া বিশুষ্ক করিবে। যদি রৌদ্রাভাবে কিম্বা বৃষ্টি জন্য রস বেশ বিশুষ্ক হইতে না পারে, তাহা হইলে সেই আমসত্ত্ব ভ্যাপ্‌সা গন্ধ যুক্ত ও বিস্বাদ হয়। এজন্য সাবধানে রৌদ্রের দিবসেই রস ঢালিয়া শুষ্ক করিতে হইবে। ১

এইরূপে ৭।৮ দিবস রস ঢালিয়া শুষ্ক করিতে পারিলেই অন্ততঃ সিকি ইঞ্চি পুরু হইয়া উঠিবে। এতদপেক্ষা বেশী পুরু করিবার ইচ্ছায় রাখিবে না। কারণ তাহাতে যদি কোন রূপে ভিতরে সামান্যও কাঁচা থাকিয়া যায় তাহাহইলে পচিয়া নষ্ট হইতে পারে ও দুর্গন্ধ বা বিস্বাদ হইবে। সিকি ইঞ্চি পুরু হইলেই এক দিবস খুব ভাল রূপ শুকাইয়া প্রস্থের দিকে দৈর্ঘ্য রাখিয়া ৪ চারি অঙ্গুলি বিস্তৃত করত তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা কর্ত্তন করিয়া ছোট ছোট খণ্ড করিবে ও চেটাই হইতে তুলিয়া লইবে। পরে তাহাতে সামান্য রূপ সর্ষপ তৈল উভয় পৃষ্ঠায় মাখাইয়া ২।১ দিন আবার রৌদ্রে দিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। কোনও মৃৎপাত্রের অভ্যন্তরে সর্ষপ তৈল মাখাইয়া তন্মধ্যে মুখ ঢাকিয়া রাখিয়া দিবে, এবং ২।১ মাস অন্তর রৌদ্রে দিবে ও সামান্য সামান্য সর্ষপ তৈল মাখাইবে।

আরও এক প্রকারে আমসত্ত্ব প্রস্তুত করা যায়। কিন্তু তাহা খুব পুরু হয় না। ১৬ পাউণ্ডের বালী কাগজের তুল্য মোটা হয়। প্রথমে এক খানি কিম্বা ততোধিক থালায় বস্ত্র খণ্ড দ্বারা জল বেশ করিয়া মুছিয়া ফেলিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দিবে। যখন থালাগুলি একটু গরম হইবে, তখন তাহাতে সর্ষপ তৈল মাখাইয়া সামান্য পরিমাণ উৎকৃষ্ট আম্রের রস ঢালিয়া দিয়া থালা খানি ধরিয়া ঝেঁাকাইয়া ঝেঁাকাইয়া সমস্ত থালায় সমান করিয়া দিবে, হস্ত দ্বারা নাড়িবে না। পরে রৌদ্রে শুকাইতে দিবে। প্রাতঃকালেই এইরূপ করিতে হয়। তাহাহইলে সমস্ত দিবসে বেশ বিশুষ্ক হইয়া যাইবে, ও বৈকালে তুলিয়া লইয়া পর দিবস আবার উভয় পৃষ্ঠায় সামান্য সর্ষপ তৈল মাখাইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। গোপাল ভোগ, নেঙড়া, হাজীপুরে নেঙড়া, বোম্বাই প্রভৃতি আম্রের এই রূপ আমসত্ত্ব অতি উৎকৃষ্ট হয়। কাঁঠালের আমসত্ত্ব ও

---

* হস্তদ্বারা শুষ্ক না করিয়া বাঁশের চেয়াড়ি দ্বারা শুষ্ককরা ভাল, কারণ খাদ্য দ্রব্যে যত কম হাত লাগান যায় ততই ভাল। আমের রস বাহির করিবার সময়ও এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। আমের রস বাহির করিবার অল্পদামের কল আছে। ইহাতে কাজও শীঘ্র হয়। কৃঃ সঃ

১। বৃষ্টি বাদলার দিনে উত্তাপযুক্ত ঘরে রাখিয়া আমসত্ত্ব শুকান যায়। ইহা কিন্তু রৌদ্রে শুষ্ক আমসত্ত্বের মত সুস্বাদু হয় না। কৃঃ সঃ

এই প্রণালীতে করা যায়। কিন্তু কাঁঠালের আমসত্ব বেশী দিন থাকে না, খারাপ হইয়া যায়। প্রথমোক্ত প্রণালীতে তেঁতুল ও কুলের আমসত্ব প্রস্তুত করিয়া রাখা যাইতে পারে এবং তাহা যত্ন পূর্ব্বক রাখিলে অনেক দিন থাকে। তেঁতুল ও কুলের আমসত্বে গুড় বা চিনি মিশ্রিত করিয়া দিলে তাহা বেশ মিষ্ট অম্ল হয় ও মুখ রোচকও হইয়া থাকে।

আম্রের এই ব্যবসা সম্বন্ধে এতদঞ্চলের পুরুষকে কোন পরিশ্রমই করিতে হয় না, তাহারা বাগান হইতে আম্র আনিয়া দিলেই তাহাদের কার্য্যের অবসান হইল। অপর সমস্ত কার্য্যই স্ত্রীলোকের দ্বারা সম্পন্ন হয়। স্ত্রীলোকের দ্বারা সম্পন্ন হয় বলিয়া, বিস্তৃত ব্যবসায়ের উপযোগী দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে না। যদি তাহাতে পুরুষের সাহায্য করা যায়, এবং ২।৪টী বিস্তীর্ণ বাগান খরিদ করিয়া লইয়া ব্যবসায়ের জন্য উদ্যোগী হওয়া যায়, তাহাহইলে অনায়াসে একটী সুবিস্তৃত কারবার চলিতে পারে ও তাহাতে বেশ লাভবান হওয়া যায়। নচেৎ স্ত্রীলোকে নিজের পরিশ্রমে ও উৎসাহে যাহা করে, তাহাতে সাংসারিক খরচ বাদে দু দশ টাকার কেহ কেহ বিক্রয় করে।

বিহারে ধান্য চাষ

শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র সরকার, কর্ণেলি ওহিও প্রভৃতি কৃষি-বিশ্ববিদ্যালয়ের
কৃষি সদস্য এবং হাইকোর্টের উকিল লিখিত।

বিহার ও ছোটনাগপুরের অন্তর্গত পালামৌ জেলায় নিম্ন বা সমতল জমিতে প্রায় বার আনা ভাগে বিভিন্ন প্রকারের ধান্যের চাষ হইয়া থাকে। ধান্য এদেশের প্রধান খাদ্য সামগ্রী। কারিবাক্, দোশলী, শ্যামজিরা, ডাহিয়া, বাদসা ভোগ, সুফেদ প্রভৃতি শত শত প্রকারের ধান্য চাষ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে এতদঞ্চলে সুফেদ, ডাহিয়া প্রভৃতি মোটা ধান প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এদেশে ধান্যের চাষ সেই প্রাচীন মান্ধাতার আমলের প্রণালীতে সমাহিত হইয়া থাকে, যদি কৃষকদের নূতন বৈজ্ঞানিক প্রণালীর শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহারা কুসংস্কার বশতঃ তাহা আদৌ অনুসরণ করিতে ইচ্ছা বা আগ্রহ প্রকাশ করেনা; সেই জন্য ধান্য চাষে কোন রূপ উন্নতিও দৃষ্টি গোচর হয় না। যুক্ত রাজ্যের ন্যায় যদি আমাদের দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে দেশীয় ভাষায় কৃষকগণকে কৃষি সম্বন্ধে অল্প অল্প শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে

মহীয়সী হিতসাধিত হয় এবং ক্রমে কৃষির অবনতির পথ রোধ করা হয় সে সম্বন্ধে সন্দেহ মাত্র নাই। আমরা একান্ত বাসনা করি যে বিহার প্রদেশের কাউন্সিলের কোন দেশ হিতৈষী সদস্য এ বিষয়ে শাসকগণের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতে ক্রটী করিবেন না।

গয়া এবং পালামৌ জেলার অনেক স্থানের আমার অভিজ্ঞতা আছে। এদেশের কৃষকগণ ধান্য ক্ষেত্রে প্রায় সার দেয় না। তাহা দিলে যে ভাল হয় সে বিষয়ে বলা বাহুল্য। এদেশের বিঘা আমাদের বাঙ্গলা বিঘার সওয়া দুই গুণের কাছাকাছি, কাজে কাজেই এদেশে বিঘা পিছু ৩৬ হইতে ৪০ মণ গোময়, ছাই, পাতা পচা সার দিলে মন্দ হয় না। আমি এইরূপ সার দিয়া পালামৌর এক বিঘা ক্ষেতে অন্যূন ৫০ মণ ধান পাইয়াছি। সার দিয়া লাঙ্গল দিয়া জমি ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং ধান রোয়ার পূর্ব্বে যখন কাদা করিতে হয় সেই সময় ফি বিঘা পিছু কিছু পরিমাণ সোরা বা খাড়ী লবণ জমীতে দিলে মন্দ হয় না। এদেশে রেহড়া (alkaline) বাতসর জমীতে ধানের মন্দ ফলন হয় না কিন্তু গাছের গোড়ায় জল বেশ যথেষ্ট পরিমাণে শেষ পর্য্যন্ত থাকা চাই। গয়া এবং পালামৌ জেলার অধিকাংশ ধান্যজমি পউরু বা দোয়াঁস অর্থাৎ এঁটেল ও বালী মিশ্রিত। এই জমিতে সিলিকেটের ভাগ বাহুল্য থাকায় ধান্য উৎপন্নের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই সকল জমিতে সামান্য উদ্ভিদ খাদ্য সার (গোময়, পাতা পচা, পশুমল, ইত্যাদি) সংযোগ করিলে খুব ভাল ফসল পাওয়া যায়। আমাদের বাঙ্গলা দেশের বাঁকতুলসী, কামিনী, বাদসা ভোগ, মিশ্রিঠোকা, প্রভৃতি মিহি মাঠের ধান্য একটু চেষ্টা করিলে বিহার প্রদেশে বিশেষ ভাল রূপ জন্মায়; কিন্তু একটু যত্ন করিতে হয়।

এখন বুনা (বাউগ্) এবং রোয়া (রোপণি) সম্বন্ধে ২।১টা কথা বলা আবশ্যক। বাউগ্ বুনানিতে যে বীজ ছড়াইতে হয় তাহা সকল স্থানে সমান নহে। গয়া জেলায় বিঘায় একমণ বীজ লাগে, কিন্তু পালামৌ জেলান্তর্গত বিলৌঞ্জা পরগণায় বিঘায় ২/ মণ বীজ কৃষকগণ সচরাচর ছড়াইয়া থাকে। আমার বোধ হয় যে এত অধিক বীজ ছড়ান আবশ্যক করে না; অথবা বীজগুলি ভাল নয় বলিয়া এত অধিক বীজ ছড়াইতে হয়। বীজ নির্ব্বাচন জন্য যেমন যুক্তরাজ্য বা বিলাত প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে আড্ডা আছে, আমাদের কৃষি প্রধান দেশে এইরূপ বীজের জীবনীশক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য বীজ সংরক্ষক আড্ডা স্থাপিত করিলে খুবই ভাল হয়।

পালামৌর কৃষকগণ বলে যে এদেশ পাথুরে—কাজেই একটু বেশী বীজ বপন বা রোয়া না করিলে ফলন যথেষ্ট হয় না। এদেশে কৃষকগণ ৩।৪টি করিয়া

চারা রোয়, কিন্তু আমার বিবেচনায় ভাল রূপ জমির পাট করিয়া ও সার দিয়া জোড়া চারা এক এক গর্ত্তে রোয়া করিলে যে ফলন মন্দ হয় তাহা বলিতে পারি না। গত বৎসর আমি এইরূপ এক বিঘায় আমাদের দেশের মত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সার দিয়া ॥০ মণ ধানের তলা চারা ঐ জমিতে রোয়া করি, এবং এক হাতের কিছু কম অন্তর চারাগুলি পুতি; তাহাতে ৩৫ মণ ধান পাই, কিন্তু দেশী কৃষকগণ তাহাদের প্রাচীন প্রণালীতে যে জমিতে ধান্য উৎপাদন করে তাহাতে ১২ কিম্বা ১৫ মণের অধিক হয় নাই। আমি পালামৌর পউরু জমিতে মাট কড়াই সোণা মুগ প্রভৃতির চাষ প্রবর্ত্তন করিয়া বেশ সুফল পাইয়াছি।

বিহার বা পালামৌর অনেক জমিদারের জমিদারীতে পাহাড় আছে। পাহাড়ের নিম্ন ভুমিতে কোন চাষ হয় না। এই জমি কিরূপে লাভ জনক করা যাইতে পারে তাহা কোন কৃষক পাঠক বলিয়া দিলে বিশেষ বাধিত হই। আমার এইরূপ জমিতে ভাল খেজুর এবং এলোগাছ প্রচুর পুতিয়াছি। ইহা অপেক্ষা আর কোন রূপ লাভ জনক উপায় আছে কিনা তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।

সরকারী কৃষি সংবাদ।

বুড়ীর হাট ক্ষেত্রে তামাক চাষ শিক্ষা—

তামাক চাষ শিক্ষা দিবার জন্য বর্ত্তমান বর্ষে এই ক্ষেত্রে এক জন মাত্র শিক্ষানবিস লওয়া হইয়াছে। স্থানীয় কতিপয় চাষীকে নূতন উপায়ে তামাক চাষ করিবার জন্য প্রবর্ত্তিত করাও হইয়াছিল। তাহারা সুপদ্ধতি অনুসারে চাষ করিয়া তাহাদের ক্ষেতের তামাক ২২৲ টাকা মণ দরে বিক্রয় করিতে পারিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে তাহারা প্রতি তামাকের মূল্য ১৪৲ মণের অধিক পাইত না।

রাজসাহী ক্ষেত্রে আলু চাষের পরীক্ষা—

ইটালীয়, দার্জ্জিলিঙ এবং নৈনিতাল তিন রকম আলুর পরীক্ষায় ফলনে দার্জ্জিলিঙ এবং ইটালীর আলু অধিক দাঁড়াইয়াছে। একর প্রতি ইটালীর আলু ১০২॥০ মণ, দার্জ্জিলিঙ ১০৯।০ মণ, নৈনিতাল কেবল মাত্র ৫৭৷৴০ মণ ফলিয়াছে। পরীক্ষায় এখানে আর একটি বিষয় প্রতিপন্ন হইয়াছে

যে, খুব ক্ষুদ্র আলু বীজের জন্য ব্যবহার করা ভাল নয় কিন্তু আপাততঃ কম বীজে কাজ হয় বলিয়া চাষীরা সাধারণতঃ ক্ষুদ্র বীজ-আলুরই পক্ষপাতী।

রাজসাহীতে আমন ধান্য—১৯১২।১৩—

আলোচ্য বর্ষে এই ক্ষেত্রে ধান ভাল হয় নাই। পরীক্ষা ক্ষেত্রে উৎপন্ন ধান্যের হার একর প্রতি ৬ মণ মাত্র। নিশ্চয়ই আবহাওয়া প্রতিকূল ছিল নতুবা এত খারাপ ফল হইত না।

রাজসাহীতে ইক্ষু—

এখানকার জমি আখ চাষেরই বিশেষ উপযুক্ত বলিয়া মনে হয়। জমি নরম দোয়াঁস সুতরাং চাষে বিশেষ খরচ নাই। প্রায় সেচের আবশ্যক হয় না, সামান্য সারে বেশ ফসল হয়। এক বিঘা জমিতে ৩০/ মণ গোবর সার দিয়া বিঘাতে ৪/ মণ গুড় উৎপন্ন হইয়াছে। এখানে গুড়ের দাম ৫৲ টাকা কিম্বা ৫॥০ সাড়ে পাঁচ টাকার কম নহে।

শ্যামসাড়া ও রঙপুরের ভেণ্ডামুখী আখই এখানে ফলে বেশী, কিন্তু এখানকার স্থানীয় লাল খাড়ী আখে চাষের পাট কম এবং ফলন নিতান্ত কম নহে। ইহার আর একটি গুণ এই যে ইহাতে পোকার উপদ্রব কম।

রঙ্গপুর বুড়ীরহাট ক্ষেত্রে তামাকের চাষ—

এখানে চুরুটের বহিরাবরণের উপযুক্ত ও সিগারেটের উপযুক্ত তামাকের চাষ হইতেছে। ১৯১০।১১ সালে গুণানুসারে এক পাউণ্ড বা অর্দ্ধসের তামাক পাতা ১।০, ১৲ এবং ৸০বার আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে। ১২৩/৪ একর জমিতে উৎপন্ন ১৭/ মণ তামাক পাতা বিক্রয় করিয়া ১,৪৫৫॥০ টাকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহার জন্য জমির খাজনা, সারের খরচ সমেত চাষে ২৪৬॥/৯ পাই খরচ হইয়াছে।

বিগত বর্ষে ১৯১১।১২ সালে তামাক পাতা আরও দরে বিক্রয় হইয়াছে। চারি প্রকার তামাক পাতা যথাক্রমে ১॥০, ১।০, ।৶০, এবং ৸০ আনা দরে বিক্রয় হইয়াছে।

১৯১২।১৩ সালে সিগারেটের তামাক ব্যতীত আর অধিক স্থান লইয়া তুর্কি, আমেরিকান ও স্থানীয় ভালজাতীয় তামাকের চাষ হইতেছে।

তামাক ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ে বরবটির সবুজ সার প্রদান করা হইয়াছিল।

বৰ্দ্ধমান গবর্ণমেণ্ট কৃষি-ক্ষেত্র—

ধান্য ক্ষেত্রে সার—

বিনা সারে	এক একরে	ফলন	১৩॥০	মণ।
পাট কাটিয়া লইয়া সেই জমিতে ধান্য	,,	,,	১৫/০	,,
ধঞ্চে বুনিয়া সবুজ সার রূপে ব্যবহার করিয়া	,,	,,	১৯/০	,,
ধঞ্চে জমিতে চষিয়া দিবার সময় তাহাতে চূণ মিশ্রিত করিয়া	,,	,,	১৯॥০	,,
একর প্রতি ৩ মণ হাড়ের গুঁড়া প্রয়োগে	,,	,,	২০৲	,,

রাজসাহীতে আলু—

আলু চাষে সারের পরীক্ষা হয় নাই। কেবল মাত্র দার্জ্জিলিঙ ও নৈনিতাল আলুর চাষ করিয়া ফলাফল দেখা হইয়াছিল। দার্জ্জিলিঙ আলু একর প্রতি ১৩৪।০ মণ এবং নৈনিতাল ১৮৪॥০ মণ ফলিয়াছিল।

তিলের আবাদ—১৯১৩-১৪—

তিল বুনিবার সময় খুলনা, মেদিনীপুর, হাওড়া, রাজসাহী, দিনাজপুর, বোগরা, বাখরগঞ্জ এবং নোয়াখালী প্রভৃতি জেলায় এবং মৈমনসিংহের কতক অংশে বৃষ্টির অভাবে তিলের আবাদ আশানুরূপ হয় নাই। অন্যান্য জেলায় প্রথমে সুবৃষ্টি হইলেও পশ্চাতে অতি বৃষ্টিতে ক্ষতি হইয়াছে। বৰ্ত্তমান বর্ষে তিলের আবাদী জমির পরিমাণ ১৮৩,৮০০ একর, বিগত বর্ষে ২০০,১০০ একর জমিতে তিলের আবাদ হইয়াছিল। মোটের উপর তের আনা রকম ফসল হইয়াছে। একরে ৪।০ মণ তিল জন্মিয়াছে ধরিয়া লইলে বাঙলায় উৎপন্ন তিলের পরিমাণ ১১,৮০০ টন মাত্র। বিগত বর্ষে ২৪,৭০০ টন তিল জন্মিয়াছিল। ২৭॥০ মণে একটন হয়।

বাঙলায় তুলা চাষের অবস্থা—১৯১৩-১৪, ভাদ্রমাস পর্য্যন্ত—

বাঙলায় বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পাৰ্ব্বত্য চট্টগ্রাম, পাৰ্ব্বত্য ত্রিপুরায় তুলার আবাদ হয়। পাৰ্ব্বত্য প্রদেশেই জলদি তুলার আবাদ হয়, এই তুলাচাষের অনুকূল আবহাওয়া ছিল না। জলদি তুলায় আবদী জমির পরিমাণ খুব কম ৩৯,০৯৮ একর মাত্র। এপর্য্যন্ত মোটে ৫০০ একর জমিতে নাবী তুলার আবাদ হইয়াছে।

বাঙলায় পাটের আবাদ—১৯১১-১২

প্রথমতঃ অনাবৃষ্টি হেতু তারপর অতি বৃষ্টি হওয়ায় আলোচ্য বর্ষে ব্রিটিস ভারতে শতকরা ৮৮·৯ ভাগ মাত্র জমিতে পাটের আবাদ হইয়াছে।

পশ্চিম বঙ্গে বৈশাখ মাসের পাট বুনানির সময় উপযুক্ত পরিমাণ বৃষ্টি হয় নাই। তায় জ্যৈষ্ঠ মাসে অতি বৃষ্টি হওয়ায় পাটের জমি নিড়ান হইল না এবং অতি বর্ষায় পাট বাড়িতে পাইল না। বর্দ্ধমান মেদিনীপুর অঞ্চলে নদী বানেও পাটের বিস্তর ক্ষতি করিয়াছে। ২৪ পরগণা, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলী, অঞ্চলে যে পাট হয় সাধারণতঃ তাহাকে দেশী পাট বলে। অতি বৃষ্টি হেতু দেশী পাটের আবাদ অত্যন্ত খারাপ হইয়াছে।

পূর্ব্ব বঙ্গে, উত্তর বঙ্গে পুবে পাটের আড়ত। এতদঞ্চলেও পাট, পশ্চিম বঙ্গের মত খারাপ না হইলেও তাদৃশ ভাল রূপ জন্মে নাই। জেলার কর্ত্তাগণ অনুমান করেন যে একর প্রতি ৩ বেল ১৫/ পনেরো মণ মাত্র পাট জন্মিয়াছে। এবার পাটের খরচ প্রায় জেলাতেই চৌকিদারী পঞ্চায়েত গণের নিকট হইতে লওয়া হইয়াছিল। সকলেই বৎসরের গতিক দেখিয়া পাটের ফলন কিছু কম করিয়া বলিয়াছেন, কিন্তু কৃষি-বিভাগের বিশেষ তদন্তমতে জানা যায় যে পূর্ব্ব বঙ্গে একর প্রতি ৩·৭ বেল, উত্তর বঙ্গে ৩·৫ বেল, পশ্চিম বঙ্গে ৩·২ বেল হিসাবে পাট উৎপন্ন হইয়াছে।

শেষ বিবরণী প্রকাশে দেখা যায় পাটের আবাদের পরিমাণ নিম্ন লিখিতানুরূপ একর।

	১৯১২	১৯১৩	
বঙ্গদেশে	২,৫৭১,৫০৩	২,৭৫৫,১৬৬	+ ১৭৮,৬৬৩
বিহার ও উড়িষ্যা	২৯৮,৩৪৪	৩১৮,৩৫৮	+ ২০,০১৪
আসাম	৯৫,৬৪৭	৯৬,০৯০	+ ৪৪৩
মোট	২,৯৭০,৪৯৪	৩,১৬৯,৬১৪	+ ১৯৯,১২০

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে সর্ব্বত্রই অধিক জমিতে পাটের আবাদ হইয়াছে।

উৎপন্ন পাটের পরিমাণ একর প্রতি বেল

	১৯১২	১৯১৩	
বঙ্গদেশে	৮,৮২৩,০৮৪	৭,৯২০,৫৭৭	— ৯০২,৫০৭
বিহার ও উড়িষ্যা	৭৯২,৮৯৭	৬০২,৮৬২	— ১৯০,০৩৫
আসাম	২২৬,৭৯৭	২২৮,৩৩৬	+ ১,৫৩৯
মোট	৯,৮৪২,৭৭৮	৮,৭৫১,৭৭৫	— ১,০৯১,০০৩

কিন্তু শেষে তদন্তে দেখা যায় পূর্ব্ববঙ্গে গত বর্ষ অপেক্ষা ৩৪৮,৪০২ বেল অধিক পাট উৎপন্ন হইয়াছে, উত্তর বঙ্গে ৫৯,১৩৮ বেল কম, পশ্চিম বঙ্গে ১,১৯১,৭৭০ বেল কম, উড়িষ্যায় ১৯০,০৩৫ বেল কম হইয়াছে, কিন্তু আসামে ১,৫৩৯ বেল পাট অধিক হইয়াছে।

বিহারে পাটের আবাদ ক্রমশই বাড়িতেছে, কয়েক বৎসরের আবাদী জমির পরিমাণ দেখিলে তাহা বেশ বুঝা যায়,—

১৯০৯	...	...	২৪১,৪০০	একর।
১৯১০	...	...	২৪৮,২০০	,,
১৯১১	...	...	২৫৮,১০০	,,
১৯১২	...	...	১৯৮,৩০০	,,
১৯১৩	...	...	৩১৭,৪০০	,,

আলুর ক্ষেতে বোঁর্দ্দো মিশ্রণ—ইহার ব্যবহারে বাস্তবিকই লাভ আছে। বাঙলায় চাষীরা সহজে কিন্তু ইহা করিতে চায় না, প্রথমতঃ তাহাদের পয়সা নাই, দ্বিতীয়তঃ তাহারা নূতনে উৎসাহ হীন। হাতে হাতিয়ারে না দেখিলে তাহারা কিছু করিতে চায় না। বিগতবর্ষের সিলঙ মেলাতে প্রধান দ্রষ্টব্য জিনিষ ছিল আলু। এতদঞ্চলে কৃষি-বিভাগ অনেক ভাল আলুর চাষ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। মেলাতে নানাজাতীয় উৎকৃষ্ট আলু প্রদর্শিত হইয়াছিল। প্রতি বৎসরই মেলা ক্ষেত্রে বোঁর্দ্দো মিশ্রণ ব্যবহার বুঝাইবার আয়োজন করা হয়। ইহাতে চাষীগণের উৎসাহ বর্দ্ধিত হইয়াছে। খাসিয়ারা বোঁর্দ্দো মিশ্রণের ব্যবহার শিখিয়া লইয়াছে। এই মিশ্রণ ছড়াইবার জন্য তাহারা স্প্রে পিচকারী পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতেছে। আলুক্ষেতে পোকার উপদ্রবও কমিয়াছে। নিম্নবঙ্গে, ২৪ পরগণার চাষীরা আলুর পোকা নিবারণে এত যত্নশীল নহে। ভারতীয় কৃষি-সমিতির উদ্যোগে দক্ষিণবঙ্গে দুই একজন চাষী বোঁর্দ্দো মিশ্রণ ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে মাত্র। পাটনাই আলুর ফলন অধিক কিন্তু কয়েক বৎসর পাটনায় ভাল আলুর বীজ দুর্লভ হইয়াছে। আলু চাষের প্রধান কেন্দ্রগুলিতে কৃষি রসায়নবিদ লোক যাইয়া চাষীদের আলুতে পোকা নিবারণের উপায় হাতে হাতিয়ারে শিক্ষা দিলে বোধ হয় কিছু ফল হইতে পারে।

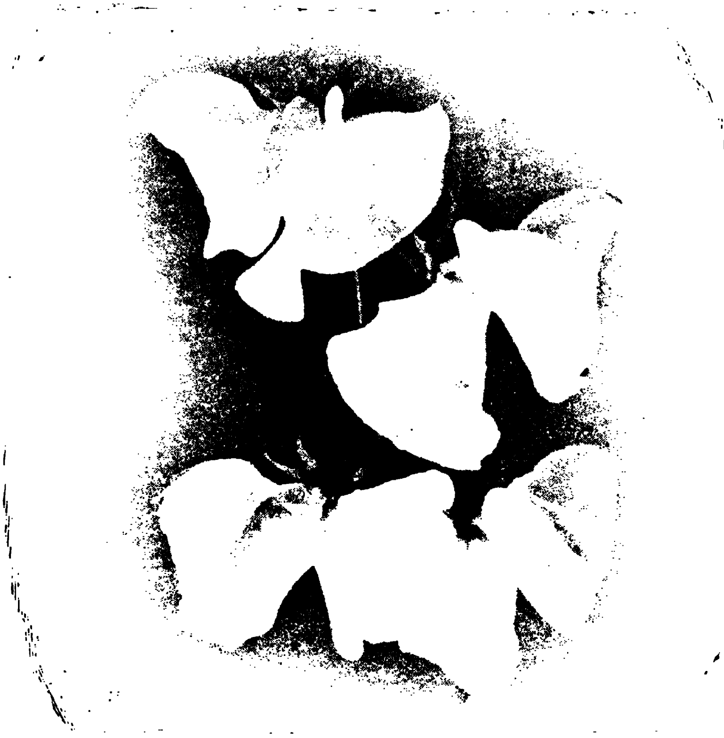


আশ্বিন, ১৩২০ সাল।

ভারতে ফলের বাগান রচনা

ছোট, খাট ফলের বাগানত কতই আছে, আমরা এখানে সে গুলির কথা উল্লেখ করিতেছি না। আমেরিকা বা অষ্ট্রেলিয়ায় যেমন বৃহৎ আয়তন ফলের বাগান দেখিতে পাওয়া যায়, সেরূপ ফলের বাগান ভারতে একটিও নাই। ভারতে ফলের ব্যবহার চির প্রসিদ্ধ, ইউরোপীয় সংস্রবে যেন আরও বাড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ অনেকানেক ইউরোপীয়েরা এখানে আসিয়া বসবাস করায় ও অন্যান্য বহুতর জাতির এখানে সমাবেশ হওয়ায় ফলের ব্যবহার শত-গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু রীতিমত ব্যবসা চালাইবার উপযুক্ত ফলের বাগান ভারত জুড়িয়া কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বাগানটি একটু বৃহৎ আয়তন হওয়া চাই এবং আধুনিক সুপদ্ধতি অনুসারে রচিত হওয়া উচিত এবং যদি ব্যবসা করিতে হয় তাহাতে এমন সমস্ত ফলের গাছ থাকিবে যে সারা বৎসর কোন না কোন ফল বাজারে চালান দেওয়া যাইতে পারিবে। মালদহে খণ্ডে, খণ্ডে অপেক্ষাকৃত বড় আমবাগান আছে। এই সকল আমবাগান উপলক্ষ করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা চলে বটে কিন্তু বাগান কোনটাই অতি পরিসর নহে। ফলগুলি বাছাই করার কোন বন্দোবস্ত নাই। কাঁচা কচি, আধপাকা সব একসঙ্গে ভাঙ্গা ও মিশান; বিদেশে ফলের বাণিজ্যের কোন চেষ্টা নাই; এই সকল বাগানে আম ছাড়া অন্য কোন ফল নাই, সুচারুরূপে ব্যবসা চালাইবার ইহাতে অনেক অসুবিধা।

সখের বাগানে আমরা চাই কিসে বাগানটি সুন্দর দেখাইবে। দুই দশটা লতা পাতার গাছ ইতঃস্তত স্তবকে স্তবকে সাজাইয়া বসাইতে পারিলে সখের বাগানের শোভা বাড়াইয়া তোলা যায়, কিন্তু ব্যবসায়ার্থ ফলের বাগান একটা স্বতন্ত্র ব্যাপার। এখানে লাভের দিক্‌টা আগে দেখিতে হইবে, সৌন্দর্য্য পরে। রাস্তা,



Sweet Pea—After-Glow,

a Reddish Mauve Color.



বা ঝিল, বা খাতের ধারে ধারে বোতল পাম (Bottle Palm) বসাইয়া কেবল শোভা বর্দ্ধন করা অপেক্ষা নারিকেল, সুপারি, খেজুর, তাল গাছ বসাইয়া শোভা এবং কাজ দুইদিক বজায় করিতে হইবে। যদি লাভ চাও এরেলিয়া, একালিফা, ডুরেণ্টা বা মেহুদী গাছের বেড়া না দিয়া ক্রমশঃ ধারে লেবু বা করঞ্চা গাছ জন্মাইয়া একটা চিরস্থায়ী আয়কর বেড়া প্রস্তত করিয়া রাখিবে না কেন?

সব কাজেরই সাধনা আছে, সব কাজের উদ্যোগ, আয়োজন করিয়া কালে ফলের অপেক্ষা করিতে হয়। এমন ভাবে বাগানের কাজটি আরম্ভ করিতে হইবে যে গোড়াতেই বিশেষ কোন ভুল চুক না হয়। মানুষের কাজ একবারে নির্ভুল হয় না, তবে যতদূর সাধ্য সাবধান না হইলে, কোন মারাত্মক ভুলে পরিণাম ফলে লোকসান অবশ্যম্ভাবী। কোন বালিয়াড়ির উপর ধানের আবাদ যেমন আকাশকুসুমবৎ হইয়া থাকে। সুন্দরবনে ফ্রেজার-গঞ্জে কৃষি-বিভাগ হইতে পাটের আবাদের কিরূপ বিফল প্রয়াস হইয়াছে তাহাও আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। ছোট খাট ভুল সংশোধন করিয়া লওয়া যায় কিন্তু বড় ভুলে নিস্তার নাই। সেই জন্য গোড়ায় আট, ঘাট বাঁধিয়া, সকল দিক বিবেচনা করিয়া, বেশ হিসাব করিয়া কার্য্য করিলে সহজে কোন ক্ষতি হয় না। প্রথমে সাবধান হইলেই হয় না, বরাবর কার্য্য প্রণালী বেশ সুশৃঙ্খল হওয়া আবশ্যক। উত্তরোত্তর নূতন নূতন প্রণালী প্রচলিত হইতেছে, নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে, সেগুলি জানিতে ও শিখিতে হইবে এবং আপনাপন কার্য্য প্রণালীর যেটুকু কসুর থাকে সংস্কার করিয়া লইতে হইবে। প্রকৃত প্রস্তাবে দেখা যায় যে মূল তত্ত্বটা এককালে উল্টাইয়া যায় না। মূলটা ঠিক থাকিলে অন্যবিধ সংস্কার সহজেই সম্পাদন করা যায়।

যে হিসাব করিয়া ব্যবসা বাণিজ্যে কার্য্য করিতে হয়, কৃষি কর্ম্মে বা উদ্যান কার্য্যেও সেই হিসাব। পৃথক এই যে, অনেক সময় ব্যবসায় ফল হাতে হাতে, বিবিধ শস্য উৎপাদনের ফল সদ্য বৎসরেই জানা যায়, কোন ভ্রম হইলে সদ্য তাহার সংশোধন চলে কিন্তু একটা ফলের বাগান আয়কর হইতে অন্ততঃ পাঁচ ছয় বৎসর সময়ের আবশ্যক এবং সকলেই আশা করে যে একবার ফলবান্ করিয়া তুলিতে পারিলে কিছু কাল তাহার ফল ভোগ করিবে। সেই জন্য উদ্যান রচনায় অধিকতর সতর্কতার প্রয়োজন। গোড়ায় বে-হিসাবী কাজ যেন না হয় বা দীর্ঘকাল বাগান ফলবান থাকার পক্ষে কোন বিঘ্ন না ঘটে। বাগ্-বাগিচা রচনায় অনেক বিজ্ঞান সম্মত কৌশল এক্ষণে মানুষের জ্ঞান গোচর হইয়াছে, এবং এক্ষণে নানা স্থানের নব বিধানানুযায়ী উদ্যান পালনের কৌশল জানিবার মানুষের অনেক সুযোগ ঘটিয়াছে, সুতরাং সকলেই এখন বাগ-বাগিচা

স্থাপনে বিশেষ বিজ্ঞতার পরিচয় দিতে পারে। তথাপি কেহ বলিতে পারিবেনা যে তাহার জ্ঞান সম্পূর্ণ হইয়াছে, কেননা সকল বৈজ্ঞানিকই বলিবে যে তাহা কোন কালে হয়ত সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব নহে। যতটুকু জানা হইয়াছে তাহারই বলে বাগানের সাজ, সজ্জা, নিয়ম পদ্ধতি বাঁধিয়া লইতে হইবে এবং নূতন নূতন বিধান যেমন গোচরে আসিবে, তদনুযায়ী সংস্কার করিয়া লইতে হইবে। সম্পূর্ণ জ্ঞান জন্মিলে তবে কাজে হাত দিব ইহাও যেমন মূর্খতা, আবার পুরাতন পদ্ধতি ভালই হউক মন্দই হউক তাহা জড়াইয়া ধরিয়া থাকিব এবং প্রাণান্তে ছাড়িব না সে মুর্খতাও তুলনায় উহার সমতুল।

বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে উদ্যান রচনা করিতে হইলে প্রথমে মৃত্তিকা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, মধ্য প্রদেশের বালুকাময় প্রান্তরে বাগান বসান কোন কালেই সহজ সাধ্য হইবে না। যেমন মাটির বিচার করিতে হইবে, স্থানের বিচারটি তাহার অগ্রে চাই। মাটির প্রকৃতিগত বা রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সাধন করা যদি বা সম্ভব হয়, স্থানের প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন করা মানুষের চেষ্টার বহির্ভূত। যেখানে উত্তরে বাতাস প্রবল সেখানে তুমি দক্ষিণে বাতাস প্রবাহিত করিতে কিছুতেই পারিবে না। যেখানে বৎসরে ৯২ ইঞ্চ বারিপাত হইবে তাহা কমাইয়া তুমি ইচ্ছামত ৪২ ইঞ্চ করিতে পারিবে না, খুব উচ্চ জমিকে মনোমত নিচু জমিতে পরিণত করিতে পারিবে না, নদীর স্রোত ফিরাইতে পারিবে না কিম্বা বরফ-পড়া দেশে বরফ পড়া বন্ধ করিতে পারিবে না। তোমাকে সেই জন্য অনুকূল আবহাওয়া খুঁজিয়া লইতে হইবে, পাহাড়, পর্ব্বতের আশ্রয় লইয়া হিমালয়ের দিক হইতে প্রবাহিত উত্তরে বাতাসের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে, যে দিক হইতে প্রবল বায়ু প্রবাহিত হয় সেদিকে বন থাকিলে ভাল, নতুবা সেই দিকে উচ্চ বৃক্ষ শ্রেণী রোপণ করিয়া বায়ুর সমতা রক্ষা করিতে হইবে, অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমি ও সরল পয়ঃপ্রণালীযুক্ত ভূমি নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হইবে, যেরূপ উচ্চ ভূমি ভাগে উদ্যান রচনা সম্ভব হইবে—তদপেক্ষা অধিক উঁচু বা নিচু না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

তারপর তুমি কিছু নির্জ্জন অরণ্যবাস বা তপস্যার জন্য বাগান করিতেছ না, যে বাগানটি কোন সুদূর পর্ব্বতের পাদদেশে স্থাপিত হইলেই চলিবে। তুমি ব্যবসায়ের জন্য সুবিস্তীর্ণ বাগান বসাইতেছ, তখন বাগানটি রেলপথ বা জল পথের নিকট না হইলে চলিবে কেন? ছোট খাট বাগানে ফল স্থানীয় লোকেই খাইয়া ফেলিতে পারে কিন্তু তাতে তোমার ব্যবসা কতদূর চলিবে? তোমার যখন বড় বাগান হইবে, তুমি যখন ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত ফল যোগা-ইবার সঙ্কল্প করিয়াছ এবং আবশ্যক হইলে বিদেশে রপ্তানি করিতেও ছাড়িবে না,

তখন তুমিত পণ্যবাহী রেলপথ বা জলপথের দিকে আগে তাকাইবে, কেননা রপ্তানির সুবিধা না পাইলে রাশি রাশি ফল কোলে লইয়া কাঁদিতে হইবে। ফল বিক্রয়ের বাজারের সন্ধান লইয়া তারপর ফলের বাগান বসান কর্ত্তব্য। রেলপথে ফল শীঘ্র বাজারে আসিয়া পৌঁছিতে পারে কিন্তু জলপথে খরচ কম। কতকগুলি ফল কিন্তু জলপথে পাঠান চলে না সুতরাং অধিক খরচে শীঘ্র বাজারে পাঠান আবশ্যক হইয়া উঠে। ইহাতে বুঝিলাম যে বাগানের কাছে দুইটা পথ প্রশস্ত হইলেই যেন ভাল হয়।

এ দেশে হাজার হাজার বিঘা জমি পড়িয়া আছে যেখানে সুন্দর ফলের বাগান হইতে পারে কিন্তু সে সকল জায়গায় অদ্যাপিও একটা ফলের গাছ রোপিত হয় নাই, রোপণের চেষ্টাও দেখা যাইতেছেনা। সে সকল জায়গা বোধ হয় অতি সহজে যোগাড় হইতে পারে। আমরা মরুভূমি বা প্রান্তরের কথা বলিতেছি না, বা নোনা বা জলা জমির কথা বলিতেছি না, সে সমুদয় আপাততঃ অকেজো হইয়া পড়িয়া থাক তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু কাজের মত জায়গারও অভাব নাই। জমির প্রাকৃতিক অবস্থা ভাল, জমিস্থিত বনজ বৃক্ষ লতাদি দেখিলে বোধ হইবে যে তাহাতে ফলের গাছ জন্মিবে, স্থানটির আবহাওয়া অনুকূল কিম্বা ফলের বাগান বসাইবার পক্ষে বিশেষ কোন ব্যাঘাত ঘটিবে না এমন স্থান খুঁজিলে এখানে কত শত সহস্র বিঘা মিলিবে কিন্তু কে তাহার তল্লাস করিতেছে, কে বল দীর্ঘায়তন ফলের বাগান বসাইতে মনোযোগী হইয়াছে!

ফলের বাগানের জন্য স্থান ও মৃত্তিকা নির্ব্বাচিত হইবার পর প্রথম কথা ভাবিতে হইবে জল নিকাশের রাস্তার বিষয়। এই কারণে বাগানটি সমতল হওয়া ভাল বটে, সেই সঙ্গে সঙ্গে দেখা আবশ্যক যে বাগানের জমিটি এক দিকে ঈষৎ ঢালু কিনা। পাহাড়ের গায়ের মত অধিক ঢালু হইলে ভাল নয় কারণ সেরূপ ক্ষেতে জল রক্ষা করা দায় বা তাহাতে জলপ্লাবন সহজে ঘটে আবার কিছু মাত্র ঢালু থাকিবে না তাহা হইলেও চলে না। ঢালু থাকিলে জমির উপরের জল, এমন কি জমির নিম্নস্তরের জল সহজে নিকাশ হইয়া যায়, জমিটি ক্রমনিম্ন হেতু জমির সর্ব্বত্র, রৌদ্র বাতাস সমভাবে পায় এমনও দেখা যায় যে জমিটি ক্রমনিম্ন হইল জল নিকাশের পথ ঘাট যুক্ত হইল, জমিটি সমুদ্র-গর্ভ হইতে এত উচ্চ যে সেখানে ফলের বাগান বসাইবার কোন আপত্য থাকিতে পারে না, কিন্তু জমিটির চারিদিকে বা তিন দিকে, যদি খুব উচ্চ ভূমি থাকে, জমিটির মধ্য ভাগে যদি এক খণ্ড সমতল জমি হয় তাহা হইলেও উহাকে নিচু জমির সামিল ধরিয়া লইতে হইবে। সহসা বৃষ্টির জল উঁচু জমি হইতে নামিয়া ফলের বাগানটি প্লাবিত করিয়া ফেলিবে এবং কখন বা অবাধ রৌদ্র

বাতাসের গতিরোধ করিবে। ফলের বাগান বসাইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট জমির আশ, পাশও এই কারণে তন্ন তন্ন করিয়া পরিশ্রম করা কর্ত্তব্য, কেননা ভূমি নির্ব্বাচনে প্রথমেই মারাত্মক ভুল হইলে তাহা আর সংশোধন হইবার নহে।

বাগানের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে যে দিক হইতে প্রবল বাতাস বহিতে থাকে সেই দিকে উচ্চ বৃক্ষ রাজী রোপণ করা কর্ত্তব্য। বাগানে বসান চারা গাছ প্রবল বাতাস সহ্য করিতে পারে না। বাগানের মধ্য দিয়া ক্রমাগত ঝড়ের মত বাতাস প্রবাহিত হইলে গাছগুলি আত্মরক্ষার্থ কিছু ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে এবং ফলপ্রসবে উদাসীন হইয়া পড়ে। সহজে জন্মে—অথচ দৃঢ়াকৃতি ফলের গাছ বাগানের প্রান্তভাগে বসানই ভাল। কোমল ফলের গাছ না বসাইয়া আমলকী, বেল, কথবেল, খেজুর প্রভৃতি কঠিন ফলের গাছ বসানই উচিত। ফলের গাছ বসাইলে তবু কিছু লাভের সম্ভাবনা, অন্য বৃক্ষাদি হইতে কাঠ ব্যতীত অন্য লাভ নাই—তাও সুদূর ভবিষ্যতে। এই প্রান্তভূমিস্থিত গাছ ও গাছের তলা সর্ব্বদাই বাগানে রোপিত গাছের ন্যায় পরিস্কৃত রাখিতে হইবে, নতুবা তাহাতে কীটাদি বাসা করিবে এবং অবসর পাইলেই বাগানে আসিয়া তাহরা উপদ্রব আরম্ভ করিবে। কিন্তু কঠিন ফলের কঠিন বৃক্ষগুলি বাড়িতে বিলম্ব হয়। নারিকেল, খেজুর সুপারির প্রান্তভূমিতে ঘন সন্নিবেশ ভাল, খেজুর সর্ব্বত্র জন্মিতে পারে, নারিকেল, সুপারি সর্ব্বত্র জন্মিবে না। সেই জন্য যেখানে সম্ভব খেজুর বৃক্ষ রোপণ করিবে অথবা দেবদারু বৃক্ষ রোপণ করিবে। ইহা সর্ব্বত্র সমভাবে বাড়ে, শীঘ্র বাড়ে, ইহার তলায় জঙ্গল হয় না. বাতাসের প্রবলতা কমিয়া আসিলে ডাল ছাঁটিয়া দিয়া বৎসরে একবার কাষ্ঠ লাভ করা যায়। আমরা চাই কাজ, সখ মিটান আমাদের উদ্দেশ্য নহে। হয়ত একের সাধ্যে এমন বাগান তৈয়ারি করা সম্ভব হইবে না সুতরাং সাধারণের পয়সা লইয়া কার্য্য করিতে হইলে তাহা বনে জঙ্গলে ছড়াইয়া ফেলিয়া নষ্ট করা কিছুতেই উচিত নহে। ভূমি নির্ব্বাচনের দোষে ও কার্য্য দক্ষতার অভাবে একজন উদ্যোগী পুরুষ মাননীয় শ্রীযুত যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষের দেওঘরে অদ্যাপিও বাগান তৈয়ারি হইল না। তাহা এখনও বীজন অরণ্য।

বাগানের পক্ষে ভারতের জমিকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—এক গ্রীষ্ম প্রধান দেশের ফলের জন্য,—এখানে কলা পেঁপে ফলিবে, নারিকেল গাছ জন্মিবে কিন্তু আঙ্গুর, ন্যাসপাতি ফলিবে না—এমন জমির সন্ধান পূর্ণিয়া, বাঁকুড়া, ময়ূরভঞ্জ, সিংভূমে মিলিবে; দ্বিতীয় প্রকার নাতিশীতোষ্ণ দেশের ফলের বাগান, যেখানে আপেল, ন্যাসপাতি, আঙ্গুর ফলিবে, পাটনাই ডালিম জন্মিবে, পেয়ারা, লেবু, আমও ফলিবে কিন্তু কলা, পেঁপে, নারিকেল, সুপারি আদৌ জন্মিবে না এরূপ জমির সন্ধান উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে, যুক্ত প্রদেশে, দেরাদুন বা গাড়োওয়াল

রাজ্যে সন্ধান করিতে হইবে। আসামে পাহাড়ের উপর, যেখানে শীতের একটু আধিক্য আছে—আপেল, ন্যাসপাতি প্রভৃতি খুব ফলে, নিম্ন প্রদেশে কমলা লেবু প্রচুর জন্মে কিন্তু আম ভাল রূপ ফলে কিনা কেহ তাদৃশ তদন্ত করিয়া দেখে নাই। এতদঞ্চলে বারিপাত অধিক হয়, এখানকার জমি একটু রসা হয় এরূপ জমিতে আমের গাছ সুন্দর জন্মিবে কিন্তু হয়ত তাদৃশ নিশ্চিত ফসল আশা করিতে পারা যাইবে না।

ফলের বাগানের স্থানটি নির্ণয় হইয়া গেলে. বাগানের মাটি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। বাগানের কোন কোন স্থানের মাটি হয়ত ভাল এবং ফল বৃক্ষ রোপণের উপযুক্ত তাহা দেখিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নহে। লাভের জন্য ফলের বাগান বসাইতে হইলে বাগানের মাঝে মাঝে প্রত্যেক দুই বা তিন বিঘা অন্তর কোদাল দ্বারা খুঁড়িয়া মাটি কিরূপ দেখা উচিত। দোয়াঁস মাটি—যাহাতে সম পরিমাণ বালি ও কর্দ্দম আছে এবং যাহাতে উদ্ভিজ্জ গলিত পদার্থ যথেষ্ট আছে তাহাই ফলের বাগানের মনোমত মৃত্তিকা। ভূপৃষ্ঠ হইতে অন্ততঃ তিন ফিট গভীর এইরূপ মৃত্তিকা থাকা আবশ্যক। তাহার নীচের মৃত্তিকা সছিদ্র হইবে যাহাতে ভূমির উপরস্থিত জল সহজে শোষিত হইতে পারে, কিন্তু এই নিম্নস্তরের মৃত্তিকার কিয়ৎ পরিমাণে জল ধারণ ক্ষমতাও থাকা চাই। কারণ এই স্তরে কিয়ৎপরিমাণে জল রক্ষিত না হইলে, সময় মত কৈশিকাকর্ষণে উপর স্তরের জমিতে সে যোগাইতে পারে না। বাগানের সর্ব্বত্র এরূপ মাটি মেলা অসম্ভব, ইহার ইতর বিশেষ দেখিলে সাধ্যমত মাটির স্বাভাবিক গঠন পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করা হইয়া থাকে। কখন বা জমির প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষাদি রোপণের ব্যবস্থা করিতে হয়।

মাটির গুণে বাগানের কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র অগ্রসর হয়। দোয়াঁস মাটিতে বৃষ্টি হইলে, সে জল অতি সত্বর শুষিয়া যায় এবং মাটিতে কোদাল দিবার ('যো' হয়) উপযুক্ত হয়। মাটি আটাল হইলে মাটির 'যো' হইতে অধিক সময় লাগে বা 'যো' অধিক ক্ষণস্থায়ী হয় না এবং একবার 'যো' নষ্ট হইলে এমন শক্ত হইয়া উঠে যে সে মাটির কায়কিৎ করা বহুব্যয় সাধ্য, কখন বা অসাধ্য মত হইয়া উঠে, পুনরায় বৃষ্টি বা জল সেচনের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হয়। দোয়াঁস মাটিতে কাজ করা সহজ। উদ্যান পালক তাহাতে নানারূপ সারের সাহায্যে তাহাকে আদর্শ মৃত্তিকায় পরিণত করিতে পারে। আটাল মাটিতে উদ্ভিজ্জ পদার্থ অধিক মাত্রায় থাক এবং তাহাতে উদ্ভিদের খাদ্য বেশী থাকে কিন্তু তথাপিও উদ্যান পালক দোয়াঁস মাটিরই পক্ষপাতী। বাগানের কার্য্য একটির পর একটি লাগিয়াই থাকে

একটি কার্য্যের বিলম্ব হইলে অন্যটির বিলম্ব হইবে, কিম্বা হয়ত তাহা আর হইয়া উঠিবে না এবং এই কারণে হয়ত আসল কাজ খারাপ হইয়া যাইবে।

ঠিক মনের মত মাটি হইবে এবং নিম্নস্তরের মাটিটিও উপযুক্ত জলধারণের গুণ বিশিষ্ট হইবে ইহা কদাচিৎ আশা করা যায়। খুব হালকা বা খুব শক্ত মাটি হইলে উদ্যান পালক তাহাতে ঘন ঘন লাঙ্গল মৈ দিয়া, তাহাতে শিম্বি জাতীয় বীজ বুনিয়া তলার গাছ জমির সহিত চষিয়া দিয়া, তাহাতে চূণ ছড়াইয়া দিয়া, তাহাতে জল নিকাশের পথ করিয়া দিয়া, তাহাতে গোবর সার সংযোগ করিয়া জমির প্রাকৃতিক গঠন বদলাইয়া লয়।

এই প্রকারে স্থান নির্ণয় হইলে এবং মৃত্তিকা বিচার করিয়া লইয়া বাগানের কার্য্যারম্ভ করিতে হয়। যেখানে বাগান বসাইবে তাহাতে ছয় মাস বা এক বৎসর পূর্ব্ব হইতে চাষ কারফিৎ করিতে হইবে। বাগানের কার্য্যে ধীরে ধীরে সম্পন্ন হওয়া উচিত কোন বিষয়ে ব্যস্ততা প্রকাশ করিলে অশুভ ফল দর্শে।

স্বদেশী মেলা—মেলায় আবশ্যকীয় শিল্প দ্রব্য এবার খুব কমই আসিয়াছে। স্বদেশী মেলা বলিলে আমরা যাহা বুঝি এবারের মেলায় তাহার পূর্ণাবয়ব দেখিতে পাইলাম না। মিলের বা তাঁতের সুতী বস্ত্র যৎসামান্যই আসিয়াছে। মুর্শীদাবাদ ও অন্যান্য স্থানের রেশমী ধুতি, সাড়ী, জামার কাপড় নাই বলিলেই হয়। আমরা শুনিয়াছি যে অনেক জায়গায় জামাতে বসাইবার লেস্, চিকণ প্রস্তুত হইতেছে কিন্তু মেলায় সে গুলি দেখিতে পাইলাম না। ভাল স্বদেশী মোজা, গেঞ্জি তৈয়ারি হইতেছে, মেলায় তাহা যৎসামান্য দেখিলাম। স্বদেশেও অনেক চামড়ার কারখানা হইয়াছে. ঐ সমুদয় কারখানার দ্রব্যাদি মেলাতে খুব কমই আসিয়াছে। কাঞ্চন নগরের ছুরি, কাঁচি, নাটাগড়ের কলকজা মেলাতে কিছুই নাই একা দাস কোম্পানি, তালা চাবী ক্যাসবাক্স দেখাইয়া মেলার মান কতকটা রক্ষা করিয়াছেন। অনেক দেশী শিশুখাদ্য ও ঔষধাদি প্রস্তুত হইতেছে প্রস্তুতকারীগণ হয়ত মেলাতে আহুত হন নাই—অথবা হুজুগে মেলায় আসিয়া লাভ নাই বলিয়া আসেন নাই। বাঙলা দেশে ধান ভানা ও চাউল ছাঁটা কলের আদর দেখিলে বড়ই সুখী হওয়া যায়। কালীঘাটের ঘটক মনে করিলে তাহা দেখাইতে পারিতেন কিন্তু তাঁকে ডাকিবে কে? স্বদেশী বারসোপ সামান্য দেখিলাম, মাণিকতলায় প্রস্তুত চাপড়া সাবান এক টুকরা নাই, কিন্তু বিলাতী নকল গন্ধ সাবানের ছড়াছড়ি। নকল যে একেবারে দোষের তাহা বলিতেছি না। নকল করিতে করিতে এক দিন আসল জিনিষটায় দাঁড়াইবে কিন্তু ভাল মন্দ সবই দেখা দরকার তবেত বুঝা যাইবে যে পূর্ণতা প্রাপ্তির কত

বাকী। স্বদেশী আতর, গোলাপ, পুষ্পসার এক ছটাকও মেলাতে নাই কিন্তু বিলাতী শিশিতে, বিলাতী গন্ধ স্বদেশী লেবেল আঁটা গন্ধের প্রচুর আয়োজন। বিলাতী গন্ধের পসার বৃদ্ধি করিবার জন্য বিলাতী ঘড়ির প্রলোভন। প্রকারন্তে আমরা স্বদেশী মেলা খুলিয়া বিলাতীরই পসার বৃদ্ধি করিতে বসিয়াছি। কাজের জিনিষের মধ্যে দেখিয়াছি ডাঃ ইন্দুমাধব মল্লিকের ইক্‌ মিক্‌ কুকার। এরূপ চুল্লিতে বেশ সহজ বৈজ্ঞানিকমতে কম আঁচে রান্না করা যায়। আর একটা জিনিষ বেঙ্গল কেমিক্যালের অগ্নি নির্ব্বাপক পাউডার। বেঙ্গল পটারি কারখানার জিনিষ গুলি ও উল্লেখ যোগ্য। তার পর নাচ তামাসা রঙ্গ রহস্য। যাঁহারা স্বদেশীর পাণ্ডা হইবেন তাঁহাদিগকে প্রকৃত সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে হইবে। দেশের পল্লিতে পল্লিতে ঘুরিয়া কোথায় কোন শিল্প লুকাইয়া আছে, কোথায় কোনটার লোপ হইতেছে তাহাদের প্রকাশ ও পুনরুদ্ধারই কার্য্য এবং মেলাতে তাহারই সহায়তা সকলে চায়। মহিলাগণের দর্শন জন্য মেলাকারীগণ এবার একটু বিশেষ আয়োজন করিয়াছেন কিন্তু পর্দ্দানসীন স্ত্রীলোকগণ এ মেলাতে আসিতে পাইয়াছেন কি না দেখিয়া ঠিক বুঝা গেল না—যদি আসিয়া থাকেন তাঁহারা কতটুকু পর্দ্দা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন তাহা ঠিক বলা যায় না।

মেলা সম্বন্ধে হিতবাদীর অভিমতটি নিয়ে দেওয়া গেল—

মেলাটি নামে স্বদেশী হইলেও কার্য্যতঃ 'ফ্যান্সি ফেয়ারের' নকল। কারণ মেলা স্থলে গৃহস্থ মাত্রেরই নিত্য ব্যবহার্য্য শিল্প সম্ভারের পরিবর্ত্তে নগরের বিলাসপ্রিয় নাগর ও নাগরীদিগের রুচিকর বিলাস সম্ভারের ছড়াছড়ি দেখিলাম। সাবানের পিরামিড গড়িলে, গন্ধতৈলের নদী বহাইলে এবং এসেন্সের শিশি সমূহের দ্বারা স্ফটিক স্তম্ভ প্রস্তুত করিলে যে যথার্থ স্বদেশী মেলা হয় না, ইহা মেলার অনুষ্ঠানকারীরা যে না বুঝেন এমন নহে। কিন্তু প্রকৃত স্বদেশী মেলার অনুষ্ঠানে যেরূপ উদ্যম আবশ্যক, তাহা তাঁহাদিগের নাই। স্বদেশী নামটী বড় চিত্তাকর্ষক বলিয়া মেলাকে ঐ নামের মুকুট পরাইয়া দিয়াছেন।

পত্রাদি

পারি, রুই মুড়া, মোচা খাস আম কখন পাকে।—

শ্রীভবানী নাথ রায়, বিথলিয়া, নদীয়া।

পারি বা পায়েরী বোম্বাই জাতীয় আম। বাঙলায় এই আম জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে পাকে। রুই মুড়া ও মোচা খাস ইহারা মুর্শিদাবাদের আম; বাঙলায় প্রায় বোম্বাইয়ের সমকালেই পাকে। সচরাচর কিন্তু মুর্শিদাবাদী আমের চালান কলিকাতায় আষাঢ় শ্রাবণ মাসে আসিয়া থাকে।

পুকুরে শেওলা—শ্রীযুত দ্বারকা নাথ দাস, হাওড়া।

বোধ হয় শেওলা অর্থে পানা মনে করিতেছেন। পানা বা শেওলা উহার কোন কোন অংশ মাছে খাইয়া থাকে অতএব পুকুরে থাকিলে মাছের কোন অনিষ্ট হয় না। কিন্তু যদি পানাতে বা শেওলাতে পুকুর ছাইয়া ফেলে এবং মাছের চরিবার অসুবিধা হয় তবে তাহা যত্ন পূর্ব্বক তুলিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। গুঁড়ি পানা যখন বাতাসে পুকুরের ধারে আসিয়া লাগে তখন তাহার উপর চূণ ছড়াইয়া দিলে সেগুলি মরিয়া যায়, চূণে শেওলাও নষ্ট হইতে পারে। অত্যধিক চূণ ছড়াইবার আবশ্যক হইলে মাছ মরিয়া যাইবার সম্ভাবনা।

পেঁপের মাথা কুড়াইয়া যায় কেন? তাহা প্রতিকার কি?—

শ্রীযুত ডি, কে বিশ্বাস; লছমী কুণ্ড, বেনারস।

প্রথমে উপযুক্ত মাটিতে গাছের শ্রীবৃদ্ধি হয় তারপর নিম্নস্তরে বালি, বা খোলা কাঁকরের উপর শিকড় যাইয়া পড়িলে ঐরূপ অগ্রভাগ কুড়াইয়া যাওয়া সম্ভব। মাঝে বা মূল শিকড়ে কোন প্রকার পোকা লাগিলে ঐ প্রকার হওয়াও সম্ভব।

স্বদেশী মেলায় বঙ্গের গভর্ণর—বিগত ৫ই সেপ্টেম্বর স্বদেশী মেলার উদ্বোধন কালে বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর মেলামণ্ডপে অনেকগুলি সারগর্ভ কথা বলিয়াছিলেন স্বদেশী শিল্পের উন্নতি সাধন যে দেশের ধনবৃদ্ধির ও উন্নতির যথার্থ উপায়, এ কথা তিনি প্রথমেই উল্লেখ করেন। এদেশের শিল্প দ্রব্য যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায় পরিচালন করিয়া থাকে, তৎসমুদয়ের উন্নতি সাধনে যত্ন প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যেরূপ সংঘ সংগঠন করিয়া কাজ করিলে, ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্মিলন ঘটাইলে এই সকল শিল্প ব্যবসায়ের পরিপুষ্টি ও উন্নতি ঘটিতে পারে, তদ্বিষয়ে যথোচিত চেষ্টার অভাব বশতঃ ঐ সকল শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতি হইতেছে না।

তিনি বলেন যে, এতদিন বঙ্গদেশে মূলধনের জন্য ইউরোপের উপরেই নির্ভর করিয়া আসিয়াছে। বাঙ্গালীরা ইচ্ছা করিলে সেই মূলধনের সংস্থান করিতে পারেন। কি উপায়ে ধনবৃদ্ধি করিতে হয়, গবর্ণমেণ্ট সে শিক্ষা দেশের লোকদিগকে দিতে পারেন, কিন্তু তাহাদিগের শিক্ষা যাহাতে ফলপ্রসূ হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তজ্জন্য মূলধন আবশ্যক।

এদেশে কৃষকগণের প্রধান গুণ—যে তাহারা হাতে নাতে কাজ চালাইতে খুব দক্ষ। তাহারা তাহাদের ক্ষেতে জল মাটির সহিত যে সম্বন্ধ রাখে অন্য দেশের কৃষকেরা তাদৃশ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রাখে না। কিছু দিন পূর্ব্বে বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর সাহেব তাঁহার বক্তৃতায় এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। অন্যান্য দেশে কৃষি-কর্ম্ম অনেকটা কলবলে চলিতেছে, তথায় কৃষি-কুল যন্ত্রচালক মাত্র। কৃষি-বিভাগের কর্ত্তারা এবং দেশের অনেক বিজ্ঞলোকে মনে করেন যে এ দেশের কৃষককে লেখা পড়া শিখাইতে পারিলে দেশের কৃষির বিশিষ্ট উন্নতি হইবে। আমরা আপামর সাধারণের লেখা পড়া শিক্ষার পক্ষপাতী। এদেশে অল্প শিক্ষার কিন্তু একটা ভয়ানক দোষ আছে। নিম্ন-শ্রেণীর লোকের ছেলেরা একটু লেখাপড়া শিখিয়া আর তাহারা কুল ক্রমাগত বৃত্তি অবলম্বন করিতে চায় না। তাহারা চাকুরি লোলুপ ও বিলাসী হইয়া পড়ে। এই রূপ অর্দ্ধ শিক্ষিত লোক দ্বারা সমাজের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই অধিক হয়। জাপান, জার্ম্মনি, কিম্বা আমেরিকার মত প্রতি পল্লিতে পল্লিতে কিছু বিজ্ঞান চর্চ্চার বন্দোবস্ত অচিরে হইতেছে না সুতরাং নিরক্ষর লোকের হাতেই আমাদের দেশের চাষ আবাদ নির্ভর করিতেছে। তাহাদিগকে বুঝাইয়া নূতন পথে চালাইতে পারিলে তাহাদিগের দ্বারা অনেক কাজ হইবে। তাহাদের পন্থা-গুলিও সবই অবৈজ্ঞানিক নহে। তাহারা অনেক সময় ঠিক কাজ করে তবে বুঝাইতে জানে না। যিনি ভারতের কৃষির উন্নতিকামী, তিনি চাষীদের সহিত একযোগে কার্য্য করিলে সাফল্য লাভ করিবেন। কেবলমাত্র দুই দশ জন শিক্ষিত ভদ্র সন্তানকে কৃষি-বিজ্ঞান শিখাইয়া দেশের কাজ কিছু অধিক অগ্রসর হইবে না।

এদেশে কৃষকের দুরবস্থা—অনেকেরই ধারণা যে মামলা-মোকদ্দমা হেতু, আবাদী জমির উৎপাদিকা শক্তিহ্রাস হেতু বড় অতিরিক্ত লোকসংখ্যা এবং খাজনা বৃদ্ধি হেতু কৃষককুলের এত দুরবস্থা ঘটিয়াছে। ইহার উপর ম্যালেরিয়া আছে। এদেশে জ্বরের প্রাদুর্ভাবে কৃষককুলের দুরবস্থার একশেষ হইতেছে। খালাদি মজিয়া গিয়াছে, জলনিকাশের পথ বন্ধ হইয়াছে। কলুষিত জল পান করিয়া, এবং অযোগ্য আহার করিয়া তাহাদের দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে এবং এই কারণে তাহাদের মধ্যে ম্যালেরিয়ার এত প্রকোপ। এদেশে কৃষির উন্নতি করিতে হইলে কেবল কৃষি-কলেজ বা স্কুল স্থাপন করিয়া কতিপয় সংখ্যক লোককে কৃষি-শাস্ত্রে পারদর্শী করিবার পূর্ব্বে কৃষককুলের স্বাস্থ্য বিধান সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক।

আবার দেশ রক্ষা করিতে হইলে প্রকৃত দেশের উন্নতি ইচ্ছা করিলে শিল্পও চাই, কৃষিও চাই। ইংলণ্ডে শিল্প আছে বলিয়াই ত ইংলণ্ডের নিজের দেশে খাদ্য শস্য কম জন্মিলেও ইংলণ্ড অন্যত্র হইতে অন্নসংস্থান করিতে পারিতেছে। এক টাকা স্থলে চারিটাকা মূল্য দিতে পারিতেছে অথচ দিন দিন ধনাঢ্য হইয়া উঠিতেছে। আমাদের দেশে শতকরা ৭৫ জন কৃষিজীবি এখনও আছে। ইহাদিগকে যদি খাড়া করিয়া তুলিতে পারা যায়, তাহা হইলে কি কৃষির জন্য ভাবিতে হয়? যেগুলি কৃষক আছে, তাহাদিগকে বাঁচাও। আর যাহারা কৃষিরত নহে, তাহাদিগের মধ্যে [illegible] সমর্থ, তাহাদিগকে শিল্প বাণিজ্যে লাগাইবার উপায় দেখ। কৃষিও

চাই, শিল্প-বাণিজ্যও চাই; তবে দেশ রক্ষা হইবে। কেবল কৃষিতে কি সব খরচ কুলাইবে? নিজেদের খাইয়া বাঁচাইতে হইবে; তাহার উপর রাজার রাজস্ব আছে তাহার উপর কৃষককুলের দুরবস্থা আছে, হাজাশুকা আছে; কেবল কৃষির উপর নির্ভর করিলে কি চলিতে পারে? কৃষিতে খাঁকতি পড়ে—শিল্প-বাণিজ্যে পোষাইতে হইবে; আবার বাণিজ্যে খাঁকতি পড়ে—কৃষিতে পোষাইতে হইবে। দুইই চাই। অতএব দুয়েতেই দৃষ্টিতে রাখিতে হইলে অগ্রে স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি কেহ হিতৈষী থাকেন, তাহা হইলে অগ্রে তাহারই ব্যবস্থা করুন; নহিলে কিছুতেই দেশ বাঁচাইতে পারিবেন না। যিনি যাহাই বলুন, মূল কথা অগ্রে কৃষককুলকে বাঁচাও।

সার-সংগ্রহ

খেজুর-চিনি

যে যশোহর আজ ম্যালেরিয়ার বাসভূমি,—যে যশোহর ম্যালেরিয়ার প্রকোপে জঙ্গলাকীর্ণ ও জনহীন হইতে বসিয়াছে, যে যশোহর এখন শিল্পবাণিজ্যহীন হইয়া শ্রীভ্রষ্ট অবস্থায় বর্ত্তমান—যে যশোহরের নদী সমূহ মজিয়া উঠিয়া শৈবালসমাচ্ছন্ন বক্ষ হইতে কেবল বিষবাষ্প বিস্তার করিতেছে—অল্পকাল পূর্ব্বেও সেই যশোহর চিনির কারবারের প্রধান আড়ং ছিল। যশোহরের খেজুর-চিনি ভারতের সর্ব্বত্র—এমন কি, ভারতের বাহিরেও রপ্তানী হইত। কোটচাঁদপুর, চৌগাছা, কেশবপুর প্রভৃতি স্থানে বহু কারখানা ছিল। চিনির ব্যবসায়ে লাভ দেখিয়া ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে গ্লাডষ্টোন ওয়াইলী কোম্পানী চৌগাছায় চিনির কল বসাইয়াছিলেন। তখন বেঙ্গল সেণ্ট্রাল রেলপথও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কলিকাতা হইতে নৌকায় মাল চালান হইত, আর যশোহর পর্য্যন্ত পাকা রাস্তাও ছিল। সেই গতায়াতের অসুবিধার সময় চৌগাছায় কল বসাইয়া ইউরোপীয় ম্যানেজার পাঠান কিরূপ লাভের আশায় সম্ভব হইত তাহা সহজেই অনুমেয়। কোটচাঁদপুরেও কল ছিল।—সরকারী রিপোর্টে দেখা যায়, তখন চৌগাছা খেজুর-গাছে পূর্ণ ছিল। চৌগাছার কল অনেক দিন পরে বন্ধ হয়। তাহার পর মিষ্টার নিউহাউস চৌগাছায় আবার কল বসান ও বেগ ডানলপ কোম্পানী সেই কল চালাইয়া পরে বন্ধ করেন। কল বন্ধ হইবার বিবিধ কারণ ছিল। ১০ হাজার টাকার মাল ১ লক্ষ টাকায় কিনিলে—মূলধনের সুদ পোষাইয়া লাভ হয় না। এ ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছিল। যশোহরকে কেন্দ্র করিয়া নদীয়া ও ২৪ পরগণার কোন কোন স্থানেও চিনির কারবার চলিয়াছিল। এখন সে কাজ বন্ধ হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালার একটা প্রধান ব্যবসা নষ্ট হইয়াছে—সহস্র সহস্র লোক কাজ হারাইয়াছে। অর্থ কার্জ্জন

একবার বিদেশী—"রাজসাহায্যপুষ্ট" চিনির উপর শুল্ক বসাইয়া এ দেশের চিনির ব্যবসা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

লর্ড কার্জ্জন একবার বলিয়াছিলেন, সরকারের কোন কাজে নামিতে কিছু বিলম্ব হয়। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। বর্ত্তমানে লোক চিনির ব্যবসায়ের সর্ব্বনাশ হেতু খেজুর বাগান কাটিয়া মাঠান জমী করিয়া ধানের ও পাটের চাষ করিতেছে। এখন সরকার কিসে খেজুর-চিনির ব্যবসা রক্ষা পায়, তাহার চেষ্টা করিতেছেন। এ বিষয়ে যে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, ১৮৩৬-৩৭ খৃষ্টব্দে কলিকাতা হইতে ১৩ হাজার টন চিনি রপ্তানী হইয়াছিল, আর ১৮৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে রপ্তানীর পরিমাণ ৬৩ হাজার টন হয়। এখন—এই দুর্দ্দশার সময়েও বঙ্গে ১ লক্ষ টন চিনি উৎপন্ন হয়—তাহার মূল্য ৭৫ লক্ষ টাকা। আমাদের বিশ্বাস, লেখক চিনির দাম লিখিতে গুড়ের দাম লিখিয়াছেন।

সরকার হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, প্রতি একারে ৩৫০টি গাছ বসাইলে তাহা হইতে ৩ টন গুড় পাওয়া যায়। ইক্ষুর চাষে এত গুড় পাওয়া যায় না। আবার ইক্ষুর চাষ অনিশ্চিত—অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পোকা প্রভৃতিতে কোন কোন বৎসর চাষের অসুবিধাও হয়। খেজুরগাছে সে অসুবিধা নাই। রসের পরিমাণে বড় তারতম্য হয় না। আবার ইক্ষুর চাষে আকমাড়াই কল কিনিতে অনেক খরচ করিতে হয়। খেজুর-গুড় করিতে সে ব্যয় বাঁচিয়া যায়। সত্য বটে, আকের চিনি করিতে আকের সিটাতেই জ্বালানি হয়, খেজুর-চিনি করিতে জ্বালানি কাঠ কিনিতে হয়; কিন্তু খতাইয়া দেখিলে ইহাতে অধিক খরচ পড়ে না। আবার খেজুর গাছের সঙ্গে সঙ্গে তালগাছ বসাইলে বড়ই সুবিধা হয়। শীতের সময় খেজুরের ও গ্রীষ্মের সময় তালের রস পাওয়া যায়। তাহাতে সমস্ত বৎসরই কাজ চলিতে পারে।

পূর্ব্ব-উত্তর আমেরিকার আদিম নিবাসীরা গুড় প্রস্তুত করিত। তাহারাও গাছে চাঁচ দিয়া যশোহর জেলায় ব্যবহৃত নলির মত নলি ব্যবহার করিত। গামলায় রস ঢালিয়া তাহারা তপ্ত প্রস্তরখণ্ড রসে ফেলিয়া গুড় প্রস্তুত করিত। ইহার পর তাহারা রস জ্বাল দিয়া গুড় করিত। এখন তথায় উন্নত প্রণালীতে চিনি প্রস্তুত হইতেছে।

সরকারী রিপোর্টে দেখা যায়, গুড় অনেকটা ভাল করা যাইতে পারে। এক্ষণে মৃৎপাত্রে রস জ্বাল দেওয়া হয়। পাত্রগুলি প্রত্যহ ধৌত করা হয় না—পাত্রে পোড়া গুড় জমিয়া থাকে। তাই গুড় পরিষ্কার হয় না—কৃষ্ণবর্ণ হয়। ১৮৯২-৯৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুত ভূপালচন্দ্র বসু যশোহরে গুড় প্রস্তুতের পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি মৃৎপাত্রের পরিবর্ত্তে লৌহ কটাহ ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছিলেন—গুড় ভাল

হয়, আর সেই গুড় হইতে সেণ্ট্রিফিউগাল কলে চিনি করিলে চিনি শাদা হয়। দেশে লৌহ-কটাহে রস জ্বালাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল গুড় প্রস্তুত করা যাইবে। আর এক কথা—গুড় জাল দিবার সময় রস ছাঁকিয়া লওয়া প্রয়োজন; নহিলে গুড় পরিষ্কার হয় না।

বাঙলায় পাটা শেওলা দিয়া গুড় সাফ করা হইয়া থাকে। ইহাতে অর্থব্যয় অতি সামান্য বটে; কিন্তু চিনি প্রস্তুত করিতে অত্যন্ত বিলম্ব হয়। সেণ্ট্রিফিউগাল কল ব্যবহার করিলে গুড় হইতে অতি শীঘ্র চিনি প্রস্তুত হয়; তাহাতে টাকা বহুবার ঘুরিয়া আসাতে লাভ হয়। ভূপাল বাবু বলেন, ভাল গুড় লইয়া সেণ্ট্রিফিউগাল কলে অতি উৎকৃষ্ট চিনি প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার মত এই যে, এই কল ব্যবহৃত হইলে চাষীরা উৎকৃষ্ট গুড় প্রস্তুত করিবে।

রস ধরিবার প্রথারও পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। ভাঁড়ের বদলে ঢাকনিওয়ালা ধাতুপাত্র ব্যবহার করিতে না পারিলে পাত্র সাফ করিবার ব্যবস্থা হইবে না। এনামেলকরা পাত্রে রস ধরিয়া দেখা গিয়াছে, ভাঁড়ে ধরা রস অপেক্ষা সে রস ভাল। ইহার কারণ এই ভাঁড় সাফ করা হয় না—তাই ভাঁড়ে ধরা রসও খারাপ হয়।

রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, গুড় ভাঁড়ে না পূরিয়া পিপায় বা ক্যানেস্তারায় পুরিলে সুবিধা হয়। নাগরী ভাঙ্গিয়া গুড় লইয়া কলে দিতে হয়। সময় সময় নাগরির খাবরা গুড়ের সঙ্গে কলে পড়ে। তাহাতে কলের ফিল্‌টার ব্যাগের কাপড় ছিঁড়িয়া যায়। আবার গরুর গাড়ীতে আনিবার সময় নাগরি ভাঙ্গিয়া গুড় নষ্ট হয়। পিপা বা ক্যানেস্তারা ব্যবহার করিলে সে ভয় থাকে না।

রিপোর্টে দেখা যায়, সেণ্ট্রিফিউগাল কল বসাইয়া রস কিনিয়া চিনি প্রস্তুত করিলে যথেষ্ট লাভ হয়। ইহার জন্য বড় বড় কারখানা সংস্থাপিত করিলে যে লাভ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

একটি কথা জানা প্রয়োজন। রিপোর্টে যে কলের কথা বলা হইয়াছে, তাহা বসাইতে বা চালাইতে প্রথমতঃ কিরূপ ব্যয় পড়িবে? আমাদের বোধ হয়, চাষী দিগের পক্ষে এরূপ কল সংস্থাপন করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং যদি বড় বড় আড়ঙে কেহ কল সংস্থাপন করেন, তবেই ফল হইতে পারে। ইহাতেও কিছু অসুবিধা যে নাই এমন নহে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চিনির ব্যবসায়ে অসুবিধা বুঝিয়া অনেকে খেজুর-বাগান কাটিয়া মাঠান জমি করিয়া চাষ করিতেছে। কোন্ আশায় তাহারা আবার খেজুর-বাগান করিবে? খেজুরগাছ বড় হইয়া রস দিবার উপযোগী হইতে সময় লাগে। যত দিন নূতন গাছ বড় হইয়া রস দিবার মত

না হয়, তত দিন রসের পরিমাণ অধিক হইবে না—কলেও যথেষ্ট কাজ হইবে না—আবার রস না বাড়িলে লোক বাগানও বাড়াইবে না।

যাহা হউক, সরকার যদি আমদানী চিনির উপর শুল্ক বসাইয়া বা অন্য কোন উপায়ে খেজুর-চিনির ব্যবসায়ে নূতন জীবনসঞ্চারের উপায় করেন, তবে লোকের উৎসাহ হইবে, অনেক লোকের অন্নের উপায় হইবে।

এ বিষয়ে 'অমৃতবাজার পত্রিকার' প্রবর্ত্তক শিশির কুমার ঘোষ মহাশয়ের চেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনেকে অবগত নহেন, কেবল ব্যবসা বজায় রাখিবার ও কারখানাওয়ালাদের উৎসাহ দিবার জন্য তিনি অনেক দিন লোকসান দিয়াও একটা কারখানা চালাইয়াছিলেন। তাহার পর তিনি স্বয়ং নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া ও চৌগাছার শ্রীযুত দেবেন্দ্র প্রসাদ ঘোষের নিকট হইতে নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া সে সকল 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' প্রকাশ করেন ও সেই সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সেই সকল প্রবন্ধ যখন প্রকাশিত হয়, তখন যদি সরকার চেষ্টা করিতেন তবে বোধ হয় এই ব্যবসার পুনরুদ্ধার সহজসাধ্য হইত, এখন সে কাজ আর সহজ সাধ্য নহে।

সরকার যদি রিপোর্ট বাহির করিয়াই নিশ্চিন্ত না হন, পরন্তু যাহাতে বঙ্গে খেজুর চিনির ব্যবসা রক্ষা পায় তাহার উপায় করেন, তবে বঙ্গবাসীর মহদুপকার সাধিত হইবে—শত শত নিরন্ন বাঙ্গালীর অন্নের উপায় হইবে—বঙ্গের পল্লীতে পল্লীর বহুলোকের অবস্থার উন্নতি হইবে। আমরা আশা করি, সরকার সে বিষয়ে অবহিত হইবেন; আর বিদেশাগত সরকারী সাহায্যে পুষ্ট চিনির সহিত প্রতিযোগিতার অবশ্য উপায় করিবেন।

বাগানের মাসিক কার্য্য

কার্ত্তিক মাস।

আশ্বিন মাস গত হইল, বিলাতী সব্জী বপন করিতে আর বাকী রাখা উচিত নহে। কপি, সালগম, বীট প্রভৃতি ইতিপূর্ব্বেই বপন করা হইয়াছে। সেই সকল চারা এক্ষণে নাড়িয়া নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে রোপণ করিতে হইবে। মটর, মূলা এবং নাবী জাতীয় সীম, সালগম, বীট, গাজর, পিঁয়াজ ও শস্য প্রভৃতি বীজের বপনকার্য্য আশ্বিন মাসের শেষেই আরম্ভ করা উচিত। নাবী ফসলের এখনও সময় আছে, এখনও তাহাদের চাষ চলে। কার্ত্তিকের প্রথমে ঐ সমস্ত বিলাতী বীজ বপন যেন আর বাকী না থাকে। বীজ আলুও এই সময় বসাইতে হইবে। পিঁয়াজ ও পটল চাষের এই সময়। আশ্বিনের প্রথমার্দ্ধ গত হইলে রবিশস্যের জন্য জমি তৈয়ারী করিতে হইবে এবং আশ্বিন মাস গত হইতে না হইতেই মসুরী, মুগ, তিল, খেঁসারী প্রভৃতি রবিশস্যের বীজ বপন করিলে ফল মন্দ হয় না। কিন্তু আকাশের

অবস্থার উপর সব নির্ভর করে। যদি বর্ষা শেষ হইয়াছে ব[illegible] মনে হয়, তবেই রবি ফসলের জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত, নচেৎ বৃষ্টিতে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। সচরাচর দেখা যায় যে, আশ্বিন মাসের শেষেই বর্ষা শেষ হইয়া যায়, সুতরাং বঙ্গদেশে কার্ত্তিক মাসেই উক্ত ফসলের কার্য্য আরম্ভ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

ধনে—যেমন তেমন জমি একটু নামাল হইলে যথেষ্ট পরিমাণে ধনে হইতে পারে। ধনে এই সময় বুনিতে হয়।

সুল্পাদি—সুল্প, মেথি, কালজিরা, মৌরী, রাঁধুনি ইত্যাদি এদেশে ভাল ফলে না কিন্তু উহাদিগের শাক খাইবার জন্য কিছু কিছু বুনিতে পারা যায়। এই সকল বপনেরও এই সময়।

কার্পাস গাছ—কার্পাসের দুই চারিটি গাছ, বাগানের এক পাশে রাখিতে পারিলে গৃহস্থের অনেক কাজে লাগে। উহার বীজ এখন বপন কর।

তরমুজাদি—তরমুজাদি, বালুকামিশ্রিত পলিমাটিযুক্ত চর জমিতেই ভাল হয়। যে জমিতে ঐ সকল ফসল করিতে হয়, তাহাতে অন্যান্য সারের সঙ্গে আবশ্যক হইলে কিছু বালি মিশাইয়া দিবে। তরমুজ মাটি চাপা দিলে বড় হয়। তরমুজ বীজ বসাইবার এই সময়।

উচ্ছে—৪।৪ হাত অন্তর উচ্ছের মাদা করিতে হয়, নচেৎ পাইট করিতে ও উচ্ছে তুলিতে কষ্ট হইবে। উচ্ছের বীজ একটী মাদায় ৩।৪টার অধিক পুতিবে না। উচ্ছে বীজ এই মাসের মধ্যে বসাও।

পটোল—পটলের মূলগুলি প্রথমে গোবরের সার মিশ্রিত অল্পজলে ২।৩ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া নূতন কল বাহির হইলেই ভূমিতে পুতিবে। পুনঃ পুনঃ খুঁড়িয়া ও নিড়াইয়া দেওয়াই পটলক্ষেত্রের প্রধান পাইট। পটল চাষ এই মাসে আরম্ভ হয়।

পলাণ্ডু—কল সমেত এক একটী পিঁয়াজ আধ হাত অন্তর পুতিয়া দিবে [illegible] জমি নিতান্ত শুকাইয়া গেলে মধ্যে মধ্যে জল দিয়া আবার মাটির "যো" হইলে খুঁড়িয়া দিবে। এই মাসে পেঁয়াজ বসাইবে।

মটরাদি—শুঁটি খাইবার জন্য আশ্বিনের শেষে মটর, বরবটি ও ছোলা বুনিতে হয়। ঘাস নিড়াইয়া দেওয়া ভিন্ন ইহাদের বিশেষ পাইট কিছুই করিতে হয় না।

ক্ষেত্রের পাইট—যে সকল ক্ষেতে আলু, কপি বসান হইয়াছে, তাহাতে জল দিয়া আইল বাঁধিয়া দেওয়া ভিন্ন এ মাসে উহাদিগের আর কোন পাইট নাই।

ফলের বাগান—এই সময় কোপাইয়া গাছের গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত।

মরসুমী ফুল বীজ—সর্ব্বপ্রকার মরসুমী ফুল বীজ এই সময় বপন করা কর্ত্তব্য। ইতিপূর্ব্বে এষ্টার, প্যান্সি, দোপাটি, জিনিয়া প্রভৃতি ফুল বীজ কিছু কিছু বপন করা হইয়াছে। এতদিন বৃষ্টি হইবার আশঙ্কা ছিল, কিন্তু কার্ত্তিক মাসে প্রচুর শিশিরপাত হইতে আরম্ভ হইলে আর বৃষ্টির আশঙ্কা থাকে না, সুতরাং এখন আর যাবতীয় মরসুমী ফুল বপনে কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

গোলাপের পাইট—গোলাপ গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দিয়া এই সময় রৌদ্র ও বাতাস খাওয়াইয়া লইতে হইবে। ৪।৫ দিন এইরূপ করিয়া পরে ডাল ছাঁটিয়া গোড়ায় নূতন মাটি, গোবরসার প্রভৃতি দিয়া গোড়া বাঁধিয়া দিলে শীতকালে প্রচুর ফুল ফুটে। গাছের গোড়া খোলা থাকাকালে কলিচুণের ছিটা দিলে বিশেষ উপকার হয়। বাঙলাদেশের মাটি বড় রসা এই কারণে এখানে এই প্রথা অবলম্বনে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

কৃষক

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৪শ খণ্ড। | কার্ত্তিক, ১৩২০ সাল। | ৭ম সংখ্যা।

পাট।

পাটের ব্যবসায়ে ফড়িয়াগণের অসদ্ব্যবহার—

আমাদের দেশের অশিক্ষিত নিরীহ কৃষকেরা বুঝিতে পারে না যে ফড়িয়াগণের নিকট অল্প নগদ অর্থের বিনিময়ে কি ঘোর অনিষ্ট তাহারা আহ্বান করিতেছে। এই ফড়িয়াগণের আচরণ কিরূপ ভয়ঙ্কর, কত অপ্রীতিকর তাহা আলোচনা করিলে ক্রোধে অধীর হইতে হয়। সামান্য অর্থ তাহারা চাষীদের দাদন দেয়, পরিবর্ত্তে বাজার দর অপেক্ষা অল্প মূল্যে পাট ক্রয় করে। সেই উত্তম পাটে জল দিয়া ও তাহাতে বালি মিশাইয়া, তাহাকে বেশী ভারি করে এবং অল্প ওজনের পাটকে বেশী ওজনে বিক্রয় করে। নিরীহ কৃষকগণ কিছুই জানিল না, অথচ সম্পূর্ণ ভাবে কলঙ্কের ভাগী হইল। বালি ও জল শুষ্ক শুভ্র উত্তম পাটে মিশিয়া পাটের রং কালো করিয়া ফেলে। জমিদারগণের ক্ষমতা এখনও অপ্রতিহত আছে দেখা যায়। অন্যদিকে আবার ভারতের প্রজারা বিলাতের Labour party র মত স্বাধীন নহে, জমিদারগণের বাধ্য। জমিদারগণের কার্য্যে তাহারা প্রতিবাদ করিতে শিখে নাই। জমিদারগণের কথা তাহারা দেবতার আজ্ঞার ন্যায় প্রতিপালন করে। আমাদের জমিদারগণ ইচ্ছা করিলে জুয়াচোর ফড়িয়াদের এই ঘোর অনিষ্টকর শুষ্ক, শুভ্র, কোমল পাট জল ও বালি সংযোগে দূষিত করিবার পথ একেবারে বন্ধ করিতে পারেন। তাঁহাদের ইচ্ছার উপর এইরূপ একটী গুরুতর কার্য্য নির্ভর করিতেছে; তাঁহারা ইচ্ছা করিলে অনায়াসে কৃষকগণকে রক্ষা করিতে পারেন। দেশের এমন একটি লাভবান ব্যবসা, যাহার প্রভাবে কোটী কোটী টাকা কৃষকগণ প্রাপ্ত হইতেছে, যাহারা প্রভাবে বঙ্গ দেশে ৬৫ টি পাটের

কল ও ৩৯টি জুট প্রেস, মান্দ্রাজে তিনটি জুট প্রেস ও যুক্ত প্রদেশে ২টি পাটের কল রীতিমত চলিতেছে এবং দেশের কত লোক ঐ সকল স্থানে প্রতিপালিত হইতেছে, যাহা বঙ্গদেশের একটী গৌরবের বস্তু, এত কল্যাণ কর, প্রীতিপদ, যাহা ভাবিতে আনন্দ হয়, ঐ বস্তু যাহাতে না ধ্বংস প্রাপ্ত হয় সে বিষয় জমিদার-গণের দেখা ও তাহার উন্নতির চেষ্টা করা কি তাঁহাদের কর্ত্তব্য নয়? তাঁহারা যদি পাটের সুবীজ সংগ্রহের ভার স্বয়ং গ্রহণ করেন, যেমন গভর্ণমেণ্টের অনুযোগে হইয়াছিল, তাঁহাদের জমিদারির ভিতরে পাটক্ষেত্র যদি মধ্যে মধ্যে পরিদর্শন করেন, বা আবশুক হইলে কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করেন, তাহা হইলে তাঁহারা দেশের কোটী কোটী নিরীহ প্রজাদের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়া দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতে পারেন।

অন্যত্র পাট চাষের চেষ্টা—

জাভা, পশ্চিম আফ্রিকা ও অন্যান্য দুই একটী স্থানে পাট চাষের বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। ধনচে, রীহা প্রভৃতি দ্বারাও পাটের কার্য্য কতকটা পরিমাণে করিবার চেষ্টাও চলিতেছে। যদি এই দুইটী বিষয়ে পরীক্ষা সন্তোষ জনক হয়, আর যদি সঙ্গে সঙ্গে পাটের উন্নতির চেষ্টা না করা হয় তাহা হইলে বঙ্গ দেশের পাটের আর এত আদর থাকিবেনা। ইহা কি ভাবিবার বিষয় নহে?

আমাদের দেশে একটি ছিদ্রান্বেষী সম্প্রদায় আছেন। দেশহিতকর-কার্য্যের অনুষ্ঠাতা সাজিবার প্রয়াসে তাঁহারা সামান্য কোন জিনিসে রঙ দিয়া তাহাকে এমন উজ্জ্বল করেন, তিল পরিমিত কোন বস্তু তাঁহাদের তুলিকার আবর্ত্তে পড়িয়া ঐরূপ বৃহদাকার ধারণ করে, যে সাধারণে তাঁহাদের চিত্রিত আলেখ্য দেখিয়া যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে ও এক দারুণ বিপদাশঙ্কায় অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া উঠে। আমাদের দেশে পরামর্শদাতা অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু যথার্থ কল্যাণকর কোন কার্য্যে অগ্রসর হইতে বড় তাঁহাদের ভিতরে কাহাকেও দেখা যায় না। কোনও ব্যক্তি একটি যৌথ কারবার স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন, অমনি কতকগুলি পরামর্শ দাতা বিনাহ্বানে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, এমন আন্তরিক শুভানুধ্যায়িতার ভান করিয়া, অবৈতনিক উপদেশ রাশি বর্ষণে, তাঁহাকে সে কার্য্যে প্রতিনিবৃত্ত করিতে সমধিক চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পরামর্শ দাতাগণের বিবেচনায় সে ব্যবসা নিরাপদ নহে স্থির হইল। তাঁহারা অন্য অনেক ব্যবসার নাম করিলেন। দুঃখের বিষয় তাঁহাদের অনুমোদিত ব্যবসার কথা বিশেষ ভাবে আলোচিত হইবার পর বুঝা গেল যে তাঁহারা যে ব্যবসার কথা বলিতেছেন তাহা নিজেরা কখনও করেন নাই, অপরে তাহা করিয়া বিশেষ লাভবান হইয়াছেন

ঐ কথা তাঁহারা শুনিয়াছেন। আবার অনুগ্রাহকবর্গদের মধ্যে যাহাদের সহৃদয়তা কিছু বেশী তাঁহারা নিঃসঙ্কোচে বলিলেন, যৌথ কারবার না করাই ভাল। উহাতে অনেক আশঙ্কা আছে।

আমাদের দেশের কৃষক সম্প্রদায় নিঃস্ব, আবার তাহারা অশিক্ষিত। ভাল মন্দ বিচার করিয়া কোন কার্য্য করিবার শক্তি তাহাদের নাই। যথার্থই যদি তাহারা ক্রমে ক্রমে ধান চাষ উঠাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে পাট চাষে যত্নবান হইয়া থাকে, আর ইহাই যদি দেশের অনিষ্টকর কার্য্য বলিয়া অনুমিত হয়, তবে ইহার প্রকৃত কারণ কি ছিদ্রান্বেষীরা একবার অনুসন্ধান করুন। তাঁহারা দেখিবেন ধানও আমাদের দেশে যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। গমও বড় কম নহে। কলাই সরিষা প্রভৃতিরত কথাই নাই। কিন্তু উৎপন্ন শস্যের কত অংশ অন্যান্য দেশে রপ্তানি হইতেছে তাহা একবার আলোচনা করুন। আমাদের দেশের উৎপন্ন শস্য, আমাদের আবশ্যকমত যদি দেশে থাকিয়া, উদ্বৃত্তাংশ যদি রপ্তানি হইত, তাহা হইলে দুর্ভিক্ষ কি—ভারতবাসীর জানিবার সম্ভাবনা থাকিত না। তাহার পর নিঃস্ব কৃষকেরা জমিদার দিগের নিকট ধান, গম প্রভৃতি চাষের জন্য কোন অর্থ সাহায্য পায় না, কাজে কাজেই যে চাষের জন্য তাহারা অগ্রিম অর্থ সাহায্য পায়, সেই চাষেই তাহারা বিশেষ মনোযোগী হয়। এ দোষ কাহার তাহা সাধারণে বিবেচনা করুন। যথার্থ যদি ধান চাষের প্রথার বৃদ্ধির জন্য কেহ আন্তরিক ব্যগ্র হইয়া থাকেন, তবে প্রতিকারার্থ যথার্থ কার্য্য করুন। পাট চাষ করাইবার আবশ্যক হইবে না। এমন উপায় এখনও অনেক বর্ত্তমান আছে, যাহাতে পাট চাষে হস্তক্ষেপ না করিয়া, ধান, গম প্রভৃতির চাষ আরও বর্দ্ধিত করা যায়। কৃষিকার্য্য অশিক্ষিত ব্যক্তির কার্য্য বলিয়া যাঁহারা ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিতে একটু দ্বিধা-বোধ করেন না, ফাঁকা সমালোচনা দ্বারা তাঁহারা চাষের কি উন্নতি করিবেন ভাল বোঝা যায় না। শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি কৃষকদের দুঃখ ও সঙ্গে সঙ্গে দেশের দৈন্যদশা প্রাণে প্রাণে বুঝিয়া থাকেন তবে অগ্রসর হউন। অর্থ সাহায্য দ্বারা তাহাদিগকে উৎসাহিত করুন। জঙ্গল কাটিয়া আবাদ পত্তনে সহায়তা করুন। যেখানে জল নাই, সেখানে জলাগমের ব্যবস্থা করুন। কি উপায়ে জমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হয়, বিজ্ঞানানুমোদিত সেই সকল কার্য্যে কৃষকগণকে প্রবৃত্ত করুন, নিজ নিজ গ্রামের প্রত্যেক কৃষিক্ষেত্র সাক্ষাৎ পরিদর্শন করুন। যথার্থ কাজ করিবার অনেক পথ প্রশস্ত আছে, সেই সকল পথে ধাবমান হউন। বিহার অঞ্চলের চাষীরা সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর, সন্ধ্যার সময় একস্থানে সমবেত হইয়া, প্রত্যেকে কি কি কার্য্য করিয়াছে তাহার আলোচনা করে। এই প্রকার আলোচনা দ্বারা তাহারা কিছু না কিছু শিক্ষা করে। আমাদের দেশে সে প্রথা

নাই। প্রত্যেক জমিদার যদি তাঁহার জমিদারীর ভিতর যত প্রকার চাষ হয় তাহার সংবাদ রাখেন, কোন্ স্থানে কোন্ কৃষক কি চাষ করিয়া কিরূপ কৃতকার্য্য হইতেছে, বা কোন স্থানে কৃষকের সকল চেষ্টা বিফল হইতেছে, এই সমস্ত সংবাদ যদি জমিদারগণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া রাখেন, আর আবশ্যক হইলে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেও কুণ্ঠিত না হন, তাহা হইলে বাস্তবিকই বাঙ্গালার মাটিতে সোণা ফলিতে পারে।

পাট পচান ও পাট কাচিবার ফলে জল দুষিত হয়, একথা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু এই দুষিত জলই যে আমাদের দেশের ম্যালেরিয়া, বিসূচিকা প্রভৃতি রোগের একমাত্র কারণ, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। আমাদের পল্লীগ্রাম অঞ্চলে বৃষ্টির জল বহির্গমনের পথ আদৌ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বর্ষাকালে গ্রামের ভিতরে লোকের বাড়ীর সম্মুখে ও আশে পাশে জল আবদ্ধ হইয়া থাকে। ঐ আবদ্ধ জলে চারি দিকেস্থ ছোট ছোট গাছ পালা পচিয়া জল দুষিত করে। ঐ দুষিত জল হইতে পরে এমন এক অস্বাস্থ্যকর বাষ্পোদ্গম হয় যাহাতে সেই স্থানের সমস্ত বায়ুকে দুষিত করিয়া তুলে। আর সেই দুষিত বায়ুর প্রভাবে সেই স্থানের অধিবাসীরা ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগাক্রান্ত হয়। এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে মোটে পাট চাষ হয় না, কিন্তু বৃষ্টির জল আবদ্ধ হইয়া থাকে। দেখা গিয়াছে সেই স্থানের লোকেরা ম্যালেরিয়া রোগে অধিক আক্রান্ত হয়। আমরা দেখিয়াছি যে বর্ষাকালেই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেশী। স্বাস্থ্য হিতকর কোন কার্য্য করিতে হইলে, অগ্রে বর্ষার জল বহির্গমনের পথের রীতিমত ব্যবস্থা আবশ্যক। যে জলে পাট পচান হয় সে জল অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত। কেহ তাহা ব্যবহার করিতে পারে না। আর প্রায়ই গ্রামের এক প্রান্তে যেখানে লোকজনের বসতি নাই, সেই খানেই পাট পচান হয়।

পাট চাষে জমির উর্ব্বতা বৃদ্ধি—

পাট বপনের ফলে জমির উর্ব্বরতা শক্তির হ্রাস হয় না। নাইট্রোজেন(Nitrogen) জমির উর্ব্বরতা শক্তির প্রধান সহায়তা করে। পাটে নাইট্রোজেন নাই, সুতরাং পাট নাইট্রোজেন আহরণ করে না, জমির উর্ব্বরতাও নষ্ট করে না। এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু অবগত হইতে হইলে নিবারণ বাবুর "জুট-ইন-বেঙ্গল" পাঠ করা উচিত ও উক্ত গ্রন্থকারের "কৃষি রসায়ন" হইতেও অনেক জানিতে পারা যায়।

আমাদের দেশের ধান, গম ও পাটচাষের অবস্থা বুঝিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে আমাদের দেখা উচিত যে কি পরিমাণে ঐ সমস্ত জিনিষ আমাদের দেশে উৎপন্ন হয়, আর কত পরিমাণেই বা বাহিরে রপ্তানি হয়। আমরা ১৯০৪ সালের একটী মোটামুটি হিসাব দিলাম।

	বিঘা	উৎপন্ন গাঁট বা মণ	রপ্তানি গাঁট বা মণ
পাট	৮৬৯৯১০০	৭৪০০০০০	৩৫২৫৩৩৮
চাউল	১৫৪৭৬০৭০০	৬০৬১২৩২০৫।২॥	৬৬৮৪০২১০/৬৵০
গম	৮৫৪১০৬৭০	২০৬৭৭৮৪৩৭৵০	৬০১৩১১৯৫৸৬৵০

উক্ত তালিকা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে আমাদের দেশে ধান ও গম যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর যথেষ্ট পরিমাণে রপ্তানিও হইয়া থাকে। এক্ষণে পাট চাষের দ্বারা ধান চাষের কতদূর ক্ষতি হইতেছে, আর সেই ক্ষতি পূরণের কোন উপায় আছে কিনা, তাহাও একবার অনুযোগ কর্ত্তারা বিবেচনা করিবেন। তাঁহারা হয়ত বলিবেন যে, যে পরিমাণ জমিতে পাট চাষ হয়, যদি পাট চাষ না হইয়া ঐ পরিমাণ জমিতে ধান, গম প্রভৃতি চাষ হয়, তাহা হইলে চাউল ও ময়দা প্রভৃতির মূল্য অনেক কমিয়া যায়। কিন্তু আমাদের বোধ হয় যে রপ্তানির কার্য্য তাহা হইলে আরও বর্দ্ধিত হয়। আমরা দেখিয়াছি যে হামবার্গ, ট্রেষ্ট, লণ্ডন প্রভৃতি স্থানের সওদাগরগণ অনেক সময় তাঁহাদের আবশ্যক মত মাল কলিকাতার বাজারে যোগাড় করিতে পারেন না। Old Hard চাউল বোধ হয় আরও দুই তিন জন শুধু হামবর্গের ব্যবসায়ীরা ক্রয় করিতে পারেন। সুতরাং পাট চাষ কমিলে ফলে এই হওয়া সম্ভব যে আমাদের দেশের কৃষকেরা যে চাষ করিয়া বিশেষ লাভবান হইতেছে, তাহাদের সেই লাভের পথ বন্ধ হইয়া যাইবে। তাহারা আরও নিঃস্ব হইয়া পড়িবে।

আমাদের দেশের পাটকলে প্রায় ৮০,০০০ লোক নিযুক্ত আছে। ইহা কি কম আনন্দের বিষয়? পাটের বিপক্ষে যে আন্দোলন চলিতেছে, তাহা কি প্রকারান্তরে এতগুলি লোকের দৈনন্দিন গ্রাসাচ্ছাদনের বিপক্ষে নহে? ইহা কি একবার ভাবিবার বিষয় নহে? আমাদের বিবেচনায় যাহাতে পাট চাষের আরও উন্নতি হয়, যাহাতে বাঙ্গালার পাটের সুনাম ফড়িয়াগণ নষ্ট না করিতে পারে, যাহাতে প্রতারণা প্রবঞ্চনা এ বৃহৎ অথচ মহৎ কার্য্যের অন্তরালে লুক্কাইত না থাকে, যাহাতে সুন্দর শৃঙ্খলার উপর সতেজে পাট চাষ চলিতেপারে, যাহাতে আমাদের দুঃখক্লিষ্ট দারিদ্রগ্রস্ত কৃষকগণ যতদূর সম্ভব সুখে থাকিতে পারে, সে বিষয়ে আমাদের দেশের জমিদারগণ সর্ব্বান্তঃকরণে গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করুন, দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে।

মানকচু

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায় লিখিত

যে দেশে খর্জ্জুর গুড় ঘরে ঘরে মান ;
কোন দেশ হয় বল তাহার সমান।

বিবিধ জাতীয় কচু আমরা বাজারে দেখিতে পাই তন্মধ্যে মান, অমর্ত্তমান, মুখী, সোলা ও কালকচু বা বুনোকচু উল্লেখ যোগ্য। যে সকল জেলা মানের রাজ্য সেই সকল জেলা ও মহকুমা ব্যতীত অন্যান্য স্থানে মুখীকচু এবং সোলা কচু কৃষাণের একটী প্রধান ফসল। মুখী আবার দুই প্রকার ছোটনা ও বড়ান। ছোট্না মুখী ভাদ্র মাসে উঠে। ইহাকে ভাদুরে বা আউশে মুখী কহে। বড়ানমুখী কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে তুলিতে হয়। বড়ানকে চলতি কথায় হেঁয়ুতেমুখী কহিয়া থাকে, কারণ হেমন্ত কালেই ইহারা পুষ্ট ও গৃহস্থের আহারের উপযুক্ত হইয়া থাকে। মুখী কচুর মধ্যে হেঁয়ুতে কচুই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মুখরোচক।

সোলা কচু ভাদ্র আশ্বিন মাসে সহর মফঃস্বলে যথেষ্ট আমদানি হইয়া থাকে। এই কচুর ডাঁটা ও মূল সমস্তই রাঁধিয়া খাইতে হয়। সোলা কচু ভাল করিয়া পাইট করিয়া আবাদ করিতে পারিলে প্রায় ৩।৪ সের পর্য্যন্ত কাণ্ডযুক্ত হইয়া থাকে। অনেকে এই সোলা কচুকেই মানকচু কহিয়া থাকে।

কলিকাতার সন্নিকটে মানের যথেষ্ট আবাদ হইয়া থাকে। সেই সমস্ত মান সহরের বাজারে সময়ে খুব আমদানি দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু সেগুলি মানের ক্ষুদ্র আকার (diminutive form) ভিন্ন আর কিছুই নহে। কৃষাণ মানের পোয়া অন্য স্থান হইতে ব্যবসায়ের আশায় সংগ্রহ করিয়া আনিয়া আবাদ করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু উপযুক্ত মাটী ও প্রকৃত পাইট না হওয়ায় কচুগুলি অতি ক্ষুদ্র হইয়া প্রায় বড় সোলা কচুর মতন হইয়া দাঁড়ায়।

অমর্ত্তমানের মুখী খাইতে সুমিষ্ট কিন্তু তত সিদ্ধ হয় না ইহার মূল কাণ্ড আদৌ সিদ্ধ হয় না সেই কারণ এ কচুর প্রচলন খুব কম।

অমর্ত্তমানের জালি পাতা জড়াইয়া মাছ ভাতে বিশেষতঃ চিঙড়ী মাছ ভাতে খাইতে অতি সুস্বাদু হইয়া থাকে।

কালকচু ও বুনোকচু মফঃস্বলে আদাড়ে পচা পুকুর ও ডোবার গাবায় যথেষ্ট পরিমাণে জন্মাইয়া থাকে। বাগ্দী ও বাউরীগণ এই সব কচুর ডাঁটা ছাঁটিয়া কাটিয়া হাটে বিক্রী করিয়া বেশ দু পয়সা লাভ করিয়া থাকে। বর্ষাকালে পাড়া

গাঁয়ে নারিকেল কোরা দিয়া এই কচু শাকের ঘণ্ট একটী অপূর্ব্ব উপাদেয় তরকারি। এই বিনা আবাদের মুখরোচক তরকারি বর্ষাকালে গৃহস্থের যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে। এ অঞ্চলে কচু শাকের এত আদর এত কদর যে আশ্বিন মাসে দশমীর দিন মা দশভূজা শ্বশুরালয়ে যাইবার সময় ভিজা ভাত (পান্তা ভাত) এবং নারিকেল কোরা দিয়া এই কচুশাকের ঘণ্ট অতি তৃপ্তির সহিত আহার করিয়া পিত্রালয় পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

শারদীয়া মহাপূজার দশমীর দিন পূজা বাড়িতে, হিন্দুর ঘরে ঘরে সে দিন ভিজে ভাত ও কচু শাকের ভারি ধুম পড়িয়া যায়।

মানকচু কচুর রাজা। যাঁহারা ২।৩ সের ওজনের বড় কচু দেখিয়া পরিতৃপ্ত হন তাঁহারা যদি ৩০ সের ১৲ একমন ওজনের বড় মান কচু কখনও স্বচক্ষে দেখিতে পান তাহা হইলে সেই কচু ও তাহার জন্মস্থানের যে কত দূর প্রশংসা তাঁহাদের মুখে বাহির হইয়া পড়ে তাহা বর্ণনাতীত।

গত বারে আমার অন্যতম বন্ধু মুর্শিদাবাদ কান্দী মহকুমার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটদ্বয়—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদয়াল প্রামাণিক ও শ্রীযুক্ত মনোহর গুপ্ত মহাশয়কে এবং আমার কলিকাতার সাহিত্যিক বন্ধু বহুবিধ গ্রন্থ ও অভিধান প্রণেতা ৺সুবল চন্দ্র মিত্র মহাশয়কে আমাদের বাগান হইতে ৩৫ সের ওজনের মানকচু উপহার দিয়াছিলাম। বর্ত্তমান বৎসরে আমাদের বাগানে যে মানকচু জন্মাইয়াছে তাহার ভিতর কয়েকটী ২০ সেরের ও উপর হইতে পারে। সুবল বাবু একদিন হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন—"আপনার মান, মান করিয়া আমার গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনি চেষ্টা করিয়াও আমাদের হেঁসেলে ভিষ্টিতে পারেন নাই। এক চন্দ্রে শত চন্দ্র হইয়া আমাদের পাড়ায় পাড়ায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন"—আমার আত্মীয় জমিদার শ্রীযুক্ত হরি পদ মিশ্র মহাশয় প্রতিবৎসর প্রায় ১মণ ওজনের মান সংগ্রহ করিয়া কলিকাতার সম্ভ্রান্ত বন্ধুবান্ধবদিগকে উপহার পাঠাইয়া থাকেন। মানকচুর পচা পাতা ও ডাঁটা ঘৃতকুমারীর রসের ন্যায় মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা কারক। শিশুদিগের শ্লেষ্মাশক্ত হইয়া কোঁকটান হইলে এ অঞ্চলে কবিরাজ মহাশয়েরা মানকচুর পাতা পচানি মস্তকে প্রলেপ দিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। বিকার গ্রস্ত রোগীর (delirium) এবং পাগলের শিরঃপীড়ায় কচুর পচানি বিশেষ উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কৃষকে দেখিলাম লেখা হইয়াছে মানকচু তুলিবার সময় ভাদ্র মাস কিন্তু ভাদ্র মাস মানের উপযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। মান তুলিবার প্রকৃত সময় পৌষ হইতে ফাল্গুন মাস কিন্তু কৃষকগণ অর্থের লোভে আগামী অগ্রহায়ণের প্রথম হইতেই মান তুলিতে আরম্ভ করে। অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ব্বে মান তুলিলে মান পুষ্ট হয় না—মানের ভিতর সরু সরু শিকড়ের ন্যায় আঁশ থাকে, মান খাইতে গাল ধরে।

যত দিন মানে ফুল না ধরে ততদিন মানের কাণ্ড বাড়িতে থাকিবে। ফুল ধরিলে মান পরিপুষ্ট হয়। ফুল ধরার পর মানের ডাঁটা কাটিয়া কিছু দিন জমিতে রাখিয়া দিলে সেই মানকচু প্রকৃত নাম পদবাচ্য হইয়া থাকে। মাঘ ফাল্গুনের পুষ্ট মানে গাল ধরে না, আঁশ আদৌ থাকে না, খাইতে অতীব সুস্বাদু হইয়া থাকে। এই সময়ের মান সিদ্ধ (ভাতে) নৈনিতাল আলু বলিয়া ভ্রম হয়। এই পরিপুষ্ট মানমণ্ডই কবিরাজদিগের শোথ রোগের প্রধান পথ্য।

কোষ্ঠবদ্ধতা দোষে (Habitual constipation) দাস্ত পরিষ্কার রাখিতে মানকচুর ন্যায় উপাদেয় মুখরোচক তরকারি ব্যতীত অন্য কোন তরকারি বাঙ্গালা দেশে আছে কিনা সন্দেহ। ওল হইতেও মান অর্শ ও কোষ্ঠবদ্ধতার (Piles ও Constipation) অধিক কাজ করিয়া থাকে। পুষ্ট মানের ডাঁটা কাটিলে ঠিক জীবদেহের রক্তের ন্যায় রাঙা আটা বাহির হইয়া থাকে। শুনিতে পাই পূর্ব্ববঙ্গে মানের পূজা হইয়া থাকে।

যশোহর, খুলনা, চব্বিশপরগণা মানের আকর ভূমি।

সাধারণতঃ তোলামাটীতেই বৃহৎ-কাণ্ড-যুক্ত মানকচুর জন্ম হইয়া থাকে, সেই কারণে এদেশে উজাড় বাস্তু ও পুষ্করিণীর পাড়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মান জন্মিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

দোআঁশ মাটীতে ছাই সার বেশী দিয়া জল নিকাশের পথ পরিষ্কার রাখিয়া মানের আবাদ করিতে হয়, কারণ জমিতে জল দাঁড়াইলে মানের কাণ্ড পচিয়া যায়, অতিরিক্ত সেঁথা জমির মানে গাল ধরে।

মানের জমি হইতে মান তুলিয়া লইলে, সেই স্থানের ছোট মুখী ও এঁটে হইতে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে আপনা আপনি অনেক ছোট ছোট মানের চারা বাহির হইয়া থাকে। এই চারাকে মানের পোয়া বলে। এই সমস্ত পোয়া বর্ষাশেষে আশ্বিন কার্ত্তিকমাসে নূতন জমিতে বসাইয়া দিয়া জমি একবার কোপাইয়া দিতে হয়। এ সময় এ দেশের সরস মাটীতে বেশ যো বা বাতাস থাকে, কাজেই মানের চারাগুলি অগ্রহায়ণ মাস নাগাত নূতন শিকড় পাতিয়া ২।১টী পাতা ছাড়িয়া মরমর অবস্থায় শীত কাল কাটাইয়া দেয়।

যখন মরা গাছে কচি পাতা গজায়, আম জাম মুকুলে ভরপুর হয়, সেই সরস মধুর বসন্তকালে এই আধমরা কচু গাছগুলিও আপনি নূতন পাতা ছাড়িয়া সজীব হইয়া উঠে। তখন কৃষাণ এক পসলা পাইলে বাতাস মূল (?) জমিটা বেশ করিয়া খুঁড়িয়া দিয়া থাকে। গাছে ২।৩ টী করিয়া পাতা ছাড়িলে, সিকি ছাই ও বার আনা টাটকা গোবর অথবা খাঁটি গোবর সার কৃষাণ প্রতি গাছের গোড়ায় ঢিপি করিয়া রাখিয়া যায়।

পুনরায় আর ২।৩ আচাল জল হইলে সেই সমস্ত সার কাণ্ডের চারিধারে উঁচু করিয়া দিয়া চারি পাশ অল্প অল্প খুসিয়া দেয় যেন শিকড় কাটা না পড়ে, এই সময় সমস্ত জমি আর একবার কোদলাইয়া দিতে হয় ইতি মধ্যে গাছগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাল ছাড়িয়া সমস্ত জমি ঢাকিয়া ফেলে। পাতার ছায়ায় জমিতে আর বেশী আগাছা জন্মাইতে পারে না, পুনরায় ভাদ্রমাসে গাছের গোড়ায় আর কিছু সার দিয়া জমি একবার খুসিয়া দিতে পারিলে মানের পাট সাঙ্গ হইল, তখন মান ক্রমশঃ কদলী পত্রের ন্যায় ঘন ঘন বাল ছাড়িতে থাকিবে আর কাণ্ড ফুলিয়া মোটা হইয়া পড়িবে।

মান তুলিয়া তার চোখশুদ্ধ মুখ কাটিয়া পুনরায় শীঘ্র মাটীতে পুতিয়া দিলে সেই মুখ হইতে গাছ বাহির হয়। এই গাছ গুলিকে ভাল সার দিয়া পাট করিতে পারিলে সর্ব্বাপেক্ষা প্রকাণ্ড মান প্রস্তুত করিতে পারা যায়। বড় মানের মুখ কাটিয়া পোতা মান সওয়া মন পর্য্যন্ত ওজনের হইয়া থাকে শোনা গিয়াছে, এক বৎসরেই মান প্রকাণ্ড হইয়া থাকে। কেহ কেহ ভ্রান্ত ধারণা বশতঃ মান দুই বৎসর রাখিয়া থাকে। দুই বৎসরের মান কেবল লম্বা হইয়া পড়ে এবং গত বৎসরের সমস্ত কাণ্ডটী শিকড় হইয়া মূলে পরিণত হইয়া যায়, কেবল নুতন বৎসরের বর্দ্ধিত কাণ্ডটীই মান হয় আর আহারের উপযুক্ত হইয়া থাকে।

শিকড় বিশিষ্ট মানের মূল ঝুনা নারিকেলের ন্যায় ভাজিয়া খাইতে বড় মধুর লাগে।

আমাদের দেশে মানকচু ভাজা, মানকচু ভাতে, মানকচুর ডাল্না আর কচু মাছ যে কি উপাদেয় তরকারি হয় তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরকে বুঝান কঠিন।

আমি একবার রাঢ় দেশে মান লইয়া গিয়াছিলাম, তাঁহারা মান সিদ্ধ ভারি পছন্দ করিয়াছিলেন, আর মান কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া গজার ন্যায় এক প্রকার মিষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এমন মানের ডাল্না বা কচু মাছ কিছুই রাঁধিতে পারিলেন না। মানের পোয়া পুতিবার সময় ৬।৭ হাত অন্তর ফাঁক করিয়া চারা পুতিতে হয় যেন পাতা বাড়িলে পাতায় পাতায় না লাগে।

অল্প গর্ত্ত করিয়া পোয়া বসাইতে হয় বেশী গর্ত্ত করিলে মানকাণ্ডে অধিক শিকড় জন্মিয়া থাকে। সার সমস্ত জমিতে না ছিটাইয়া কেবল মান কাণ্ডে স্তুপীকৃত করিয়া দিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। মানের জমি কোপাইবার সময় সাবধান হইয়া কোপাইতে হয়. কারণ শিকড় কাটা পড়িলে কাণ্ড বাড়িবার ব্যাঘাত হইয়া থাকে। কথায় আছে ইন্দুরের ধান, আর সজারুর মান। দিন দিন পল্লীগ্রাম শ্রীহীন হওয়ায় বন জঙ্গলের আদাড় বাড়িয়া উঠিতেছে আর

২

সজারু ও বংশবৃদ্ধি করিয়া বনের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। বড়ই দুঃখের বিষয় এমন যে মান কচুর চাষ তাহাও গ্রাম হইতে সজারুর উৎপাতে দিন দিন উঠিয়া যাইতেছে। সজারু কোন গতিকে মানের সন্ধান পাইলে কুমড়া, বেগুন, কাঁকুড়, আনারস পরিত্যাগ করিয়া মানকাণ্ডগুলি সর্ব্বাগ্রে কুরিয়া কুরিয়া শেষ করিয়া ফেলিবে।

এই ভয়ানক জানোয়ারের উৎপাত রক্ষা করিতে হইলে পাকা প্রাচীর দিয়া আবাদ রক্ষা করা ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই, কিন্তু তাহা কি এই দুঃখদীর্ণ ক্ষীণ পল্লী বাসীর পক্ষে কখনও সম্ভবপর? বর্ত্তমানে মানের চাষ করিয়া বন্যবরাহ ও সজারু তাড়াইবার জন্য কৃষাণকে প্রায় সারা রাতই জাগিয়া পাহারা দিতে হয়।

উদ্ভিদের বন্ধ্যা রোগ

শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত লিখিত

মনুষ্য প্রভৃতি প্রাণীগণের ন্যায় উদ্ভিদগণও জন্ম, মৃত্যু, যৌবন, জরা, বার্দ্ধক্য প্রভৃতি দশান্তর ভোগ করিয়া থাকে। প্রাণীগণের যেরূপ নানা কারণে সময়ে জ্বর বিকার ইত্যাদি বিবিধ রোগ হইয়া থাকে, উদ্ভিদগণেরও মধ্যে মধ্যে তদ্রূপ নানা প্রকার রোগ হইতে দেখা যায়। সুতরাং প্রাণীগণের ন্যায় উদ্ভিদ গণেরও রোগ সমূহের রীতিমত চিকিৎসা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। উদ্ভিদের সর্ব্বপ্রকার রোগের লক্ষণ নির্ব্বাচন কিম্বা সেই সমস্ত রোগের যথাযথ চিকিৎসা বিধান করা সাধারণের পক্ষে অতীব কঠিন। উদ্ভিদ চিকিৎসা সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত নানা গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে কয়েকটী রোগের প্রতিকার সম্বন্ধে লেখা হইল।

উদ্ভিদগণের প্রধান ব্যাধি বন্ধ্যাত্ব দোষ। অর্থাৎ এমন অনেক বৃক্ষ ও লতা দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহারা রীতিমত বর্দ্ধিত হইয়াও কখন ফল অথবা পুষ্পাদি প্রসব করে না। তাহাতে বপনকারীর অন্তঃকরণে অত্যন্ত কষ্ট হইয়া থাকে। সকলেই ফল পুষ্প প্রত্যাশায় বৃক্ষ লতাদির বীজ বপন করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদিগের উক্ত বৃক্ষে যদি সময়ে ফল না ফলিল,—তাহা হইলে তাহাদের দুঃখ বর্ণনাতীত। স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে স্বামীর যে কত কষ্ট তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু ঔষধাদি ব্যবহার দ্বারা বন্ধ্যা স্ত্রীও যেরূপ পুত্রবতী হইতে পারে সেইরূপ বন্ধ্যাত্ব দোষ সম্পন্ন উদ্ভিদগণকে উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা ফলবান করিতে পারা যায়।

বৃক্ষাদির বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হইবার প্রধান কারণ, (১ম) বৃক্ষাদির মূলে অধিক পরিমাণে সার প্রদত্ত হইলে, (২য়) উদ্ভিদের প্রকৃত্যানুরূপ ক্ষেত্র না হইলে, (৩য়)

বৃক্ষাদির মাইজে পোকা ধরিলে উপস্থিত হয়। যে স্থলে উদ্ভিদের প্রকৃতি অনুরূপ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তেজ কিম্বা বায়ু পাইতেছে না, সে স্থলে প্রথমতঃ সেই বাধা নিবারণ করা কর্ত্তব্য। পরে যদি উদ্ভিদের আকৃতি অবয়ব দ্বারা তাহাদিগের দুর্ব্বলতার লক্ষণ লক্ষিত হয়, তাহা হইলে উদ্ভিদগণের প্রকৃতি অনুযায়ী তাহাদিগের মূলদেশে আবশ্যক মত সার প্রদান করা বিধেয়।

যে স্থলে অতিরিক্ত তেজনিবন্ধন বৃক্ষগণ বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হয়, সে স্থলে গাছের মূল দেশের মৃত্তিকা হইতে এক হাত কি দেড় হাত পরিমাণ উর্দ্ধে বৃক্ষের মাইজ পর্য্যন্ত একটী ছিদ্র করিয়া দিলে বৃক্ষাদির বন্ধ্যাত্ব দোষ অপগত হইতে পারে। কিন্তু এরূপ সতর্কতার সহিত ছিদ্র করিবার কারণ এই যে মাইজটী যেন ভেদ হইয়া না যায়। এইরূপ ছিদ্র দিয়া অনবরত এক প্রকার রস নির্গত হইতে থাকে এবং ভবিষ্যতে তাহার বন্ধ্যাত্ব দোষ অপসৃত হইয়া সেই বৃক্ষে নিশ্চয়ই ফলোৎপাদন করা যাইবে।

বৃক্ষাদির মাইজে পোকা ধরিলে তাহাদিগের ফলোৎপাদক শক্তির হ্রাস হইয়া তাহারা ক্রমশঃ বন্ধ্যা হইয়া পড়ে, এবং পরিশেষে একেবারে নিস্তেজ হইয়া যায়। এরূপস্থলে যে স্থানে বৃক্ষাদির পোকা ধরে সেই স্থানে কার্ব্বলিকএসিড জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া কিম্বা কোলটার্ পিচকারী দ্বারা ঢালিয়া দিলে সমস্ত পোকা নষ্ট হইয়া মরিয়া যায়। অথবা মাৎগুড় অল্প পরিমাণে জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া বৃক্ষের মস্তকে এত পরিমাণে ঢালিয়া দিতে হয় যে সেই গুড় ক্রমে বৃক্ষের সমস্ত গাত্র বহিয়া মৃত্তিকায় আসিয়া পতিত হইবে। এইরূপ করিলে গুড়ের লোভে পিপীলিকা সকল বৃক্ষের উপরিভাগ পর্য্যন্ত উঠিতে থাকিবে এবং সেই সমস্ত পিপীলিকা বৃক্ষের অনিষ্টকারী সমস্ত পোকা খাইয়া ফেলিবে। গাছের পোকা মারিবার আর একটী সহজ উপায় পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, আমার একটী কলম আমগাছের কাণ্ডে (মৃত্তিকা হইতে ৩।৪ অঙ্গুলি উচ্চে) এক প্রকার পোকা লাগিয়া বৃক্ষটীর চতুঃপার্শ্বের ছাল খাইয়া ফেলিয়া ছিল, ভিতরে প্রবেশ করিয়া ছিল কিনা দেখা যায় নাই। তখন পোকা ধরার প্রথম অবস্থা, বৃক্ষটীকে তখনও নিস্তেজ করিতে পারে নাই, এরূপ অবস্থায় সমস্ত পোকা ধরা স্থানটী বেশ করিয়া চুণ দিয়া লেপিয়া দিলাম। ৩।৪ মাস পরে বৃষ্টির জলে চুণ গুলি ধুইয়া যাওয়ায় দেখা গেল সেই স্থানে নূতন ছাল জন্মিয়াছে এবং আজ কাল সেই গাছে ফল ধরিতেছে। আর পোকারও কোন উপদ্রব নাই।

বৃক্ষ লতাদির অধিক পরিমাণে শাখা পল্লব হওয়ার জন্য তাহাদিগের ফুল ফল না হইলে সে সকল জাতীয় বৃক্ষাদির মুকুলোদ্গমের সময়ের অব্যবহিত পরে কিম্বা পূর্ব্বে শাখা পল্লবাদি কর্ত্তন করিয়া দিতে হয় এবং তাহাদিগের মূল দেশের

মৃত্তিকা খনন করিয়া তাহাদের শিকড় কিছু ছাঁটিয়া বাহির করিয়া দিলেও চলিতে পারে। কোন বৃক্ষ কিম্বা লতা অকালে শুকাইয়া যাইবার উপক্রম হইলে তাহাদের মূল দেশ খনন করিয়া, পুরাতন মৃত্তিকা সমস্ত অপসারিত করত পুনরায় তাহাতে নূতন মৃত্তিকা ও সার প্রদান করা উচিত, তাহাহইলে সে বৃক্ষ কিম্বা লতা পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিবে এবং ফল প্রসব করিবে। কিন্তু বৃক্ষাদি একেবারে সম্পূর্ণ শুষ্ক হইয়া গেলে তাহার আর কোন রূপ চিকিৎসা অনাবশ্যক।

উই, লাল পিপীলিকা, ঝিঁ ঝিঁ পোকা, একপ্রকার লাল পোকা, শম্বুক, ভেক, পঙ্গপাল প্রভৃতির প্রতি কৃষিজীবিদের বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত।

উই—বৃক্ষের মূলে রক্ত কি পুরাতন লৌহ পুতিয়া দিলে অনেকটা নিবারিত হয়।

লাল পিপীলিকা—ক্ষেত্রের এক পার্শ্বে গুড় বা বাদামের তৈল রাখিলে সমস্ত পিপীলিকা তথায় জমা হয়, তখন তাহাদিগকে নির্ম্মূল করা যাইতে পারে।

ঝিঁঝিঁপোকা—বৃক্ষের মূলে গর্ত্ত করিয়া জল দিলে নিবারিত হয়।

লাল পোকা—গাছের গোড়ায় ছাই দিলে মরিয়া যায়।

এতদ্ভিন্ন অনেক ক্ষুদ্র জন্তু দ্বারা অনিষ্ট হয় এবং বৃক্ষলতাকে অফলন করিয়া ফেলে। তুঁতে, দোক্তা ও হরিদ্রার জল বৃক্ষে সেচন করিলে অনেক পোকার অনিষ্ট হইতে রক্ষা হয় এবং বৃক্ষগণ সুস্থ দেহে ফল প্রদানে মনোযোগী হইতে পারে।

সরকারী কৃষি সংবাদ।

উড়িষ্যায় তুলার আবাদ—ভাদ্র ১৩২০ সাল—

এ প্রদেশের মধ্যে রাঁচিতেই সমধিক পরিমাণে জলদি তুলার চাষ হয়। সাঁওতাল পরগণা, সম্বলপুর, অঙ্গুল এবং মানভূমেও তুলার আবাদ হইয়া থাকে। এতাবৎ আবহাওয়া তুলা চাষের অনুকূল। সাঁওতাল পরগণা, হাজারিবাগ, সিংভূমে তুলার বপন কার্য্য আজিও শেষ হয় নাই।

উত্তর বিহার, কটক, মানভূমে ও সিংভূমে নাবী তুলার চাষ অধিক। দারবঙ্গে জলপ্লাবনে নাবী তুলার কিছু ক্ষতি হইয়াছে, অন্যত্র মোটের উপর তুলার আবাদ ভালই বলিতে হইবে।

জলদি তুলার আবাদী জমির পরিমাণ ৫৮,২০৮ একর। নাবী তুলা অদ্যাবধি ২৫,৭৪৬ একর জমিতে বোনা হইয়াছে, বিগতবর্ষে এতদিনে ২৭,২৫১ একর মাত্র জমিতে আবাদ হইয়াছিল।

পঞ্জাবে ইক্ষু—

ব্রিটীস সাম্রাজ্যের ভিতর প্রায় শতকরা ১৬ ভাগ ইক্ষু পঞ্জাবে জন্মে। বর্ত্তমান বর্ষে ইক্ষু বসাইবার সময় আবহাওয়া অনুকূল ছিল, সেই জন্য অন্য বৎসর অপেক্ষা অধিক জমিতে আকের আবাদ হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষের আবাদী জমির পরিমাণ ৩৮১,০৬৫ একর।

আসামে তুলার আবাদ—১৯১৩-১৪—

প্রায় ৩৪,৭০০ একর পরিমাণ জমিতে তুলার আবাদ হইয়াছে। আবাদের বর্ত্তমান অবস্থা বেশ ভাল বোধ হইতেছে।

আসামে হৈমন্তিক ধান্য—১৯১৩-১৪—

গত বৎসর অপেক্ষা বর্ত্তমান বর্ষে কিছু কম জমিতে হৈমন্তিক ধানের আবাদ হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষের জমির ৩,১০১,৫০০ একর, বিগত বর্ষের জমির পরিমাণ ৩,২৫৯, ৬০০ একর। শিবসাগর জেলা ব্যতীত অন্যত্র ধান রোপণের সময় বৃষ্টির অভাব হেতু সকল জমিতে আবাদ হইয়া উঠে নাই।

বিগত বর্ষে ষোল আনার উপর ফসল হইয়াছিল, কিন্তু এ বৎসর বার আনা ফসলও হইবে না। একর প্রতি ৯ হন্দর ধান জন্মিয়াছে ধরিয়া লইলে, বর্ত্তমান বর্ষে ২০,২৯৭,৭০০ হন্দর ধান পাওয়া যাইবে। বিগত বর্ষে আসামে ৩২,৫৬৩,৪০০ হন্দর ধান উৎপন্ন হইয়াছিল। এক হন্দর ধানের ওজন প্রায় এক মণ চৌদ্দ সের।

বিহার ও উড়িষ্যায় তৈলশস্য—তিল—

সাহাবাদ, সারণ, মজঃফরপুর, কটক, বালেশ্বর, পুরী, সম্বলপুর এবং মানভূম এই আটটি জেলায় তিলের আবাদ হয়। বর্ত্তমান বর্ষে তিলের জমির পরিমাণ ১২,৩০০ একর, বিগতবর্ষে তিলের জমির পরিমাণ ১২১০০ একর। প্রায় ষোল আনা ফসল ধরিলে ১,৯০০ টন তিল উৎপন্ন হইয়াছে।

পঞ্জাবে তিলের আবাদ—ভাদ্র ১৩২০ সাল—

শ্রাবণের শেষ পর্য্যন্ত ১৩৯,৮২২ একর পরিমাণ জমিতে তিল বুনানি হইয়াছে। বিগত বর্ষে এমন দিনে ১৫৬,৮১৩ জমিতে তিলের আবাদ শেষ হইয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষে এতদঞ্চলে

তিলের আবাদ বড় নাবী হইয়াছে, ভাদ্রের শেষ পর্য্যন্ত সকল জমিতে বুনানি শেষ হয় নাই।

উচ্চ জমির অম্লাক্তত।—

অনেকের বিশ্বাস যে নিচু জলা জমিতে নানা প্রকার উদ্ভিজ্জ পদার্থ পচিয়া জমি সহজেই অম্লাক্ত হইয়া উঠে এবং শস্যের হানি হয়, কিন্তু উচ্চ জমি এরূপ অম্লাক্ত হওয়া সম্ভব নহে। বর্ত্তমান বর্ষে ঢাকাতে ও জোড়হাটে এই বিষয়ের তদন্ত করা হইয়াছিল, তাহাতে প্রকাশ পায় যে ঢাকার পুরাতন চরের শক্ত লাল মাটির ও জোড়হাটের পুরাতন বালুচরের মাটিরও অম্লাক্ত দোষ বিলক্ষণ আছে। এই প্রকার উঁচু জমির যে অম্লাক্ত দোষ থাকিতে পারে, তাহা এ পর্য্যন্ত কেহ বিশ্বাস করিত না—বা তাহার জন্য তদন্তও হয় নাই। বঙ্গীয় রসায়ন তত্ত্ববিদ্ মিঃ মেগিট্ বলেন যে, তাঁহার বিশ্বাস—উত্তর-পূর্ব্ব ভারতের অধিকাংশ উচ্চ জমির এই দোষ আছে।

খুব সম্ভব এই যে, সকল জমি নিকটস্থ কোন পর্ব্বত মৃত্তিকায় সংগঠিত হইয়াছে। সেই পর্ব্বত মৃত্তিকায় চুণ কিম্বা পটাসাদি আল্কালাইন বা ক্ষার পদার্থের অভাব ছিল, সেই জন্য এই মাটিগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক অম্লাক্ত। কিম্বা পূর্ব্বে এই সকল মাটিতে চুণের ভাগ যত ছিল এখন জলে ধৌত হইয়া বা অন্য কারণে চুণের ভাগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। জমিতে বারম্বার শস্য উৎপাদন করিলেও পটাসাদি ক্ষার ও লতাগুল্মাদির দ্বারা আহৃত হইয়া কমিয়া যায়। যে কোন কারণে ঐ সকল জমি এখনও অধিক অম্লাক্ত দেখা যাইতেছে।

অধিকাংশ সময় দেখা যায় যে, জমিতে অম্লের ভাগ অধিক হইলে ফস্ফরিক অম্ল যাহা শস্যাদির বিশেষ খাদ্য তাহা উন্মুক্ত হইয়া পড়ে এবং জলের সহিত তাহা জমি হইতে বাহির হইয়া যায়—সুতরাং সে সকল জমিতে শস্য সুচারুরূপ জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না।

অধিকাংশ শস্য মাটিতে চুণ ও ক্ষারাদির সাম্যভাব পছন্দ করে, কিম্বা ক্ষারের ভাগ ঈষৎ অধিক হইলেও ক্ষতি হয় না। যদিও ধান্যাদির মত কোন শস্য অম্লাক্ত জমিতে জন্মিতে ও শস্য উৎপাদন করিতে দেখা যায়, কিন্তু সেই জন্য ইহা মনে করা উচিত নয় যে, তাহারা অম্লাক্ততা পছন্দ করে; জমির অম্লাক্ততা নষ্ট হইলে সেই সকল শস্য অধিকতর শস্য উৎপাদন করিতে পারে। কোন কোন শস্য এই অম্লাক্ততা বিদ্যমান থাকিলে অচিরে মরিয়া যায়। রসায়ন তত্ত্ববিদ্ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, জোড়হাটে কোন ক্ষেত্রে আউশ ধান মন্দ হইল না, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে জৈ বপন করিয়া দেখা গেল যে, জৈয়ের গাছ বাহির হইয়া কিছু বড় হইল তার পর মারা গেল। জৈ বুনিবার পূর্ব্বে জমিতে গোবর সার ছড়ান হইয়াছিল, সেই জন্য মনে হইল যে গোবর সার দিবার পর জমিতে রসাভাব হেতু জৈ মারা গেল। তখনও জমির অম্লাক্ততার কথা মনে উদয় হয় নাই। তদন্তে স্থির হইল যে জমির উপরের মাটির প্রাকৃতিক অবস্থা অনুকূল এবং দুই ইঞ্চ নিচের মাটি পর্য্যন্ত জমিতে বেশ রস আছে। তার পর ঐ জমিতে মটিকলাই বপন করা হইল তাহা একরকম মন্দ হইল না। সন্দেহ নিরাকরণ জন্য মাটির রাসায়নিক পরীক্ষা হইল এবং তাহাতে প্রতিপন্ন হইল যে মাটিতে চুণ ও ক্ষারভাগ কম এবং অধিক অম্লাক্ত।

সকলেই অবগত আছেন যে চুণের দ্বারা কি রূপে জমির উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে। চুণ জমির অম্লাক্ততা নষ্ট করে, চুণ জমির প্রাকৃতিক গঠনের পরিবর্ত্তন সাধন করে, চুণ জমির সার সমূহের এরূপ একটু পরিবর্ত্তন করিয়া দেয় যে তাহাতে যে শস্য জন্মে তাহাদের চেহারা ভাল দেখায়, এবং চুণ নিজেই সামান্য মাত্রায় শস্যাদির খাদ্য।

নাইট্রোজেন বৃক্ষাদির একটি সর্ব্বপ্রধান উপাদান। নাইট্রোজেন নাইট্রেট্ রূপ ক্ষারে পরিণত না হইলে বৃক্ষাদি তাহা গ্রহণ করিতে পারে না, চাষিত্বে অম্লের ভাগ অধিক নাইট্রেট্ একেবারে হয় না এমন নহে কিন্তু সম্পূর্ণ মাত্রায় নাইট্রি-ফিকেসনের বিঘ্ন ঘটে সেই কারণে বৃক্ষ লতাদির আহারের ব্যাঘাত ঘটে।

যে সকল জমি অম্লাক্ত দোষে দুষ্ট সে গুলিতে বারম্বার চাষ দিয়া হাওয়া রৌদ্র লাগাইয়া সবুজ সার প্রয়োগ করিয়া শোধরাইয়া লওয়া যাইতে পারে কিন্তু অধিক সময় সাপেক্ষ। চূণ দ্বারা এই কার্য্য অতি সহজে এবং অল্প ব্যয়ে সাধিত হয়।

চূণ জমিতে সামান্য মাত্রায় ছড়ান উচিত, অধিক চূণ ছড়াইলে ক্ষতি হয়। জমির অধিক নিচে পর্য্যন্ত চূণ প্রয়োগ করা অবিধেয় তাহাতে লাভ নাই বরং ক্ষতির সম্ভাবনা আছে।

যে যৎকিঞ্চিৎ চূণ জমির উপর স্তরে ছড়ান যায় তাই জল দ্বারা নিম্ন স্তরে নীত হইয়া বাইকার্ব্বনেট অব লাইম রূপে বৃক্ষাদির বিশেষ উপকারে আসে। চূণ ছড়াইয়া জমি চষিয়া চূণ মাটির সহিত মিশাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। উপযুক্ত মাত্রায় চূণ একটু হিসাব করিয়া ছড়াইতে হয়। কম বা বেশী হইলে ক্ষতি হয়।



কার্ত্তিক, ১৩২০ সাল।

ভারতে ফলের বাগান রচনা।

ফলের বাগানের স্থান ও জমি নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেলে একটা বড় কাজ মিটিয়া গেল। গোড়ায় কোন গলদ হইলে অনেক পরিশ্রম ও অর্থ বৃথা নষ্ট হইয়া যায়। অতঃপর নির্দ্দিষ্ট জমির কারকিৎ মেরামতে মনোযোগী হইতে হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জলবসা জমিতে ফলের বাগান হয় না, জমির জল নিকাশের পথ গুলি আগেই ঠিক করিয়া লইতে হইবে। পয়োনালা না থাকিলে নূতন পয়োনালা করিয়া লইতে হইবে।

জমিটি সমতল হওয়া আবশ্যক বটে কিন্তু এক দিকে ক্রমনিম্ন বা ঢালু হইবে। অধিক ঢালু হইলে জমির উপর দিয়া জল প্রবাহ চলিয়া গেলে জমির অনেক সার ধৌত হইয়া যায়। জমিটিকে খণ্ডে খণ্ডে ভাগ করিয়া তাহার চারিদিকে আইল বাঁধিয়া রাখিলে জমিতে ইচ্ছামত জল রক্ষা বা জল বাহির করিয়া দিবার সুবিধা হয়। বাগানের চারিদিকে কিছু বৃহদায়তন খাত বা খানা এবং বাগানের মধ্যস্থ ছোট ছোট খণ্ড গুলির চারি পাশে ক্ষুদ্রায়তন খাত বা খানা থাকিলে ভাল হয়। প্রতি বর্ষাতেই জমির ধোয়াট নামিয়া খানায় সঞ্চিত হয়; সুতরাং খানার পলি মাটি খুব সারবান। শীতের শেষে খানার জল শুকাইয়া গেলে ৯ ইঞ্চি পরিমাণ পলিমাটি চাঁচিয়া তুলিয়া লইয়া বাগানে ছড়াইতে পারিলে বাগানের বৃক্ষগুলির বিশেষ উপকার সাধিত হয়। খানা খাত না থাকিলে জলের স্রোতের সহিত বাগানের সারবান মাটি ইতস্ততঃ বহুদূরে নীত হয়। তাহাতে বাগানের মালিকের বিশেষ লোকসান হইল বুঝিতে হইবে।

বৃক্ষাদিতে জল সেচনের জন্য বাগানের মধ্যে স্থানে স্থানে পুষ্করিণী, ঝিল, বাঁধ, কূপ বা অন্য জলাশয় থাকা আবশ্যক। জলাশয়ের চারি পাহাড় বা পাড় হইতে ক্ষেত্র

গুলি ক্রমশঃ নিচু করিয়া রচনা করিতে হয়, কেন না তথা হইতে জল তুলিয়া নালা সাহায্যে ক্ষেত্রে যথা তথা লইয়া যাওয়া যায়। এই সমস্ত জলাশয় হইতে জল তুলিবার জন্য শিউনি, বালতি বা ডোঙ্গা কল থাকিলে অনেক পরিশ্রম বাঁচিয়া যায়। কলসী দ্বারা হাতে জল তুলিয়া সামান্য বাগানের কার্য্য চলিতে পারে কিন্তু বৃহৎ বাগানের জন্য জল তুলিবার কৌশল আবশ্যক। এমন কি চেনপাম্প কিম্বা চাপ পম্প বসান আবশ্যক হইয়া পড়ে। সহজে সময়মত জল যোগান বা কম খরচে জল সেচনের ব্যবস্থা বাগানের অন্যতম প্রধান কার্য্য। যথোপযুক্ত সার প্রয়োগ করিলেও জলাভাবে সারের কার্য্য হয় না বা সার প্রদানের ফল পাওয়া যায় না। জল চালাইবার ও জল নিকাশের একই পয়োনালী হইলে চলিতে পারে, এক নালাদ্বারাই উভয় কার্য্য চলিতে পারে। এস্থলে ইহাও বলিয়া রাখি যে সকল জলাধার হইতে ক্ষেতে জল সেচনের কার্য্য নির্ব্বাহ হয় তাহাতে সঞ্চিত পাঁক তুলিয়া ক্ষেতে ছড়াইতে পারিলে জমিতে সার দেওয়ার কার্য্য হয়।

এখন বাগানের মাটি কি প্রকার হইবে বিচার করিয়া দেখা উচিত। এ বিষয়ে মতের অনৈক্য খুব। যাহা এক প্রকার ফলের পক্ষে ভাল মাটি, অন্য ফলের পক্ষে তাহা হয়ত অচল। সেই একটি বৃহৎ বাগানে হয়ত দুই তিন বা ততোধিক প্রকার মাটি মিলিতে পারে, যে মাটিতে যে ফল ভাল রকম জন্মিবে তাহা নির্ব্বাচন করিয়া বসানই উদ্যান পালকের কর্ম্ম পটুতার পরিচায়ক।

কিন্তু মাটিতে নানা রকম সার ও অন্য মাটি মিশাইয়া মাটির অদল বদল করা যায়, এই কারণে সুনিপুণ উদ্যান পালক এক রকম মোটামুটি কাজ চালাইবার মত মাটি পাইলেই আপনাকে ধন্য মনে করে। যে মাটির প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক অবস্থা সহজে বদলান যায় সমস্ত উদ্যানস্বামীর সেই ভাল মাটি; দোআঁস মাটিই এই রকমের মাটি। দোআঁস মাটি লইয়া নানা প্রকার পরিবর্ত্তন সাধন করা যায়। সাধারণ ফলের বাগানের পক্ষে মাঝারি রকমের দোআঁস মাটির আবশ্যক। ১ কিম্বা ১।৷০ ফুট মাটির উপর শস্য ক্ষেত্র রচনা করা যাইতে পারে, কিন্তু ফলের বাগান বসাইতে ইহাতে জমির উপরি ভাগ হইতে অন্ততঃ ৩ কিম্বা ৪ ফিট গভীর দোআঁস মাটি না থাকিলে তাহাতে ফলের গাছ বসান চলিবে না। দোআঁস মাটির যে কি উপাদান আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। মাটির অবস্থা বুঝিয়া তাহাতে চাষ কারকিৎ করিয়া ও সার দিয়া জমি মনের মত করিয়া লইতে হয়। মূল কথা এই ফলের বাগানের মাটি সরস হইবে, অধিক জল পড়িলে মাটিতে শুষিয়া নিম্নস্তরে চলিয়া যাইবে, এঁটেল মাটির ক্ষেতের মত জল বসিয়া কাদা হইবে না এবং বৃষ্টিপাত বা জল সেচনের পর শিঘ্র 'যো' হইয়া লাঙ্গল মৈ দিবার উপযুক্ত হইবে।

সাধারণ জমির এই রকম ঠিক করিয়া লইয়া তারপর তাহাতে ফলের গাছ বসান কর্ত্তব্য।

কাহার মতে ফলের বাগানের জমিতে ঘাস জন্মাইতে দিলে জমিটি ঠাণ্ডা থাকে। এই প্রকার ঘাস মাঠের মাঝে মাঝে চৌকা কাটিয়া ফলের গাছ বসাইতে হয়। ইহাতে পশু খাদ্য ঘাস যথেষ্ট পরিমাণে পাইবার উপায় হয়, ফলের গাছ গুলিও ইতিমধ্যে তৈয়ারি হইয়া উঠে। কিন্তু ইহার এক বিপদ এই যে, যদি দৈবাৎ উদ্যান রক্ষক একটু অমনোযোগী বা অসাবধান হইয়া পড়ে তবে গাছের গোড়া পর্য্যন্ত ঘাস জন্মিয়া গাছ গুলিকে নিস্তেজ করিয়া ফেলে; ঘাস মাঠের মধ্যে এক একটি বড় বড় চৌকা রচনা করিয়া ছোট বড় হিসাবে দশ, পনেরো বা বিশটা গাছ এক সঙ্গে স্তবকে স্তবকে রোপণ করিলে এবং তাহার তলা গুলি কোদাল, বিদে প্রভৃতির দ্বারা পরিষ্কার করিয়া রাখিলে গাছের গোড়ায় ঘাস জন্মিবার আশঙ্কা দূর হয় বটে কিন্তু এই প্রকারে ব্যবসায়ের জন্য উদ্যান রচনা করা বড়ই ব্যয় সাধ্য। বড় ফলের বাগানে লাঙ্গল মৈ দ্বারা কারকিৎ মেরামতের কার্য্য চলা চাই, জল চালাইবার জন্য সরাসর পয়োনালা থাকা চাই নতুবা ব্যয় বাহুল্য হয়।

অতএব ঘাস মাঠ চষিয়া জমি পরিষ্কার লইয়া বাগান বসান কর্ত্তব্য। ঘাস চাপগুলি উলটাইয়া ঘাস গুলি চাপা পড়ে এবং শিকড় গুলি উপরে ভাসিয়া উঠে ও রৌদ্রে শুকাইয়া যায়। ঘাসগুলি পচিয়া জমির সারের কার্য্য করে। জমির ঘাস নষ্ট করিতে গ্রীষ্ম ও শীতকালই ভাল। শুকার সময় জমিট বার বার লাঙ্গল দ্বারা চষিয়া মৈ দ্বারা ঢিল ডেলা ভাঙ্গিয়া দিতে পারিলে অচিরে ঘাস মরিয়া যায়। এরূপে যে জমি তৈয়ারি হয় তাহাতে উদ্যান পালক গাছ বসাইয়া সুখী বোধকরে, কেননা জমিট ঘাসে ও ঘাসের শুক্না শিকড় প্রভৃতি উদ্ভিদ সারে সারবান হইয়া থাকে।

বাগানের ঘাস বা আগাছা কুগাছা মারিবার জন্য জমিতে লাঙ্গল দিলেও তাহাতে বাগানের মাটি তৈয়ারি হইয়া গেল না বুঝিতে হইবে, কারণ এ দেশের লাঙ্গল দ্বারা বড় বেশী ৫ কিম্বা ৬ ইঞ্চ মাটি খোঁড়া হয়। ভাল লাঙ্গল ব্যবহার করিলে বা দুই বা ততোধিক বার চাষ দিলে না হয় ৯·১০ ইঞ্চ গভীর চাষ হইল তাহার বেশী আর হয় না, কিন্তু বাগানের জমি ২ ফিট অথবা ৩ ফিট গভীর ভাবে খনন করা কর্ত্তব্য; গুচ্ছ, মূল, তৃণ, শস্যাদি জন্য নাতি গভীর চাষ যথেষ্ট কিন্তু মূলা, শালগম, ওল, মানকচু প্রভৃতির জন্য গভীর কর্ষণ আবশ্যক। ফলের শিকড় মাটির বহু নিম্ন পর্য্যন্ত চলিয়া যায় সুতরাং ফলের গাছ বসাইবার সময় মাটি যত অধিক খোঁড়া হয় ততই ফলদায়ক হয়। সুতরাং ফলের বাগানে খোঁড়ার জন্য কোদালই প্রশস্ত যন্ত্র। বিলাতে বাষ্পীয় লাঙ্গলে গভীর খনন কার্য্য সাধিত হয়। বড় জমি

না হইলে ঐ লাঙ্গল চালাইয়া খরচে পোষাইয়া উঠে না। বাগানের মাটি কোপাইবার সময় কিন্তু সতর্ক হওয়া উচিত যেন ক্ষেতের নিম্নস্তরের মাটি উপরে উঠিয়া না পড়ে। কারণ নিম্ন স্তরের মাটি প্রায়ই কম সারবান হয় সুতরাং তদ্বারা উপরের মাটি চাপা দেওয়া অবিধেয়। কিন্তু নিম্ন স্তরের মাটি গাছের শিকড় প্রবেশের সাহায্যের জন্য আল্‌গা করিতে হইবে। জমি গভীর খোদিত হইলেও এক বা দুইবার লাঙ্গল মৈ দিবার আবশ্যক হয় তা না হইলে জমি সম্পূর্ণ সমতল হয় না বা কুগাছাদি ঝাড়িয়া বাছিয়া পরিষ্কার করিবার সুবিধা হয় না। এরূপ সুপরিষ্কৃত না হইলে তাহাতে যে গাছ বসান চলে না এমন নহে, কিন্তু প্রথমেই একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া জমি পরিষ্কার করিয়া লইলে পরে অনেক পরিশ্রম বাঁচিয়া যায়। প্রথমে জমি পরিষ্কার করা যত সহজ, গাছ বসাইয়া পরিষ্কার করিতে গেলে তত সহজ হয় না। বড় ফলের গাছ যেমন আম, নিচু, ন্যাসপাতি বা আপেল কিম্বা কলা, পেঁপে গাছ বসাইয়া পরে বাগান পরিষ্কার করা যদি বা চলে কিন্তু টেঁপারি, শসা যে গুলিকেও ফলের মধ্যে ধরা যায় তাহাদের ক্ষেত আগে পরিষ্কার ও প্রস্তুত করা আবশ্যক। এ গুলি ফলের মধ্যে গণ্য হইলে ও আমরা ইহাদের ক্ষেত্রজ ফসল বলিয়া ফলের বাগান হইতে বাদ দিতে পারি।

বাগানের জমি পরিষ্কার করিবার আর একটি সহজ উপায় আছে। যদি সময় পাওয়া যায় তাহা হইলে বর্ষারম্ভে সামান্য চাষ দিয়া সমুদয় ক্ষেতে যত দূর সম্ভব ধঞ্চে বা পাট বুনিয়া দাও। জমিতে যে আগাছার বীজ পড়িয়া আছে বৃষ্টির জল পাইলেই তাহারা অঙ্কুরিত হইয়া উঠিবে। সঙ্গে সঙ্গে ধঞ্চে বা পাটও জন্মিবে। ধঞ্চে বা পাটের চাপে তাহারা ফল পুষ্প প্রসব না করিয়া মরিয়া যাইবে। ইহাতে বাগানটি ভবিষ্যত জঙ্গলের হাত হইতে অনেকাংশে পরিত্রাণ পাইবে। বাগানের ঘাস মারিবার এক মাত্র উপায় লাঙ্গল মৈ দেওয়া কিন্তু সব ঘাস তাহাতে মরে না। জমি আলগা পাইলে মুথার আরোও বরং বৃদ্ধি হয়। মুথার মূল গুলি লাঙ্গল দ্বারা ভাসাইয়া তুলিয়া নিড়াইয়া, বাছিয়া না ফেলিলে মুথা মরে না। ইহাতে কিন্তু খরচ অধিক। মুথার ক্ষেত চষিয়া ধঞ্চে কিম্বা পাট বুনিলে মুথা নিশ্চয় মরিবে এবং ইহাতে নিড়াইবার ব্যয় বাঁচিয়া যাইবে।

বাগানের ধার ভিতর পরিষ্কার না রাখিলে বাগান পরিষ্কার রাখা যায় না একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মনে কর তুমি তোমার বাগানের জমি বেশ পরিষ্কার ঘাস ও বন শূন্য করিলে কিন্তু তোমার বাগানের ধারে উলু বা কেশে ঘাস রহিয়া গেল, যদি তুমি সেগুলি অগ্রাহ্য করিয়া তুলিয়া না ফেল তাহাহইলে পর বৎসর দেখিবে যে তোমার বাগান ময় উলু বা কেশে গজাইয়া উঠিয়াছে। যাকে সামান্য শত্রু বোধে অগ্রাহ্য করিয়াছিলে সে তোমার বিষম শত্রুতা করিতে বসিয়াছে।

অনেকে ভুল করিয়া বন এরণ্ডের ডাল বসাইয়া বাগানের বেড়া দেয়। তাহাতে বেড়া অনায়াসে এক বর্ষায় তৈয়ারি হইয়া উঠে, কিন্তু তাহারা যে একটা বিষম শত্রুকে আনিয়া নিকটে স্থাপন করিতেছে তাহা তখন বুঝে না। যখন এই এরণ্ডের ফল পাকিয়া ফাটিতে থাকে এবং ইতস্ততঃ ছুটীতে থাকে তখন জানিবে যে পরবর্ত্তী বর্ষায় তোমার বাগান বন এরণ্ডে ছাইয়া যাইবে। যদি ইহার বেড়াই করিতে হয় তবে ইহার ফল হইতে দিতে নাই। ক্রমাগত ডাল ছাঁটিয়া বেড়া ঠিক করিয়া রাখিতে হয়।

বাগানের বেড়া (বিশেষতঃ আমরা যে রকম বড় বাগানের কথা বলিতেছি।) এক বড় সমস্যার ব্যাপার। কাঁটা তারের বা তারের জালের বেড়া দিলে বেশ নিরুদ্বেগ হওয়া যায় বটে কিন্তু ২ কিম্বা ৫ শত একর তারের বেড়া দেওয়া কি কম পয়সার খেলা। বাগান বসাইবার বেড়াতে যদি এত অধিক খরচ হয় তাহাহইলে সকল করা কঠিন হইয়া উঠিবে। বাগানের চারি পাশে পগার করা মন্দ নহে কিন্তু পগার বা খাত বড় না হইলে শেয়াল, শুকর প্রভৃতি জন্তু কিম্বা গো, মহিষ বা ছাগাদির উপদ্রব নিবারিত হইবে না। পশ্চিমাঞ্চলে অনেক স্থানে শশকাদি জন্তু চারাবাগানে বড় উপদ্রব করে, তাহাদের আটকান জালের বেড়া ভিন্ন অন্য রকমে হয় না। ব্যবসায়ের জন্য যেরূপ বিস্তৃত বাগানের কথা বলিতেছি তাহা সদ্য বৎসরেই বেড়া দ্বারা ঘিরিয়া ফেলা অসম্ভব। ক্রমশঃ ঘিরিবার চেষ্টা করিতে হইবে, এবং ঘিরিবার নানা উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। কোন দিকে পগার তুলিয়া আটক করিতে হইবে, কোন দিকে কাঁটা বেড়ার বীজ বা ডাল বসাইয়া ঘিরিতে হইবে। কোন দিকে দুই এক বৎসর স্থায়ী বাঁশের বেড়া দিয়া তাহার কোলে সরবতী করঞ্চা প্রভৃতি গাছে স্থায়ী বেড়া করিয়া লইতে হইবে। চিতা এরেলিয়া, ডুরয়সা প্রভৃতি গাছের ডাল বসাইলে অতি শীঘ্র বাড়ে কোথা বা এই সকলের বেড়া দিতে হইবে। আর বাগানের মাঝে মাঝে যে খানে শসা, আখ, মাট কড়াইয়ের চাষ হইবে, সেই সকল অংশ ঘিরিবার জন্য তারের জালের ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে হইবে। যখন যেখানে আবশ্যক তারের জাল দিয়া ঘিরিয়া লওয়া হইবে। ফলের বাগান বসাইয়া গাছ গুলি যতদিন বড় না হয় তত দিন তাহার মধ্যে নানা প্রকারের আবাদ করা চলিতে পারে এবং বৃহৎ বাগানে এরকম স্থান চিরদিন মেলা অসম্ভব নহে।

ফলের বাগান বসাইতে হইলে প্রথমেই দেখা কর্ত্তব্য যে জমিতে উপযুক্ত মাত্রায় চুণ আছে কিনা। চুণ গাছের একটি প্রধান সার, তদ্ব্যতীত চুণ অন্য সার গুলিকে গলাইয়া গাছের গ্রহণোপযোগী করিয়া দেয়, চুণ জমির প্রাকৃতিক কঠিন গঠন বদলাইয়া মাটি নরম করিয়া দেয়, চুণ জমির আগাছা কুগাছা নষ্ট করিবার সহায়তা

করে। সুতরাং প্রথমেই দেখা উচিত যে জমিতে উপযুক্ত মাত্রায় চূণ আছে কিনা। জমির নিচের স্তরে অনেক চূণ থাকিলে উপরের স্তরে চূণের অভাব দেখা যায়। উপরের স্তরে চূণ না থাকিলে চারা গাছ গুলি শীঘ্র বর্দ্ধিত হইবার সুবিধা পায় না। কিঞ্চিৎ মাটি লইয়া তাহাতে মিউরিয়েটিক অম্ল ঢালিয়া দিলে যদি মাটি ফুটীয়া উঠে তবে জানিবে যে সে মাটিতে চূণ আছে। চূণ কম থাকিলে বা না থাকিলে জমিতে চূণ প্রদানের ব্যবস্থা আগে করিয়া তবে কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে, চূণ একবার আছে জানিলেই হয় না, চূণের মাত্রা কমিয়া যাওয়া সম্ভব, সুতরাং চূণ উপযুক্ত মাত্রায় বিদ্যমান আছে কিনা দেখিতে হইলে মাঝে মাঝে মাটি পরীক্ষা আবশ্যক। এই প্রকারে সকল দিক গুছাইয়া লইয়া তবে ফলের গাছ বসাইবার উদ্যোগ করিবে। কি গাছ এবং কিরূপ গাছ বসাইতে হইবে আমরা বারান্তরে আলোচনা করিব।

খাদ্যতত্ত্ব—কৃষি-রসায়ন তত্ত্ববিদ্ গবর্ণমেণ্ট কৃষি বিভাগের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত মূল্য ১৲, কাপড় বাঁধাই ১।০, পুস্তক খানি ছাপা ভাল, ইহা ১২৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

গ্রন্থকর্ত্তা যে কৃষি-রসায়ন তত্ত্বে সুপণ্ডিত তাঁহার প্রণীত কৃষি-রসায়ন পুস্তকে তাহার পরিচয় দিয়াছেন, এ পুস্তকেও তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অধিকন্তু কৃষি পরিদর্শকের কার্য্যে নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় চাউল, ধান, গম, ভুট্টা, দাইল, কলাই সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহার ফলাফল এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই পুস্তক খানি পাঠ করিলে ইহা একজন বহুদর্শী লোকের লেখা বলিয়া সহজেই অনুমান করা যায়। গ্রন্থকার ভারতবর্ষে প্রচলিত সমুদয় খাদ্যবস্তু বিশ্লেষণ দ্বারা যথা সম্ভব সঙ্কলিত করিয়াছেন ও খাদ্যবস্তুর গুণাগুণ বিচার করিয়া সুখাদ্য, কুখাদ্য নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন ভদ্রলোক-মাত্রেই ভাল ছাঁটা মাজা সরু চাউলের অন্ন আহারে রত। কিন্তু বিজ্ঞান বলিতেছে অধিক ছাঁটা সরু চাউল মূল্যে অধিক হইলেও ইহা মোটা আছাঁটা চাউল অপেক্ষা সারবান নহে কারণ ছাঁটা চাউলের অধিকাংশ তৈলাক্ত পদার্থ ও লবণ এবং কতক পরিমাণ নাইট্রোজেন যুক্ত পদার্থ কুঁড়ার সহিত চলিয়া যায়। খাদ্য সম্বন্ধে এইরূপ অনেক রহস্য নিবারণ বাবু উদ্‌ঘাটন করিতে যথা শক্তি প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহাতে খাদ্যবস্তু ভাত, দাইল, মাছ, মাংস, তরকারী রন্ধন, পলান্ন, মিষ্ঠান্ন, চাটনি, মোরব্বা প্রভৃতি প্রস্তুত প্রণালী দেওয়া আছে। পাক-প্রণালীর পুস্তক বাজারে বিরল নহে তবে ইহার বিশেষত্ব এই যে গ্রন্থকার বিশেষ যত্ন সহকারে বিজ্ঞানানুমোদিত রন্ধনের সুপ্রণালী দেখাইয়া দিয়াছেন, কিরূপ রন্ধনে খাদ্য সুপথ্য, সুখাদ্য হয়, কিসে লঘু

পথ্য হয়, কিরূপ সামান্য ত্রুটিতে গুরুপাক হয় তাহার যথাসাধ্য বিচারের ত্রুটি করেন নাই। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকে অজ্ঞানতা বশতঃ আলোচাউলের পরিবর্ত্তে সিদ্ধ চাউল খায়, ভাতের ফেন ফেলিয়া দেয়, মাংস, ডিম্ব অতি সিদ্ধ করিয়া গুরুপাক করিয়া তোলে, অসিদ্ধ দাইল আহার করিয়া দাইলের বলকারক গুণ হইতে বঞ্চিত হয়।

তাঁহার পুস্তক খানিতে খাদ্য সম্বন্ধে বস্তুতঃ অনেক খবর পাওয়া যায়। পুস্তক খানি বেশ সুপদ্ধতিতে বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে লিখিত। তিনি দেখাইয়াছেন আমাদের শরীর রক্ষার উপাদান কি--আমরা চাই শ্বেতসার, শর্করা, তৈল, প্রোটিদ্ এবং লবণ। ইহার মধ্যে প্রথম তিনটি দাহ্গুণ বিশিষ্ট এবং শরীরের উত্তাপ বর্দ্ধক, শেষোক্ত দুইটি মেদকারী খাদ্যের নাইট্রোজেন-যুক্ত ভাগকে প্রোটিদ্ বলে। একজন পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক প্রত্যহ শ্বেতসার ও শর্করা ৪০ তোলা, ঘৃত ও তৈল ৮ প্রোটিদ্ ১০ তোলার আবশ্যক। চাউল, দাইল, মৎস্য, মাংস, ঘৃত, তৈল হইতে আমাদিগকে ইহা সংগ্রহ করিতে হয়। খাদ্যবস্তুর সহিত লবণ ব্যবহারও আবশ্যক। প্রত্যেক লোকের দৈনিক রসদের জন্য কি চাউল, দাইল প্রভৃতি কি পরিমাণে আবশ্যক তাহা বিশেষরূপ দেখাইয়া দিয়াছেন। খাদ্যদ্রব্য কি প্রকারে পরিপাক হয় তাহাও চিত্র সন্নিবেশ করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন কারণ পরিপাক রহস্য না জানিলে মানুষকে খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে অধিকতর সতর্ক হইতে পারে না; শেষ অধ্যায়ে আয়ুর্ব্বেদ মতে খাদ্য বস্তুর একটি তালিকা ও উক্তমতে ব্যবস্থা সন্নিবেশিত করিয়া পুস্তক খানির সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি সাধন করিতে প্রযত্ন করিয়াছেন। ফলতঃ এই অল্প আয়ত্তের মধ্যে মোটামুটি গৃহস্থের খাদ্য সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা উচিত বা শিখিবার আছে তাহা সকলই জানা যায় ও শিখা যায়।

খাদ্য সম্বন্ধে কৃষকে মাঝে মাঝে আলোচনা করা হয়—এই আলোচনাকারী গণের মধ্যে শ্রীযুক্ত নিবারণ বাবু অগ্রণী। খাদ্য সম্বন্ধীয় অনেকানেক বিষয়ই কৃষি বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত সুতরাং ইহা কৃষিপ্রিয় ব্যক্তিগণের মধ্যে সম্যক আলোচনা বিশেষ আবশ্যক বলিয়া মনে হয়, সাধারণ গৃহস্থের ও ইহা প্রয়োজনীয়।

পত্রাদি

শ্রীযুক্ত ডি, কে, বিশ্বাস, বেনারস।

ভুট্টাতে পুরা দানা হয় না কেন?—ভুট্টা অনেক সময় খুব বড় ও সতেজ দেখা যায় কিন্তু ছাড়াইলে দেখা যায় দানা অত্যন্ত কম ইহার প্রতিকার কি?

সম্ভবতঃ মাজরা পোকা লাগিয়া ভুট্টার প্রচুর দানা উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটে। মাজরা পোকা ভুট্টা গাছের ডাঁটার মধ্যে প্রবেশ করিয়া মাথা খাইতে থাকে এবং ভুট্টা গাছে যে পুষ্পশীষ বাহির হয় তাহা নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং তাহাতে এত পরাগরেণু কম থাকে যে তদ্দারা গর্ভকোষের সমুদয় বীজগুলির পরিপুষ্টি হয় না। অনেক সময় ভুট্টাটি দেখিতে বড় হইলেও তাহার ভিতর অধিকাংশ বীজ ভুয়া হয় এবং অতি কমই পুষ্ট দানা পাওয়া যায়। সঠিক খবর গাছ সমেত ভুট্টা না দেখিলে বলা যায় না।

যদি মাজরা লাগিয়া থাকে বলিয়া অনুমান হয়, তবে তাহাদের হাত হইতে নিস্তার পাইতে হইলে বার মাসই সতর্ক থাকিতে হয়। ফসলের পোকা ২৯ পৃষ্ঠা দেখুন „ শীত নিদ্রার পর যখন ইহাদের প্রজাপতি বাহির হইয়া ডিম পাড়ে তখন হইতে ইহাদের বংশ বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয় এবং কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইতে থাকে। অতএব যখন যে ফসলে পাওয়া যায় সেই সময়েই ইহাদের বিনাশের উপায় করা উচিত। ক্ষেতে মাজরা লাগিয়াছে কিনা মধ্যে মধ্যে দেখিতে হয় এবং মাজরা আক্রান্ত গাছ দেখিলেই তাহা সমূলে উপড়াইয়া ধ্বংস করিলে সেই সঙ্গে অনেক মাজরা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়।

মাননীয় শ্রীযুক্ত কৃষক সম্পাদক।—

মহাশয় সমীপেষু।

১। Tapioca টেপিওকা কোন সময়ে গাছ বা বীজ লাগাইতে হয়? উক্ত গাছ বা বীজ আপনাদের নিকট পাওয়া যাইবে কি না? এবং যদি পাওয়া যায়, তবে এক বিঘা জমিতে কত গাছ বা বীজ লাগিবে ও উহার মূল্য কত?

২। Aloo এলো।

৩। Sisal-hemp শিসেল-হেম্প। এই দুইটী সম্বন্ধেও আমার ঐরূপ জিজ্ঞাস্য। কি প্রকারে সূত্র প্রস্তুত করিতে হয়।

৪। রাঁচী পাহাড়ের উপরের জমিতে ঐ সকল আবাদ হইতে পারে কি না?

৫। ঐ পাহাড়ে কোন্ তুলার আবাদ লাভজনক? এবং প্রতি বিঘায় কত বীজ আবশ্যক ও তাহার মূল্য কত?

বিনীত শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য। ৩১ নং টীকেপাড়া লেন, সালিখা, হাওড়া।

১। কাসাভা বা শিমূল আলুর মূল হইতে যে পালো বা ময়দা প্রস্তুত হয় তাহাকে ট্যাপিওকা (Tapeoca) বলে। ট্যাপিওকা খাদ্য কাসাভা বা শিমূল আলু গাছ। উহার বীজ হইতে গাছ তৈয়ারি করা অপেক্ষা কটিং বা ডাল কাটিয়া পুতিয়া গাছ তৈয়ারি করা ভাল। কটিং বসাইবার বর্ষাকালই উত্তম সময় ১০০ কটিং ২৲ টাকা মূল্যে ভারতীয় কৃষি সমিতি হইতে পাওয়া যায়।

২। এলো (Aloe) গাছের অপর নাম এগেভ (Agave)। ইহার পাতার আঁশে সূত্র প্রস্তুত হয়। সূতা খুব মজবুত। আনারস গাছের আঁশ বার করার স্থায় কোন প্রকার কুরানি যন্ত্র সাহায্যে পাতার শাঁস কুরিয়া বাহির করিয়া লইলে সূত্র ভাল পৃথক হইয়া পড়ে। অনেক বিলাতী যন্ত্র এই কার্য্যের জন্ত পাওয়া যায়।

বর্ষাকালে ইহার গোড়ায় আনারসের তেউড়ের মত তেউড় বাহির হয়। সেই গুলি নাড়িয়া পুতিলেই গাছ হয়। ৮ ফিট অন্তর এক একটি সারিতে ৬ ফিট অন্তর একটী হিসাবে তেউড় বসাইলে এক একরে ৪০০ শত তেউড় বসান যায়। যে গুলির পাতার ধার তীক্ষ্ণ নহে বা করাতের মত কাঁটাযুক্ত নহে সে প্রকার এগেভের একরে ৮০০ শত চারা বসিতে পারে। এগেভের তেউড় আমাদের নিকট নাই বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের ডিরেক্টরকে চিঠি লিখিলে তিনি প্রাপ্তি স্থানের সন্ধান দিতে পারিবেন। পাহাড়ীয়া ও অপেক্ষাকৃত নিরস মৃত্তিকায় এগেভের চাষ হইতে পারে।

বারগডো জাতীয় এক প্রকার এলো গাছ আছে যাহার পাতার রসের জলীয় ভাগ উঠিয়া গেলে অবশিষ্টাংশ ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয়। উহা মৃদু বিরেচক।

শিসাল হেম্প (Sisal-hemp) ইহাও এক প্রকার এলো সূত্র। Agave Regida Lislana নামক এলো হইতে উৎপন্ন হয়। চাষ ও সূত্র নিষ্কাষণ প্রক্রিয়া একই রূপ।

৫। আমেরিকান অপল্যাণ্ড জর্জ্জিয়ান তুলার চাষ করিয়া দেখিতে পারেন। দেশী তুলার বুড়ী কাপাস নিশ্চয়ই খুব ভাল হইবে। আমেরিকান তুলার মধ্যে সি আইল্যাণ্ড তুলা খুব ভাল। আমাদের নিকট সি আইল্যাণ্ড তুলার এদেশজাত বীজ আছে। ইহারও পরীক্ষা বাঞ্ছনীয়। প্রতি বিঘায় চাষের জন্য ২ পাউণ্ড বীজ আবশ্যক। বীজ ভারতীয় কৃষি সমিতিতে পাইবেন।

স্ত্রী ও পুং পুষ্প।—কৃষিকর্ম্মে নিরত অনেকে এখনও স্ত্রী ও পুং পুশ কাহাকে বলে জানে না। সম্প্রতি আমরা এই মর্ম্মে একখানি পত্র পাইয়াছি। প্রাণী সমূহের স্থায় উদ্ভিদ পুষ্পের মধ্যে স্ত্রী ও পুং পুষ্পে বিভিন্ন আকারের যন্ত্র বিদ্যমান আছে। কোন পুষ্পের মধ্যভাগে একটি দণ্ড উত্থিত হয়। দণ্ডটী কতক-

গুলি সূত্রে সমষ্টি বা নলাকৃতি। তাহার গাত্রে দুইটি অর্দ্ধ গোলক সংযুক্ত থাকে। তাহা হইতে পরাগ রেণু নিঃসৃত হয়। ইহাই পুং যন্ত্র এবং এই যন্ত্র বিশিষ্ট পুষ্পই পুং পুষ্প। এই পুং পুষ্পটিকে উদ্ভিদতত্ত্ব বিদ্যায় (Stamen) ষ্ট্যামেন বলা হয়। কোন ফুলে গর্ভকোষ থাকে। গর্ভ বা বীজকোষের মুখটি ঈষৎ নলাকারে উর্দ্ধে উঠিয়া একটু বিস্তৃতভাব ধারণ করে। ইহার মুখে এক প্রকার আঠাবৎ পদার্থ থাকে। পরাগ রেণু ইহাতে পতিত হইবামাত্র প্রলিপ্ত হইয়া যায় এবং নলমুখে নীত হইয়া বীজকোষের বীজগুলির বৃদ্ধিপ্রাপ্তির সহায়তা করে। স্ত্রী যন্ত্রের এই অংশকে (Stigma) ষ্টীগ্‌মা এবং সমস্ত যন্ত্রটীকে (Pistel) পিষ্টিল বলে।

উদ্ভিদ, প্রাণী হইতে একটু বিভিন্ন। প্রাণীতে স্ত্রী ও পুং ভিন্ন—কিন্তু উদ্ভিদে কখন কখন একেই স্ত্রী ও পুং দুই ফুল, ফুটে, যেমন কুমড়া, লাউ, শশা প্রভৃতি। কখন বা একই ফুলে স্ত্রী পুং দুইটি যন্ত্র থাকে যথা মটর কলাইয়ের ফুল, এবং কখন বা স্বতন্ত্র গাছে স্ত্রী পুষ্প ও পুং পুষ্প ফুটিয়া থাকে। যেমন পেঁপে, পটল ইত্যাদি।

আলুর সহিত টমাটো গাছের কলম।—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী, গৌহাটী, আসাম—লিখিতেছেন যে "আপনারা আলু গাছের সহিত টমাটো গাছের যে কলম করিয়া পরীক্ষা করিতেছিলেন, তাহার ফল কতদুর অগ্রসর হইল আমাকে লিখিয়া বাধিত করিবেন। আমি এই বিষয়টি কৃষকে প্রকাশ করিতে বলি, কারণ তাহা হইলে অন্য উদ্যোগী লোকেও এইরূপ কলম করিবার চেষ্টা করিতে পারে। আপনারা মনোমত ফল পাইলে তবে সাধারণকে জানাইবেন, ইহা সদযুক্তি বলিয়া মনে হয় না, কারণ কাহার হাতে কি রকমে ফল দাঁড়ায় তাহা বলা যায় না। সেই কারণে অনেকের চেষ্টা করা ভাল।

আপনার পত্রের উত্তরে আপনাকে জানান যাইতেছে যে, আলুর সহিত টমাটোর জোড় কলম করিয়া—গোড়াটি আলুর গাছ, ডগাটি টমাটোর ডগা। ইহাতে তলায় আলু ও উপরে টমাটোর ডালে টমাটো ফলিয়াছে মাত্র। এই জোড় কলমে আলুও ভাল ফলে নাই, টমাটো খুব আশানুরূপ ফল দেয় নাই। ইহাতে উদ্ভিদ জগতের একটা বৈচিত্র্য দেখান হইয়াছে মাত্র। আলু গাছে আলু ফলিত বা টমাটো গাছে টমাটো ফলিত। ইহা দ্বারা এমন কি বড় ফল হয় নাই বা অধিক ফলন হয় নাই যে, এই ব্যাপারটা চাষের উৎকর্ষ বলিয়া লওয়া যাইবে। বরং দেখা গিয়াছে যে, আলু ও টমাটো উভয়ই নিকৃষ্ট ফল প্রসব করিয়াছে, নতুবা এক ক্ষেতে এইরূপে দুইটা ফসল এককালে জন্মিলে লাভবান মনে করা যাইত। যাহা হউক আপনার অভিপ্রায় অনুসারে আমরা ইহা অপরকে পরীক্ষা করিতে বলি ও আমরাও ইহার পুনরালোচনায় লিপ্ত রহিলাম।

শ্রীকুলচন্দ্র দাস, আঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, সোণামুড়া, স্বাধীন ত্রিপুরা।

বেলে মাটির উন্নতি।—বেলে মাটিকে দোআঁশ মাটিতে পরিণত করিতে হইলে তাহার সহিত আটাল মাটি মিশাইতে হয়। প্রচুর গোবর সার ও উদ্ভিজ্জ সার ব্যবহার করিতে পারিলে প্রাকৃতিক গঠনের পরিবর্ত্তন করা যায়। বেলে মাটি স্থুল ছিদ্র বিশিষ্ট বলিয়া তাহাতে রস রক্ষা করা কঠিন, জল সহজেই শুষিয়া যায় এবং জলের সহিত সারও মাটির নিম্নস্তরে চলিয়া যাইবার সম্ভাবনা। সুতরাং উদ্ভিজ্জাদি সার এবং আটাল মাটি প্রয়োগে তাহার কিছু রূপান্তর করিতে না পারিলে উপায়ান্তর নাই। কাঁটাল গাছের গোড়ায় গোবর সার, হাড়ের গুঁড়া এবং আটাল মাটির মিশ্রসার দিলে কাঁটাল গাছ সতেজে বাড়িতে পারে এবং ঐ প্রকারে সমুদয় ক্ষেতের মাটির উন্নতি সাধন করিতে পারিলে সকল রকম শস্য নির্ব্বিঘ্নে হইবে। কয়েক জাতীয় ফসল যেমন তামাক, তরমুজ, ফুটি অপেক্ষাকৃত বেলে মাটিতেই ভাল হয়।

সুপারফস্ফেট কি প্রকারে প্রস্তুত হয় জানিতে চান।—হাড়ভস্ম একটা কাঠের গামলা বা চৌবাচ্ছায় রাখিয়া অল্পে অল্পে জল মিশ্রিত সালফিউরিক এসিড দিয়া ক্রমশ নাড়িতে থাকিলে কাদার থাসার মত এক প্রকার পদার্থ হইবে এবং শুষ্ক হইয়া ডেলা বাঁধিয়া যাইবে। এই সকল ডেলা চূর্ণ করিয়া লইয়া গুঁড়া ক্ষেতে ছড়াইতে হয়। সমুদয় দ্রব্যগুলি সংগ্রহ করিয়া এবং রেল খরচা করিয়া লইয়া গিয়া পল্লীগ্রামে সুপারফস্ফেট প্রস্তত করা সহজ ব্যয়সাধ্য নহে।

সহজে হাড়চূর্ণের উপায় জানিতে চান।—হাড় সংগ্রহ করিয়া একটি গর্ত্তে স্তরে স্তরে সাজাইয়া ক্রমাগত কিছু দিন ধরিয়া জলসিক্ত করিয়া রাখিলে এক বৎসরের হাড় পচিয়া গুঁড়া করিবার সুবিধা হয়। হাড়ের দুই একটি স্তরের মাঝে মাঝে ছাই কিম্বা চুণ দিয়া ঢাকিয়া দিলে হাড় শীঘ্র নরম হয়। অনন্তর ঢেঁকিতে কুটিয়া বা মুগুর দ্বারা চূর্ণ করিয়া লইতে হয়।

সার-সংগ্রহ

গো-তত্ত্ব

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার A.B.L.L.B. M.B.DFA. (Lond). লিখিত

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সমগ্র ভারতে কৃষিকার্য্য বলদের সাহায্যে সম্পাদিত হইয়া থাকে। অশ্বশক্তির দ্বারা কৃষিকার্য্য আমাদের দেশের মাটির উপযোগী নহে,

এবং পাশ্চাত্য প্রদেশের মত আমাদের দেশে অশ্বও বহুল উৎপাদিত হয় না। কাজেই বলদ-শক্তি আমাদের দেশে সস্তা ও অনায়াসলভ্য। অশ্বশক্তির দ্বারা বা বহুব্যয়সাধ্য বিলাতী কলকারখানার দ্বারায় আমাদের মত দীনদেশে কৃষি-বৃত্তি প্রচলন ও পরিচালিত করা মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, পাঞ্জাব, লাহোর, দিল্লী, কুমায়ুন, অযোধ্যা, গয়া, পাটনা, ছাপরা প্রভৃতি জেলায় কৃষির উপযোগী জলপাত স্বল্প হওয়ায় গোশক্তির সাহায্যে ইন্দারা বা কূয়া হইতে "মোট" সাহায্যে জল উত্তোলন করার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। ময়দাভাঙ্গা, তেল নিস্পেষিত করা, লাঙ্গল বহন করা, শকট টানা, সুরকী মাড়া প্রভৃতি বহুকাজ বলদশক্তির সাহায্যে আমাদের দেশে সমাহিত হইয়া থাকে।

দুগ্ধের জন্য অস্মদ্দেশে গোপালন একটি প্রধান কাজ প্রাচীনকালে ছিল; কিন্তু এখন আমাদের দোষেই এই ব্যবসা ভারত হইতে প্রায় উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইতে চলিয়াছে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি গোমূত্র বা গোময়ে অত্যুত্তম সার হইয়া থাকে। এখন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান মতে ডাঃ ওয়াল্টার লেদার সাহেব বলেন যে, গোময়ে যথেষ্ট নাইট্রোজেন মিশ্রিত পদার্থ আছে। ডাঃ স্কট্ এবং মিঃ লেদার উভয়ের মতে ভিন্নদেশ হইতে আনীত গোময়ে কি কি ধাতু পদার্থ আছে, তাহা নিম্নলিখিত তালিকা দেখিলে সবিশেষ জানা যাইবে। এই সকল তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা পাওয়া গিয়াছে।

	জলীয় পদার্থ	আর্সেনিক পদার্থ	ধাতব পদার্থ
শকটের বলদ	17.46	61·89	20.25
কানপুর ,,	70.26	10.54	19.20
পুনা ,,	65.07	13.67	21.26
ক্ষীণকায় ,,	19.59	59.26	21.15

উপরোক্ত তালিকা হইতে বেশ প্রতীয়মান হইতেছে, গোমূত্রে এবং গোময়ে কিরূপ উচ্চদরের সার প্রস্তুত হইতে পারে, এবং আমাদের দেশের অজ্ঞ কৃষককুল তাহা অবাধে সমগ্র দেশে নষ্ট হইতে দিতেছেন। সার সম্বন্ধে সামান্য-রূপ আমি "সার"-পর্য্যায়ে আলোচনা করিয়াছি। গোরক্তে "প্রুসীয় ব্লু" রং এবং অন্ত্রের সহযোগে সোণার তবক প্রস্তুত হইয়া থাকে। ফলতঃ গোজাতির দ্বারা আমাদের অশেষ উপকার সাধিত হইয়া থাকে।

জাতি বর্ণ ইত্যাদি প্রাণীতত্ত্ববিদগণের মতে ভারতীয় গোজাতি মেমেলিয়া (mammulia বা স্তন্যপায়ী) পরিবারের অন্তর্গত রোমন্থনকারী (ruminenace)

গণের মধ্যে বোভাইডীর (bovidæ tribe) মধ্যস্থিত বস (bos) genus এর অন্তর্গত subgenus বস-ইণ্ডিকাস (bos indicus) বংশভুক্ত হইতেছে। গৃহপালিত ভারতীয় গোজাতি অতি প্রাচীনকালে, এমন কি ২১৫০ খৃঃ পুঃ অব্দে বন্য বসজাতি হইতে জন্মিয়াছে বলিয়া মহাত্মা ডারুইন প্রকাশ করেন। ভারতবর্ষের কয়েকটি পার্ব্বত্য স্থান মধ্যভারত, তিব্বত, মধ্য-এসিয়া প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে বন্য গোজাতি প্রাকৃতিক অবস্থায় পরিদৃষ্ট হয়। প্রধান প্রাণীতত্ত্ববিদ মহাত্মা ডারুইন বলেন যে, অন্যূন ২২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে এই বন্য গোজাতিকে আদিম মনুষ্যজাতি পালিতাবস্থায় আনিয়া স্বীয় অশেষকার্য্যে নিয়োগ করিতেছে। মেষ ও ছাগল ইহাদের বহুকাল পরে মনুষ্যজাতির বশ্যতা স্বীকার করে। ইহারা সকলেই একপরিবারভুক্ত এবং সেই জন্য ইহাদের তিনটি জাতিরই রোগাদি একপ্রকার। বন্য হরিণ ও পালিত মহিষও এই বৃহৎ পরিবারভুক্ত। গোজাতির ন্যায় মেষ, ছাগল ও মহিষও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আছে। সাসেক্স, মেরিনো, সারে (Surrey). স্রপসায়ার, ডিহন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় মেষ জাতি পাশ্চাত্য দেশে দৃষ্ট হয়। সেইরূপ মুবীয়া, সুইস্, ইংলিশ, মিশরীয় প্রভৃতি কয়েক প্রকার ছাগলও দেখিতে পাওয়া যায়। গো এবং মেষ বা ছাগলের চিকিৎসাও একরূপ। বন্য গোজাতি মহীশূর নেলোর, চরসিদ্ধি, মেঘনা-নদের উর্ব্বর চরসমূহে, কুমায়ুন ও রোহিলখন্দ প্রদেশে, এবং হিমালয় প্রদেশে দৃষ্ট হইয়া থাকে। গোমাংসের জন্য আমেরিকা অঞ্চলে বৃহৎ ঘেরার মধ্যে পালিত গোজাতিকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহাকে রেনচিং (ranching) বলে। এই গোগণ কয়েক বৎসর পরে অবাধে বাড়িলে তাহাদিগকে হনন করিয়া "মীটট্রষ্টের" নিকট তাহাদিগের মাংস বিক্রয় করিয়া আমেরিকায় বহুকৃষক অর্থবান হইয়া থাকে। আমাদের দেশে গো-হনন একেবারে শাস্ত্রের অনুশাসন মতে নিষিদ্ধ। কিন্তু ভারতে প্রত্যহ যে পরিমাণে গোবধ হইতেছে তাহাতে দিন দিন কৃষির অবস্থা শোচনীয় হইয়া আসিতেছে। ইহা অপেক্ষা আমাদের দেশের বিস্তীর্ণ অনুর্ব্বর ভূভাগে মুসলমানগণ বা অপর অন্ত্যজ জাতিগণ "র‍্যাঞ্চিং" করিয়া খাদ্যের জন্য গো উৎপাদন করেন তাহা হইলে ইহা মন্দের ভাল বলিয়া আমার বোধ হয়। ১৮৫৮ সালের ইণ্ডিয়ান ফিল্ডে Mr. B. H. বলেন যে আকবরপুর ও দোস্তপুর জেলায় Sir T. Proby Cautty ১৮২০ সালে বন্য গো-পা দেখিয়াছিলেন। পুনশ্চ ডাঃ বটলার তাঁহার "Topography of Oudhe" নামক পুস্তকে স্পষ্টই লিখিয়া গিয়াছেন যে বঙ্গবংশীয় বন্য গোজাতি প্রায়ই কালবর্ণের হইয়া থাকে এবং হরিপুরের নিকট বনে বহুল দৃষ্ট হয়।

গোজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাণীতত্ত্ববিদগণের মতভেদ দৃষ্ট হয়। মিঃ ব্রাইদ বলেন যে ভারতীয় গোজাতির অত্রদেশে আনয়ন ও প্রসারণ অতি প্রাচীনকালে

আফ্রিকা প্রদেশ হইতে হইয়াছিল। আফ্রিকা প্রদেশ প্রাচীন কুরু রাজ্যের অংশবিশেষ ছিল। কিন্তু এই মতটি আমার সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। মিশরদেশের পিরামিডের উপরে অঙ্কিত গোজাতির মূর্ত্তি দেখিয়া মিঃ ব্লাইদ এই কথা বলেন; কিন্তু হিমালয় প্রদেশস্থ ভূগর্ভ হইতে যে গো-কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলে বেশ বোধ হয় যে পিরামিড নির্ম্মাণের বহু বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতবর্ষে ঝুঁটযুক্ত গোজাতি বর্ত্তমান ছিল।

ভারতীয় গোজাতির বৈজ্ঞানিক নাম জেবু (Zebu) অর্থাৎ ঝুঁট বা ককুদযুক্ত গোজাতি। বিলাতি গোজাতি ককুদহীন এবং শিং ইহাদের গোল (cylindrical) ভারতীয় গোজাতির শিং চ্যাপ্টা (flattened)। বন্য গয়াল, বাইসন, ইয়াক প্রভৃতি জাতিগণ ভারতীয় গোজাতির সহিত বিশেষ সম্পর্কিত বলিয়া আমার মনে হয়। বিলাতি গোজাতি বস্ টরাস্ (bos taurus) পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এই দুই পরিবারের এখন ভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও, ইহাদের মধ্যে সংযোগকালে সঙ্কর শাবক উৎপাদিত হইয়া থাকে। মহিষ জাতির মধ্যে যেমন একপালের স্ত্রী এবং পুরুষ মধ্যে জননক্রিয়া রহিত হয়, গোজাতির মধ্যে শোণিতের সেই অমিশ্রণ ভাব আদৌ দৃষ্ট হয় না। এখন বিজ্ঞানবলে জেবু এবং টরাইনগণ দুই বিভিন্ন পরিবার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ১ জেবুর ককুদ আছে, বসটরাসের (bos taurus) অর্থাৎ পাশ্চাত্য গোজাতির তাহা নাই। ২। জেবুর ভ্রূণপিণ্ড টরাস অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হয়। ৩। টরাসের শাবকের গর্ভ হইতে দন্তোদ্গম হয়, জেবুর তাহা হয় না। ৪। জেবুর শাবক ক্ষুদ্রতর হয় (rounder and shorter) এবং পশ্চাদ্ভাগ গড়ানে (hind quarters slope abruptly instead of being continued straight to form a right angle as in the case of taurines)। বিলাতি গোজাতির কানগুলি ঈষৎ গোল বা বাদামী কিন্তু জেবুর কানগুলি কিছু তীক্ষ্ণাগ্র বিশিষ্ট। ভারতীয় গোজাতি এক সময় চীন, জাপান, তুর্কীস্থান, আফ্রিকা, তাসমানিয়া, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে বহুল দৃষ্ট হইলেও এখন ভারতবর্ষ ভিন্ন অপরস্থানে বড় দৃষ্ট হয় না। পশ্চিম ভারত দ্বীপপুঞ্জ, বৃটিশ গায়েনা, অষ্ট্রেলিয়া, উত্তর আমেরিকা, কেপকলোনি প্রভৃতি স্থানে এই জাতীয় গোজাতি দৃষ্ট হয়; ইহারা সঙ্করোৎপাদনের জন্য ঐ সকল দেশে নীত হইয়াছে। পারস্য দেশেও ভারতীয় গোজাতির বংশধরগণ দৃষ্ট হয়। ইহারা খুব পরিশ্রমী এবং কষ্ট সহিষ্ণু। সঙ্কেত মাত্রে বসিয়া দাঁড়াইয়া উঠে। বেউইক এবং ভিসী এই ভারতীয় ককুদ যুক্ত গোজাতির বিষয় আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় গোজাতির পঞ্জর অস্থি ১৪টি কিন্তু টরাইনের তাহা ১৩টি বই নহে।

বাগানের মাসিক কার্য্য

অগ্রহায়ণ মাস।

সব্জীবাগান।—বাঁধাকপি, ফুলকপি প্রভৃতির চারা বসান শেষ হইয়া গিয়াছে। সীম, মটর, মূলা প্রভৃতি বোনাও শেষ হইয়াছে। যদি কার্ত্তিকের শেষেও মটর, মূলা, বিলাতি সীম বোনার কার্য্য শেষ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে নাবী জাতীয় উক্ত প্রকারের বীজ এই মাসেও বোনা যাইতে পারে। নাবী আলু অর্থাৎ নৈনিতাল, বোম্বাই প্রভৃতি এই সময় বসান যাইতে পারে। পটল চাষের সময় এখনও যায় নাই। শীতপ্রধান দেশে কিম্বা যথায় জমিতে রস অধিক দিন থাকে—যথা উত্তর-আসামে বা হিমালয়ের তরাই প্রদেশে এই মাস পর্য্যন্ত বাঁধাকপি, ফুলকপি বীজ বোনা যায়। নিম্নবঙ্গে কপি চারা ক্ষেত্রে বসাইতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে।

দেশী সব্জী:—বেগুন, শাকাদি তরমুজ, লঙ্কা, ভুঁই শসা, লাউ, কুমড়া, যাহার চৈত্র বৈশাখ মাসে ফল হইবে তাহা এই সময়ে বসাইতে হয়। বালি আঁশ জমিতে যেখানে অধিক দিন জমিতে রস থাকে তথায় তরমুজ বসাইতে হয়।

ফুলের বাগান।—হলিহক, পিঙ্ক, মিগ্নোনেট, ভার্বিনা, ক্রিসন্থিমম, ফ্লক্স, পিটুনিয়া অ্যাষ্টারসম, সুইটপী ও অন্যান্য মরসুমী ফুল বীজ বসাইতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে। অগ্রহায়ণের প্রথমে না বসাইলে শীতের মধ্যে তাহাদের ফুল হওয়া অসম্ভব হইবে। যে সকল মরসুমী ফুলের বীজের চারা তৈয়ারি হইয়াছে, তাহার চারা এক্ষণে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রোপণ করিতে হইবে বা টবে বসাইয়া দিতে হইবে।

ফলের বাগান।—ফলের বাগানে যে সকল গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, কার্ত্তিক মাসে তাহাদের গোড়ায় নূতন মাটি দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, যদি না হইয়া থাকে তবে এ মাসে উক্ত কার্য্য আর ফেলিয়া রাখা হইবে না, পাঁকমাটি চূর্ণ করিয়া তাহাতে পুরাতন গোবর সার মিশাইয়া গাছের গোড়ায় দিলে অধিক ফুল ফল প্রসব করে।

কৃষি-ক্ষেত্রে।—মুগ, মসুর, গম, যব, ছোলা প্রভৃতির আবাদ যদি কার্ত্তিক মাসের মধ্যে শেষ হইয়া না থাকে, তবে এমাসের প্রথমেই শেষ করা কর্ত্তব্য। একেবারে না হওয়া অপেক্ষা বিলম্বে হওয়া বরং ভাল, তাহাতে ষোলআনা না হউক কতক পরিমাণে ফসল হইবেই। পশুখাদ্যের মধ্যে মাঙ্গোল্ড বীটের আবাদ এখনও করা যাইতে পারে। কার্পাস ও বেগুন গাছের গোড়ায় ও নব রোপিত বৃক্ষের নিম্নে

আইল বান্ধিয়া দেওয়া এ মাসেও চলিতে পারে। যব, যই, মুগ, কলাই, মটর এই সকল রবি শস্যের বীজ বপন এবং পরে গমের বীজ বপন ; আলু ও বিলাতি সব্জীর বীজ লাগান এ মাসেও চলিতে পারে ; কপির চারা নাড়িয়া ক্ষেত্রে বসান হইয়াছে, তাহাদের তদ্বির করাই এখন কার্য্য। তরমুজ ও খরমুজের বীজ বপন ; মূলা, বীট, কুমড়া, লাউ, শসা, পেঁয়াজ ও বরবটীর বীজ বপন করা হইয়াছে ঐ সকল ক্ষেত্রে কোদালী দ্বারা ইহাদের গোড়া আল্গা করিয়া দেওয়া ; আলুর ক্ষেত্রে জল দেওয়া এই মাসে আরম্ভ হইতে পারে ; বিলাতি সব্জীর ভাঁটিতে জল সিঞ্চন, প্রাতে বেলা ৯টার সময় উহাদের আবরণ দিয়া সন্ধ্যায় আবরণ খুলিয়া দেওয়া ; বার্ত্তাকু, কার্পাস ও লঙ্কা চয়ন ও বিক্রয় ; ইক্ষুর ক্ষেত্রে জল সেচন ও কোপান এই সময়ের কার্য্য।

গোলাপের পাইট।—কার্ত্তিক মাসে যদি গোলাপের গাছ ছাঁটা না হইয়া থাকে, তবে এ মাসে আর বাকি রাখা উচিত নহে। বঙ্গদেশে বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনার সময় কাটিয়াছে। কালী পূজার পর ঐ কার্য্য করিলে ভাল হয়, উত্তর পশ্চিম ও পার্ব্বত্য প্রদেশে অনেক আগে ঐ কার্য্য সমাধা করা যাইতে পারে। গোলাপের ডাল, "ডাল কাটা" কাঁচি দ্বারা কাটিলে ভাল হয়। ডাল ছাঁটিবার সময় ডাল চিরিয়া না যায় এইটি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। হাইব্রিড গোলাপের ডাল বড় হয়, সেই গুলি গোড়া ঘেঁসিয়া কাটিতে হয়। টীগোলাপ খুব ঘেঁসিয়া ছাঁটিতে হয় না। মারসাল নীল প্রভৃতি লতানীয়া গোলাপের ডাল ছাঁটিবার বিশেষ আবশ্যক হয় না, তবে নিতান্ত পুরাতন ডাল বা শুষ্কপ্রায় ডাল কিছু কিছু বাদ দিতে হয়। ডাল ছাঁটার সঙ্গে সঙ্গে গোড়া খুঁড়িয়া আবশ্যক মত ৪ হইতে ১০ দিন রৌদ্র খাওয়াইয়া সার দিতে হয়। জমি নিরস থাকিলে তরল সার, জমি সরস থাকিলে গুঁড়া সার ব্যবহার করা বিধেয়। গামলায় পোড়ামাটি, সরিষার খৈল, গোমূত্র ও অল্প পরিমাণে এঁটেল মাটি একত্র পচাইয়া সেই সার জলে গুলিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। সার-জল নাতি তরল নাতি ঘন হইবে। গুঁড়া সার, সরিষার খৈল এক ভাগ, পচা গোময় সার এক ভাগ, পোড়ামাটি এক ভাগ এবং এঁটেল মাটি দুই ভাগ একত্র করিয়া মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। গাছ বুঝিয়া প্রত্যেক গাছে সিকি পাউণ্ড হইতে এক পাউণ্ড পর্য্যন্ত এই সার দিতে হয়। ঐ মিশ্র সারে একটু ভুসা মিশাইলে মন্দ হয় না, ভুসা কলিকাতার বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। প্রতি পাউণ্ড মিশ্র সারে এক পেকেট ভুসা যথেষ্ট, ভুসা দিলে গোলাপের রঙ বেশ ভাল হয়। পাকা ছাদের রাবিশের গুঁড়া কিঞ্চিৎ, অভাবে পোড়ামাটী ও গুঁড়া চুণ সামান্য পরিমাণে মিশাইয়া লইলে গাছে ফুলের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়।

কৃষক

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৪শ খণ্ড। | অগ্রহায়ণ, ১৩২০ সাল। | ৮ম সংখ্যা।

গোয়ালিয়ার পাতা ও আপাঙ্গ মূল।

শ্রীজগৎ প্রসন্ন রায়।

গোয়ালিয়ার পাতার সংস্কৃত নাম গোধাপদী, ল্যাটীন Vitis Peadata, আপাঙ্গের সংস্কৃত নাম অপামার্গ আপাঙ্গ, ল্যাটীন Achyran thes as pera, বাঙলা চিড়চিড়ে।

এই দুটী দেশীয় গাছড়ার বিস্তারিত গুণাগুণ বা ইতিহাস লেখা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, একটী প্রতক্ষীভূত আশ্চর্য্য ঘটনা কৃষকের গ্রাহকদিগকে উপহার দিবার জন্যই উপরোক্ত গাছড়া দুটীর নাম উল্লেখ করিতে হইল। কিছু দিন গত হইল আমাদের জনৈক আত্মীয় পচা ক্ষতে ভুগিয়া হাঁসপাতাল হইতে হতাশ্বাস হইয়া বাটী ফিরিয়া আসেন, তাঁহার এই দুষিত ক্ষত আরোগ্য করিবার জন্য তিনি চাঁদসী প্রভৃতি নানাস্থানের ঔষধ ব্যবহার করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন। তাঁহার পায়ের সেই পুয়হীন ঈষৎ লোহিতাভ ক্ষখানি পচা ঘা কিছুতেই সারিতে ছিল না।

পেটেন্টের বাজারে আজ কাল দি নিউ ফরমুলা কোম্পানীর আলছারিনের ভারি নাম জাঁকিয়াছে, তাই তিনি এক শিশি আলছারিন ডাকে আনাইয়া ঘায়ে লাগাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, এই তাঁহার শেষ চেষ্টা।

যে দিন ডাকে ঔষধ আসে ও খোলা হয় সেই দিন ঘটনা চক্রে সন্ন্যাসী গোপাল দাস বাবা আমাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হন। এই সঙ্গে গোপাল দাস বাবা সম্বন্ধে ২।১ টী কথা সংক্ষেপে না বলিলে বক্তব্য বিষয় পরিষ্কার হইবে না। গোপাল দাস বাবা ৺ চন্দ্রনাথ তীর্থ যাইবার সময় সশিষ্যে প্রতিবৎসর একবার করিয়া আমাদের বাটীতে পদার্পণ করিয়া থাকেন। ৫।৬ দিন দিবা রাত্র লক্ষী

নারায়ণের ভোগ ও পূজা অর্চ্চনার ভারি ধুম পড়িয়া যায়। স্বর্গীয় পিতাঠাকুর মহাশয়ের আমোল হইতে তাঁহার এবাড়িতে গতিবিধি আছে, তিনি একজন সাধারণ গঞ্জিকা সেবী সন্ন্যাসী নহেন, অনেক সম্ভ্রান্ত বড়লোক তাঁহার শিষ্য। বনগ্রাম মহকুমার প্রখ্যাত উকিল শ্রীযুক্ত বাবু সন্তোষ নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গোপাল দাস বাবার শিষ্য, বনগ্রামের হেডমাষ্টার মাননীয় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও অন্যান্য স্থানীয় উকিল, মোক্তার, সাতক্ষীরা মহকুমার অনেক ভদ্রলোক সাতক্ষীরার জমিদার শ্রীযুক্ত গিরিজা নাথ বাবু প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত মহোদয়ের নিকট গোপাল দাস বাবা বিশেষ রূপে আদৃত ও সম্মানিত।

দি নিউ ফরমুলা কোম্পানীর ঔষধের প্যাক খোলা হইতেছে এমন সময় সন্ন্যাসী ঠাকুর আসিয়া দেখা দিলেন, তিনি কিসের ঔষধ জিজ্ঞাসা করায় ক্ষতের সমস্ত বিবরণ অবগত হইলেন এবং বলিলেন বাবা বনজঙ্গলে পাহাড় পর্ব্বতে ঘুরিয়া বেড়াই আমি তোমাদের নিকট একজন অশিক্ষিত নাগা। তা বাবা আমি যখন তোমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি তখন আর আলছারিন প্রয়োগের আবশ্যক নাই, আমি যাহা বলি তোমরা তাহা এক সপ্তাহ করিয়া দেখ ফল না হয় তখন অন্য ঔষধ ব্যবহার করিও। এই কথা বলিয়া বাবাজী ছোট গোয়ালিয়ার পাতা বার আনা ও সিকি পরিমাণে আপাঙ্গের মূল তুলিয়া আমাদের হাতে দিয়া বলিলেন, নিমপাতা গরম জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল দিয়া দুইবেলা ঘা পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া এই দুটী গাছড়া বাটিয়া ঘায়ের উপর প্রলেপ দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে।

আমরা এই সন্ন্যাসী কথিত পদ্ধতি অবলম্বন করায়, অত যে যন্ত্রণা—অমন যে দুষিত ঘা—যাহা আজ ২ বৎসর ধরিয়া বিবিধ চিকিৎসা ও যন্ত্র চিকিৎসায় আরোগ্য হয় নাই তাহা ১০।১২ দিনের মধ্যে নির্দ্দোষরূপে সারিয়া গিয়াছে।

দেশীয় গাছড়ার এরূপ আশ্চর্য্য শক্তি দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছি, গোয়ালের পাতা দুই জাতীয় আছে। সন্ন্যাসী মহাশয় আমাদিগকে ছোট গোয়ালিয়ার পাতা অর্থাৎ যে লতার বেল পাতার ন্যায় এক বোঁটায় তিনটা করিয়া পাতা হয় এবং পাতার কিনারা খাঁজ কাটা খাঁজ কাটা হইয়া থাকে তাহাই ব্যবহার করিতে দিয়াছিলেন, দুষিত ক্ষতগ্রস্ত রোগী এই প্রক্রিয়া একবার অবলম্বন করিয়া দেখিলে আমরা সুখী হইব। তাঁহাদের দ্বারা গোয়ালিয়া পাতা আপাঙ্গ মূলের গুণ জনসাধারণের নিকট ক্রমশঃ প্রচারিত হইয়া পড়িবে।

শণ

রজ্জু আমাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু। রজ্জু না হইলে আমাদের অনেক কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। বিশেষতঃ গৃহাদি নির্ম্মাণে রজ্জুর বিশেষ প্রয়োজন। রজ্জু না হইলে আমাদের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। সকল প্রকার রজ্জুই উদ্ভিজ্জ। বিচালী, জুন, বাবুই, সরমুঞ্জা প্রভৃতি তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ হইতে, নারিকেল ছোবড়া হইতে এবং পাট, শণ, ধঞ্চে প্রভৃতি গাছের আঁস হইতে আমাদের প্রয়োজনীয় রজ্জু প্রস্তুত হয়। আনারস, মুগুয়া প্রভৃতি গাছের পাতার আঁস হইতেও রজ্জু প্রস্তুত হয়। যে সকল বৃক্ষ হইতে রজ্জু প্রস্তুত হয়, যত্নের সহিত তাহাদের চাষ করিতে হয়।

এক্ষণে পাটের রজ্জু ও পাটের থলিয়ার যেরূপ বহুল প্রচলন ও আদর হইয়াছে পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। পূর্ব্বে শণের রজ্জু ও থলিয়ার বিশেষ আদর ছিল, এখনও যে নাই তাহা নহে। এখনও আমাদের এ প্রদেশে শণের দড়ি ও থলিয়ার (গুণের) বিশেষ আদর আছে। শণের দড়ি ও থলিয়া (গুণ) যেরূপ মজবুত, পাটের দড়ি ও থলিয়া সেরূপ মজবুত নহে। পাটের থলিয়া ২।১ বৎসর মধ্যেই নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু শণের থলিয়া যত্নপূর্ব্বক নিয়ত ব্যবহার করিলেও ১০।১৫ বৎসর কি তাহা অপেক্ষা অধিক দিন যাইতে পারে। পাটের দড়ি ও থলিয়া কলে প্রস্তুত হয় বলিয়া উহার মূল্য খুব কম। সস্তা বলিয়া পাটের দড়ি ও থলিয়ার এত আদর ও বহুল প্রচলন হইয়াছে। শণের থলিয়ার সমস্তই হাতে তৈয়ার করিতে হয় বলিয়া উহা বহু পরিশ্রম সাপেক্ষ, তজ্জন্য বহুমূল্য। এখানকার কৃষকেরা গরু বান্ধিবার জন্য এবং হল চালনার জন্য যে দড়ীর প্রয়োজন হয় তাহার সমস্তই শণের এবং হাতে তৈয়ার করিয়া থাকে। পাটের দড়ী অপেক্ষা শণের দড়ী খুব মজবুত। পাটের আঁস অপেক্ষা শণের আঁস স্বভাবতঃ মজবুত বলিয়া পাটের দড়ি অপেক্ষা শণের দড়ি অধিক দিন টিকিয়া থাকে। বাজারে কলে ভাঙ্গা শণের দড়ী অপেক্ষা হাতে কাটা ও হাতে ভাঙ্গা শণের দড়ী খুব মজবুত হয়।

শণের আঁস ঢেরায় কাটিয়া রজ্জু প্রস্তুত করে। সেই রজ্জু সরু মোটা অনুসারে ৬ হইতে ১০ খি পর্য্যন্ত একত্র করিয়া পাক দিতে হয়। তাহার পর সন্ধ্যার পর ভিজাইয়া রাখিয়া, তৎপর দিন সকালে পুনরায় ভাগ করিয়া পাক দিয়া মাজিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়। খুব শুষ্ক হইলে তেভাঁজ করিয়া হাতে ভাঙ্গিলে যে দড়ী প্রস্তুত হয় তাহা গবাদি পশু বান্ধিয়া রাখিবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্য্য জন্য ব্যবহৃত হয়। শণের আঁস যদি পচা না হয়, তবে এই দড়ী এত মজবুত হয়

যে, বহুকাল ব্যবহার করিলেও ছেঁড়ে না। বাজারের কলে ভাঙ্গা দড়ী অপেক্ষা এই দড়ী অনেক দিন ব্যবহার করিলেও টিঁকিয়া থাকে।

হাতে কাটা শণের দড়ির থলিয়া তৈয়ার করিতে হইলে দুইটী ঢেরার দড়ী একটী কাটিতে পাক লাগে এরূপভাবে একত্র করিয়া জড়াইয়া গুটাইয়া তাগ করিতে হয়। এই দড়ীর দ্বারা টানা করিতে হয়। টানার দড়ী কিছু সরু হওয়া আবশুক। পড়েনের দড়ী অপেক্ষাকৃত মোটা হওয়া চাই। পড়েনের জন্যও দুইটী ঢেরার দড়ী একত্র করিয়া একটী কাটিতে গুটাইয়া ঢেরা দ্বারা উল্টা পাক দিয়া ঐ দড়ী একত্র মিলিত করিতে হয়। পাক যেন খুব বেশী না হয়। সেই দড়ী পুনরায় একটী ছোট কাটিতে পাক দেওয়া পড়েনের দড়ী গুটাইয়া নলি প্রস্তত করে। তৎপরে তাঁতে হাতে করিয়া কাপড় বপনের ন্যায় থলিয়া বুনিতে হয়। কাপড়ের টানা সুতা যেমন তাঁতের গোলাকার কাষ্ঠ খণ্ডে জড়ান থাকে, ইহার টানার দড়ি সেরূপভাবে না থাকিয়া টানার দড়ির উভয় পার্শ্বে খুঁটা গাড়িয়া তাহাতে টানার দড়ি খুব টান দিয়া দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করে। থলিয়ার পরিসর ১০ হইতে ১২ ইঞ্চির অধিক করে না। এইরূপে হাতে কাটা পাটের দড়িতেও হাতে বুনিয়া থলিয়া প্রস্তত করে। ঐ থলিয়া ৫ হাত পরিমাণ কাটিয়া তিন খণ্ড একত্রে জোড় দিয়া সেলাই করিতে হয়। তৎপরে উহা দুই ভাঁজ করিয়া উভয় পার্শ্ব সেলাই করিলেই থলিয়া প্রস্তত হইল। ঐ থলিয়া কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিবার সময় মুখগুলি সেলাই করিয়া বন্ধ করিতে হয়, নচেৎ পড়েনের দড়ি খুলিয়া যাইতে পারে। ঐ থলিয়া দ্বারা ঐখানকার কৃষকদিগের চাষের নানাপ্রকার আসবাব প্রস্তত হয়। ঐ চট দ্বারা গুণ (শিকল দেওয়া থলিয়া) পালান, কাঁপা, গরুর পৃষ্ঠ দেশ হইতে লেজ পর্য্যন্ত বিস্তৃত আড়াই হাত দীর্ঘ এবং দুই হাত প্রস্থ চট প্রস্তত করে।

কলে প্রস্তত পাটের থলিয়ায় মাল বোঝাই বস্তা গাড়িতে বহন করিয়া এক স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যায়। গরুর পৃষ্ঠে বোঝাই করিয়া লইয়া যাইতে হইলে গুণের আবশুক হয়। গুণের মুখের অপর দিকে শিকল ভাঙ্গা থাকে। গরুর পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া লইয়া যাইতে হইলে দুইটী গুণের শিকলের মধ্য দিয়া দড়ি গলাইয়া দুইটী গুণকে আবদ্ধ করিয়া গরুর পৃষ্ঠে তুলিয়া দিতে হয়। আমাদের এখানে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ধান, চাল, কলাই, খইল প্রভৃতি বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইলে এইরূপ করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। এখন হাতে কাটা পাটের দড়িতেও এইরূপ শিকল ভাঙ্গা গুণ প্রস্তত হইতেছে। গবাদি পশুর পৃষ্ঠে বোঝাই চাপাইতে হইলে প্রথমতঃ পৃষ্ঠ দেশে পালান দিয়া তৎপরে বোঝা চাপাইতে হয়। পালানের উপর দিকে চট, নিম্নে পাটনাই খেরুয়া দিয়া সেলাই করিয়া তাহার

ভিতরে শিমুল তুলা দিয়া পালান কোমল করিতে হয়। নচেৎ গবাদি পশুর পৃষ্ঠ দেশ ছালার ঘর্ষণে ক্ষত হইয়া কষ্টকর হইয়া উঠে।

আমাদের এখানে শীষশুদ্ধ ধান গাছ মাঠ হইতে গরুর পৃষ্ঠে দিয়া লইয়া আইসে। বিচালী বহন করিতে হইলেও গরুর পৃষ্ঠে বোঝাই করিয়া লইয়া যাইতে হয়। ঐ সকল ধান গাছের ও বিচালীর আটি কাঁপায় আবদ্ধ করিয়া গবাদি পশুর পৃষ্ঠে চাপাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। কাঁপাও শণের দড়িতে প্রস্তুত চটে তৈয়ার হইয়া থাকে। দুইটী কাঁপায় শিকল ভাঙ্গা থাকে। গুণের ন্যায় ঐ শিকলে দড়ি প্রবেশ করাইয়া দুইটী কাঁপাকে একত্র করিয়া বোঝাই সমেত গরুর পৃষ্ঠে চাপাইয়া দেওয়া হয়। গরুর পৃষ্ঠে বোঝাই চাপাইবার পূর্ব্বে পালান দিয়া বোঝা চাপাইতে হয়। পালানের পশ্চাৎ ভাগ হইতে গরুর লেজের কাছ পর্য্যন্ত উভয় পার্শ্বে ঝাঁপাইয়া চট দিয়া আবৃত করিয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক, নচেৎ বিচালীর ছালার ঘর্ষণে গরুর উভয় পার্শ্বের টঁ্যাকের চামড়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া ক্ষত হইয়া পড়ে। এই সকল নিতান্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য শণের দড়িতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমাদের এখানকার কৃষকদিগের শণের দড়ি ব্যতীত কোন রূপে চলিতে পারে না।

ইহা ব্যতীত শণের দড়িতে অন্যান্য অনেক কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। খড়ো ঘরের চাল সলা দিয়া ছিটিতে হইলে শণের দড়ির নিতান্ত আবশ্যক হয়।

শণ চাষে লাভ নিতান্ত মন্দ নহে। ভাল রকম শণ জন্মাইতে পারিলে বিলক্ষণ লাভ হইয়া থাকে। এ প্রদেশে এরূপ নিতান্ত প্রয়োজনীয় ও লাভ জনক শণের চাষ কি প্রণালীতে সম্পাদিত হয় অতঃপর তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

উচ্চ ভূমিতে ও দোয়াঁস মাটিতেই শণ ভালরূপ জন্মিয়া থাকে। মাটিতে বালির বা মেটেলের ভাগ কিছু কিছু ন্যূনাধিক্য হইলেও ক্ষতি হয় না। জ্যৈষ্ঠ মাসেই শণ বপনের প্রকৃত সময়। জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ব্বে যে সময়ে যো পাওয়া যাইবে, সে সময়ে জমিতে ২।১ টী চাষ দিয়া ফেলিয়া রাখিতে হয়। পচা গোবর সারই শণ গাছের বিশেষ উপযোগী। জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ব্বে চাষ দিবার পর নিয়মিত রূপে সার দিয়া বৈশাখ মাসের শেষে ঐ সার জমির সর্ব্বত্র সমভাবে ছড়াইয়া রাখিবে। শণের জমি বেশ ঘন ঘন করিয়া গভীর করিয়া কর্ষণ করা নিতান্ত আবশ্যক। বীজ বপনের পূর্ব্বে চাষ দিয়া রাখিবে ও ঐ সময় আগাছা সকল মারিয়া ফেলা নিতান্ত আবশ্যক। জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৫ই এর পর বৃষ্টি হইবার পর যো পাইলেই শণ বীজ বপন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত বীজ বপন করিলে ও বিশেষ ক্ষতি হয় না। সরস মৃত্তিকায় বীজ বপন করা উচিত। তাহা হইলে শীঘ্রই মৃত্তিকার রসে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া চারা বাহির হইয়া থাকে। শণের বীজ ২।১ দিন মধ্যেই অঙ্কুরিত হইয়া চারা বাহির হয়। জমির সর্ব্বত্র যেন বীজগুলি সমভাবে ছড়ান হয়।

জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ব্বেই জমিতে চাষ সার দিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখা হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৫ই এর পর যো পাইলে একটী চাষ দিয়া শণ বীজ ছড়াইয়া দেওয়া হয়। তাহার পর বিপরীত দিক দিয়া আর একটা চাষ দিয়া মই দেওয়া আবশ্যক। শণের জমিতে জল দাঁড়াইলে গাছ নিস্তেজ হয় তজ্জন্য মই দিবার পর জমির জল বাহির করিয়া দিবার জন্য জুলি কাটিয়া রাখা আবশ্যক। অধিক বৃষ্টি হইলে জমিতে জল না দাঁড়াইয়া বাহির হইয়া যায়। শণের বীজ বপনের সময় ক্ষেতে যেন ঘাস ও আগাছা না থাকে, এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

প্রতি বিঘায় ৮।১০ সের শণের বীজ বপন করা আবশ্যক। শণের জমি বেশ উর্ব্বরা ও দস্তর মত সার দেওয়া না হইলে গাছ উর্দ্ধ দিকে উত্থিত হয় না। শণের গাছ ঘন সন্নিবিষ্ট না হইলে, গাছ উর্দ্ধ দিকে বেশি উত্থিত না হইয়া মোটা হইয়া শাখা বাহির হইয়া চারি দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এরূপ গাছে শণ বেশি হয় না এবং শণও মোটা আঁসের হয়। ঘনশাখা প্রশাখা বিশিষ্ট শণ গাছের আঁস বাহির করা কষ্টকর হয়। শণের চারা খুব ঘন সন্নিবিষ্ট হওয়া আবশ্যক। শণের গাছ ঘন হইলে গাছ খুব উর্দ্ধ দিকে উত্থিত হয়। গাছ মাত্রেরই সূর্য্যের আলোক ও তাপ নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সূর্য্যের তাপ প্রাপ্ত হইয়া বৃক্ষের পত্রগুলি ঘোর হরিদ্বর্ণ হইয়া থাকে। কোন স্থানের বৃক্ষ বা তৃণকে কয়েক দিন আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলে তাহার হরিদ্বর্ণের পরিবর্ত্তে কতকটা শ্বেতবর্ণের ন্যায় হইয়া থাকে। সূর্য্যের আলোক ও তাপ না পাওয়াতেই এরূপ ঘটিয়া থাকে। সকল গাছই সূর্য্যের তাপ ও আলোক পাইবার ইচ্ছা করে। সূর্য্যের আলোক ও তাপ বিহীন স্থানে কোন বৃক্ষ রাখিলে, যদি তথাকার কোন স্থানে সূর্য্যের আলোক কিয়ৎ পরিমাণে পায় তবে সেই বৃক্ষ ঐ আলোক পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া সেই দিকে শাখা প্রশাখা বিস্তারিত করিয়া ধাবমান হইতে থাকে। শণ গাছ ঘন হইলে ডাল বাহির না হইয়া তাহা উপর দিকে উঠিতে থাকে। গাছ ঘন হইলে আওতা প্রযুক্ত চতুঃপার্শ্ব হইতে আলোক ও তাপ আসিতে পারে না, এজন্য গাছ আলোক ও তাপ পাইবার জন্য উর্দ্ধ দিকে উত্থিত হয়। এই কারণে ঘন বনের ও বাগানের গাছ শাখা প্রশাখা বিস্তারিত না করিয়া উর্দ্ধ দিকে উত্থিত হয়। জমি উর্ব্বরা হইলে শণের গাছ ৪।৫ হাত পর্য্যন্ত উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া থাকে। আর এক জাতীয় শণ গাছ আছে তাহা উর্দ্ধ দিকে ৭।৮ হাত পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। তাহার আঁস ভাল নহে মোটা ও শক্ত। এরূপ শণের চাষ আমাদের এ প্রদেশে হয় না।

শণ বপনের পর আর বিশেষ একটু পাইট করিতে হয় না। শ্রাবণ মাসে শণ গাছের ফুল ধরে। সমস্ত গাছগুলিতে হরিদ্রাবর্ণের ফুল ফুটিয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিস্তার করে। সেই সৌন্দর্য্য দর্শন করিলে নয়ন মন পুলকিত হইয়া উঠে। এক স্থানে

যদি অনেক গুলি জমিতে শণ গাছ থাকে, আর ঠিক একই সময় যদি সকল গাছের ফুল ফুটিয়া উঠে, তবে যেন সমস্ত মাঠই এক অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিয়া সর্ব্বস্রষ্টা জগদীশ্বরের অসীম মহিমা কীর্ত্তন করে। দূর হইতে দর্শন করিলে বোধ হয় যেন সমস্ত মাঠই ঘোর হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে।

শণে জমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে। শণের জমিতে পর বৎসর আশু বা কেলেস ধান বপন বা রোপণ করিলে বিনা সারে প্রচুর ফল লাভ করিতে পারা যায়। কেবল শণ বলিয়া কেন,—শিম্বিজাতীয় ফসল মাত্রেরই এই গুণ আছে। তজ্জন্য পর্য্যায় রোপণ দ্বারা বিনা সারে অনেক দিন পর্য্যন্ত প্রচুর ফল লাভ করিতে পারা যায়। শিম্বি জাতীয় ফসল মাত্রেই নৈসর্গিক নিয়মানুসারে বায়ু প্রভৃতি হইতে নাইট্রোজেন আহরণ করিয়া আপন মূল দেশে সঞ্চিত করিয়া রাখে। সকল প্রকার উদ্ভিদের পোষণোপযোগী উপাদান এক প্রকার নহে, এ কথা আমরা অন্যান্য প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। শিম্বিজাতীয় উদ্ভিদের পোষণ জন্য নাইট্রোজেনের বিশেষ প্রয়োজন হয় না, কিন্তু তৃণজাতীয় উদ্ভিদের পুষ্টি সাধন জন্য নাইট্রোজেন বিশেষ উপযোগী। তজ্জন্য শিম্বি জাতীয় উদ্ভিদ যে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিয়া রাখে, তাহা তাহাদের পুষ্টি সাধন জন্য প্রায়ই ব্যয়িত না হইয়া জমিতে সঞ্চিত থাকে; তজ্জন্য পর বৎসর ঐ জমিতে তৃণজাতীয় ফসল বপন বা রোপণ করিলে, জমিতে সঞ্চিত তাহাদের পোষণোপযোগী নাইট্রোজেন প্রাপ্ত হইয়া আপনাদের পুষ্টি সাধন করে।

জমির উর্ব্বরতা ও ঘন বপন অনুসারে শণ গাছ যত উর্দ্ধে উত্থিত হইবে, ততই অধিক আঁস প্রাপ্ত হইয়া অধিক লাভবান হইতে পারা যায়। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিতে শণ ভাল জন্মে না। আষাঢ় মাসে দীর্ঘ কাল ধরিয়া বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হইলে শণের বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে।

এ বৎসর আমাদের এ প্রদেশে গত জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৫ই ১৬ই হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া প্রায় প্রতিদিনই বৃষ্টি হওয়ায় জমিতে জল দাঁড়াইয়া যায়। তজ্জন্য যো না পাওয়াতে প্রায় কোন চাষীই শণ বপন করিতে পারে নাই। তজ্জন্য এ বৎসর এখানে শণ নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য ও মহার্ঘ হইবে। যদিও কষ্টে সৃষ্টে পুরাতন শণ দ্বারা বা অন্যান্য উপায়ে রজ্জুর কার্য্য সম্পন্ন করিবে বটে, কিন্তু আগামী বর্ষে শণ বীজের নিতান্ত অভাব উপস্থিত হইবে। এমন কি বীজের অভাবে শণ বপন করিতে পারিবে না। যদিও কেহ কেহ সামান্য পরিমাণে শণ চাষ করিয়াছিল, তাহাও আবার দামোদর নদের ভীষণ বন্যায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

নিয়াজ ? করিয়াও শণ বীজ বপন করিতে পারা যায়, কিন্তু তাহাতে আশানুরূপ ফল লাভ করিতে পারা যায় না। শুষ্ক মৃত্তিকায় বীজ বপন করিলে গাছ যে রূপ তেজস্কর হয়, কাদায় বীজ বপন করিলে সেরূপ হয় না। এ বৎসরের ন্যায় জমিতে যো না পাইলে অগত্যাই বাধ্য হইয়া নিয়াজ করিয়া বীজ বপন করিতে হয়। নিয়াজ করিয়া যেরূপ ধান্য বীজ বপন করে, শণ বীজও সেইরূপ বপন করিয়া থাকে। সার ও চাষ দেওয়া জমিতে কাদায় ২টী চাষ ও মই দিয়া তাহার উপর শণ বীজ ছড়াইয়া দিতে হয়। বীজ যেন জমির কোথাও বেশি কোথাও কম না পড়ে। কাদায় চাষ দিবার পর যদি জমিতে ঘাস বা কোন আগাছা ২।১ টী থাকে যবে তাহা হাতে করিয়া নিড়াইয়া দিতে হইবে, তাহার পর মই দেওয়া উচিত। জমির জল বাহির হইয়া যাইবার জন্য জমিতে মধ্যে মধ্যে নালা কাটিয়া দেওয়া নিতান্ত দরকার। যেন বৃষ্টি হইবা মাত্র জমির সমস্ত জল ঐ নালা দিয়া অবাধে বাহির হইয়া যাইতে পারে। বীজ বপনের পর জমির কোন স্থানে যেন কিছু মাত্র জল দাঁড়াইয়া না থাকে। এরূপ উপায়েও শণ গাছ উৎপন্ন করিতে পারা যায়। জমি উর্ব্বরা হইলে ইহাতেও ফল মন্দ হয় না।

কেহ কেহ নামাল জমিতেও (যে জমিতে হৈমন্তিক ধান রোপণ করা হয়) শণ বপন করিয়া থাকে। পূর্ব্বলিখিত মতে জমিতে শণ বীজ বপন করিবার পর শ্রাবণ মাসে শণ গাছের ফুল ধরিলে গাছ কাটিয়া, গাছের অগ্রভাগ (গাছের ডগে যে স্থান হইতে ফুল ধরিতে আরম্ভ হয়) কাটিয়া সেই জমির সর্ব্ব স্থানে কর্ত্তিত অগ্রভাগে সমভাবে ছড়াইয়া দিয়া দুইটী চাষ ও মই দিয়া ফেলিয়া রাখে। ইহার ৩।৪ দিন পরে পুনরায় তাহাতে চাষ ও মই দিয়া তাহাতে ধান্য চারা রোপণ করিয়া থাকে। যদিও এই ধান্য চারা রোপণ নাবি হয় বটে, কিন্তু তাহাতেও প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। তৎপূর্ব্বে রোপিত ধান্য অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন হয় না। এরূপ করিয়া ধান্য রোপণ করিলে শণের বীজ পাইবার আশা থাকে না। শ্রাবণ মাসের যে সময় কৃষকের ধান্য রোপণের কার্য্য শেষ না হওয়ায়, তাহারা এরূপ প্রণালীতে শণ চাষ করিয়া, শণ কাটা, শণ গাছ পচান ও তাহা কাচা লইয়া ব্যস্ত হয় না। এই সকল কারণে এরূপ প্রণালীতে কৃষকেরা শণ চাষ খুব কম করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে লাভ প্রচুর আছে। সামান্য পরিশ্রমের জন্য এরূপ প্রচুর লাভ ত্যাগ করা উচিত নহে। বীজের অভাব জন্যও অনেকে এরূপ শণ চাষ করে না।

ভাদ্র মাসের প্রথমেই শণ গাছের শুঁটী বেশ পক্ক হইয়া উঠে। ঘন সন্নিবিষ্ট শণ গাছের অগ্রভাগে খুব ছোট ছোট ও সরু সরু সামান্য শাখা হইতে দেখা যায়। যেখান হইতে শাখা বাহির হয়, সেই স্থান হইতেই ফুল ধরিতে আরম্ভ

করে। সেই ফুল হইতে শুঁটী জন্মে। ফুল হইতে কচি কচি শুঁটী হইবার পর অনেক সময়ে অনেক জমির শুঁটী শুয়া প্রভৃতি পোকায় খাইয়া নষ্ট করিয়া থাকে। তজ্জন্য অনেক সময়ে বীজ হয় না। অগ্র পশ্চাৎ বপন অনুযায়ী শণের বীজ সুপক্ক হইতেও অগ্র পশ্চাৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রাবণ মাসের শেষ হইতে ভাদ্র মাসের শেষ পর্য্যন্ত শণের বীজ পক্ক হইতে দেখা যায়। শণের শুঁটী গুলি দেখিতে প্রায় আঙ্গুর ফলের ন্যায়। শণের বীজ সুপক্ক হইলে শুঁটীর মধ্যস্থ বীজ গুলি নড়িয়া ঝুম্ ঝুম্ করিয়া বাজিতে থাকে। শণের বীজ পক্ক হইবার পর গাছ শুষ্ক হইতে থাকে। শুষ্ক গাছ পচাইলেও আঁশ বাহির করা যায় না। একারণ বীজ পক্ক হইবার পরই গাছ মরিবার পূর্ব্বেই শণ কাটিয়া ফেলা উচিত। কাজে করিয়াই শণ গাছ কাটিয়া থাকে। শণ গাছ কাটিতে বিলম্ব করিলে অনেক গাছ শুষ্ক হইয়া যায়। এজন্য বীজ পক্ক হইলেই অবিলম্বে শণ গাছ কাটা নিতান্ত আবশ্যক।

মাটকড়াই

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার, A B.L L.B. M B D F.A. লিখিত।

মাটকড়াই (Ground nut) একটি পুষ্টিকর এবং উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী। বেলে মাটীতে সার দিয়া এই সামগ্রীর চাষ করা হয়। ইহা ভাজিয়াই আমাদের দেশে সমধিক ব্যবহৃত হয়। বেলে মাটী এই শস্য উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। লাঙ্গল দিয়া জমীতে সার দিয়া মই প্রদানপূর্ব্বক ড্রিল দ্বারা বা হাতে ছড়াইয়া তাহার উপর চষিয়া ও মই দিয়া আষাঢ় মাসে ইহা বপন করিতে হয়। পরে ভাদ্র মাসে বা আশ্বিন মাসের প্রারম্ভেই মাটকড়াই জমি হইতে উত্তোলন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ব্যবহার করা হয়। মাটকড়াই ঘানিতে মাড়িয়া সরিষার সহিত ভেজাল প্রদানের জন্য দেশী কোলু ও তেলীগণ দ্বারা সজিনা গাছের ছালের সহিত বহুল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সকল তঞ্চকতা পূর্ণ ব্যবসাতেই ত আমাদের খাদ্য সামগ্রী বিশুদ্ধ ভাবে না পাওয়া যাইবার কারণ দেশে এত অধিক রোগের সৃষ্টি হইতেছে।

মাটকড়াই ভাজিয়া কি ধনী কি দরিদ্র সকল সম্প্রদায়ের বঙ্গদেশ বাসীগণ খাদ্য রূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। মেলায়, রাস্তায়, হাটে বাজারে "টাটকা গরম

চিনাবাদাম" রূপ ফিরিওয়ালার যাদুময়ী বচনে কোন বৃদ্ধ, বর্ষীয়সী বা বালক বালিকার মন না টলিয়া যায়। "গরমা গরম, টাট্‌কা চিনাবাদাম" বুলীর এমনই মোহিনী ও আকর্ষণী শক্তি যে সকল দেশেই এই ডাকে সকলকে বাহিরে আসিতে হয়। এই চিনাবাদামই আমাদের দেশের মাটকড়াই। ২৪ পরগণা অঞ্চলে বোড়াল, বাঁশধানী, ডায়মণ্ডহার্বার, মেদিনীপুর, নদীয়া, আসাম, সিঙ্গাপুর, চীন, মরিশশ, পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, আসাউম, নীলনদের দুই পার্শ্ববিধৌত প্রদেশ সমূহ বর্ম্মা, আরাকান, মান্দ্রাজ, লঙ্কা, জাভা, বোর্নীও, মিচিগান, জর্জ্জীয়া, ফেনুচী, ডেলাওয়ার, দক্ষিণ আফ্রিকা, কোচীন, টন্‌কীন্‌, প্রভৃতি দেশে কোটী কোটী মণ চিনাবাদাম, মাটকড়াই বা গ্রাউণ্ড নট্‌ জন্মিয়া থাকে। ইহার চাষে বড় বেশী পাট নাই। তবে বীজ গুলি ভাল হওয়া চাই এবং যাহাতে পোকায় তাহা নষ্ট না করে সেইজন্য মহাদ্রাবণ সোলুশানে বা "বার্দ্দো মিক্‌শ্চারে," অথবা অপর কোন কীট বীজাণুঘ্ন দ্রাবণে ডুবাইয়া মাটীতে পুতিলেই ভাল হয়। এইজন্য আমেরিকা দেশীয় ড্রিল লাঙ্গল বা মেষ্টন লাঙ্গল ব্যবহার করিলে আমাদের দেশের কৃষকগণ অনেক উপকার পাইতে পারেন। মাটকড়াইয়ের খৈল এক উত্তম গো খাদ্য সামগ্রী।

সরকারী কৃষি সংবাদ।

শুক্‌না আবাদ—

শুক্‌না আবাদের অর্থ হয়ত অনেকে বুঝে না। যে সকল ভূভাগে বৃষ্টি অতি কম হয়, যে সকল স্থানের মাটি স্বভাবতঃ রসহীন, যাহাতে সামান্য পরিমাণ ঘাস ব্যতীত অন্য কোন বন জঙ্গল হয় না সেই সকল ভূভাগকে শুক্‌না ভূভাগ নাম দেওয়া যাইতে পারে। এই সকল জমিতে চাষ আবাদ করিয়া যদি ফসল ফলান যায় তবে তাহাকে শুক্‌না আবাদ (Dry Farming) বলা যাইতে পারে। আমেরিকা মহাদেশে এমন অনেক অতি বিস্তৃত ময়দান পড়িয়া আছে। তথায় অনেকানেক ব্যবসায়ী সম্প্রদায় গো মেষাদি চরাইয়া পশু পালনের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। তাঁহারা অতি সুবিধামত করে এই সকল জমি ব্যবহার করিতে পারেন, কারণ ঐরূপ প্রকার জমি হইতে জমিদারগণের অন্য কোন রকম আয়ের সম্ভাবনা, নাই সুতরাং তাঁহারা যাহা কিছু পান তাহা লইয়াই জমি বিলি করিতে রাজি হইয়া থাকেন।

যে সকল জমিতে রস আদৌ নাই, যাহা মরুভূমির মত তাহাতে চাষ হওয়া সুকঠিন। কিন্তু যাহাতে সামান্য পরিমাণে রস আছে তাহাতে সুচাষ দ্বারা ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হইতে পারে। কোন এক সম্প্রদায় লোকে উদ্যোগী হইয়া এই সকল জমিকে চাষের জমিতে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ভারতে রাজপুতানায়, মধ্য প্রদেশে, সিংভূমে এই প্রকারের বহুবিঘা জমি পতিত রহিয়াছে। যে সকল স্থানে বৎসরে ১০ হইতে ২০ ইঞ্চ পর্য্যন্ত বারিপাত হয় সেই সকল প্রদেশেও শুক্‌না আবাদ প্রবর্ত্তন করা চলিতে পারে। ভারতীয় কৃষি-বিভাগ যাহাতে ভারতে এই রকম শুক্‌না আবাদের প্রবর্ত্তন করেন তজ্জন্য সকলেই সমুৎসুক আছে। ভারতীয় কৃষি বিভাগ এই কারণে সিন্ধুদেশের ডেপুটী ডিরেক্টর হেণ্ডারসন সাহেবকে আমেরিকায় শুক্‌না আবাদ পরিদর্শন করিতে পাঠাইয়া ছিলেন। তিনি ১৯১১ সালে আমেরিকার যুক্তপ্রদেশের প্রান্তরে শুক্‌না আবাদ সমূহ পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন।

উত্তর টেক্‌সাস্ এবং নূতন মেকিসকো প্রদেশের প্রান্তর গুলি অনেকাংশে ভারতীয় প্রান্তরের অনুরূপ। তথাকার পাট্‌কিলে রঙের মাটি, তাহার উপর ভারতের মত গোঘাস, ভূমির গায়ে ছোট ছোট পাহাড় থাকায় বন্ধুর ইত্যাদি লক্ষ্য করিলে মনে হয় যেন আমরা দাক্ষিণাত্যের ভূভাগে আসিয়াছি। এখানকার সর্ব্বোচ্চ তাপের পরিমাণ ১১০ F.।

শুকনা আবাদ প্রবর্ত্তিত করা যাইবে কি না দেখিতে গেলে নিম্ন লিখিত কয়েকটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করিতে হইবে।

১। জমি সম্পূর্ণ নিরস কি না,

২। কি পরিমাণ বৃষ্টি হয়, বৎসরের কোন্ কোন্ সময় হয়, কি পরিমাণ বৃষ্টি বারি জমিতে শোষিত হয়, কি পরিমাণ গড়াইয়া চলিয়া যায়,

৩। উত্তাপ কত বাড়ে, কত কমে, তুষার পাত হয় কি না, 'লু' চলার মত গরম বাতাস বহে কি না,

৪। মাটির প্রাকৃতিক গঠন কি প্রকার, রস ধারণ ক্ষমতা আছে কি না। স্বাভাবিক স্থান, পাহাড় নিকটে থাকিলে, দুইটি পাহাড়ের মাঝে জমিতে জল রক্ষার সুবিধা আছে কি না।

শুষ্ক স্থানে আবাদ করিতে হইলে কেহ লাঙ্গল দ্বারা গভীর চাষ দিতে বলেন, কেহ বা তাহার বিরোধী। কেহ গ্রীষ্মে জমি ফেলিয়া রাখিতে বলেন, কেহ জমি চষিয়া তাহার উপর রোলার চালাইয়া মাটি চাপিয়া রাখিতে বলেন ইত্যাদি অনেক মতামত আছে। একটা কথা সকলেই মানেন যে জমির উপরের দুই ইঞ্চি মাটি সম্পূর্ণ ধুলার মত গুঁড়া করিয়া রাখিলে, বিশেষ উপকার হয়—এইরূপ অবস্থায় কৈশিক আকর্ষণে জল উবিয়া যাইতে পারে না, এবং এই প্রকার মাটিতে বৃষ্টি বারি সহজে শোষিত হয়। আসল কথা এই যে জমিতে যাহাতে অধিক বৃষ্টি বারি রক্ষা করা যায় এবং যাহাতে অধিক রস রক্ষা করা যায় এই চেষ্টাই করিতে হইবে। তাহা করিতে পারিলে প্রত্যেক বৃষ্টি পাতের পরে কোন না কোন শস্য উৎপাদন করা সম্ভব হইতে পারে।

আমেরিকার কৃষি-বিভাগ কোন একটি বাঁধা ধরা নিয়ম প্রচার করেন না। চাষাবাদের যেমন নিয়ম আছে যেখানে যেমন সাজে সেই অনুসারে কার্য্য করিতে তাঁহারা উপদেশ দেন। যে সকল শস্য অপেক্ষাকৃত নিরস জমিতে হওয়া সম্ভব তাঁহারা তাহারই সন্ধান বিশেষ করিয়া করিয়া থাকেন। অনাবৃষ্টি সহ, নিরস স্থানের উপযুক্ত বৃক্ষ, লতা, শস্যের সন্ধান করিয়া তাঁহাদের লোকজন নানা দিক দেশে ফিরিতেছে।

যুক্ত প্রদেশের এমারিলো নামক স্থানে কয়েকটি শুকনা আবাদ পত্তন হইয়াছে। এতদঞ্চলে প্রায় ১৫ ইঞ্চের অধিক বৃষ্টিপাত হয় না। এইখানে চাষীরা জোয়ার, ভুট্টা, বরবটির চাষ করে। যে বৎসর বৃষ্টি অধিক হয় সে বৎসর ফসল মন্দ হয় না কিন্তু প্রতি বৎসর ফসল পাওয়া কঠিন। চাষে অধিক পয়সা খরচ করিলে পোষায় না। জমি ফেলিয়া রাখিলেও বিশেষ লোকসান হয়। যদি তাহারা একর- (৩॥ বিঘা) প্রতি ১৫ বুসেল (১ বুসেল=প্রায় ১ মণ) শস্য এক বৎসর অন্তর পায় তাহা হইলেও ধন্য মনে করে। তবে জমিতে বাঁধ দিয়া জল বাঁধিয়া রাখার

উপায় করিতে পারিলে স্বতন্ত্র কথা। কাছে নিকটে উভয় পাশে পাহাড় না থাকিলে এরূপ সুযোগ কদাচিত ঘটে।

গ্রীষ্মকালে জমি ফেলিয়া রাখা কিম্বা ১০ ইঞ্চ গভীর কর্ষণ করিয়া রোলার দ্বারা জমি চাপিয়া রাখা ভাল কিন্তু তাহাতে ব্যয় অধিক হয় সুতরাং তাহা সাধারণ চাষীর পক্ষে সম্ভব নহে।

এই প্রকার বড় বড় প্রান্তরে কলের লাঙ্গলে চাষ করা মন্দ নহে। ইঞ্জিন বসাইয়া লাঙ্গল চালাইতে পারিলে আরও ভাল হয়। এমন বহু বিস্তৃত ক্ষেতে ইঞ্জিন-বলে লাঙ্গল চালান বড় সুবিধা জনক। যেখানকার মাটি নিরস বা শীঘ্র রসহীন হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা তথায় যতশীঘ্র লাঙ্গল মৈ দেওয়া সমাধা হয় ততই ভাল। বড় ধনী না হইলে এত পয়সা খরচে অগ্রসর হইতে পারিবে না। তাঁহারা যে অর্থ ব্যয় করিবেন তাহার কতটা সদ্ব্যবহার হইল তাহাও মধ্যে মধ্যে খতাইয়া দেখা আবশ্যক।

এমারিলো ক্ষেত্রে বর্ষাবসানে ৮ ইঞ্চ গভীর চাষের ব্যবস্থা আছে এবং বর্ষারম্ভে উপর উপর ৪ বার জমি চষিতে হইবে। ৩॥ ফিট অন্তর লাঙ্গলের শীরালে শস্য বপন করা হয়, প্রত্যেক সারিতে একটা গাছ হইতে আর একটা গাছ ১ ফুট ব্যবধান থাকে। ঘন বীজ বুনিয়া বিশেষ অধিক ফল হয় না। জোয়ার, বাজরা, বরবটি ক্রমান্বয়ে পাল্টাপাল্টি এই কয়টি শস্য লইয়া তাহারা দিনাতিপাত করে।

শুকনা আবাদ সম্বন্ধে সাধারণতঃ কেহ যেন ভুল ধারণা করিয়া না বসেন,

যে, ইহার বাঁধা ধরা পদ্ধতিতে চাষ কার্য্য সম্পাদন করা যায়,

যে, ভূমি গভীর বা অনতি গভীর কর্ষণ করিলে ভাল বা মন্দ ফল হইবে,

যে, গভীর চাষে এতদঞ্চলের মাটির অধিক রস ধারণ ক্ষমতা জন্মিবে,

যে, এক বৎসর জমি ফেলিয়া রাখিয়া পরবর্ত্তী গ্রীষ্মকালে জমি চষিতে আরম্ভ করিলেই অধিক ফসল হইবে,

যে, শুকনা জমি চাষ আবাদের কোন নির্দ্ধারিত নিয়ম কানুন আছে ইত্যাদি।

তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, ভারতে আমেরিকার মত বিস্তর প্রান্তর পড়িয়া আছে তাহাতে অনাবৃষ্টি সহ ও নিরস মাটির উপযুক্ত, বৃক্ষ, লতা, শস্যাদি আবাদ করিয়া পরীক্ষা করা বাঞ্ছনীয়। এবম্প্রকার আয়কর বৃক্ষলতা বিদেশ হইতে আনাইয়া চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

ভারতে যে সকল স্থানে শস্য ভাল হয় না বা যেখানে দুর্ভিক্ষ্য লাগিয়াই আছে তথায় জমি অপেক্ষাকৃত সরস মিলিলেও তথাকার চাষীরা হলবাহী বলদের অভাবে চাষ করিতে পারে না। হলবাহী বলদাদির যোগাড় করিয়া দিতে পারিলে বোধ হয় ঐ সকল স্থানের দুর্ভিক্ষ কতকটা কমাইয়া আনা যায়। স্থানীয় গবাদি এত দুর্ব্বল যে তাহারা লাঙ্গল মৈ টানিতেই পারে না এবং এক বৎসর খাদ্যাভাবে

সমূলে মরিয়া যায়। বলদাভাবে বা রুগ্ন বলদ দ্বারা কাজ চলেনা সুতরাং এই সকল প্রদেশে হল চালনের সুব্যবস্থা আগে আবশ্যক। পানীয় জলের জন্য কূপ খনন ভিন্ন উপায় নাই। আর্টিফিসিয়াল টিউব কূপ খননে বোধ হয় সুবিধা হইতে পারে।

ধানের ক্ষেতে ধঞ্চে সার—

বৰ্দ্ধমান গভর্ণমেণ্ট কৃষি-ক্ষেতে দেখা গিয়াছে যে, একর প্রতি (৩॥ বিঘায়) ৩ মণ হাড়ের গুঁড়া এবং ১ মণ সোরা ব্যবহার করিয়া ৩০ মণ ধান উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু ধঞ্চের সবুজ সার ব্যবহার করিলে ধানের ফলন ২৯।০ মণ হইয়া থাকে। ৩ মণ হাড়ের গুঁড়া এবং ১ মণ সোরা জমিতে প্রয়োগ করিতে হইলে অন্যূন ২২৲ টাকা খরচ পড়িবে, কিন্তু ১০৲ টাকা খরচে জমিতে ধঞ্চে বুনিয়া সারের কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে। অতএব ধানের ক্ষেতে ধঞ্চে সার প্রয়োগ করাই অধিকতর লাভজনক বোধ হইতেছে।

বৰ্দ্ধমানে আখ—

বৰ্দ্ধমান অঞ্চলে বিনা সারে আখের আবাদ করিলে এক একরে (৩॥ বিঘায়) ৩৬ মণ গুড় উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। রাজসাহীর মাটি কিন্তু ইক্ষু চাষের অধিকতর উপযুক্ত বলিয়া মনে হয়। তথায় বিনা জল সেচনে এবং সামান্য সারে এক একরে এত আখ জন্মায় যে একরে প্রায়ই ৭২ মণ গুড় পাওয়া গিয়া থাকে। এক একরে ১৫০ মণ মাত্র গোবর সার ব্যবহার করিলেই যথেষ্ট সার দেওয়া হইল।

রাজসাহীতে চারি প্রকার ইক্ষুর পরীক্ষা—

ঢাকা গাণ্ডেরি	...	...	গুড়ের পরিমাণ ৬৯ মণ একর প্রতি
ভেণ্ডামুখী (রঙ্গপুর)	...	...	„ „ ৭৯৲ „ „ „
শ্যামসাড়া (হুগলী)	...	...	„ „ ৮১ „ „ „
খড়ি (স্থানীয়)	...	...	„ „ ৬১ „ „ „

এখানে শ্যামসাড়া ও ভেগুামুখীর ফলন অধিক হইলেও স্থানীয় লোকে খড়ি আখের আবাদ করিতে ভাল বাসে, তাহার প্রধান কারণ এই যে খড়ি আখ, কম খরচে, অল্প আয়াসে চাষ করা যায় এবং খড়ি অধিকতর অনাবৃষ্টি সহ এবং শৃগালাদি জন্তু সহজে ইহা তছরূপ করিতে পারে না।

রাজসাহী গভর্ণমেণ্ট ক্ষেতে আলু—

মাঝারি বীজ আলু বসান শ্রেয়ঃ কারণ রাজসাহী ক্ষেতে পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে বীজ আলু যত ওজনের বসান যাইবে উৎপন্ন ফসলও অনুপাতে ততোধিক হইবে। কিন্তু খুব বড় আলু বসাইলে সেই অনুপাতের ঠিক থাকে না এবং খরচের অনুপাত খুব বাড়িয়া যায়। সেইজন্য মাঝারি আলু বসানই ভাল।

দার্জিলিঙ মাঝারি ও ছোট আলু বসাইবার ফলাফল—

	ক্ষেত একর	বীজ	উৎপন্ন আলু একরে
দার্জিলিঙ মাঝারি	½	৩॥ মণ	৮৩॥ মণ
,, ছোট	½	১॥ ,,	১৬॥ ,,

[আমরা কিন্তু পাটনা লাল টিকুরি আলু বসাইয়া দেখিয়াছি যে তাহাতে ছোট বড় বীজের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। ছোট কুলের মত বীজ আলু বসাইয়া এবং সামান্য মাত্রায় সার ব্যবহার করিয়া একরে ১৮০ মণ আলু ফলাইতে পারা গিয়াছে। কৃঃ সঃ]

বাঙলায় তিলের আবাদ—

বর্ত্তমান বর্ষে (১৯১৩-১৪) সালে তিলের আবাদ কম হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষের জমির পরিমাণ ১৮৩,৮০০ একর মাত্র। বিগত বর্ষে ২০০০,১০০ একর জমিতে তিলের আবাদ হইয়াছিল।

একর প্রতি ৪ মণ তিল জন্মিয়াছে ধরিয়া লইলে বর্ত্তমান বর্ষে ২১,৮০০ টন তিল জন্মিয়াছে। বিগত বর্ষের উৎপন্ন তিলের পরিমাণ ২৪,৭০০ টন ছিল।



অগ্রহায়ণ, ১৩২০ সাল।

ভারতে ফলের বাগান রচনা।

বাগান তৈয়ারি করিতে গেলে জমিটি আগে পরিষ্কার করিয়া লওয়া আবশ্যক এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কারণ অপরিষ্কৃত ভূমিতে উদ্যান রচনা করিলে পরিণামে বিষম অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। ফলের বাগান বলিলে আমরা যে কেবল আম, লিচু, লকেট, পেয়ারা, ন্যাসপাতি গাছের কথাই ধরিব এমন কিছু নিয়ম নাই, শসা, কলা, আতা, পেঁপে, টেঁপারি, ষ্ট্রবেরীও ফলের বাগানে স্থান পাইয়া থাকে। যদি বাগানের জমি সম্পূর্ণ আগাছা কুগাছা শূন্য না থাকে তবে তাহাতে টেঁপারি প্রভৃতির আবাদ অসম্ভব, পেঁপে, কলা, আতার আবাদও নির্ব্বিঘ্নে করা যায় না। আম, জাম, লিচু, নারিকেল প্রভৃতি ফলের গাছ বসাইয়া তার পর বাগান ক্রমশঃ সাফ করিয়া লইলেও লওয়া যায় বটে কিন্তু দেখা যায় যে আগে বাগানটি বেশ পরিষ্কার করিয়া লইয়া, জমির উঁচু নিচু স্থান গুলি সমতল করিয়া লইয়া, জমির জল নিকাশী পয়োনালা ঠিক করিয়া লইয়া গাছ বসানই সুবিধাজনক। সুরুতে জমি পরিষ্কারের কাজটা একটু ভাল হইলে, পরে বাগান সাফ্ রাখার খরচ এবং কষ্টের অনেক লাঘব হয়। আমরা এমন কথা বলিতেছি না যে যিনি একটি হাজার বিঘা ফলের বাগান করিবেন তাঁহাকে সমস্ত জমিটা এককালে পরিষ্কার করিয়া লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। জমিটিকে বহু খণ্ডে ভাগ করিয়া লইয়া এক এক খণ্ড সাফ্ করিয়া লইতে হইবে এবং তাহাতে গাছ বসাইবার কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে; নতুবা দীর্ঘকাল ধরিয়া কেবল বাগান পরিষ্কার করার কার্য্য চলিতে থাকিলে এবং তাহার মধ্যে কোন দিক দিয়া কোন রকমে একটি পয়সা না আসিলে, ধনী, কিম্বা কর্ম্মী সকলকেই নিরুৎসাহ হইয়া পড়িতে হইবে। অর্দ্ধ পরিষ্কৃত কিম্বা অসম্পূর্ণ পরিষ্কৃত ভূমিতে অস্থায়ী ভাবে এমন

সকল বৃক্ষ লতা রোপণ করা চলে যে তাহাতে দু পয়সা লাভ হইতে পারে। মনে করুণ যদি জমিটিতে একটি পুষ্করিণী বা ঝিল খুদিবার আবশ্যক হয় তাহার পাড়ের উপর কলা ও পেঁপে গাছ যত শীঘ্র বসান যায় ততই ভাল। এরূপ তোলা মাটিতে লাউ, কুমড়া, পুঁই গাছ অতি শীঘ্র বাড়ে এবং অতি অল্প সময়ে বেশ দু পয়সা আসিতে পারে। এমন অনেক স্থান আছে যে যেখানে কলা হইবে না কিন্তু ভারতের সর্ব্বত্র, অতি শীত প্রধান পার্ব্বত্য ভূমি হইতে নিম্নবঙ্গের ধান ক্ষেতের পাশে বাগানেও, পেঁপে ফলিবে এবং লাউ কুমড়া পুঁই অবাধে জন্মিবে।

বাগান বসাইবার পূর্ব্বে আর একটি কার্য্য করিয়া লইতে পারিলে ভাল হয়। যে জমির উপর বড় গাছ বা লতা ওয়ালা বন থাকে তাহার মাটি, লতা, পাতা, গাছ, পচা সারে বেশ সারবান থাকে। বন কাটিয়া তাহাতে যে কোন গাছ বসাইলে উদ্ভিজ্জসার পাইয়া সহজে বাড়িতে থাকে। কিন্তু এমন জমি আছে যে তাহাতে উদ্ভিজ্জ সার বা বোদ মাটি নাই, বা এত অল্প আছে যে তাহাতে নবরোপিত বৃক্ষাদির সম্পূর্ণ সারের কার্য্য হয় না। এমন অবস্থায় যদি অপেক্ষা করা সম্ভব হয়, তবে জমিতে লাঙ্গল মৈ দিয়া পাট, শণ বা ধঞ্চে বীজ বপন করিয়া, পাট, শোণাদির চারা জমির সহিত চষিয়া লইয়া তৎপরে বৃক্ষাদি রোপণের ব্যবস্থা করিলে, কাজটা বেশ সুচারু হয়। কিন্তু অনেকে এতটা সময় ক্ষেপ করা যেন যুক্তি মনে করেন না। অধিকাংশ স্থলে কিন্তু এই উপায়ই খুব প্রশস্ততর বলিয়া মনে হয়। জমির ঘাসমারা বড় সুকঠিন ; জমি চষিয়া শণ, ধঞ্চে, বুনিতে পারিলে জমির ঘাস সমস্ত নিশ্চয় মরিয়া যাইবে। স্থূলতঃ বাগান বসাইবার পূর্ব্বে দেখিব যে জমিটি পরিষ্কার করা হইয়াছে কিনা, জমিতে বোদ মাটির ভাগ আছে কিনা, জমিতে উপযুক্ত পরিমাণ চুণের ভাগ আছে কিনা কিম্বা কমিয়া যাইতেছে কিনা, জমির জল নিকাশ হইতেছে কিনা এবং জমিতে জল যোগাইবার উপযুক্ত ব্যবস্থা হইয়াছে কিনা। এই সমস্ত ঠীক করিয়া লইয়া তবে কোন্ গাছ কোথায় বসাইব তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ভারতের মত বিভিন্ন জল হাওয়ায় কোন্ স্থানে বাগান করিবার জমি নির্দ্দিষ্ট হইল জানিতে না পারিলে বাগানে কোন্ গাছ বসান কর্ত্তব্য বা কোন্ গাছ বসাইলে লাভ হইবে বলা কঠিন।

বাঙ্লা দেশের ২৪ পরগণায় যদি দাড়িম্, ন্যাশপাতির আবাদের চেষ্টা কর তবে তোমার চেষ্টা ফলবতী হইবে না। ঐ সকল বৃক্ষ তোমার বাগানের শোভা বর্দ্ধন করিয়া থাকিতে পারে কিন্তু তোমাকে আয়ের মুখ দেখিতে দিবে না।

আম, লিচু গাছ ২৪ পরগণায় অনেক আছে বটে কিন্তু আম, লিচুর বড় বাগান এতদঞ্চলে নাই। আম মালদহে যেমন ফলে, ২৪ পরগণায় তেমন ফলে না। ২৪ পরগণায় আম গাছ এক বৎসর ফলিলে দুই বৎসর আর সেই গাছে ফল হয় না, সুতরাং ২৪ পরগণাতে বড় আম বাগান করিয়া লাভ নাই। পাটনা, মজঃফরপুরে, মুর্শীদাবাদে, ভাল আম, লিচুর একটা কেন্দ্র। ঐ সকল জায়গায় আম, লিচুও খুব উৎকৃষ্ট সুতরাং ঐ সকল স্থানে আম, লিচুর বড় বাগান করিতে পারা যায়। একটা বাগানে অন্ততঃ ৫০০০ আম গাছ, ৫০০০ লিচু গাছ থাকিলে তাহাকে কতকটা বড় বাগান বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় কারণ আমাদের ভারতবর্ষে কোথাও তদপেক্ষা বড় বাগান কদাচিৎ দেখা যায়।

কাশীর ল্যাঙড়া আম প্রসিদ্ধ, কাশীর পাতি লেবুও ভারত বিখ্যাত। কাশী, গয়া, এলাহাবাদে যেমন পাতি লেবু জন্মে তেমন কি বাঙলা দেশের রসা মাটিতে জন্মান সম্ভব? কখনই না; বাঙলা রসা মাটিতে গাছ খুব তেজে হয় কিন্তু ফল তত হয় না; কাশীতে গাছে পাতা থাকুক না থাকুক ফলে ডাল ভাঙ্গিয়া যাইবে। এই জন্য আমাদের স্থান ভেদে বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষ লতা রোপণের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বাঙলায় রসা মাটিতে এবং আর্দ্র জল হাওয়ায় সর্ব্বত্র কলা, পেঁপে, জামরুল, আনারস, কাঁটাল অনায়াসে জন্মিবে। আতা বাঙলাদেশে যেমন হয় অন্যত্র তেমনটি হয় না। হালকা বেলে মাটিতে, নদীর চরে তরমুজ যেমন হইবে বাগানের ভারি মাটিতে তেমন জন্মিবে না। সেই জন্য গোয়ালন্দের, ব্রহ্মপুত্রের চড়ায়, গঙ্গা যমুনার চড়ায় এবং সিন্ধু নদের চড়ায় আমরা তরমুজ দেখিতে পাই। কিন্তু নদীর চড়ায় আঙ্গুর খুঁজিলে পাওয়া যাইবে না, আঙ্গুরের জন্য বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। দাক্ষিণাত্যে, পঞ্জাবে, সীমান্ত উচ্চ প্রদেশে, এমনকি কলিকাতার আশে পাশে আঙ্গুর ক্ষেত করা চলে।

পাটনাতে ন্যাসপাতি গাছ বিস্তর আছে। তথায় ফলেও ভাল কিন্তু ফল তত ভাল হয় না। মোটের উপর কিন্তু দেখা যায় ভারতের সমতল ভূমির ন্যাসপাতি অপেক্ষা পাহাড়ের ন্যাসপাতি ভাল। হিমালয়ের পাদদেশে পাহাড়িয়া জায়গায় ন্যাসপাতি খাইতে খুব সুস্বাদু। অতএব ন্যাসপাতির বাগান করিতে হইলে ঐ অঞ্চলে করাই ভাল।

বাঙলা দেশে বা আসামে লিচু ভাল হয় না কিন্তু লকেটের এই সকল স্থান বেশ মনের মত। রসা মাটি এবং আদ্র জল হাওয়া লকেট যখন খুব ভাল বাসে তখন আসামে এবং বাঙলায় লকেটের বাগান করাই সুবিধা জনক।

আবার আমরা দেখিতেছি পাটনা, এলাহাবাদ, কাশী প্রভৃতি স্থান পেয়ারা বাগানে ছাইয়া রহিয়াছে। পেয়ারা কিন্তু বাঙলায় বেশ হয়; আসাম বা বাঙলায় পেয়ারা বাগান করিলে তোমার লাভ হইবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

খরমুজ কিম্বা ফুটি বা গোমুখ জাতীয় ফল পাটনা বা পশ্চিমাঞ্চলেই ভাল হয়, কাঁকড়ি ও তথায় হইয়া থাকে কিন্তু কাঁকুড় বা শসার জন্য যেন বাঙলার মাটিই ভাল হয়। বাঙলা বা আসামের মত শসা অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় না।

পার্ব্বত্য প্রদেশে বাতাবী লেবু হয় না কিন্তু সমতল ভূমিভাগে প্রায় সর্ব্বত্রই বাতাবী হইয়া থাকে। কাগজী, সরবতী লেবু বাঙলার সর্ব্বত্র প্রচুর জন্মে। বাঙলায় এই সকল লেবুর চাষে বিশেষ লাভ আছে।

নারিকেল, শুপারি নিম্ন বঙ্গ ছাড়াইয়া যত উত্তর বা পশ্চিমে যাইবে তত আর দেখা যাইবে না। একটু উঁচুতে, পাহাড়ে নারিকেল, শুপারি নাই বা পশ্চিমে রসহীন মাটিতে উহা জন্মিতে দেখা যায় না। হুগলী ছাড়াইয়া বর্দ্ধমানে নারিকেল বিরল; গাছ হয় না, যদি বা গাছ হয় তবে ফল হয় না। খেজুর সর্ব্বত্র হয়। ভাল খেজুর, আরব বা পারস্য দেশের খেজুর—রাজপুতনা উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে খেজুরের ভাল আবাদ হইতে পারে। বাঙলায় না হইবার কারণ দেখা যায় না। নারিকেল, শুপারি, খেজুর, লবণাক্ত জমিই ভাল বাসে। তাহাদের সারে সোরা ব্যবহার করিতে হয়। সুতরাং তাহা বাঙলায় না হইবে কেন?

সিলেটের পার্ব্বত্য প্রদেশে কমলা লেবুর আবাস। চুণ, ঘুটিঙের মাটিতে কমলা বেশী পরিতৃপ্ত। সেই জন্য নাগপুরেও কমলা হয়। রাঁচি, সিংভুম বা সাঁওতাল পরগণায় না হইবার কারণ দেখা যায় না। তবে বাঙলায় কমলার আবাদ করা নিতান্ত অদুরদর্শিতা বলিয়া মনে হয়।

ব্যবসায়ের জন্য বাগান, বড় বাগান হওয়া চাই। এমেরিকায়, অষ্ট্রেলিয়ায় ফলের বাগানের পরিমাণ দশ হাজার, বিশ হাজার, পঁচিশ হাজার একরের কম নহে। ভারতে সে রকম বাগান একটীও নাই। বাগান বড় হইলেও একটা বাগানে যাবতীয় ফলের গাছ বসাইতে হইবে এ যুক্তি আদৌ ভাল নহে। যে বাগান রচিত হইবে সেইখানকার মাটির ও জল হাওয়ার উপযুক্ত দুই চারি বা দশ প্রকার ফল বাছাই করিয়া লইতে হইবে এবং তাহাদেরই আবাদ প্রচুর পরিমাণে করিতে হইবে।

বাঙলা দেশের ২৪ পরগণায় যদি বাগান আরম্ভ করিতে হয় এবং তোমার বাগান যদি বৃহদাকারের হয়, তবে তাহাতে নারিকেল শুপারির আবাদ করিবে। আম, লিচু ত্যাগ করিয়া কাঁটাল গাছ বসাইবে, বাতাবী ও কাগজী, সরবতী লেবু গাছ বসাইবে। তারপর কলা, পেঁপে, আনারসের প্রচুর আবাদ করিবে এবং

মধ্যে প্রশস্ত ক্ষেত্র রচনা করিয়া শসা, টমাটো, টেঁপারির আবাদ করিবে। যাহা হইবে তাহার আবাদ করাই যুক্তি, যাহা হইবেনা তাহার আবাদ করিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।

কাশীর কুলের আবাদ কাশী, গয়া, পাটনা, এলাহাবাদ অঞ্চলে করাই ভাল। বাঙলায় দেশী কুলের আবাদ কর যাহার জ্যাম, জেলী, টোপাকুল ও আচার তৈয়ারি করিয়া বিদেশে পাঠাও, দেখিবে তাহাতেই তোমার লক্ষ্মী। নাই বা তুমি বাঙলায় দালিম, ন্যাসপাতি করিতে পারিলে তোমার কুলই সব কুল বজায় করিতে পারিবে।

তেঁতুলের কি কম আবশ্যক? বাঙলায় তাল, তেঁতুল, কুল, খেজুর যে অনায়াসে যেখানে সেখানে জন্মায়। কিছু না করিয়া এই কয়টা জিনিষের একটু খোঁজ রাখিলে, এই কয়টা গাছের একটু যত্ন লইলে, তোমার পয়সা খায় কে? সেই জন্য আমরা সর্ব্বদাই বলি যে কাজেই, বিশেষতঃ বাগান বাগিচা করিতে হইলে, অন্ধের মত কার্য্য করা ভাল নহে, সকল দিকে চোখ রাখিয়া কার্য্য করিলে তবে লাভের মুখ দেখা যায়, নতুবা বৃথা পরিশ্রম, বৃথা অর্থব্যয় হয়।

ভাল চারা সংগ্রহ, উদ্যান কর্ত্তার একটি প্রধানতম কার্য্য। নারিকেল চারা বসাইতে হইবে। পাকা ঝুনা নারিকেল ও পাকা শুপারির চারা হয়। কিন্তু অপরিণত বয়স্ক ছোট গাছের নারিকেল বা শুপারির গাছ বসাইলে সেই গাছ ফলিতে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়। কাঁকিনী (অধিক বৎসরের পুরাতন) নারিকেল ও শুপারির গাছের চারা শীঘ্র ফলবান হয়। তোমাকে হয় ঐ রূপ গাছের নারিকেল, শুপারি যোগাড় করিয়া চারা তৈয়ারি করিয়া লইতে হইবে নতুবা ভাল জায়গা হইতে চারা সংগ্রহ করিতে হইবে। কেবল আমরা নারিকেল ও শুপারির কথা বলিলাম। আম, লিচু, জাম, জামরুল, লকেট প্রভৃতি যে কোন ফলের কলম পরিণত বয়স্ক বৃক্ষ হইতে করা উচিত। তাজা গাছের, তাজা ও ফলবান ডালের, তাজা কলম না পাইলে, বাগানে বসাইতে নাই। আমরা বারান্তরে কখন্ গাছ বসাইতে হইবে এবং কিরূপে গাছ বসাইতে হইবে তাহার আলোচনা করিব।

পত্রাদি

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ দে, মোক্তার, নোয়াখালি।

সার ব্যবহারের সময়—রেড়ীর খৈল, সোরা, হাড়ের গুঁড়া, সুপার-ফস্ফেট এই সকল সার কোন্ সময় ক্ষেতে ছড়াইতে হয়?

হাড়ের গুঁড়া গলিতে বিলম্ব হয় সেইজন্য বীজ বপন বা চারা রোপণের কিছু কাল পূর্ব্বে বর্ষারম্ভে ক্ষেতে ছড়াইলে উহা পচিয়া পরবর্ত্তী ফসলের উপকারে লাগে, অন্য সারগুলি বীজ বপন বা চারা রোপণের সমকালে বা দুই এক দিন পূর্ব্বে প্রয়োগ করা চলে। (কৃঃ সঃ)

আলুতে কি সার দিলে বিঘায় ৮০/ মণ আলু হইতে পারে—আলুতে খৈল সার সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বিঘা প্রতি রেড়ির খৈল ৪/০ মণ কিম্বা ৬/০ মণ অথবা সরিষার খৈল ১৫/০ মণ কিম্বা ২০/০ মণ প্রয়োগ করিলে বিঘাতে ৮০/, ৯০/ এমন কি একশত মণেরও অধিক আলু জন্মিতে পারে। কিন্তু ইহা মনে রাখা উচিত যে আলুতে কেবল নাইট্রোজেন যুক্ত সার দিলেই আলুর ফলন বাড়ে না। তাহার সহিত ফস্ফরিক এসিড্ ও পটাস সার দেওয়া উচিত। বোন-সুপার দিলে ফস্ফরিক এসিড এবং ছাই প্রয়োগে পটাস সার মিলিতে পারে। কিন্তু ছাইয়ে পটাসের ভাগ অল্প সেইজন্য অধিক মাত্রায় ছাই না দিলে চলে না। বিঘা প্রতি ৩০ পাউণ্ড মিউরিয়েট অব পটাশ এবং ৫০ পাউণ্ড বোন-সুপার ব্যবহার করিলে এবং উপযুক্ত মাত্রায় খৈল দিলে আলুতে সম্পূর্ণ সার দেওয়া হইল, নতুবা একটি অভাবে আর একটি সারের কার্য্য পূর্ণমাত্রায় হইবে না এবং আশানুরূপ ফলও হইবে না। সম্পূর্ণ সার ব্যবহারে বিঘায় ১২৫/ মণ আলু ফলান বিচিত্র নহে।

শ্রীপুলিনবিহারী বসু, রাধাবল্লবপুর ; রঙপুর।

বেগুন গাছে লাল পিঁপড়া—এক রকম লাল পিঁপড়া আম গাছে বেড়ায় ও বাসা বাঁধে তাহাতে গাছের কোন অনিষ্ট করে না, পরন্তু অন্য পোকা ধরিয়া খাইয়া উপকার করিয়া থাকে। এক রকম লাল লম্বা ধরণের পিঁপড়া বা উইয়ের মত পিঁপড়া কপি প্রভৃতির শিকড় খাইয়া গাছ মারিয়া দেয় (ফসলের পোকা ৯৪ পৃষ্ঠা)। ইহারা মাটির নীচে ঘর করিয়া থাকে, ইহাদের দ্বারা বেগুন গাছের

ফসলের পোকা নামক বেগুন ও অন্যান্য ফসলের পোকার চিত্র দেওয়া আছে ও প্রতিকার ব্যবস্থা আছে দাম ১৷০ টাকা।

অপকার হইতে পারে। এক প্রকার লাল কীড়া বেগুন গাছের ডাঁটার মধ্যে ছিদ্র করিয়া প্রবেশ করে এবং ডাঁটার মাজ কুরিয়া খাইতে থাকে তাহাতে গাছের ডগা শুকাইয়া ঝুলিয়া পড়ে। জলের সঙ্গে কেরোসিন বা ফিনাইল মিশাইয়া গোড়ায় দিলে দুষ্ট পিঁপড়ার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ হইতে পারে। মাজ-পোকায় লাগিলে গাছ গুলি তুলিয়া পুড়াইয়া ফেলা ভাল। ভারতীয় কৃষি সমিতির কীট নিবারক আরোকের জল গাছে ছিটাইলে পোকা লাগিতে পারে না।

শ্রীকুলচন্দ্র দাস, বি, এল, আঃ মেজিষ্ট্রেট্, হিল ত্রিপুরা।

বেলে জমির উন্নতি সাধন—বেলে জমিকে দোয়াঁস জমিতে পরিণত করিবার উপায় জানিতে চান। প্রচুর গোবর সার ব্যবহার করিলে এবং উদ্ভিজ্জ ও পাতাসার যথোপযুক্ত মাত্রায় ব্যবহার করিতে পারিলে এবং সুবিধা থাকিলে পুষ্করিণীর পাঁক মাটি ব্যবহার করিলে বেলে জমির উন্নতি হইতে পারে এবং তাহা অনেকাংশে দোয়াঁস জমিতে পরিণত হইবে। ঘন ঘন জমিতে লাঙ্গল মৈ দিয়া জমির আশু উন্নতি করিয়া লইলে তাহাতে আদা হলুদ বেশ হইবে।

গোজাতির খাদ্য—আজকাল গৃহ পালিত পশুদিগের সস্তায় খাদ্য পাওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারত—কৃষি প্রধান দেশ, কাজেই অস্মদ্দেশে গোশক্তির বিশেষ প্রয়োজনবিধায় গবাদিপশু চাষের ও দুগ্ধের জন্য প্রতিপালন করা কৃষক-দের অনিবার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং তাহাদের সস্তায় খাদ্য সংগ্রহ করা একটি সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদেরই খাদ্য সামগ্রী দুর্ম্মূল্য হওয়ায়, জোটা মুস্কিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং জীবন সংগ্রাম অতিক্রম করিয়া রক্ত মাংস একত্র রাখা দুরূহ, তার পর গোরু বাছুরের খাদ্য সংগ্রহ করা আমাদের দেশের গৃহস্থ লোকেদের পক্ষে সুদূর পরাহত!!! বস্তুতঃ এবিষয়ে চিন্তা করা একটি প্রয়োজনীয় বিষয় হইয়াছে।

আমাদের দেশে সাইলোতে খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া রাখার প্রথা আমে-রিকা বা ইউরোপ খণ্ডের মত নাই। পশুখাদ্য সংগ্রহের জন্য "সয়লিং" বা কাঁচা খাদ্য উৎপাদন করিয়া তাহা খাওয়াইবার ব্যবস্থা আদৌ নাই, জমীদার মহোদয়গণের অর্থলিপ্সায় ক্রমে ক্রমে চারণগুলি প্রত্যেক গ্রাম হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। খড় খুব উত্তম খাদ্য না হইলেও আমাদের দেশে গোখাদ্য রূপে বহুল ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং তাহার মূল্যও দুর্ম্মূল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মাঠেও জলাভাবে ঘাস নাই। নিঃস্ব কৃষক এখন করে কি, কি করে তাহার লাঙ্গলা বলদ বাঁচায় ও চাষ করে? এবিষয়ে কোন সহৃদয় কৃষকের পাঠক আলোচনা

করিবেন কি ? আমার বিবেচনায় সয়বীন চাষ, গিনিঘাস, সোরঘম,(যোয়ার বা বজরা) কাফির শস্য, ইক্ষুপাতা, কাঁচাকলার বাসনা, কুঁচি করিয়া সপ্তাহে দুই দিন খইল ও ভুষির সহিত মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে মন্দ হয় না। ইহাতে লবণ ব্যবহারের কাজ হইবে। কিন্তু এই খাদ্য সামান্য পরিমাণে প্রত্যহ দ্বিপ্রহরের জাবের পরিবর্ত্তে "খোঁটায় বাঁধা দোয়াল" গাভীর জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। মদের ভাঁটীর খোস্ত (refuse,) মক্কার ডাঁটার কুট্‌টী, জোয়ার, রাগী, চাজড়ার কুট্‌টী, শুষ্ক ঘাস ইত্যাদিও ব্যবহার করা যাইতে পারে। এসম্বন্ধে মদপ্রণীত "গোপালবান্ধব" নামক পুস্তকের অন্তর্গত গোজাতির খাদ্য বিচার পর্য্যায়টি বিশেষ যত্ন সহকারে পঠনীয়। এ সম্বন্ধে অপরাপর লেখকগণ তাঁহাদের মতামত ও অভিজ্ঞতা লিখিলে ভাল হয়। আর এক কথা বৈজ্ঞানিক উপায়ে ধান্য চাষের বিষয় যেমন নেব্রাস্কা, কলেরেডো, মেক্‌সিকো প্রভৃতি দেশে হয় তাহার বিষয় কোন মহাত্মা কৃষকে ২।৪টা প্রবন্ধ লিখিলে ভাল হয়, অর্থাৎ ধানের সার, রোগ নির্ণয়, স্প্রেইং ইত্যাদি সম্বন্ধে।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র উকীল লিখিত।

সার-সংগ্রহ

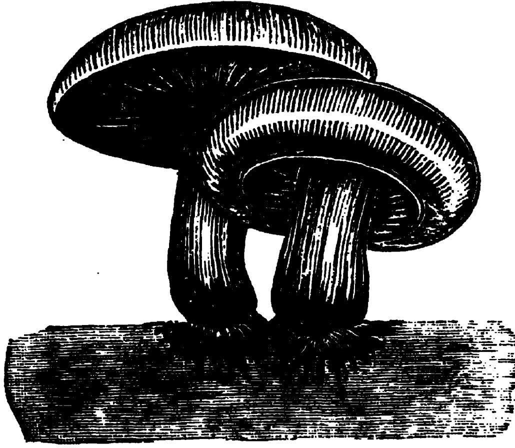
কোঁড়ক বা ভেকের ছাতা

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

পার্শ্বে যে উদ্ভিদের চিত্র প্রদত্ত হইল তাহাকে আমরা কোঁড়ক বলি। সচরাচর লোকে যাহাকে বেঙের ছাতা বলে, ইহা তাহাদিগের এক জাতি। এইরূপ উদ্ভিদ ফুটিলে ছত্রাকা হয়, সেই জন্য ইহাদিগকে বেঙের ছাতা বলে। ফুটিলে ইহারা কিরূপ হয়, পরবর্ত্তী চিত্রে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।



আমরা কোঁড়ক বলি, কিন্তু বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইহার ভিন্ন নাম। কেবল ইহার নহে, অনেক গাছের এইরূপ। উদ্ভিদের কথা বলিতে হইলে কাজেই আমাদিগকে উদ্ভিদ্ শাস্ত্রের নাম ব্যবহার করিতে হয়। সে নাম ব্যবহার করিলে সমগ্র পৃথিবীতে, যাহার উদ্ভিদ্ শাস্ত্রে সামান্য একটু জ্ঞান আছে, সেই বুঝিতে পারে যে কোন্ গাছের কথা আমি বলিতেছি।



ফুটন্ত কোঁড়ক

উদ্ভিদদিগকে প্রথমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—(১) যাহাদের ফল হয় না; (২) যাহাদের ফুল হয়। কোঁড়ক প্রথম শ্রেণীভুক্ত উদ্ভিদ। ইহার ভিতর কয়েক জাতি আছে। এক জাতিকে ফঙ্গি বলে। কোঁড়ক সেই জাতিয় উদ্ভিদ। অনেক ফঙ্গি অতি ক্ষুদ্র হয়। এই বর্ষাকালে জুতার উপর ও অন্যান্য দ্রব্যের উপর যে শ্বেত বর্ণের ছাতা পড়ে, তাহাও ফঙ্গস্ জাতীয় উদ্ভিদ। এই জাতীয় অনেক উদ্ভিদ এত ক্ষুদ্র হয় যে, খালি চক্ষে তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না, অণুবীক্ষণের সহায়তায় কেবল দেখিতে পাওয়া যায়। আজ কালের মত এই যে, নানা প্রকার প্রাণী, অণু ও উদ্ভিদাণু মানুষের শরীরে প্রবেশ করিলে মুহুর্মুহু তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া উৎকট রোগ উৎপাদন করে, সেই সমুদয় উদ্ভিদাণুও ফঙ্গস্ জাতীয় উদ্ভিদ্। কোঁড়ক এক প্রকার ফঙ্গস্। উদ্ভিদ শাস্ত্রে ইহার নাম আগারিকস্ কম্পেষ্ট্রিস্ (Agaricus campestris) ; ইংরেজিতে ইহাকে মশরুম (Mushroom) বলে।

কোঁড়ক মানুষে আহার করে। ইহা ভাজিয়া অথবা ডালনা করিয়া খাইতে হয়। উপরে বড় কোঁড়কের চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। আর এক প্রকার ছোট কোঁড়ক আছে, তাহাও লোকে ভাজিয়া খায়। সাহেবেরা বড় কোঁড়ককে উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী বলিয়া বিবেচনা করেন। সে জন্য তাঁহাদের জন্য বিদেশ হইতে অনেক শুষ্ক কোঁড়ক কলিকাতায় আমদানি হয়।

শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন মাসে কোঁড়ক হয়। সে দিন সুধীর আমার নিকট ক'টা কোঁড়ক আনিয়াছিল। তাহা দেখিয়াই এই প্রবন্ধ লিখিতে আমার ইচ্ছা হইল। সুধীর বলিল যে, আমার বাড়ীর নিকট এক পতিত ভূমিতে এই কয়টা কোঁড়ক হইয়াছিল। কিন্তু ইহাদিগকে রাঁধিতে দিতে আমি সাহস করিলাম না। তাহার কারণ এই যে, কোন কোন কোঁড়ক বিষ, তাহা খাইলে মানুষ মরিয়া যায়।

আড়াই সত বৎসর পূর্ব্বে রুষ সম্রাট আলেক্সিয়সের পত্নী কোঁড়ক খাইয়া মারা গিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ফরাসি দেশে এক সৈনিক পুরুষ প্রাতঃকালে দশটার সময় কোঁড়ক খাইয়াছিলেন, সন্ধ্যা সাতটার সময় তাঁহার উদরে অতিশয় বেদনা উপস্থিত হইল। রাত্রি দশটার সময় তাঁহার স্ত্রীরও সেইরূপ বেদনা হইল। তাহার পর দুই জনেরই ভেদ ও বমি হইতে লাগিল। দুই জনেই ঘোর পিপাসায় ছটফট করিতে লাগিলেন। হাত পায়ে খাল ধরিতে লাগিল। ক্রমে নাড়ী দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। পরদিন প্রাতঃকালে দশটায় স্বামী ও সন্ধ্যা ছয়টার সময় স্ত্রী মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। মূর্খ লোকদিগের ভিতর এরূপ ঘটনা হইলে তাহারা বুঝিতে পারিত না যে, কোঁড়ক খাইয়া হইয়াছে। কোনরূপ পীড়া হইয়াছে, ইহাই তাহারা মনে করে। আমাদের দেশে হইলে লোকে ওলাউঠা মনে করে। কিন্তু আশ্চর্য্য কথা এই যে, ফরাসি সাহেবকে যে লোক কোঁড়ক দিয়াছিল, সপরিবারে সে অবশিষ্ট ভাগ ভক্ষণ করিয়াছিল। তাহাদের কাহারও কিছু হয় নাই। তাহার পর লোক অনুসন্ধান করিয়া দেখিল যে, সে কোঁড়ক গুলিতে প্রথম লবণ মাখিয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া দিয়াছিল। তাহার পর সিদ্ধ করিয়া সে জল ফেলিয়া দিয়া তবে রন্ধন করিয়াছিল।

সচরাচর লোকে যে কোঁড়ক ভক্ষণ করে, তাহার নাম কেবল আমি উপরে করিয়াছি। তা না হইলে প্রায় এক সহস্র প্রকার কোঁড়কের গাছ আছে। আগারিকস্ মস্কেরিয়স্ নামক এক প্রকার বিষ কোঁড়ক আছে। কিন্তু সাইবিরিয়ার উত্তর পূর্ব অঞ্চলে মানুষে ইহা স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ করে। ছোট কোঁড়ক যে বিষ হয়, একথা আমি এ দেশে কখন শুনি নাই। বড় কোঁড়কের কোন্ গুলা বিষ, কোন্ গুলা বিষ নহে, বাহির দেখিয়া তাহা বড় বুঝিতে পারা যায় না। বিষ কোঁড়কের চিহ্ন এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—(১) যাহাদের ছত্র পাতলা; (২) যাহাদের ডাটা ছত্রের এক ধারে, অর্থাৎ মাঝখানে নহে, (৩) যাহাদের ভিতর হইতে দুধের মত রস বাহির হয়; (৪) কিছুক্ষণ ঘরে থাকিলে যাহাদের ভিতর হইতে ময়লা জল বাহির হয়; (৫) যাহাদের ডাঁটার গলায় মাকড়শার জালের ন্যায় পদার্থ থাকে। কেহ কেহ বলেন যে কোঁড়কের নিকট রৌপ্য লইয়া গেলে যদি রৌপ্য বিবর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে জানিবে যে, সে কোঁড়ক বিষ। সোজাসুজি পরীক্ষা এই যে, কাঁচা কোঁড়কের একটু লইয়া চাকিয়া দেখিতে হয়। যদি অল্প মিষ্ট লাগে তাহা হইলে সেই কোঁড়ক বিষ নহে। যদি তিক্ত ও দুর্গন্ধ ও বিস্বাদ বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে সে কোঁড়ক পরিত্যাগ করাই ভাল। হাত দিয়া একটু কোঁড়ক রগড়াইয়া দেখিবে, যদি তাহার শ্বেতবর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া সবুজ বর্ণে পরিণত হয়, তাহা হইলে সে কোঁড়ক পরিত্যাগ করিবে। যদি সবুজ বর্ণে পরিণত

না হয়. তাহা হইলে সে কোঁড়ক খাইতে দোষ নাই। বন্য কোঁড়কে বিষের ভয় থাকে, ইংলণ্ড ফরাসি প্রভৃতি দেশে লোকে চাষ করিয়া যে কোঁড়ক উৎপাদিত করে, তাহাতে বিষের ভয় নাই। ইতালি দেশের রাজধানী রোমনগরে চতুঃপার্শ্বের গ্রাম হইতে লোকে অনেক বন্য কোঁড়ক আনিয়া বিক্রয় করে। কোন্ কোঁড়ক বিষ, কোন্ কোঁড়ক বিষ নহে তাহা পরিক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত এ স্থলে একজন সরকারি কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছে। বিলাতে আগারিকস্ ফালোয়াইডিস্ (Agaricus phalloides) নামক এক প্রকার কোঁড়ক আছে। ইহা ভয়ানক বিষ। ইহার ছত্রে ডিম্ ডিম্ থাকে, সে জন্য অনায়াসে চিনিতে পারা যায়। আমানিটা মস্কেরিয়া (Amanita muscaria) নামক এক প্রকার বিষ কোঁড়ক দ্বারা সুইডেন দেশের লোক মাছি ও ছারপোকা বিনষ্ট করে। কিন্তু কামস্কাটকা দেশের লোক আবার এই কোঁড়ক খাইয়া নেশা করে। কেবল তাহা নহে— যাহারা এই কোঁড়ক খাইয়া নেশা করে, তাহাদের প্রস্রাব পান করিলেও নেশা হয়। যখন দেশে কোঁড়কের অভাব হয়, তখন মানুষ করে কি? নেশা করা তো চাই। যে ভাগ্যবান্ লোক কোঁড়ক খাইয়া নেশা করিয়াছে, অন্য লোককে কাজেই তাহার প্রস্রাবটুকু পান করিয়া নেশা করিতে হয়।

ফরাসি প্রভৃতি দেশে নানাজাতীয় কোঁড়ক জন্মে ও লোকে প্রচুর পরিমাণে ইহা ভক্ষণ করে। এমন কি ইতালি ফরাসি ও জর্ম্মাণ দেশের দুঃখী লোকেরা প্রায় দুইমাস কাল প্রধানতঃ ইহাই খাইয়া প্রাণ ধারণ করে। আগারিকস্ ডিলিসিওসস্ (Agaricus deliciosus) নামক এক প্রকার কোঁড়ক আছে, তাহাতে ঈষৎ কমলা লেবুর গন্ধ থাকে। আর এক প্রকার কোঁড়ক আছে, তাহাতে মৌরির গন্ধ থাকে। জর্ম্মাণি দেশে এক প্রকার বাদশাহি কোঁড়ক আছে। এক জাতীয় ছোট কোঁড়ক আছে, তাহাদের বহু সংখক একত্রিত হইয়া ভূমি হইতে চক্রাকারে উত্থিত হয়। শুভ্রবর্ণের চক্র তাহার চারিদিকে ও মাঝখানে ঘাস, দেখিতে অতি সুন্দর। এরূপ কোঁড়ককে ফরাসি দেশে চাম্পিগনন্ বলে। সে জন্য ফরাসি দেশে যাহারা কোঁড়কের চাষ করে, তাহাদিগকে চাম্পিগনালিষ্ট বলে। বিলাতে এই কোঁড়ক দিয়া কেচপ নামক এস্ বা মশলা প্রস্তুত হয়। ইহা তরল পদার্থ। মাংসের উপর ঢালিয়া দিয়া খাইলে মাংস সুতার হয়। এইরূপ চক্রাকার স্থান পরিত্যাগ করিয়া কোঁড়ক অন্যত্র চলিয়া গেলে, সে স্থানটাতে কিছুদিন আর ঘাস জন্মে না। লোক চলিতে ঘাসের উপর যেরূপ পথ পড়িয়া যায়, সে স্থানটা সেইরূপ দেখায়। লোকে মনে করে যে রাত্রিকালে পরীগণ ঘূর্ণিত হইয়া এই স্থানে নৃত্য করিয়াছিল, সেজন্য ইহা ঘাস শূন্য হইয়াছে। তাই লোকে এরূপ

স্থানকে পরীচক্র (Fairy Ring) বলে। কখন কখন সেই স্থানে পুনরায় সবুজ ঘাস জন্মিয়া চক্রাকার হয়। সেজন্য কবি বলিয়াছেন :—

Merry eines their
morris pacing,
Emerald rings on brown
heath tracing.

এই প্রবন্ধ লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের দেশে সহর অঞ্চলে লোকে যদি কোঁড়কের চাষ করে, তাহা হইলে লাভ হইতে পারে। সাহেবদের ইহা আদরের সামগ্রী। এ দেশে তাঁহারা বিলাত হইতে আমদানি শুষ্ক কোঁড়ক ভক্ষণ করেন। টাটকা কোঁড়ক পাইলে বোধ হয় তাঁহারা অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে পারেন। যে স্থানে পচা কাঠ বা পাতা আছে, তদ্রূপ কোন কোন স্থানে আমাদের দেশে কোঁড়ক আপনা আপনি জন্মে। পুরাতন মেটে ঘরের মেজেতেও আমি কখন কখন কোঁড়ক হইতে দেখিয়াছি। উই ঢিপিতে ছোট কোঁড়ক হইতে দেখিয়াছি। ফুটন্ত কোঁড়ক খাইতে ভাল নহে। ফুটিবার পূর্ব্বে ইহা তুলিয়া লইতে হয়। দেওঘরে থাকিতে আমার বাড়ীতে লোকে ফুটন্ত কোঁড়ক বেচিতে আসিত। তাহাদের মুখে ছত্রাকার ফুটন্ত কোঁড়ক ভাল লাগে। বলিতে গেলে কোঁড়ক, কোঁড়ক গাছের ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। অল্প সময়ের মধ্যেই ইহা মাটি ফুড়িয়া উঠিয়া পরিবর্দ্ধিত হয়। ঠিক কোঁড়ক নহে, কিন্তু এই জাতীয় এক প্রকার উদ্ভিদ আছে, ইংরেজি ভাষায় তাহাকে পভবল্ বলে। ঘাসের ভিতর প্রথম ইহা সামান্য একটু বিন্দুর ন্যায় উত্থিত হয়। তাহার পর দুই চারি দিনের মধ্যে বৃহৎ এক শুভ্র বর্ণের গোলায় পরিণত হয়। আমাদের দেশে পভবল্ কোন স্থানে দেখি নাই। দারজিলিঙে একবার দেখিয়াছিলাম। খাইতে ঠিক কোঁড়কের মত। ট্রফ্ল নামক এইরূপ আর এক প্রকার উদ্ভিদ্ আছে, তাহাও সাহেবেরা অতি আদরে ভক্ষণ করেন। ট্রফ্ল মাটির উপরে হয় না, মাটির ভিতর লুক্কায়িত থাকে। দেখিতে ইহা আলুর ন্যায়। তোমার আমার জ্বালায় ট্রফ্ল মাটির ভিতর কোথায় যে লুক্কায়িত থাকে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। কিন্তু তবুও তাহার নিস্তার নাই। ইহাকে ধরিবার নিমিত্ত মানুষের শিক্ষিত কুক্কুর আছে। ঘ্রাণ দ্বারা সেই কুক্কুর ইহার সন্ধান পাইয়া মানুষকে বলিয়া দেয়। তাহার পর মানুষ প্রায় এক হাত গভীর মাটি খুঁড়িয়া ইহাকে বাহির করে। কোঁড়কের স্বভাব অন্যান্য উদ্ভিদের ন্যায় নহে। অন্যান্য উদ্ভিদ্ সূর্য্যকিরণের সহায়তায় হরিৎবর্ণের পত্রের দ্বারা বায়ু হইতে কারবন গ্রহণ করে ও অক্সিজেন বাষ্প পরিত্যাগ করে। মানুষ ও জীব জন্তুর ন্যায় কোঁড়ক অক্সিজেন গ্রহণ করে ও কারবনের বাষ্প পরিত্যাগ করে।

সেই জন্য ইহার দেহের বর্ণ শ্বেত। অন্যান্য উদ্ভিদের ন্যায় ইহার ফুল হয় না। ইহার দেহের ভিতর অতি সূক্ষ্ম রেণু হয়। তাহাই ইহার বীজ। পরিপুষ্ট হইলে দেহ ফাটিয়া সেই রেণু নিকটস্থ ভূমিতে পতিত হয় অথবা বায়ুবেগে দূর দেশে উড়িয়া যায়। এরূপ রেণুকে স্পের বলে। কিন্তু কোঁড়কের রেণুকে স্পন্ বলে। যে স্থানে কোঁড়ক হয় সেই স্থানের মৃত্তিকায় অনেক বীজ থাকে। সেই স্থানের মাটি আনিয়া কোঁড়কের চাষ করিতে পারা যায়। অনেক সময় লোকের বাড়ীর নিকট ঘোড়ার বিষ্ঠার উপর কোঁড়ক আপনা আপনি জন্মে। বর্ষাকালে লোকের ঘরের ভিতরও দ্রব্যাদিতে শুভ্র বর্ণের ছাতা পড়ে। সে জন্য লোকে মনে করে যে কন্নি জাতীয় উদ্ভিদ্ আপনা আপনি জন্মে, বীজের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তাহা হইলে বায়ুতে ইহার বীজ থাকে, সুবিধা হইলে উদ্ভিদ্রূপে স্ফুটিত হয়। অনেকে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত জড় হইতে জীবের সৃষ্টি করিতে পারেন নাই।

যে স্থানে কোঁড়ক হয়, সে স্থানের মাটি আনিয়া কোঁড়কের চাষ করিতে পারা যায় বটে কিন্তু তাহা অপেক্ষা বিলাতী বীজ ব্যবহার করিলেই ভাল হয়। কারণ তাহা করিলে আর বিষের আশঙ্কা থাকে না। শুনিয়াছি যে, কলিকাতা উইলসন হোটেলে উহার বীজ বিক্রীত হয়। মুসুরি পাহাড়েও মাটি মিশ্রিত বীজ বিক্রীত হয়। এক সের এইরূপ মাটির মূল্য দুই টাকা চারি আনা। খোলা ভূমিতে অথবা বৃক্ষতলে অথবা ঘরের ভিতর কোঁড়কের চাষ করিতে পারা যায়। ঘোড়ার নাদি ইহার প্রধান সার। তাহার সহিত পচা পাঁক অথবা পচা পাতা মিশ্রিত করিয়া ভূমি প্রস্তুত করিতে হয়। তাহার পর এক হাত উচ্চ আল করিয়া তাহার উপর বীজ বপন করিয়া উত্তমরূপ পিটীয়া দিতে হয়। বিলাতে সহর অঞ্চলে মাটির নিম্নে ঘরের ভিতর লোকে ইহার চাষ করে। ঘরের প্রাচীরের গায়ে একটীর উপর আর একটী স্তরে স্তরে আলমারী করিয়া তাহার উপর মৃত্তিকা ও সার দিয়া লোকে ইহার চাষ করে। কাঠের বাক্সর ভিতরও সার ও মাটি দিয়া লোকে কোঁড়ক উৎপাদন করে। আমাদের দেশে কোঁড়কের চাষ এইরূপে করিলে ভাল হয়। ভিজা সেঁতসেঁতে গুদাম ঘরে ইহার চাষ করিবে। এক হাত গভীর করিয়া তাহার মাটী খুঁড়িয়া বাহির করিয়া ফেলিয়া দিবে। তাহার পর নূতন মৃত্তিকা দিয়া সেই স্থান পূর্ণ করিবে। সে নূতন মৃত্তিকা ষোল ভাগের পাঁচ ভাগ বাগানের পচা পাতা, লতা সম্বলিত মৃত্তিকা, দশ ভাগ টাটকা ঘোড়ার নাদি, এক ভাগ ভস্ম বা কাঠ পোড়া ছাই দিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে। এই কয় দ্রব্য উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া দুই দিন রৌদ্রে ফেলিয়া রাখিবে। তাহার পর গুদামের ভিতর লইয়া মেজের উপর বিস্তৃত করিয়া দিবে। তাহার পর সে মাটি তুলিয়া

এক হাত উচ্চে ও এক হাত প্রস্থে সারি সারি আল করিবে। চারি পাঁচ দিন পরে আলের উপর আধ হাত অন্তর কোঁড়কের বীজ বপন করিবে। বীজ বপন করিয়া তাহার উপর মাটি চাপা দিয়া উত্তমরূপে পিটিয়া দিবে। এক মাস পরে তাহার উপর পুনরায় আরও কিছু বাগানের মাটি বিস্তৃত করিয়া দিবে। ভূমি, জল দ্বারা মাঝে মাঝে আর্দ্র করিয়া রাখিবে। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন মাসে বীজ বপন করিতে পারা যায়। দুই কি আড়াই মাস পরে কোঁড়ক ভূমি ভেদ করিয়া বাহির হইবে।

ফরাসি দেশের রাজধানী প্যারিস নগর সুড়ঙ্গের উপর নির্ম্মিত। উপরে রাজপথ, প্রকাণ্ড অট্টালিকা, কুড়ি লক্ষ লোকের বাস, নিম্নে প্রশস্ত সুড়ঙ্গ ও গভীর গহ্বর। সুড়ঙ্গগুলি একত্র করিলে দীর্ঘে প্রায় দশ ক্রোশ হয়। মাটির নিম্নে বার হাত হইতে তিন শত হাত গভীর দেশে সুড়ঙ্গগুলি অবস্থিতি। গৃহনির্ম্মাণের নিমিত্ত পূর্ব্বে লোকে এই স্থান হইতে প্রস্তর কাটীয়া লইয়াছিল। সেই জন্য নগরের নিম্নে এরূপ সুড়ঙ্গ ও গহ্বর হইয়াছে। ইহাদের কিয়দংশ মানুষের মৃত দেহ গোর দিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। সে স্থান হাড়ে পরিপূর্ণ হইয়া আছে। ফরাসি বিপ্লবের সময় অনেক লোকের দেহ এ স্থানে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। তখন প্রতিদিন অনেক মানুষের মাথা কাটা হইত। ঘাতক হাতে, এত মানুষের মাথা কি করিয়া কাটে। তাহার হাতে ব্যথা হইবে সে জন্য ফরাসিরা মানুষের মাথা কাটিবার জন্য গিলটিন নামক কল প্রস্তুত করিয়াছিল। এই কলের সহায়তায় প্রতিদিন কচ কচ করিয়া লোকের মাথা কাটা হইত। গিলটিন যন্ত্রটী না হইলে ফরাসিদের চলে না। সে বার অনেক কষ্টে পণ্ডিচারি হইতে যন্ত্র আনাইয়া তবে ফরাসডাঙ্গায় এক ব্যক্তির গলা কাটা হইয়াছিল। অনেক লোকের অস্থি সুড়ঙ্গের এক ভাগে আছে। উপর ভাগে পৃথিবীর গভীর দেশে অন্ধকারে লোকে কোঁড়কের চাষ করে। প্রতি বৎসর প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকার কোঁড়ক এ স্থানে উৎপাদিত হয়। বার শত লোক ইহার চাষ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। নগরের নিম্নে পৃথিবীর ভিতর সুড়ঙ্গে অনেক লোকের কোঁড়ক ক্ষেত্র আছে। কৃষকদিগকে তাহার জন্য গবরমেণ্টকে খাজনা দিতে হয়। কোন কোন কৃষকের তিন তালা ক্ষেত্র আছে। মাটির ভিতর প্রথম কুড়ি হাত নামিলে, সে স্থানে অনেক ক্ষেত্র। তাহার পর আর দশ হাত নিম্নে নামিলে, সে স্থানে অনেক ক্ষেত্র। তাহার পর আর কুড়ি হাত নামিলে, সে স্থানেও অনেক ক্ষেত্র। কূপের ন্যায় গর্ত্ত দিয়া এক তালা হইতে দ্বিতীয় তালায় ও দ্বিতীয় তালা হইতে তৃতীয় তালায় নামিতে হয়।

কোঁড়ক-কৃষকেরা সহজে কাহাকেও আপনাদের ক্ষেত্র দেখায় না। যাহা হউক, পাঠক এস আমরা একবার পৃথিবীর ভিতর কোঁড়ক ক্ষেত্র দেখিয়া আসি।

এক স্থানে সামান্য একটী কূপ দেখিলাম। কূপে জল নাই, নিবিড় অন্ধকারে পরিপূর্ণ কূপের পার্শ্বে রাশি রাশি ঘোড়ার নাদি পড়িয়া আছে। এই ঘোড়ার বিষ্ঠায় জল দিয়া দেড় মাস ধরিয়া লোকে ইহাকে উল্টাইতে পাল্টাইতে থাকে। একটু পাকিয়া আসিলে কূপপথে নীচে ইহা নিক্ষিপ্ত হয়। তাহার পর সার রূপে কোঁড়কক্ষেত্রে ইহা ব্যবহৃত হয়। ঐ কূপ দিয়া আমাদিগকে সুড়ঙ্গের ভিতর নামিতে হইবে। কূপের মাঝখানে এক খণ্ড কাঠ পোতা আছে। সেই কাঠের গায়ে এ-ফোড় ও ফোড় করিয়া আড়া আড়ি কয়েকটী কাষ্ঠ খণ্ড সন্নিবেশিত আছে। তাহাতে পা দিয়া আমাদিগকে কূপের ভিতর নামিতে হইবে। প্রায় কুড়ি হাত নামিয়া ভূমি পাইলাম। ঘোর অন্ধকার ভূমি কাদায় পরিপূর্ণ। কাদায় আমাদের পা বসিয়া গেল। কৃষক ও আমরা বাতি জ্বালিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কোন স্থান অতি সঙ্কীর্ণ, কোন স্থান প্রশস্ত ঘরের ন্যায়। সাবধান,—এ স্থানটা উচ্চ নহে। বলিতে বলিতে আমাদের মাথা ঠুকিয়া গেল। কোন কোন স্থানে শয়ন করিয়া তবে লোক যাইতে পারে। কৃষক আমাদিগকে বলিল যে, পূর্ব্বকালে লোকে তিন প্রকারে কোঁড়কের চাষ করিত। কেহ ডুমুর কাঠের উপর সার দিয়া তাহার উপর মাঝে মাঝে জল সেচন করিত ; কেহ পপলার নামক বৃক্ষ কাষ্ঠে সুরা মিশ্রিত জল সেচন করিত। কেহ সরেল গাছের পাতা সিদ্ধ করিয়া সেই জল দ্বারা ভূমি সিক্ত করিত। তাহা করিলেই আপনা আপনি কোঁড়ক উৎপন্ন হইত। বীজ বপনের আবশ্যকতা ছিল না। এখন ফরাসী কৃষকেরা প্রথম এক স্থানে বীজ প্রস্তুত করে। বীজ প্রস্তুত হইলে ক্ষেত্রে লইয়া বপন করে। আমরা দেখিলাম যে, ক্ষেত্রগুলি সারি সারি ঘোড়ার নাদি মিশ্রিত মাটির আলে বিভক্ত। এক একটী আল প্রস্থে ও উচ্চে এক হাতের কিছু অধিক। রৌপ্য চূর্ণের ন্যায় এক প্রকার উজ্জ্বল বালুকা ও শুভ্রবর্ণের এক প্রকার মৃত্তিকা দিয়া আলগুলি আচ্ছাদিত। অশ্বপৃষ্ঠে যে ভাবে লোক উপবিষ্ট হয়, সেই ভাবে বসিয়া মজুরগণ আলের উপর বীজ বপন করে। বীজ বপন করিয়া উত্তমরূপে সে স্থানটা পিটিয়া দিতে হয় ; মাঝে মাঝে ক্ষেত্রে জল সেচন করিয়া ভূমি সর্ব্বদাই আর্দ্র রাখিতে হয়। ক্ষেত্রগুলি অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হয়। সুড়ঙ্গের ভিতর সর্ব্বদা বিশুদ্ধ বায়ুর চলাচল আবশ্যক। সে জন্য এক এক স্থানে ভূমির উপর সামান্য এক একটী গর্ত্ত আছে। তাহার নিম্নে কৃষক আগুন জ্বালাইয়া রাখে। অগ্নির উত্তাপে ভিতরের বায়ু লঘু হইয়া উপরে উপরে উঠিয়া যায়। তাহার পর অন্য পথে উপর হইতে বিশুদ্ধ বায়ু আসিয়া সে অভাব পূর্ণ করে। তিন মাস পরে ভূমি ফুড়িয়া কোঁড়ক বাহির হইতে থাকে। বাতির আলোকে সে সময় ক্ষেত্রগুলি অতি সুন্দর দেখায়। কোন স্থানে সামান্য একটু শুভ্রবর্ণের,

বিন্দু হইয়া শিশু কোঁড়ক উপরে উঠিতে চেষ্টা করিতেছে। কোন স্থানে বালক কোঁড়ক তাহা অপেক্ষা একটু বড় হইয়া মাথা বাড়াইতেছে। কোন স্থানে বা পূর্ণবয়স্ক কোঁড়ক কৃষকের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। সুড়ঙ্গের ভিতর পথ হারাইলে আর রক্ষা নাই। কৃষকদিগকে আপনার আপনার স্থানটী উত্তমরূপে চিনিয়া রাখিতে হয়। তথাপি একবার একজন কৃষকের বাতি নিবিয়া গিয়াছিল। অন্ধকারে সুড়ঙ্গের ভিতর সে নিরুদ্দেশ হইয়া পড়িয়াছিল। পল্টনের গোরা আসিয়া অনেক খুঁজিয়া তিন দিন পরে তবে লোকে তাহাকে বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

ফঙ্গস্ জাতীয় উদ্ভিদ্ সকল জীবের শত্রু। প্রাণীদিগের নানা ব্যাধির ইহারা মূল। ধান, গম প্রভৃতি উদ্ভিদ্‌দিগেরও ইহারা পরম শত্রু। কিন্তু ইহাদেরও শত্রু আছে। মাইকোগোন (Mycogona roses) নামক এক প্রকার সূক্ষ্ম উদ্ভিদ্ আছে, তাহাদের আক্রমণে কোঁড়কের সর্ব্বনাশ হয়, এই স্থানে ইহাদের আক্রমণে প্রতি বৎসর কৃষকদিগের প্রায় ছয় লক্ষ টাকার কোঁড়ক নষ্ট হইয়া যায়। ইন্দুরেও অনেক কোঁড়ক ভক্ষণ করে। সে জন্য এই পাতাল পুরীতে কৃষকদিগকে বিড়াল পুষিয়া রাখিতে হয়। পাথুরে কয়লার সহিত কোঁড়কের সদ্ভাব নাই। এক ডেলা পাথুরে কয়লা পড়িয়া থাকিলে তাহার নিকট কোঁড়ক জন্মে না। আবার লৌহের উপর কোঁড়কদিগের ঘোর বিষ দৃষ্টি। যদি কোন মজুরের রাগ হয়, তাহা হইলে কৃষককে জব্দ করিবার নিমিত্ত তাহাকে বিশেষ কিছু করিতে হয় না। ক্ষেত্রের মাঝে মাঝে দুই চারিটা পেরেক পুতিয়া দিলেই হয়। পেরেক দেখিলে দূর হইতে কোঁড়কেরা সাবধান হয়। পেরেকের চারি ধারে অনেক দূর পর্য্যন্ত একটীও কোঁড়ক জন্মে না। কেবল প্যারিস নগরে নহে, ফরাসি দেশের নানা স্থানে লোকে কোঁড়কের চাষ করে।

আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়।—আমরা মণিশঙ্কর গোবিন্দজী বিদ্যাশাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট হইতে তাঁহার ঔষধালয়ের এক খানি অল্‌বাম বা চিত্র পুস্তক পাইয়াছি। তাঁহার এই চিত্র পুস্তক দেখিয়া বেশ বুঝা যায় যে তাঁহার ঔষধের কারবার খুব ফালাও এবং অল্প হইতে ইহা এরূপ বহু বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। ইঁহার আদি ঔষধালয় বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে জামনগরে অবস্থিত। এক্ষণে বোম্বায়ের অন্যত্র ও কলিকাতা, পুণা, মান্দ্রাজ, করাচি, রেঙ্গুন ও কলম্বোতে শাখা ঔষধালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইনি স্থানীয় সংবাদ পত্রাদিতে যেরূপ সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপন দেন তাহাতে তাঁহার কারবার এতদূর বিস্তৃত তাহা অনুমান করা সুকঠিন। পুস্তক

খানিতে অনেকগুলি সুন্দর ছবি আছে, কতকগুলি ছবি কিন্তু ব্যবসায়ের আইন অনুসারে অনুচিত বলিয়া মনে হয়। আমরা বুঝিতে পারি যে তাঁহার ঔষধালয়ের ঔষধের কারখানার, কার্য্যালয়ের প্রকোষ্ঠ গুলির বা ঔষধালয়ের কার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মচারীবৃন্দের চিত্র গুলির সমাবেশ উপযুক্তই হইয়াছে। সম্রাট, সম্রাজ্ঞীর চিত্র বা জামনগরের মহারাজার চিত্র বা তাঁহার নিজের চিত্রেরও সার্থকতা বুঝিতে পারি, কিন্তু মণিভিলা, মণিকুটির বা তাঁহার নিযুক্ত উকিলের বা তাঁহার উত্তরাধিকারীর চিত্রের এই পুস্তকে প্রবেশাধিকার কখনই উপযুক্ত মনে করা যায় না। আমরা বিলাতী ধরণে ব্যবসা করিতে বসিয়া বিলাতী ব্যবসায়ে নিয়ম কানুন গুলি সর্ব্বদা মানিয়া না চলিব কেন ! পুস্তক খানি কিন্তু সুন্দর ছাপা হইয়াছে।

বাগানের মাসিক কার্য্য

পৌষ মাস।

সব্জী বাগান।—বিলাতী শাক্‌সব্জী বীজ বপন কার্য্য গত মাসেই শেষ হইয়া গিয়াছে। কোন কোন উদ্যানপালক এমাসেও পারস্লী (Parsley) বপন করিয়া সফলকাম হইয়াছেন। কেবল বীজ বোনা কেন, কপি প্রভৃতি চারা নাড়িয়া ক্ষেত্রে বসান হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে তাহাদের গোড়ায় মাটি দেওয়া ও আবশ্যক মত জল দিবার জন্য মালিকের সতর্ক থাকিতে হইবে। সালগম, গাজর, বীট, ওলকপি প্রভৃতি মূলজ ফসল যদি ঘন হইয়া থাকে, তবে কতকগুলি তুলিয়া ফেলিয়া ক্ষেত্র পাতলা করিয়া দিতে হইবে। আগে বসান জলদি জাতীয় কপির গোড়া খুঁড়িয়া দিতে হইবে। গোড়া খুঁড়িয়া এই সময় কিছু খৈল দিয়া একবার জল সেচন করিতে পারিলে কপি বড় হয়।

কৃষি-ক্ষেত্রে।—আলু গাছে মাটি দিয়া গোড়া আর একবার বাঁধিয়া দিতে হইবে। পাটনাই আলুর ফসল প্রায় তৈয়ারি হইয়া গিয়াছে। এই সময় কিন্তু ফসল কোদালি দ্বারা উঠাইয়া না ফেলিয়া যতদিন গাছ বাঁচিয়া থাকে ততদিন অপেক্ষা করা ভাল। ইতিমধ্যে নিড়ানি দ্বারা খুঁড়িয়া কতক পরিমাণ আলু খুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। যে ঝাড় হইতে আলু তুলিবে তাহাতে মটরের মত আলুগুলি রাখিয়া বাকি গুলি তুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই আলুগুলি তুলিয়া পরে গোড়া বাঁধিয়া দিবে। ইহাতে গাছগুলি পুনরায় সতেজে বাড়িতে থাকে। আলু ক্ষেত্রে এমাসে দুই একবার আবশ্যক মত জল দেওয়া আবশ্যক। মটর, মসুর, মুগ প্রভৃতি ক্ষেত্রের বিশেষ কোন পাইট নাই। টেঁপারি ক্ষেতেও জল দেওয়া এই সময় আবশ্যক।

তরমুজ, খরমুজ, চৈতে বেগুন, চৈতে শসা, লাউ, কুমড়া ও উচ্ছে চাষের এই উপযুক্ত সময়।

কৃষক

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৪শ খণ্ড। } পৌষ, ১৩২০ সাল। { ৯ম সংখ্যা।

পল্লীর লক্ষ্মী শ্রী

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায় লিখিত

এনামেল বা চীনা মাটীর আসবাব পত্রে গৃহ-স্থলী সাজাইয়া গৃহস্থ যেমন বড়মানুষ সাজিয়া থাকে পাটের পয়সায়ও কৃষাণ প্রায় সেইরূপ বড় মানুষ হয়, পর পর এই কয় বৎসর পাটের আবাদে কৃষাণ বড় লোক হইয়া পড়িয়াছিল, কৃষাণের গৃহ শ্যামবাজারের টীনের বাক্সে, রঙিন্ মশারি, রঙিন্ চাদর, এনামেলের বাসনে উজ্জ্বল হইয়াছিল, পাটের ব্যবসায়ে কত কৃষক, কত ফড়ে পাকাবাড়ি করিয়াছে, ঘরে তক্তপোষ, দরজায় চৌকাট কপাট লাগাইয়াছে, কিন্তু কেবল এই এক বৎসরের পাটের অজন্মায় কৃষাণের সমস্ত সৌন্দর্য্যের লাঘব হইয়া উঠিয়াছে, যে পাটের আবাদে অবস্থাপন্ন গৃহস্থ হইয়া উঠিয়াছিল, সেই দেখিতেছি সর্ব্বাগ্রে মহাজনের নিকট টাকার জন্য হাত পাতিতে আরম্ভ করিয়াছে। যার মাঠ ভরা পাট ছিল সেই দেখিতেছি জমিদারের খাজনা একটী পয়সাও দিতে না পারিয়া লাঞ্ছিত হইতে বসিয়াছে। যে বছর বছর তাড়া তাড়া নোট—ঘরে তুলিয়াছে সে এক বৎসর গত না হইতে পয়সার কাঙ্গাল হইয়া পড়িয়াছে। পাটের কৃষাণকে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাওয়া যায়—বাবু কাঁচা পয়সা একটীও হাতে থাকে না যেমন আসে তেমনই খরচ হইয়া যায়। কথায় আছে পুরাতন চাউল ভাতে বাড়ে। আজ পল্লিগ্রামে সেই পুরাতন চাউল ভাতে বাড়িয়া পল্লীর লক্ষ্মী শ্রী—ফিরাইয়া আনিয়াছে। আজ মফঃস্বলে পাটের পুতিগন্ধে সোণার হেমন্ত কলুষিত হইতেছে না। মাঠে কার্ত্তিকশালী ভরা ধান্য শীষের কেমন এক মধুর সৌরভ—ইহা কেমন এক অপূর্ব্ব মাধুরি বিলাইতেছে;—কেমন এক হাসিমাখা সুষমাভরা, যেন কোন অতীতের লক্ষ্মী শ্রী—ফিরাইয়া আনিতেছে। পল্লীর মাঠে মাঠে পাড়ায় পাড়ায়

পথে পথে ধানের শীষে দোদুল্যমান বোঝাই গাড়ীর পেছু পেছু না ঘুরিলে পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবে না। এবার পল্লীগ্রামে দূষিত গন্ধে ঘরে মানুষ হাঁপাইয়া উঠিতেছে না, খালে বিলে মৎস্যকুল মরিয়া ভাসিতেছে না; ম্যালেরিয়া দেবীর করাল বদন বিষদন্তহীন, পাটের কৃষাণের রক্ত আমাসা নাই, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, মজুর পাইতেছে। পুরাতন চাউল ভাতে বাড়িতেছে অর্থাৎ যাহার ঘরে ২০।৩০ বৎসরের ধানে ভরা গোলা ছিল তাহারই আজ সুবর্ণ যোগ। ধানের কৃষক গোলা ছাড়িয়া দ্বিগুণ লাভে ধান বিক্রি করিয়া পয়সা জমাইতেছে আর ক্ষণভঙ্গুর চীনেমাটির গৃহস্থলীর ন্যায় পাটের হটাৎ বড়লোক কৃষাণ আজ সেই পুরাতন ধানের কৃষাণের দ্বারে অন্ন ভিক্ষা করিতে বসিয়াছে—ধানের দাদন চাহিতেছে, এটা কি মফঃস্বলের একটী নূতন দৃশ্য নয়? আর কি হইতেছে, আর অনেক কৃষাণ সেই বাপ ঠাকুর দাদার পুরাতন আবাদ খেঁজুর গাছের জন্য হায় হায় করিতেছে। তিন চার পুরুষের খেঁজুর বাগান কাটিয়া জমী ভাঙ্গিয়া পাঠ বুনিতেছিল কিন্তু এবার এই এক বর্ষায় পাট নোপাট হইয়া গেল, তাই বুঝি আজ পুরাতন খেজুর গাছের কথা অনেক কৃষাণের মনে পড়িয়া গিয়াছে। এবার আর কোথাও কোন গাছ বাদ যায় নাই, যে যেখানে যে গাছ পাইয়াছে তাহাই চাঁচিয়া ছুলিয়া আবাদ করিয়াছে। পাঠক! একবার দেখিয়া যাও সেই অসময়ের কাণ্ডারী পিতৃ স্বরূপ প্রাচীন খর্জ্জুর বৃক্ষগুলি সন্তান প্রতিপালন করিবার জন্য এই শেষ বয়সেও কেমন সারি সারি কণ্ঠ চিরিয়া রক্ত দান করিয়া—সুমিষ্ট সুস্বাদু বারি দান করিয়া বিপন্ন কৃষকের অভাব দূর করিতেছে। আজ আবার গ্রামের জঙ্গল কাটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, সে মুক্ত পল্লীর যেন দেহ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ঘরে ঘরে কৃষক বা'ন জ্বালাইয়া গুড় প্রস্তুত করিতেছে ব্যাধিমুক্ত কৃষক-বালক আজ যেন কত কাল পরে হাসি মুখে বা'নের আগুন পোহাইতে পোহাইতে গরম রসে বাসিভাত ভিজাইয়া আনন্দে আহার করিতেছে আর "সূয্যি মামা সূয্যি মামা রোদ কর" বলিয়া বাঁশ ঝাড়ে লুকাইত সূর্য্য দেবকে সত্বরে মাথার উপর আসিবার জন্য সমস্বরে আহ্বান করিতেছে। কেবল একবার পাট হয় নাই বলিয়াই মশা কমিল, ম্যালেরিয়া কম পড়িয়া গেল জঙ্গল কাটা পড়িল—পল্লীর লক্ষ্মী শ্রী ফিরিয়া আসিল।

একবার পাট হইল না আর কৃষকের গর্ব্ব খর্ব্ব হইল, কৃষক যে ভিখারী সেই ভিখারীই রহিয়া গেল। যে সুযোগ এক বৎসর আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতে পারে না—এক বৎসর আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারে না, তাহাকে আহ্বান না করিয়া অসময়ের কাণ্ডারী—বিপন্নের সহায়—অন্ধের যষ্ঠী সেই চির পুরাতনকে সাদরে আলিঙ্গন করা কি আমাদের সঙ্গত নহে? আজ যদি তোমরা সারা মাঠ পাট না বুনিতে আজ যদি পাটের লোভে পূর্ব্ব পুরুষের খেজুর বাগানগুলি তুলিয়া

না ফেলিতে তবে কি এই এক বৎসরেই এত শীঘ্র তোমাদিগকে অভাবের দ্বারে উপস্থিত হইতে হইত? না—

শত কণ্ঠে করিতে ক্রন্দন,
"ফিরে এস বলি আজি ওহে পুরাতন"

আনারসের চাষ

শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত লিখিত

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন আনারসের আদি জন্মস্থান দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল দেশ। তথা হইতে প্রথমে ইউরোপে ও তৎপরে পর্ত্তুগীজদিগের দ্বারা ভারতবর্ষে আনীত হয়, সংস্কৃত ভাষায় ইহার নাম "বহুনেত্র।" আয়ুর্ব্বেদাদি শাস্ত্রে আনারসের নিম্নলিখিত গুণগুলি বর্ণিত আছে যথা ;—

বহুনেত্র ফলকাম্লং ক্রিমিঘ্নং মধুরং সবম্।
বলাং বীতহরং রুচচং শ্লেষ্মদং তর্পনং গুরু ॥"

অর্থাৎ ইহা অম্ল মধু, রসযুক্ত, ক্রিমিনাশক, সারক, বলকর, রুচিজনক, বায়ু নাশক, তৃপ্তিপ্রদ ও গুরুপাক। আনারস যে একটী উৎকৃষ্ট ফল তাহা কাহারও অবিদিত নাই, ইহার কচি পাতার রস অল্প চিনি সংযোগে খাইলে ক্রিমি সকল মরিয়া মলের সহিত বাহির হইয়া যায়। অর্দ্ধ পক্ক আনারস ঘৃতে ভর্জ্জিত করিয়া খাইলে অতি উপাদেয় ও মুখ রোচক হয়, অথবা উক্ত রূপ ভর্জ্জিত আনারস খণ্ড দ্বারা মোরব্বা প্রস্তুত করিলে আরও উৎকৃষ্ট হয়। আনারস দ্বারা সাহেবদের ব্যবহারোপযোগী চাটনী প্রস্তুত করিয়া ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে পাঠাইতে পারিলে একটী বিশেষ লাভ জনক ব্যবসায় হইতে পারে। সুপক্ক আনারস খাইবার সময় উহার চোকগুলি মুখে ধরে, অগ্রে আনারস খণ্ডগুলি লবণ দিয়া বেশ করিয়া কচলাইয়া ধুইয়া ফেলিয়া পরে অত্যল্প লবণ সংযোগে খাইলে আর মুখে ধরে না এবং খাইতেও সুমিষ্ট বোধ হয়।

আনারসের চাষ করিতে কোন ঝঞ্চাট নাই, বর্ষাকালে ইহার চাষের সময়, আনারসের চারা উহার গাত্রেই জন্মিয়া থাকে, ইহাকে উহার "মুখী" বলে, ছায়াযুক্ত আর্দ্র ভূমিতে দুই হস্ত অন্তর অর্দ্ধ হস্ত গভীর গর্ত্ত করিয়া এই মুখী রোপণ করিতে হয়, শুষ্ক ভূমিতে ও অধিক রৌদ্রতাপ যুক্ত স্থানে ইহার চাষ ভাল হয় না, প্রতি বৎসর বর্ষাকালে ইহার কতকগুলি করিয়া চারা তুলিয়া ফেলিয়া গাছগুলি ফাঁক করিয়া দিতে পারিলে ফল ভাল হয় ও গাছ অনেক দিন জীবিত থাকে। ইহার

জন্য বেশী যত্ন করিতে হয় না, কেবল গাছের গোড়ায় "ওচ্‌লা" দিলেই বেশ সারের কার্য্য করে। ইহাতে ফল সুমিষ্ট ও বড় হয়, গাছের আওতায় ইহার চাষ ভাল হয়, সুতরাং ইহাও সুবিধা জনক যে বড় বড় গাছের তলায় যে সকল স্থান অকর্ম্মণ্য-ভাবে পতিত ছিল, তাহাতে আর একটী ফসল উৎপন্ন হইল। সময় অসময়ে এক একটী আনারসের মূল্য ৴০ এক আনা হইতে ১৲ এক টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে।

আনারসের পাতা হইতে একটী ব্যবসায় হইতে পারে, ইহার পাতা হইতে সুন্দর আঁশ বাহির হয়, সেই আঁশ দ্বারা অনায়াসে রসা, রশি, বেহালার তার ও তুলার সহিত মিশ্রিত করিয়া রেশমের ন্যায় বস্ত্রও প্রস্তুত হইতে পারে, আমাদের দেশে আনারসের পাতাগুলি নষ্ট হয়। উহা হইতে আঁশ বাহির করিতে পারিলে একটী পরিত্যক্ত জঞ্জাল হইতে একটী কার্য্য করা হয়, আঁশ বাহির করিবার কৌশলটী এই ;—কতকগুলি কাঁচা পাতা একত্র করিয়া আখ মাড়া কলের ন্যায় বাবলা কাঠের কলে পিশিয়া লইয়া একখানি কাঠের উপর রাখিয়া হাতুড়ী দ্বারা থেতো করিয়া লইতে হয়, অথবা পাতাগুলি একখানি তক্তার উপর বিছাইয়া কাস্তিয়ার উল্টা পীঠ দিয়া ঘসিয়া অসার অংশ বাদ দিবে, পরে পরিষ্কার জলে ২৷৩ বার ধৌত করিয়া পরিষ্কার করিয়া লইবে, অনন্তর এ আঁশকে তিন চারি দিন দিবসে রৌদ্রে ও রাত্রিকালে শিশিরে রাখিতে হইবে, এরূপে প্রস্তুত করিলে আঁশ গুলি চিক্কণ, দৃঢ় ও কোমল হইবে, এবং দেখিতে প্রায় রেশমের ন্যায় হইবে। আমরা এইরূপে সুতা প্রস্তুত করিয়া বেহালার তার করিয়া দেখিয়াছি রেশমের তার অপেক্ষা ভাল বাজে, এবং খুব টান সহ, সহজে ছিড়িতে পারা যায় না, এরূপ লাভ জনক কৃষিতে সকলেরই মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

শণ

শণ গাছ কাটিবার কালীন বাম হস্তে যতগুলি গাছ ধরিবে, সে গুলিকে এক স্থানে রাখিবে। এইরূপ করিয়া আট মুঠায় যতগুলি গাছ হইবে, সে গুলিকে একত্র করিয়া আটি বান্ধিতে হইবে। গাছগুলি রাখা যেন গোলমাল করিয়া না হয়। সকল গাছের গোড়া ও ডগা যেন এক এক দিকেই থাকে। এইরূপ করিয়া ক্ষেত্রের সমস্ত গাছ কাটিয়া আটি বান্ধা হইলে, সমস্ত আটির অগ্রভাগ (যে স্থান হইতে শুঁটী বাহির হইয়াছে) কাটিয়া ফেলিতে হইবে। অগ্রভাগে যে শুঁটী থাকে, তাহা রৌদ্রে শুকাইয়া বীজ বাহির করিয়া লইতে হয়। রৌদ্রে শুঁটীগুলি শুষ্ক হইলে আপনা হইতেই ফাটিয়া বীজ বাহির হয়। বীজগুলিকে রৌদ্রে শুষ্ক

করিয়া যত্ন পূর্ব্বক রাখিতে হইবে। বীজের মূল্যও নিতান্ত কম নহে। সময়ে সময়ে বহুমূল্যে শণ বীজ বিক্রীত হইয়া থাকে। সচরাচর ৫।৬ টাকা মণের কম পাওয়া যায় না। সময়ে সময়ে ১০।১২ টাকা মণ দরেও বিক্রীত হইয়া থাকে। গাছগুলি কাটিবার কালীন যদি কর্ত্তিত গাছের সহিত শুষ্ক গাছে, তৃণ কি আগাছা থাকে, সে গুলি বাছিয়া ফেলিয়া দিয়া আটি বান্ধা কর্ত্তব্য। খুব বড় জমিতে শণ দেওয়া হইলে, একবারে সমস্ত শণ না কাটিয়া ক্রমে ক্রমে কাটা উচিত।

সেই কর্ত্তিত শণ গাছের আটিগুলির অগ্রভাগ কাটা হইয়া গেলে, ঐ আটি বান্ধা গাছগুলি পচাইতে হইবে। অগ্রভাগ অপেক্ষা শণ গাছের গোড়ার দিকে পচিতে কিছু অধিক সময় লাগে। এ কারণ শণ গাছের আটির গোড়ার দিকের কতক ভাগ জলে ডুবাইয়া অগ্রভাগ জলের উপর জাগাইয়া রাখে। এরূপ ভাবে রাখিতে হইলে অবশুই অগভীর জলেই ডুবাইয়া রাখিতে হয়। আটির দৈর্ঘ্যের ¼ অংশ গোড়ার দিক জলে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। এরূপ ভাবে ডুবাইয়া রাখিতে হইলে যে স্থানে ডুবাইয়া রাখিতে হইবে, তাহার চতুর্দ্দিকে সামনাসামনি বাঁশের খুঁটা গাড়িয়া কৌশল ক্রমে সামনাসামনি খুঁটার উপর বংশদণ্ড বান্ধিয়া ও উহার উপর কোন ভারি বস্তু রাখিয়া দেয়, অথবা মাটির ঘাস শুদ্ধ চাপড়া কাটিয়া বসাইয়া দেয়। অধিক শণ হইলে একবারে সমস্ত শণ না কাটিয়া অগ্র পশ্চাৎ কাটিয়া ঐরূপে পচাইতে হয়। এক স্থানে একবারে এরূপে অধিক শণ পচাইবারও সুবিধা হয় না। এইরূপ ভাবে একদিন (২৪ ঘণ্টা) রাখিয়া তাহার শণের আটি গুলিকে শোয়াইয়া পচাইতে হয়। ইহাতে ও ঐরূপ বংশদণ্ড প্রোথিত করিয়া ও ঐ বংশদণ্ড বান্ধিয়া তাহার উপর ভারি বস্তু রাখিয়া ও ঘাসশুদ্ধ মাটির চাপ বসাইয়া দেয়। এরূপ কৌশল করিয়া শণ গুলিকে রাখিতে হইবে যেন শণের আটিগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া ভাসিয়া না উঠে। এইরূপে তিন দিন (৭২ ঘণ্টা) রাখিলে শণগুলি বেশ পচিয়া আঁাস উঠিবার উপযোগী হয়। জল অনুসারে ঐ সময়েরও তারতম্য হইয়া থাকে। বদ্ধ পচা জলে শণ পচাইলে শীঘ্রই পচিয়া যায়, সুতরাং তিন দিন রাখিবারও আবশ্যক হয় না। নির্ম্মল বা স্রোত বিশিষ্ট জলে শণ পচাইলে, তিন দিন অপেক্ষা অধিক সময় না রাখিলে শণ পচিয়া আঁাস বাহির করিবার উপযোগী হয় না। যে স্রোত বিহীন জলাশয়ে পুনঃ পুনঃ শণ পচান হয়, সে জলাশয়ের জল শীঘ্র পচিয়া যায়, সে জলে শণ পচাইতে দিলে দুই দিনের পরই শণ পচিয়া উঠে। শণ গাছ অধিক পচিলে শণের আঁাস কম মজবুত ও অকর্ম্মণ্য হয়, বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন না করিলে শণের আঁাস একবারে নষ্ট হইয়া যায়। এজন্য শণ পচাইবার জন্য শোয়াইয়া দিবার ২ দিন (৪৮ ঘণ্টা) পরে একটী শণের গাছ ফিড়িয়া বাহির করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। যদি দুই দিনের পরই

শণের গাছ হইতে আঁস বিচ্ছিন্ন করিবার উপযোগী হয়, তবে তৎক্ষণাৎ শণ কাচিতে আরম্ভ করিয়া দিতে হইবে। তৃতীয় দিনে কেবল একবার পরীক্ষা করিয়া বিশ্বস্ত হইয়া থাকিলে চলিবে না। ৩৪ বার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। এইরূপ সাবধানতার অভাবে অনেক কৃষকের শণই পচিয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। নীচের শণ আগে পচিয়া থাকে, এ কারণ নীচের শণ আগে কাচা উচিত।

অনেক শণ কাচিতে যদি অধিক সময় লাগে, তাহা হইলে, ততক্ষণ শণ জলে নিমর্জ্জিত থাকিলে শণের আঁস পচিয়া খারাপ হইয়া যাইবে বিবেচনা করিলে শণের যাড় ভাসাইয়া দিতে হইবে। যাহারা শণ বিক্রয় করিয়া থাকে, তাহারা শণ গাছ অধিক সময় পচাইয়া রাখে। অধিক পচান হইলে শণের গাছ হইতে আঁস বাহির করিয়া লওয়ার সুবিধা হয়।

পরিস্কার জলে শণ ভিজাইলে, শণের রং বেশ শুভ্র বর্ণ হয়। অপরিষ্কার মলিন জলে শণ কাচিলে শণের রংও খারাপ হইয়া থাকে। শণ পাকিবার কিছু দিন পরে শণ কাটিয়া ভিজাইলেও শণের রং খারাপ হয়।

শণ কাচিবার সময় শণ গাছের আটির ½ অংশ আন্দাজ লইয়া তাহা দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দুই হাতের দ্বারা জলের উপর আঘাত করিতে হয়। একবার শণ গাছের অগ্রভাগ ধরিয়া গোড়ার দিক জলের উপর তৎপরে গোড়ার দিক ডগের উপর তৎপরে গোড়ার দিক ধরিয়া অগ্রভাগ জলে আছাড় দিতে হয়। এইরূপ সামান্যক্ষণ করিলে শণ কাটির সহিত আঁস বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তাহার পর দুই হাতের শণ একত্রে মিলিত করিয়া রাখা হয়। এইরূপ মিলিত এক এক অংশকে এক শিসে বলে।

শণ কাচা হইলে ভিজা থাকিতে থাকিতে এক একটী শিসে শণ লইয়া কাটি হইতে আঁস গুলি কৌশল পূর্ব্বক বাহির করিয়া লইতে হয়। ভিজা থাকিতে থাকিতে আঁস বিচ্ছিন্ন করা ভাল; তাহাতে কাটি হইতে সহজেই আঁস বিচ্ছিন্ন করা যায়। যদি সে সময়ে ছাড়াইবার সুবিধা না হয়, তবে আঁস জড়িত শণ রৌদ্রে শুষ্ক করা উচিত, নচেৎ পচিয়া আঁস কম মজপুত হয়। বিচ্ছিন্ন আঁসগুলি ও দড়ি টাঙ্গাইয়া তাহার উপর দিয়া শুষ্ক করিয়া লওয়া উচিত। তাহাও অধিক ক্ষণ ভিজা থাকিলে আঁস কম মজপুত হয়। গাছ হইতে আঁস বিচ্ছিন্ন করিয়া আঁসের অগ্রভাগ সামান্য একটু শণের আঁস দ্বারা জড়াইয়া আবদ্ধ করিয়া রাখা উচিত। নচেৎ শণের আঁসগুলি গোলমেলে হইয়া ভরতা হইয়া যায়।

শুষ্ক ও শণের কাটি হইতে বিচ্ছিন্ন চারি শিসা শণ একত্র মিলিত করিয়া পাক দিয়া তেতাঁজ করিয়া মুড়ি বান্ধা হয়। সচরাচর তিন মুড়িতে এক সের হইয়া থাকে।

শণ চাষে লাভ ও নিতান্ত মন্দ হয় না। ভালরূপ শণ জন্মিলে প্রতি বিঘায় ৪।৫ মণ পর্য্যন্ত শণ হইতে পারে। শণের মণ ৮৲ টাকা হইতে ১২৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। বাজারে যে শণ বিক্রীত হয়, তাহা ভাল নহে। পচা, কম মজবুত এবং শণের মধ্যে বহু সংখ্যক শণের কাটি মিলিত থাকে। সেজন্য এখানকার লোকে শণ খরিদ না করিয়া সকলেই নিজের প্রয়োজন মত শণের চাষ করে। উদ্বৃত্ত শণ পর বৎসরের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখে। খুব বেশি জমিতে শণ চাষ করে না। যদি কাহারও খুব বেশি শণ হয়, তবে সেই বিক্রয় করে। বাজারের শণ অপেক্ষা চাষীর ঘরের শণ অনেক উচ্চমূল্যেবিক্রীত হয়।

এখানকার লোকে ঢেরায় কাটিয়া শণ হইতে রজ্জু প্রস্তুত করে। শণের মূল্যের দ্বিগুণ মূল্যে দড়ি বিক্রীত হয়। যদি কোন কৃষক শণ হইতে রজ্জু প্রস্তুত করিতে অক্ষম হয়, তবে অন্যের দ্বারা রজ্জু প্রস্তুত করাইয়া লয় দুই সের শণ দিয়া এক সের রজ্জু লইয়া থাকে।

শণ কাটা হইলে সেই জমিতে পাইট করিয়া আলু কলাই প্রভৃতি রবিশস্য দেওয়া হইয়া থাকে।

শণ দুষ্প্রাপ্য ও মহার্ঘ হইলে মুগুয়া গাছের পাতার আঁস বাহির করিয়া শণের অভাব পূরণ করে। ইহারও আঁস ঠিক শণের মত হয়। তবে কিছু কড়া, মুগুয়া গাছের আঁস হইতে ও উত্তম রজ্জু প্রস্তুত হইতে পারে। সে রজ্জুতে ও শণের রজ্জুতে কোন বিশেষ প্রভেদ আছে বলিয়া বোধ হয় না। মুগুয়া গাছের আঁস নির্ম্মিত রজ্জু হইতে ও গুণ, পালাম, কাঁপা প্রভৃতি প্রস্তুত হইতে পারে।

মুগুয়া গাছ কতকটা আনারস গাছের মত। আনারস গাছের পাতা অপেক্ষা মুগুয়া গাছের পাতা বড়। আনারস গাছের পাতার উভয় পার্শ্বে যেমন কাঁটা আছে, মুগুয়া গাছের পাতার উভয় পার্শ্বে সেইরূপ কাঁটা আছে। মুগুয়া গাছের পাতার অগ্রভাগেও একটী কাঁটা আছে।

মুগুয়া গাছের পাতা কাটিয়া ১৫।১৬ দিন জলে পচাইতে হয়। তাহার পর ঐ পাতাকে কোন ভারি বস্তু দ্বারা আঘাত করিয়া পেষণ করিতে হয়। পেষণের পর পাতার অন্যান্য গলিত অংশ জলে ধৌত হইয়া আঁসটী অবশিষ্ট থাকে। তখন আঁসের রং শ্বেতবর্ণ এবং দেখিতে ঠিক শণের মত হয়। ইহার আঁসও ঢেরায় কাটিয়া রজ্জু প্রস্তুত করে।

অযত্ন সম্ভূত ইহার গাছ আমাদের এখানে অনেক আছে। বাগান ইত্যাদি স্থানের বেড়ার জন্য ধারে ধারে ইহার গাছ লাগাইয়া থাকে। শণের নিতান্ত অভাব হইলে কখন কখন কেহ কেহ ইহার পাতার আঁস বাহির করিয়া রজ্জু প্রস্তুত করে। অযত্ন সম্ভূত গাছের পাতা যেরূপ হয়, বোধ হয় খুব যত্নের সহিত

আবাদ করিলে ইহার পাতা আরো বড় হইতে পারে। ইহার আঁসে আর কোন রূপ কার্য্য হয় কি না, ইহার কোনরূপ আবশ্যকতা আছে কি না তাহা জানি না। যদি সম্পাদক মহাশয় কি কৃষকের কোন পাঠক মহাশয় ইহার অপর কোন উপকারিতার বিষয় অবগত থাকেন, তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক "কৃষক" পত্রে লিখিলে অনুগৃহীত হইব।

সরকারী কৃষি সংবাদ।

কৃষি উন্নতিকল্পে গবর্ণমেণ্টের চেষ্টা—

বিহারে নীলের চাষের দিন দিন অবনতি হইতেছে। উৎপন্ন নীল আর পূর্ব্বের ন্যায় উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয় না—কৃত্রিম নীলেরই সমধিক আদর দেখা যাইতেছে। অনেকগুলি নীলের কুঠী একেবারে উঠাইয়া দিয়াছে, অনেকে প্রজাদিগের সহিত নূতন বন্দোবস্ত করিতেছে। পূর্ব্বে কৃষকদিগকে যে সকল ক্ষেত্রে নীল বপন করিতে হইত, এখন তাহারা ইচ্ছামত যে কোন শস্য বপন করিতে পারে। বিহারে নীলকরদিগের শক্তি ও ক্ষমতা দিন দিন হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে।

সম্প্রতি বাঙ্গালা দেশের কৃষি-বিভাগ হইতে অনেকগুলি কার্য্যের প্রস্তাব হইয়াছে। আমরা নিম্নে কতিপয় প্রয়োজনীয় প্রস্তাবের আলোচনা করিলাম।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট কতিপয় উপযুক্ত উদ্ভিদ্‌বিদ্‌কে উৎকৃষ্ট ধান্য, তিল, সরিষা, ডাল কলাই ও মরিচ উৎপাদনের উপায় নির্দ্ধারণ কল্পে নিযুক্ত করিয়াছেন। যাহাতে উন্নত প্রণালীর পাট উৎপাদন ও কীটের হস্ত হইতে ধান্য রক্ষা করা যাইতে পারে তাহার জন্যও চেষ্টা করা হইবে।

গবর্ণমেণ্ট আর একটী প্রকৃত সৎকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অধীনে ৮ জন কৃষি পরীক্ষক নিযুক্ত ছিলেন। বর্ত্তমানে আরও অতিরিক্ত ২২ জন কৃষি পরীক্ষক নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হইবে। ইহারা কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্র লইয়া উন্নত প্রণালীতে চাষ করিবেন—জমিদারগণ ইহাদিগকে সাহায্য করিবেন। ময়মনসিংহ জেলায় এই ভাবে কার্য্যারম্ভ হইয়াছে।

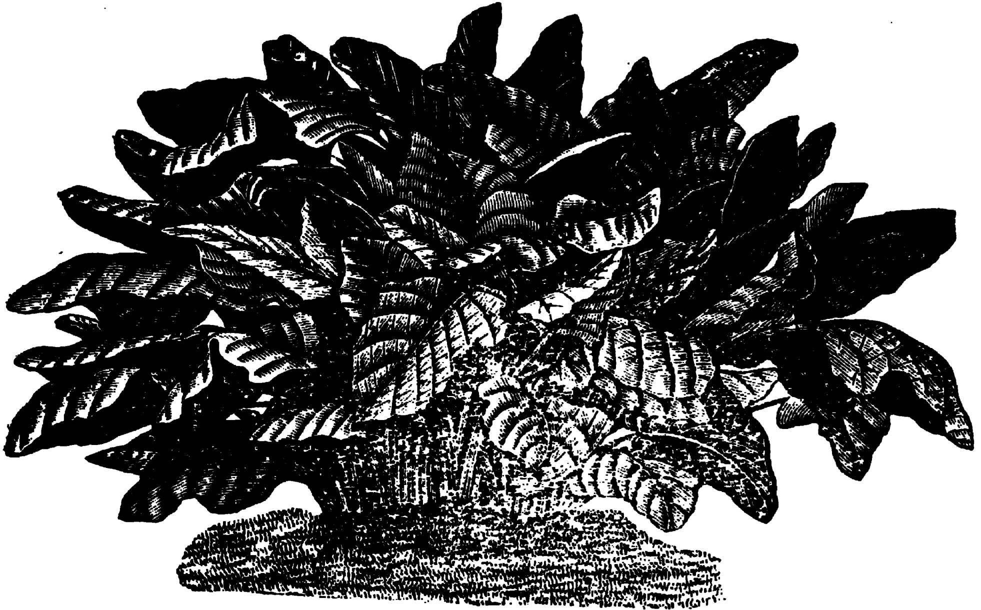
গো-জাতির উন্নতি সাধন কল্পে এ বৎসর চেষ্টা করা হইবে।

রেশমের পোকার মধ্যে একরূপ সংক্রামক পীড়া দেখা দেওয়ায় বাঙ্গালার রেশম উৎপাদন একপ্রকার অসম্ভব হইয়াছে। এই জন্য গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বত্র নির্দ্দোষ

বীজ বিতরণ করিবার জন্য সঙ্কল্প করিয়াছেন। যাহাতে উন্নত শ্রেণীর রেশম কীট উৎপাদন করা যায় তাহারও গবেষণা করা হইবে।

বিগত বর্ষে সমস্ত বঙ্গদেশে উৎপন্ন পাটের পরিমাণ ও পাটের ক্ষেত্রের সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা হইয়াছিল। এ বৎসর যাহাতে পাটের উন্নতি হয় তাহার জন্য চেষ্টা করা হইবে।

বর্ত্তমান বর্ষে কোথায় কি পরিমাণ পাট উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে, সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট তাহার তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। গত বৎসরের তুলনায় পাবনায়, রঙপুর ও ত্রিপুরায় শতকরা ৫ ভাগ পাটের চাষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফরিদপুর ও পূর্ণিয়ায় আদৌ বৃদ্ধি পায় নাই। ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলায় গত বৎসর অপেক্ষা বেশী জমিতে পাট বোনা হইয়াছে।

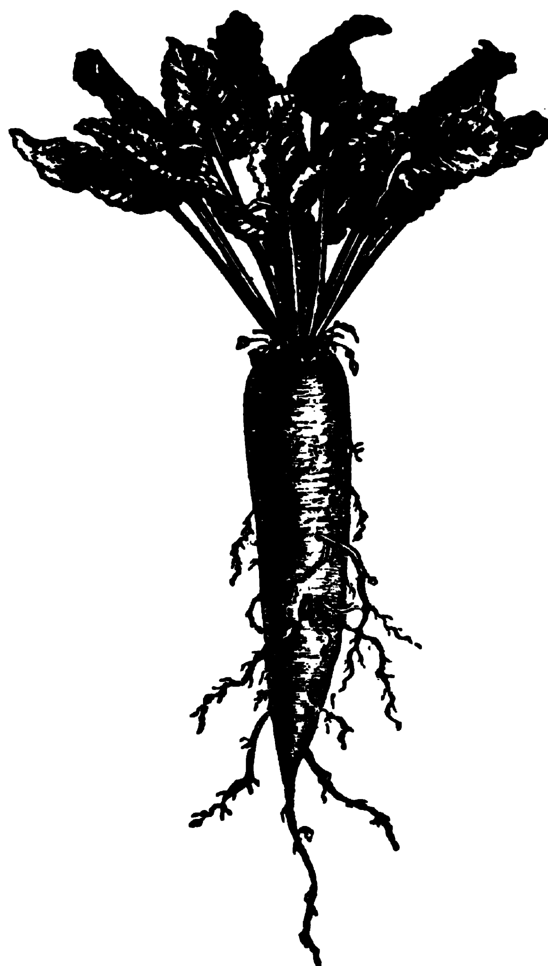


পাতাবাহার বীট

বীটের ক্রমোন্নতি—

বীটের ইংরাজী নাম Beet; ইহারা বীটা ভলগারিস (Beta Vulgaris) বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। ইউরোপের দক্ষিণাংশে সমুদ্র উপকূলে এই শ্রেণীর বীট দেখিতে পাওয়া যায়। বহু পূর্ব্বে ইহা কেহ খাইত না। কিন্তু ইহার পাতাগুলি সুন্দর রঙের হইত বলিয়া এবং পাতার সুন্দর গঠন দেখিয়া লোকে ফুল বাগানে শোভার জন্য বীট বসাইত। ক্রমশঃ ইউরোপে ইহা সালাদ বা

চাট্‌নি করিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। ইহার চাষ হইতে লাগিল। যখন পাতার জন্য গাছ করা হইত, তখন তাহাতে মূল হউক বা না হউক কেহ তাহার তত্ত্ব লইত না। মূল খাইয়া স্বাদ পাইয়া মূলের উন্নতি করিতে চেষ্টা করিল। ক্রমে বাজারে লম্বা বীট দেখা দিল। ইংলণ্ড, এমেরিকার লোকও ক্রমশঃ বীট খাইতে আরম্ভ করিল। বীটের উন্নতি চরম সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এখন আর শিকৃড়ে * মূলার মত লম্বা বীট কেহ ভালবাসে না। বীট ক্রমশঃ গোল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গোল হইয়াও তাহার গায়ের শিকড় তাহাদিগকে ছাড়িয়া যায় নাই। সুখাদ্য লম্বা বীটও হইয়াছে, ক্রমশঃ বীট সুগোল হইয়াছে এবং গাত্র শিকড় শূন্য হইয়াছে। ইজিপসিয়ান লাল গোল বীট সকলের বড় প্রিয়। শাদা এক প্রকার ইংলিশ্‌ বীট আছে তাহা খাইতে খুব নরম ও সুস্বাদু, দেখিতেও সুন্দর। বীট এখন আর কেবল বাগান সাজাইবার জন্য ব্যবহার হয় না, খাবার জন্য ইহার কদর বেশ বাড়িয়া গিয়াছে।



শিকৃড়ে লম্বা বীট

জার্ম্মনিতে বীট হইতে চিনি তৈয়ারি হইতেছে। এই বীট চিনিতে এখন পৃথিবী ছাইয়া ফেলিয়াছে। রসায়নবিদ্‌ প্রথমে বীটে মিষ্ট আস্বাদ পাইল। দেখিল সব সমান মিষ্ট নহে। যেটা অধিক মিষ্ট সেই গাছ হইতে বীজ উৎপাদন করিল। সেই বীজে চাষ চলিল। আবার বাছাই করিয়া অধিক মিষ্ট বীজ খুঁজিয়া লওয়া হইল এবং রাসায়নিক সার সংযোগে চাষ চলিতে লাগিল। ক্রমশঃ বীটে চিনির

* শিকৃড়ে—শিকড়যুক্ত।

পরিমাণ এত পাওয়া যাইতেছে যে, তাহা নিষ্পেষিত করিয়া তাহার রস জ্বাল দিয়া চিনি প্রস্তুত হইতেছে এবং সেই চিনি আখের চিনি অপেক্ষা সস্তা। ভারতে শর্করবীটের আবাদ চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু বিশেষ কোন ফল হয় নাই। এখানকার আবাদের প্রথা ভাল নহে ইহাই বলিতে হইবে।

ধানের ব্যাধি—

নোয়াখালি, ত্রিপুরা এবং ঢাকা জেলার অধিকাংশ স্থলে ধান্যের একপ্রকার ব্যাধি হইয়া থাকে। এই ব্যাধি যে কি, কিছুকাল পূর্ব্বে লোকের তাহা অবিদিত ছিল। কৃষকগণ ইহাকে "উপরা" বলিয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস এই যে, ইহা দৈবী আপদ্। এই ব্যাধির বীজ যেন আকাশ হইতে ভূমিতে পড়ে। কেহ কেহ মনে করে, বিখ্যাত "বরিশাল গান" ইহার কারণ।

নোয়া খালি, ত্রিপুরা, ঢাকার লোক অনেক দিন হইতে এই আপদ সহ্য করিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি ভারতীয়-কৃষি-সমিতি এই ব্যাধি সম্বন্ধে ঐ সকল স্থান হইতে অনেক পত্র পাইয়াছে তাহাদের গোচরার্থে আমরা এই সম্বন্ধে সরকারী বিবরণী কৃষকে প্রকাশ করিলাম।

বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই তিন প্রকার ধান্যের আবাদ হইয়া থাকে :—আউশ, আমন এবং বোরো। এই তিন প্রকার ধান্যের চাষ এবং বপন করিবার সময় সম্বন্ধে কৃষক মাত্রেই অবগত আছেন।

এই উপরা ব্যাধি আউশ এবং আমন ধান্যকেই আক্রমণ করিয়া থাকে। কুত্রাপি বোরো ধান্য আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই। ধান্য গাছের গাত্রে প্রথমে স্থানে স্থানে এই ব্যাধির চিহ্ন দেখা যায় ; ইহা অতি সহসা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইলেও এই সামান্য আক্রমণেই যথেষ্ট ক্ষতি হইয়া থাকে। আউশের তত ক্ষতি হয় না। কেননা ব্যাধি রীতিমত ব্যাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই আউশ ধান গোলাজাত হয়। ভাদ্র মাসে আউশ ধান্যে এই রোগ রীতিমত এবং মাঠ ব্যাপিয়া দেখা যায়। এই সময়ে আমন ধান্য সবেমাত্র বড় হইয়া উঠিয়াছে এবং ধান্যের শীর্ষ আদৌ বাহির হয় নাই। এই চারা গাছেও এই রোগ দেখা দেয়। খুব সম্ভব আষাঢ় মাসেও আউশ ধান্যে এই পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে, কিন্তু তৎসম্বন্ধে কোন পরীক্ষা হয় নাই। আমন ধান্যে ভাদ্র মাসে এবং আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি সময়ে এই ব্যাধি রীতিমত পরিব্যাপ্ত হয়। আউশ এবং আমন উভয় ধান্যেরই এই ব্যাধির আক্রমণে বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে, কিন্তু আউশের বপন হইতে সংগ্রহের সময় অল্প, কাজেই ক্ষতির পরিমাণও অল্প। আমনের জীবন-কাল অধিক, কাজেই ক্ষতিও অত্যন্ত অধিক।

আক্রান্ত ও অনাক্রান্ত ধান্তের গাছে বাহ্যতঃ কোনরূপ পার্থক্য থাকে না। কেবল আক্রান্ত গাছের পত্র শীর্ষগুলি শুকাইতে আরম্ভ করে, এবং কতকগুলি ডাঁটা কিছু বিবর্ণ হয়। ইহাকে "পাতা উপরা" বলে। পত্রের গাত্রে স্থানে স্থানে বাদামী বর্ণের দাগ পড়ে, এই পাতাগুলিকে অপসারিত করিলে অভ্যন্তরস্থ পত্র মুকুলেও এইরূপ দাগ দেখা যায়, এবং পাতাগুলি কুঞ্চিত বলিয়া মনে হয়। ডাঁটার নিম্নভাগে কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না, কিন্তু উপরের ভাগে চিহ্ন থাকে। এইরূপে আক্রান্ত ধান্য গাছকে স্থানান্তরিত করিয়া কোন সুফল পাওয়া যায় নাই। বরং গাছগুলি আরও শীঘ্র নষ্ট হয়। যদি গাছগুলিকে নাড়া চাড়া না করিয়া একই স্থানে থাকিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে ধান্তের শীর্ষ নির্গত হয়, কিন্তু ধান আদৌ পুষ্ট হয় না।

আক্রান্ত আউশ ও আমন ধান্য উভয়েই দৈর্ঘ্যে ক্ষুদ্র হয়, পার্শ্বের পাতাগুলি শুকাইয়া যায়, কখন কখনও পাতাগুলি অবিকৃতও থাকে, পত্রের বৃন্তগুলির গাত্রে বাদামী বর্ণের দাগ পড়ে এবং গাছের উপরের দুই একটি গাঁইটের অব্যবহিত পরেই একটা বিশেষ ক্ষত হয়। এই ক্ষতের দৈর্ঘ্য, গ্রন্থি হইতে মাত্র অর্দ্ধ ইঞ্চ; সময়ে সময়ে গ্রন্থির উপরে এবং নিম্নেও ক্ষত বিস্তৃত হয়। এই স্থলে ধান্যগাছের ডাঁটার বর্ণ গাঢ় বাদামী অথবা কৃষ্ণ হয়, ডাঁটা কুঞ্চিত হইয়া উঠে, এবং সামান্য চাপ দিলেই ভাঙ্গিয়া যায়। যদি পীড়ার শক্তি সেরূপ অধিক না হয়, তাহা হইলে ডাঁটার বর্ণ এক পার্শ্বে মাত্র বিকৃত হয়, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে সমগ্র স্থান ব্যাপিয়াও বিবর্ণ হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে ডাঁটার অন্যান্য স্থলেও বাদামী বর্ণের ক্ষত দেখা যায়। যদি "থোড়ের" সময় ব্যাধি দেখা যায়, তাহা হইলে কৃষকেরা তাহাকে "থোড় উপরা" এবং ধান্তের শীর্ষ বাহির হইলে ব্যাধি দেখা দিলে তাহাকে "পাকা উপরা" বলিয়া থাকে। "থোড়" ধান্তের শীষ পত্রের আবরণে আচ্ছাদিত থাকে। ব্যাধি হইলে পত্রের আবরণ শুষ্ক হইতে থাকে, এবং আবরণের গাত্রে বাদামী দাগ

থোড়ের সময় হয়। এই বাদামী দাগ ধরাই এই রোগের বিশেষত্ব। যে পত্রে থোড় আবৃত থাকে, তাহার গোড়ায় বাদামী দাগ হয়। এই সময়ে থোড় বাহির করিয়া আনিলে দেখা যায় যে, থোড়ের পুষ্পগুলি বিকৃত এবং বীজ উৎপন্ন হয় নাই। সমস্ত পুষ্পমঞ্জরী ব্যাপিয়া এক প্রকার ছাতা ধরে।

"পাকা উপরা" ব্যাধিতে ধান্যের শীষ বাহির হইয়া আইসে, কিন্তু প্রায়ই সর্ব্ব স্থলেই ধান্য পুষ্ট হয় না ; অধিকাংশই "আগড়া" বা অপুষ্ট ধান্য।

ধান্যের ক্ষতি নানা কারণে হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কীট পতঙ্গাদির আক্রমণ বা তাহাদের দংশন জাত ব্যাধি, ধান্যে ছাতা পড়া, ব্যাকৃটিরিয়া নামক উদ্ভিদাণুর আক্রমণ ইত্যাদিই প্রধান। কিন্তু ইহার কোনটিই উপরা ব্যাধির কারণ নহে। এই সমস্ত আক্রান্ত গাছে একরূপ পোকা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নাম ইংরাজিতে ঈল ওয়ার্ম্ (Eel worm)। ধান গাছের যে যে স্থানে বাদামী বর্ণের দাগ পড়ে সেই সেই স্থানেই এই পোকা বাস করে। এই সমস্ত পোকা বৃক্ষ আক্রমণ করিবার পরেই অতি শীঘ্র বৃক্ষের শীর্ষদেশে উঠিতে চেষ্টা করে। ঢাকা এবং পুষায় সরকারী কৃষিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ নানাবিধ পরীক্ষা করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এই পোকাই এই উপরা ব্যাধির একমাত্র কারণ।

ঢাকা জেলায় এই ব্যাধিকে সাধারণতঃ "ডাক" বলে। কৃষকগণ বলে যে, কোন কোন জমি হইতে এক প্রকার বাষ্প নির্গত হয়, এবং এই বাষ্পের তেজে

ধান্য নষ্ট হয়। ডাক লাগা ধান্য পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ইহা এই উপরা ব্যাধি ভিন্ন অন্য আর কিছুই নহে। এই ব্যাধি উক্ত জেলায় ১০।১২ বৎসর ধরিয়া প্রচলিত থাকিলেও গত ৫ বৎসর ইহা প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে।

এই ব্যাধির কারণ অতি অল্পদিন হইল নিরূপিত হইয়াছে। এত অল্প সময়ে আশু উপকারক ঔষধ স্থিরীকৃত হইতে পারে না। তবে কতকগুলি উপায় অবলম্বন করিলে কতকটা উপকার পাওয়া যাইতে পারে। এই গুলি লইয়া পরীক্ষাও হইয়া গিয়াছে। ধান্য কাটিয়া লইয়া যাইবার পর যে "লাড়া" অর্থাৎ ধান্য গাছের ভূমি সংলগ্ন যে অংশ পড়িয়া থাকে, তাহাকে পুড়াইয়া ফেলিলে বিশেষ উপকার হয়। অতঃপর যে ধান্যে উপরা ব্যাধি হয় নাই এরূপ বীজ বপন করা উচিত। ধান্যের লাড়ায় এবং বীজ ধান্যে অবশ্যই পোকা প্রবেশ করে। জমীতে লাড়ার মধ্যে পোকা জীবিত থাকে কিনা তৎসম্বন্ধে এখনও কিছু জানা না যাইলেও দেখা গিয়াছে যে লাড়া পুড়াইয়া ফেলায় বিশেষ উপকার হইয়াছে।

আমাদের দেশে যেরূপে ভূমি কর্ষণ করিবার প্রথা আছে, তাহাতে ধান্য কাটিবার সময় যে ধান্য জমিতে পড়ে, সেই ধান্য একবারে নষ্ট হয় না; তাহাদের কতকগুলি অবিকৃত থাকিয়া যায়। এরূপ অবিকৃত পড়া ধান্যে বর্ষায় পুনরায় গাছ হয়। যে জমীতে উপরা হইয়াছিল সেই জমীতে এইরূপ পড়া ধান্য যাহাতে একবারে পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়, তদুপযোগী জমীর পাট করা আবশ্যক। এইরূপে পড়া ধান্য পচিয়া যাইলে এই পোকাও নষ্ট হইয়া যায়। কেন না ইহা ভিজে মাটীতে জীবিত থাকে না। অতিরিক্ত কর্ষণ ধান্যের পক্ষে শুভকর নহে, একথাও মনে রাখা আবশ্যক।

অতএব ধান্য কাটা হইয়া যাইলেই শুষ্ক লাড়া পুড়াইয়া ফেলা উচিত। যাহাতে পড়া ধান্য একেবারে নষ্ট হয় অথচ জমীতে অতিরিক্ত কর্ষণ না হয় তদ্বিষয়ে উপায় অবলম্বন করা উচিত। এবং যাহাতে নির্দোষ এবং নীরোগ বীজ বপন করা হয় তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত এই তিনটি উপায় অবলম্বন করিলে ঢাকার "ডাক" এবং নোয়াখালির "উপরা" ১ম বৎসরে প্রশমিত না হইলেও ২।৪ বৎসরেই প্রশমিত হইতে পারে।



পৌষ, ১৩২০ সাল।

ভারতে ফলের বাগান রচনা

ভারতের মত বিশাল ভূমিভাগে কোথায় কোন্ জাতীয় বৃক্ষলতার আবাদ করা কর্ত্তব্য তাহার একটা তালিকা দেওয়া নিতান্ত সহজ কথা নহে। সমস্ত ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ না করিয়া বা প্রত্যেক জেলার আবহাওয়ার বিচার করিয়া না দেখিয়া ঐ প্রকারের কোন তালিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে না। যদি কেহ ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রের জল মাটির রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া দেন তবে তিনি একটা মহৎ কাজ করিবেন। একজনের দ্বারা একার্য্য সম্ভব নহে। সমস্ত দেশ জুড়িয়া নানা স্থানে রাসয়নিক পরীক্ষাগার স্থাপন করিতে হইবে। ঐ সকল পরীক্ষালয়ে চাষীর ক্ষেতের ও উদ্যানপালকের বাগানের মাটীর পরীক্ষা হইবে। এই পরীক্ষাগারে তাহাদের জমির সার নির্ণিত হইবে এবং স্থানীয় সেচন জলের বিচার হইবে। এই প্রকারে কার্য্যারম্ভ করিলে তবে বিজ্ঞান সম্মত কাজ হইবে। ইতি পূর্ব্বে আমরা কোথায় কোন্ গাছ বসাইতে হইবে তাহার আভাস দিয়াছি মাত্র। আমরা মোটামুটী বলিয়াছি যে সমুদ্র উপকূলে বা সমুদ্র উপকূল হইতে কিছু দূরবর্ত্তী স্থান সমূহে অল্প লবণাক্ত জমিতে নারিকেল, শুপারি হয়। কিন্তু খেজুর যথা তথা হয়। কলা বাঙলার মত জল হাওয়া ও সরস মাটিতে হয়। পশ্চিম বা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বা মধ্য প্রদেশের শুষ্ক মাটি বা শুষ্ক জল হাওয়ায় কলা হইবে না। এই রকমের অনেক কথাই আমরা একটা সঙ্কেত শিখাইয়া দিবার জন্য সংক্ষেপতঃ বলিয়াছি মাত্র অতঃপর যেখানে কার্য্য-ক্ষেত্র নির্ণিত হইবে দেশ, কাল ও আবহাওয়া অনুসারে সকলের নিজ নিজ কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইতে হইবে।

উদ্যান রচয়িতার, উদ্যান রচনাকালে, আর একটা প্রশ্ন মনে উদয় হয় যে, কোন্ সময় গাছ বসাইব বা কোন্ সময়, কোন্ গাছ বসাইব। গাছ বসাইবার সময়েরও

একটা নির্দ্ধারিত নিয়ম বলিয়া দেওয়া সহজ নহে। এ বিষয়েও বহুদর্শন দ্বারা কর্ত্তব্যাবধারিত হইবে। তবে আভাস দিবার জন্য বলা যায় যে, দারুণ শীতে বা ঘোরতর গ্রীষ্মের সময় কোন বৃক্ষলতা বসান চলে না। তবুও বাঙলায় বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে কলা পুতিলে বর্ষারম্ভেই গাছ বেশ ধরিয়া বসে এবং বর্ষা শেষেই ঝাড় বাঁধিয়া যায়। কিন্তু বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠের দারুণ গ্রীষ্মে, কাঁটাল, লিচু, জাম, জামরুল গাছ বসান চলে না। ঐ সকল গাছ খুব গরমের সময় বসাইতে হইলে প্রত্যেক গাছের জন্য ছায়া করিয়া দেওয়া এবং ঘন ঘন জল প্রদানের আবশ্যক হয়। এই কারণে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া মাটি একটু সরস হইলেই ও দারুণ গ্রীষ্ম কিঞ্চিৎ কমিয়া আসিলে ঐ সকল গাছ বসানই ভাল। পেঁপে গাছ, খুব বর্ষার সময় ভিন্ন অন্য সময় বীজ-ক্ষেত্র * হইতে নাড়িয়া বাগানে বসান যায় না। বৃষ্টি পড়িতেছে এমন সময় পেঁপের চারাগুলি নাড়িতে পারিলেই সুবিধা হয়। আতা চারাও পুরা বর্ষায় বসাইতে হয়। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়ে টমাটোর চাষ হয় কিন্তু আশ্বিনের শেষ টেঁপারি বসাইতে হয়। মাঘ, ফাল্গুনে আখের আবাদ করে কিন্তু কার্ত্তিক মাসে আখের আবাদ পত্তন করিতে পারিলে আরও ভাল হয়। কার্ত্তিকের সরস মাটিতে শিকড় জন্মিয়া আখের কলাগুলি মাটির উপর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিলে অন্ততঃ একবার জল সেচনের পয়সা বাঁচিয়া যায়। উদ্যানজাত তল-শস্যের কথা বাদ দিলেও আমরা দেখিতে পাই যে আষাঢ়, শ্রাবণ, গাছ বসাইবার ভাল সময় হইলেও আশ্বিন, কার্ত্তিক আরও ভাল। বর্ষারম্ভে গাছ বসাইলে গাছে জল দিবার খরচ বাঁচে বটে কিন্তু তখন অতি বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির ভয় আছে। অনাবৃষ্টি হইলে তোলা জল দিয়া বাঁচাইতে পারা যায়। বর্ষার সাহায্য মিলিল না এই মাত্র কিন্তু অতি বৃষ্টিতে বড় বিপদ। গাছের কচি শিকড় বৃষ্টির জল বসিয়া মারা যাইতে পারে। এই জন্য বর্ষার পরে গাছ বসাইলে চারা গাছ বাঁচাইবার পক্ষে অধিকতর সম্ভাবনা থাকে। বর্ষার পরে জমিতে 'যো' † হইলে তবে গাছ বসাইতে হইবে। গাছ বসাইয়া জল দিবার পর মাটির 'যো' হইলে উপর উপর খুসিয়া শুষ্ক ঘাস কুটা দ্বারা 'যো' বাঁধিয়া দিতে হইবে। 'যো' বাঁধা থাকিলে অনেক দিন অন্তর গাছে জল দিলেও গাছ মরে না। কার্ত্তিক মাসে গাছ বসাইবার আর এক সুবিধা যে, গাছগুলি সরস মাটি ও ঠাণ্ডা আবহাওয়া পাইয়া অল্পে অল্পে শিকড় ছাড়িতে আরম্ভ করে।

---

* বীজ ক্ষেত্র—বীজ তলা—অল্প পরিসর এক একটি চৌকা, যথায় বীজ ফেলিয়া চারা তৈয়ারি করা হয়।

† 'যো"—মাটি সরস থাকিবে, অথচ অতিরিক্ত আর্দ্র তাহেতু কোদাল খোন্তায় মাটি জড়াইয়া যাইবে না এই অবস্থাকে মাটির 'যো'। (১) সরস মাটির উপর খুসিয়া তাহার উপর খড় কুটা বা পাতাদ্বারা চাপা দিয়া মাটির রসবাষ্পাকারে উঠিয়া যাইতে না দেওয়ার নাম 'যো' করিয়া দেওয়া।

শীতকালে গাছের বৃদ্ধি যেন স্থগিত থাকে। প্রবল শীতের সময় মানুষ ও জীবজন্তু যেমন জড়সড় হইয়া থাকে বৃক্ষলতাদিও সেই প্রকার কতকটা অসাড়ভাব প্রাপ্ত হয়। বসন্তের হাওয়ায় গাছের পুনরায় পাতা গজাইতে থাকে। ডাল পাতার বৃদ্ধি হইলেই জানিবে যে মাটির ভিতর শিকড়ও বাড়িতেছে। একটি গাছকে সমস্ত শিকড় সমেত উপড়াইয়া যদি দেখা যায় তাহা হইলে বুঝিবে যে শিকড়গুলিও শাখা প্রশাখার ন্যায় বিস্তার পাইয়াছে। যাহার মূল শিকড়টি মাটির নিম্নে অধিক দূর নামিয়া গেল তাহার উপরের কাণ্ডটিও মাটির উপর ততটা উচ্চ হইয়া উঠিল। তার পর যেখানে অনুকূল মাটি পাইয়া শিকড় বিস্তৃত হইয়া পড়িল কাণ্ডের উপর ডাল পালা সেই স্থান হইতে বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করিল। লতা গাছ লতাইয়া যেমন বহু দূর বিস্তৃত হয় তাহাদের শিকড়ও সেই রকম বহুদূর বিস্তৃত। কোন কোন লতা কিছু বেশী সতর্ক তাহারা নিজের শরীরের গ্রন্থী হইতে শিকড় ছাড়িয়া রস গ্রহণের নূতন নূতন স্থান করিয়া লয়। নারিকেল, তাল, সুপারি প্রভৃতি পাম জাতীয় বৃক্ষের আচরণ কিছু স্বতন্ত্র। তাহাদের একটা মূল শিকড় মাটির নিম্নে বহুদূর চলিয়া যায় এই জন্য উর্দ্ধে কাণ্ডের এত বৃদ্ধি কিন্তু সেই মূল শিকড়ের অগ্রভাগ নানা শাখা প্রশাখায় বিস্তার লাভ করে তাহাদের শাখা শিকড়গুলি কাণ্ডের গায়ে একটু নিম্নেই সংলগ্ন থাকিয়া মাটির অল্প নিচু দিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া অনেক দূর বিস্তৃত হয়। পাম জাতীয় গাছের জন্য এই হেতু অধিক রসা মাটির আবশ্যক। গাছের স্বভাব ও তাহার শিকড় চালিবার ধরণ জানা থাকিলে কোন্ জমিতে কোন্ গাছ বসাইতে হইবে এবং কোন্ সময় কোন্ গাছ বসান উচিত ঠিক করিয়া লওয়া যায়। আমরা যতটুকু বুঝিয়াছি তাহাতে আমরা দেখি যে আম, লিচু, জাম, জামরুল, লকেট, ন্যাসপাতি, লেবু, পেয়ারা প্রভৃতি অধিকাংশ ফলের গাছ বর্ষান্তে বসানই ভাল। বাঙলা ছাড়াইয়া যতই পশ্চিমে যাওয়া যায় ততই মাটিতে রস কম, সে সব জায়গায় বর্ষা শেষে গাছ বসাইবার একমাত্র সময় পাওয়া যায়। তাহার অন্যথা করিতে গেলে খরচ অধিক হয়।

বর্ষার আগে বা শেষে যখনই গাছ বসাও, গাছ বসাইয়া তাহাতে জল দিতে হয়। জল না দিলে গাছের গোড়ায় আল্‌গা মাটি স্তরে স্তরে বসে না। বাগানের মাটির সহিত গাছের গোড়ার মাটির সংযোগ ও সম্বদ্ধতার প্রয়োজন। জীবজন্তুর যেমন আহার, পানীয় ও শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য বায়ুর প্রয়োজন, গাছেরও তদ্রূপ। গাছ মানুষের মত খাদ্য ও পানীয় পৃথক ভাবে গ্রহণ করে না। সাধারণতঃ বৃক্ষ লতা তাহাদের শিকড় দ্বারা কোন স্থুল বস্তু গ্রহণ করিতে পারে না। তাহাদের আহার্য্য স্থুল-সার, জল সংযোগে রসরূপে পরিণত হইলে তবে শিকড় দ্বারা বৃক্ষ শরীরে প্রবেশ লাভ করে। তাহাদের আহারে জলের অংশ খুব অধিক। মাটি

এই কারণে সরস করিয়া লইতে হইবে। মাটির রস সর্ব্বদাই রক্ষা করা চাই। সেই রস যোগাইবার জন্য বৃষ্টির জলের সাহায্য পাইলে ভাল, নতুবা তোমাকে যে কোন উপায়ে জল যোগাইতে হইবে। তুমি জল না যোগাইলে জানিবে যে মাটিতে তাহার আহার্য্য বস্তু সত্বেও বৃক্ষলতা আহার ও পানীয় উভয় হইতেই বঞ্চিত হইয়াছে। বৃক্ষ লতার শিকড়ের গতি অনুসরণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা জলান্বেষণে বহুদূর গমন করিয়া থাকে। কোন স্থানে সরস আহারের সন্ধান পাইলে তাহাদের শিকড় কষ্টে কঠিন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া প্রস্তরময় ভূমির বা ইষ্টক প্রাচিরের ছিদ্র বা ফাটালের মধ্য দিয়া শিকড় চালাইয়া তাহাদের আহার প্রাপ্তির স্থানে উপস্থিত হয়। যেখানে উদ্যান রচনা করা হইবে তাহার নিম্নস্তর কেবল বালুকা বা কাঁকরময় হইলে, কিম্বা কঠিন পাথর হইলে তথায় বৃক্ষ লতাদি রোপণ করিয়া সুপ্রণালীমত জল সেচন করিয়াও তোমার পরিশ্রম সার্থক হইবে না। বালুকাস্তরে জল যাইবা মাত্র বহু নিচে চলিয়া যাইবে। শিকড় নিরস বালুকাস্তরে পড়িয়া আহার পানীয়ের অভাবে ক্ষুন্ন ও শীর্ণ হইবে। বাহিরের ডাল পালা ক্রমে বিবর্ণ ও পরে শুষ্ক হইয়া আসিবে। নিচে প্রস্তর থাকিলে জল যাইয়া তথায় জমিবে এবং ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর উদ্ভিদের শিকড় জলে নিমজ্জিত থাকিয়াও রস গ্রহণ করিতে পারিবে না।

উদ্যান রচনায় অনেক হিসাব করিতে হয়, সকল দিকে চোখ না রাখিলে সব পরিশ্রম পণ্ড হয়। অনেক বলিয়াছি, আবার বলি দেশ, কাল, আবহাওয়া বিচার করিয়া বৃক্ষলতাদির রোপণ কাল নির্ণয় করিতে হইবে, এবং অবস্থা বুঝিয়া জল সেচনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। মাটিতে সার দিয়া বৃক্ষ লতাদি রোপণ করিতে হয়, রোপণ করিয়া জল দিতে হয় এবং যতবার সার দিতে হইবে ততবার গাছে জল দিতে হইবে, ইহা সাধারণ নিয়ম, এটী যেন মনে থাকে। বারান্তরে আমরা বৃক্ষ লতাদির রোপণ প্রণালীর বিষয় আলোচনা করিয়া আমরা এ প্রস্তাব শেষ করিব।

বাঙলায় কৃষি

কৃষিদ্বারা শিক্ষিত যুবকদের জীবনোপায় হইতে পারে কি না এই কথাই এখন অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়।

সরকারী কাগজ পত্র অনুসন্ধান করিয়া জানা যায় যে—

বঙ্গের পরিমাণ	...	১৫ কোটি		বিঘা।
চাষের জমি	...	৭॥০ „		বিঘা
যতভূমিতে ২ বার চাষ হয়	...	১ „	৬৫ লক্ষ	বিঘা
বন ভূমি	...	১ „	২০ „	বিঘা
চাষের অযোগ্য ভূমি	...	৩ „	৩০ „	বিঘা
চাষের উপযুক্ত বন	...	১ „	৫০ „	বিঘা
পতিত জমি	...	১ „	৪২॥০ „	বিঘা

চাষের যোগ্য পতিত জমিরও যে তালিকা পাওয়া যায় তাহা এই—

প্রেসিডেন্সী বিভাগ	...	...	৩০ লক্ষ বিঘা
বর্দ্ধমান বিভাগ	...	...	৬০ লক্ষ বিঘা
রাজসাহী বিভাগ	...	...	৮ লক্ষ বিঘা
ঢাকা বিভাগ	...	...	৫ লক্ষ বিঘা
চট্টগ্রাম বিভাগ	...	...	৫ লক্ষ বিঘা

১৯১২—১৩ সালে বঙ্গের কত জমিতে শস্য উৎপন্ন হইয়াছে তাহার তালিকা—

হৈমন্তিক ধান্য	...	৪ কোটি ৮৯ লক্ষ		বিঘা
ভাদুই ধান্য	...	১ কোটি ৫৯ লক্ষ		বিঘা
আশু ধান্য	...	১০ লক্ষ		বিঘা
ইক্ষু	...	৬ লক্ষ ৬৫ হাজার		বিঘা
ডাইল ইত্যাদির অন্যান্য খাদ্য শস্য	...	৪৫ লক্ষ	...	বিঘা
তিল সরিষা ইত্যাদি	...	৬২ লক্ষ	...	বিঘা
গাঁজা আফিং ইত্যাদি	...	১৫ লক্ষ	...	বিঘা

এই তালিকায় দেখা যাইতেছে যে বঙ্গে প্রায় ৬ কোটি ৬০ লক্ষ বিঘা জমিতে ধান হইয়াছিল। পাট জন্মিয়াছিল ৯০ লক্ষ বিঘা।

তরকারী ও ফলের বাগান ৩০ লক্ষ বিঘায় উৎপন্ন হইয়াছিল।

কোন শস্য হইতে কি আয় হইয়াছে তাহাও জানা যায়—

ধানে প্রতি বিঘায় ৪ মণ হিঃ	...	৫২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা
খড়ে ,, ,, ৭ মণ	...	২৫ ,, ... ,, টাকা
পাটে ,, ,, ৫ মণ	...	৩৬ ,, ... ,, টাকা
ইক্ষুতে,, ,, ১০॥০ মণ	...	৬ ,, ৫০ ,, টাকা
ডাইলে ইত্যাদি	...	১ ,, ৮০ ,, টাকা
সরিষা ইত্যাদিতে তৈল শস্য	...	৬ ,, ... ,, টাকা
আফিং গাঁজা ইত্যাদি হইতে	...	৫ ,, ... ,, টাকা
তরকারী ফল ইত্যাদি হইতে	...	৫ ,, ... ,, টাকা

উক্ত বৎসরে বঙ্গের শস্য হইতে মোট ১৬১ কোটী ১০ লক্ষ টাকা আয় দেখাইয়াছেন, কয়েক বৎসরে গড় হিসাব ধরিলে বৎসরে ১৭০ কোটি টাকা আয় হইয়া থাকে।

অনেকেরই ধারণা যে, বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিলে শস্যের ফলনের হার দুই গুণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, অর্থাৎ কৃষি হইতে ১৭০ কোটি টাকার পরিবর্ত্তে ৩৪০ কোটি টাকা আয় করা যাইতে পারে। শিক্ষা গুণে কৃষির কেমন উন্নতি হইতে পারে তাহা বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট-কৃষিবিভাগের ডেপুটী ডিরেক্টার মিঃ স্মিথ কোন সময় ছাত্র সভায় জর্ম্মণীর দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে—ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংলণ্ডই কৃষিকার্য্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল। তখন পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশের ছাত্রগণ ইংলণ্ডে কৃষিকার্য্য শিক্ষা করিতে যাইত। বর্ত্তমান সময়ে রুষিয়া, ফ্রান্স, আমেরিকা, চীন ও জাপান, এমন কি ইংলণ্ডের ছাত্রগণ কৃষি শিক্ষার জন্য জর্ম্মণী যাইতেছে। জর্ম্মণীর ভূমি উর্ব্বরা নহে, ইংলণ্ডের ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা, সুতরাং কৃষি-কার্য্যে জর্ম্মণী যে ইংলণ্ডকে হারাইয়া দিয়াছে, কেবল শিক্ষাই তাহার প্রধান কারণ। ১০০ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে যে হারে শস্য জন্মিত, জর্ম্মণীতে তাহার অর্দ্ধাংশও হইত না। বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডে প্রতি বিঘায় যে পরিমাণ শস্য জন্মে, জর্ম্মণীতে তাহা অপেক্ষা বেশী জন্মিয়া থাকে। গম ইংলণ্ডের এক প্রধান শস্য। জর্ম্মণীর অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের তুল্য গম জন্মিতেছে।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে জর্ম্মণীর ডাক্তার আলব্রট থেয়ার বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন, এখন জর্ম্মণীতে কৃষি-শিক্ষা দানের জন্য শত শত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই শিক্ষাই জর্ম্মণকৃষির উন্নতির প্রধান কারণ।

কোন বাঙ্গালী যদি ১০০ বিঘা জমি লইয়া চাষ করিতে আরম্ভ করেন, তবে হয়তঃ তিনি মাসে ৩৫০ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন, কিন্তু বাঙ্গালীর সে শিক্ষানুরাগ ও অধ্যবসায় কোথায়?”

কিন্তু বৈজ্ঞানিক কৃষি বলিলে—আজকাল আমরা কেবল জমিতে সার দেওয়ার কথাই বুঝি। কেবল সার দিলেই জমির ফলন বাড়ে না, বীজ নির্ব্বাচনের কথাটায় বড় আমাদের দেশের আস্থা নাই, সরকারী কৃষি-বিভাগও এখনও পর্য্যন্ত এবিষয়ে উদাসীন। যে বীজ লইয়া চাষ করিলে শস্যের ফলনের হার বাড়িবে সে রকম বীজ উৎপাদনের চেষ্টা ভারতে কোথাও নাই বলিলেই হয়। যে চাষ করিবে সেই সুবীজ উৎপাদন করিতে পারে কিন্তু সকলের জন্য সুবীজ সঞ্চয় করা তাহার সাধ্যায়ত্ব নহে। চাষী ও বীজ ব্যবসায়ীর কার্য্য পৃথক হইবে এবং পৃথক হওয়াও কর্ত্তব্য। ভারতে বীজ উৎপাদন ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হউক ইহাই আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

গবর্ণমেণ্ট নানা স্থানে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছেন। বাঙ্গালার শিক্ষিত যুবকগণ চেষ্টা করিলে কৃষিক্ষেত্রে শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। কৃষিক্ষেত্রেই তাহাদের বাসের সুবিধা হইতে পারে। তাহাদের কেবল নিজের আহারের ব্যয় ভার বহন করিতে হইবে। কৃষিক্ষেত্রে জ্ঞান লাভ করিয়া যদি তাঁহারা কিছুকাল কোন কৃষি কলেজে অধ্যয়ন করেন, তবে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে কৃষিকার্য্য করিয়া ধনোপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইবেন। ইহা ঠিক কথা। কিন্তু আমরা বলি যে প্রথমে কৃষি-কলেজে শিক্ষা করিয়া, তারপর হাতে কলমে অধিত বিদ্যাটা রপ্ত করিয়া লইবারও আবশ্যক হয়। এখন একটা প্রশ্ন আসিয়া পড়ে যে বহুল ছাত্রের পাঠের উপযোগী পর্য্যাপ্ত সংখ্যক কৃষি-কলেজ বা কৃষি-বিদ্যালয় এবং ছাত্রগণের কৃষি-পর্য্যালোচনার্থ কৃষিক্ষেত্র কোথায় ?

এ সকল না হয় হইল। কিন্তু বাঙলা দেশে চাষোপযোগী এক চৌহদ্দীর মধ্যে ১০০ বিঘা জায়গা যোগাড় করা বড় সহজ নহে। জমিদারগণের সহানুভূতি বিনা কোন সুযোগ ঘটিয়া উঠা দুঃসাধ্য। অনাবাদী জঙ্গল জমির যোগাড় হইলেও হইতে পারে কিন্তু সেই জমি হাসিল করিয়া আবাদে পরিণত করার খরচের সংস্থান হয়তঃ অনেক শিক্ষিত ভদ্রসন্তানের নাই। ধনী সম্প্রদায়ও তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ। আমাদের দেশে ধনী ও কর্ম্মীর মধ্যে বিশ্বাসের সূত্র বড়ই ক্ষীণ। ধনীরা, ধন, যকের মত আগলাইয়া বসিয়া থাকিতে ভাল বাসেন। অথবা কাজ না জানিয়া কাজী সাজিয়া ব্যবসায়ের ব্যাঘাত জন্মান। কখন বা কাহারও কাহারও দ্বারা ধনের অপব্যবহার হেতু ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ এখন সকল কাজের কাজীর কথা শ্রদ্ধা করিতে পারেন না। আমাদের দেশের কাজী সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই হাতে হাতিয়ারে কাজ করিতে নারাজ বা অপারগ সেই হেতু ভদ্রলোকের চাষে খরচ অধিক হয়। চাষীরা চাষের কাজ যে ভাবে চালাইতে পারে, ভদ্রলোকে তাহা পারে না। তাহাদের

চাষীর উপর নির্ভর করা ব্যতীত অন্য উপায় নাই, এই কারণে চাষীগণকেও অংশীদারের মধ্যে মানিয়া লইতে হয়। সুতরাং ভদ্রলোকের চাষে কম লাভ হইবেই হইবে। ১০০ শত বিঘার অনেক অধিক জমি লইয়া চাষ না করিলে ভদ্রলোকের কুলান মত আয় হওয়া সুকঠিন। অপর কথা এই যে, রাজ সাহায্যে জার্ম্মনিতে যথা তথা অনেক রসায়ন তত্ত্বাগার স্থাপিত হইয়াছে। বে-সরকারী রসায়নবিদের সংখ্যাও তুলনা করিয়া দেখ যে তথায় অনেক বেশী। এত বড় বঙ্গদেশে দুই চারিটা কৃষি-পরীক্ষা ক্ষেত্র দ্বারা সমগ্র বাঙলায় চাষীর কতটুকু ইষ্ট সাধন হইতে পারে!

কৃষি বা চাকুরী—আমাদের দেশের লোকের চাকুরিটা মজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আত্মনির্ভরতা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছে। সহায় সম্পদ না থাকিলে যাহা হয় তাহাই হইয়াছে, তাহা এতীব বিচিত্র মনে করা উচিত নহে। চাকুরি জুটিলে অসহায়ের সেইটাই প্রধান সম্বল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু চাকুরি যে আর জুটিবে না, এখন উপায় কি হবে এই ভাবনাই প্রবল হইতে প্রবলতর হইতেছে। চাই অদম্য উৎসাহ। তাহা হইলে বোধ হয় রাজা জমিদার, ধনী ও কর্ম্মী এই তিনের শক্তি একত্রিত হইতে পারে। অতি প্রত্যুষে তোমাকে ক্ষেতে লাঙ্গল লইয়া ছুটিতে হইবে। ক্ষেতে জল দিবার আবশ্যক হইলে রাত দিন বিচার না করিয়া জমিতে জল সেচনের আয়োজন করিতে হইবে। ক্ষেতে পোকা লাগিলে আবশ্যক অনুসারে রাতে প্রদীপ জালিয়া ফসলের পোকা বাছিতে হইবে। জমিতে আগাছা জন্মিলে ক্ষিপ্র হস্তে তাহা উঠাইয়া ফেলিতে হইবে। তুমি চারিগুণ খাটিলে তোমার অধীনস্থ লোকেরা এক গুণ খাটিবে এটা যেন মনে মনে থাকে। এতো গেল বাহিরের কাজ; ঘরের ভিতরের কাজগুলি—ফসল ছাড়া বাছা আছে, বীজ রক্ষা করার ব্যবস্থা আছে, ফল, শস্য বাজারে পাঠাইবার উদ্যোগ আয়োজন আছে, হিসাব নিকাশ আছে, মন্ত্রণা, কল্পনা আছে, কৃষিতত্ত্বের নব নব বিধান আলোচনা করা আছে। বোধ হয় রাজ্য রক্ষা ইহা অপেক্ষা সহজ নহে—চাষীর কাজ এত গুরুতর। এত খাটিলে তবে তোমার লাভ হইবে।

খোস্ পোষাকী বাঙালী যুবক এত খাটিতে, এত ধুলা কাদা মাখিতে সহজে রাজী হইবে কি? তোমায় ক্ষেতে পশু পক্ষি পালন করিতে হইবে। এই সকল পশু, পক্ষীর খোষা, ভুষী, খুদ, কুঁড়া ও তোমার আহার্য্য পাণীয়ের পরিত্যক্ত অংশে আহারের অনেক আনুকূল্য হইবে। তোমার ঘরে—চাষীর ঘরে ইহারা অতি অল্প খরচে পালিত পারিবে। ইহাদের মলমূত্রে তোমার জমীর সার যোগাইবে। গো-মহিষের বাচ্ছা জন্মিয়া তোমার ক্ষেত্রে হাল বহন করিবে, তোমার গাড়ী টানিবে। ইউরোপ এমেরিকার বাগানে, মধু মক্ষিকা পুষিয়া মধু সংগ্রহ পর্য্যন্ত

করা হয়। কৃষিক্ষেত্রেই তোমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। কৃষিক্ষেত্রের সমস্ত অংশ তোমার নখ দর্পণে থাকিবে, প্রত্যেক দ্রব্যাদিতে তোমার অহরহ নজর পড়িবে। জমির 'যো' হইলে তোমাকে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া চাষের কাজে লাগিয়া যাইতে হইবে। অতি প্রত্যুষ হইতে যতক্ষণ না রাত্রে নিদ্রা যাও ততক্ষণ এক মুহূর্ত্তও তোমায় আলস্যে কাটাইবার সময় নাই। এমন করিলে তবে লাভের মুখ দেখিতে পাইবে, এবং তোমাকে সুচাষী বলা যাইতে পারিবে।

তোমার মূল ধনের অনুপাতে তোমার ক্ষেত্রটি ছোট কিম্বা বড় হইবে। যাহা তুমি একলা আয়ত্ব করিতে পারিবে এমন একটি জমি লইয়া আরম্ভ করাই তোমার কর্ত্তব্য। ১০০ শত বিঘা জমি লইয়া আরম্ভ কর, তার পর সুবিধা বুঝিলে ক্রমশঃ তোমার জমির পরিমাণ বাড়াইয়া লও—ইহাই সুযুক্তি। শুধু শস্য উৎপাদন লইয়া পড়িয়া থাকিলে হয়তঃ চাষীর চলিতে পারে কিন্তু তুমি ভদ্রলোক, তোমার অভাব অধিক, তোমার চলিবে না, কৃষির আনুসঙ্গিক কার্য্যগুলিও তোমায় করিতে হইবে। তোমার ক্ষেত্র ছোট হইলে তুমি অন্ততঃ দশ বারটা গাভী, মহিষী পালন করিবার ব্যবস্থা করিতে পার। পনর কুড়িটা হিসাবে ছাগল, ভেঁড়া, হাঁস, মুর্গী পুষিতেও ক্ষতি নাই। দুধ, ঘি, হাঁস, মুরগী, ছাগল বেচিয়া, ডিম বেচিয়া তোমার অনেক দিনের সংসার খরচ চলিয়া যাইবে। তোমার সাংসারিক আহার পানীয়ের সাহায্য হইবে। ইহাদের পালন করিতে যে খরচ, সে পয়সা তোমার তাহাদের পরিত্যক্ত মলমূত্র সারের দামে উঠিয়া যাইবে।

ব্যবসায়ে ধনীর সাহায্য—আমাদের দেশের দুই সম্প্রদায়ের ধনী আছে, এক দল কর্ম্মীর কাজের অযথা খুঁটি নাটী ধরেন, তাতে কাজের সুসার না হইয়া ব্যাঘাতই হয়; অন্যদল একেবারে উদাসীন, টাকা সুদক্ষ লোকের হাতে দিয়াই তাঁরা নিশ্চিন্ত। তাঁহারা নিচেষ্টভাবে ঘরে বসিয়া লাভের অংশ ভোগ করিতে চান। এমন স্থলে কর্ম্মীর মনে তাহার পরিশ্রমের অনুপাতে স্বভাবতই ধনীর প্রতি একটা অশ্রদ্ধা আসে এবং ক্রমশঃ মনে হয় যে কাজটা তাহারই, ধনীকে লাভের অংশ দিতে কৃপণতা আসে। ধনীগণের উচিত কাজে অযথা ব্যাঘাত না জন্মাইয়া তাঁহাদের সতর্কতা ও চারিদিকে নজর রাখিয়া চলা—ব্যবসায়ে কিম্বা চাষে ধন নিয়োগ করিলে টাকা সুদে খাটান অপেক্ষা অধিক লাভ হয় কিন্তু টাকার অপব্যবহার হইলে লাভ হওয়া দূরে থাকুক মূলধনই বিনষ্ট হয়। টাকা পাইলেই কোন ব্যাঙ্কে জমা রাখা কর্ত্তব্য। মূলধনকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া এক ভাগ লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে হয়, দ্বিতীয় ভাগ হইতে আবশ্যক অনুসারে খরচ করিতে হইবে এবং সুবিধা হইলেই তাহা পূরণ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য; তৃতীয় ভাগ সঞ্চিত থাকিবে কেবলমাত্র ব্যবসায়ের দৈব কোন বিঘ্ন

বিপদ প্রতিকারের জন্য তাহাতে হস্তক্ষেপ করা হইবে। সমস্ত টাকাই কর্ম্মীর একতারে থাকিবে। ব্যাঙ্ক হইতে সে-ই টাকা উঠাইবে ও জমা রাখিবে কিন্তু ধনীর লক্ষ্য রাখা চাই যে নিয়মানুযায়ী খরচ পত্র হইতেছে কি না।

বাঙলায় চাষীদের বিপদ—বাঙলায় রাজ সাহায্য সে বিপদ দূর করিতে হইবে—বাঙলার জল হাওয়া, মাটি চাষের অনুকূল বটে, বাঙলা দেশ সুজলা সুফলা বটে, কিন্তু রেল বিস্তারের সঙ্গে বাঙলার স্বাভাবিক জল নিকাশী খাল, বিল, নালার মাঝে মাঝে বাঁধ পড়িয়াছে। যে গুলি শস্য ক্ষেত্র ছিল এখন জলায় পরিণত হইয়াছে। দেশময় মেলেরিয়ায় ছাইয়া ফেলিয়াছে, অধিকাংশ পল্লীভূমে চারিদিকে পচা জল। মনুষ্য পশ্বাদির পাণীয় জলের দারুণ অভাব। গবাদি পশু রুগ্ন, মানুষ অকর্ম্মণ্য, চাষ করে কে? স্থান সকল এমনি অস্বাস্থ্যকর যে তাত-বাত সহিষ্ণু কৃষককুলই তথায় টেঁকিতে পারিতেছে না, ভদ্র লোকের কি প্রকারে সেই সকল স্থানে কৃষি-ক্ষেত্র স্থাপন সম্ভব হইবে অনুমান করা যায় না। একেবারে গবর্ণমেণ্ট মনে না করিলে ইহার প্রতিকার হইবে না। জল নিকাশের পয়োনালা গুলির সংস্কার করিয়া গভর্ণমেণ্ট চাষের জমির ও চাষীর পুনরুদ্ধার সাধন করুন। রাজ সাহায্য ব্যতীত কোন দেশের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না।

পত্রাদি

চাষের জমি—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মল্লিক, কানপুর ষ্টেসন, হাঁসপাতাল।

মহাশয়, কিছু দিন পূর্ব্বে, আমার যতদূর স্মরণ হয়, "কৃষক" পত্রে পড়িয়াছিলাম যে, ত্রিপুরা রাজ্যে কৃষির জন্য জমি পাওয়া যায়। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া কাহাকে এই বিষয়ের জন্য পত্র লিখিতে হইবে তাঁহার নাম ও ঠিকানা লিখিলে অত্যন্ত বাধিত হইব। যদি ওখানে না পাওয়া যায় ত অন্য কোথায় পাওয়া যাইতে পারে তাহাও লিখিবেন।

উত্তর—ত্রিপুরা রাজ্যে কোথায় জমি পাওয়া যায় তাহা কোন মাসের কৃষকে বাহির হইয়াছিল স্মরণ নাই। যাহা হউক আপনার পত্র খানি ছাপাইয়া আমরা আবাদী জমির পুনরায় সন্ধান লইতেছি।

গোলাপের সার—শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ সরকার বেহালা ২৪ পরগণা গোলাপের সার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন।

গোলাপের সার সম্বন্ধে বহুবার কৃষকে আলোচনা হইয়াছে। আমরা অনেকবার বলিয়াছি নিম্ন লিখিত রাসায়নিক কৃত্রিম সার গোলাপের সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

সোরা (Nitrate of potash)	৮ ভাগ
বোনসুপার (Calcium phosphate)	১৫ "
জীপ্‌সম্ (Suplhate of Lime)	৮ "
ম্যাগ্নেসিয়াম-সলফেট	২ "
হিরাকস (Sulphate of Iron)	১ "
	৩৪

এই মিশ্র-সার অর্দ্ধপোয়া হিসাবে মাটির সহিত মিশাইয়া প্রত্যেক গোলাপ গাছের গোড়ায় দিতে হয়। শুষ্ক এঁটেল মাটি পুড়াইয়া ইহার সহিত ব্যবহার করিলে আরও ভাল হয়। ইহাতে গোলাপের ফুল বড় হয়, রঙ ভাল হয়। গোলাপ গাছ ছাঁটা ও জমি প্রস্তুত সম্বন্ধে জানিতে চান—ঐ সম্বন্ধে আমরা কৃষকে বারান্তরে আলোচনা করিব।

আসামে তুলাচাষ—মিঃ এইচ্, ত্রেন, সি, হিল, চাবুয়া, উপর আসাম।

বাঙী গাছ কাপাস কি রকম, ইহার আবাদে লাভ হয় কি না? বৎসরী তুলার মধ্যে কোনটি ভাল, কোন চাষে লাভ অধিক। তুলার বাজার দর কি, কোথায় বিক্রয় হয়।

উত্তর—গাছতুলা যাহার লম্বা ফল হয় সেই তুলার চাষ করাই ভাল। বাঙী নামে কোন গাছ তুলা আছে কি না আমরা জানি না। বানী নামে বৎসরী তুলা আছে। গাছ তুলার মধ্যে ঢাকার দেব কাপাসই উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার ফলগুলি লম্বা এবং বড়, আঁশ দীর্ঘ। ইহার ফলের মধ্যে ঘন সম্বদ্ধ এবং যুক্তাকারে থাকে। বীজ হইতে আঁশ অতি সহজে বিচ্ছিন্ন করা যায়।

বৎসরী তুলার মধ্যে গুজরাটের ব্রোচ; মধ্যপ্রদেশের বানী, ছোট নাগপুরের বুড়ী সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বিদেশী তুলা ভারতে জল হাওয়ায় সকল গুলা ভাল হয় না। এমেরিকান অপ্‌ল্যাণ্ড তুলা বোম্বাই প্রদেশে ধারওয়া জেলায় বেশ জন্মিতেছে। এই অপ্‌ল্যাণ্ড তুলার ভারতোৎপন্ন বীজ ধারওয়ার তুলা নামেই চলিতেছে। ইহা ভারতে জল মাটির বিশেষ উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে। আসামে বুড়ী ও ধারোয়ার তুলা চাষ করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। Mr. Gammie কৃত "Indian Cottons" পুস্তক খানি পাঠে ভারতীয় তুলা চাষের অনেক খবর পাওয়া যায়।

কলিকাতা বাজারে তুলার ও পাটের রপ্তানিকারক অনেক আছে সুতরাং এই দুইটি জিনিষের খরিদ্দারের অভাব নাই। তুলার নমুনা পাঠাইলে তবে দর ঠিক হইতে পারে। বিদেশে নমুনা পাঠাইয়াও তুলা বেচা যায়। অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করিতে না পারিলে জাহাজী চালান চলে না।

গোপাল-বান্ধব প্রথম ভাগ—শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার বি, এল, প্রণীত কাগজে বাঁধাই ডবল ক্রাউন ষোল পেজী ৩৮১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ১৲ টাকা।

কৃষি-প্রধান ভারতে গোধনই কৃষকের প্রধান ধন। গোশক্তির সাহায্য ব্যতীরেকে কৃষককুল কৃষিকর্ম্মে এক পাও অগ্রসর হইতে পারে না। গ্রন্থকার গোজাতির-উপকারিতা পরিচ্ছেদে দেখাইয়াছেন যে, হল বহন বা শকট বহন কার্য্য গোজাতিদ্বারা কম খরচে সাধিত হয়। ভারতের মত মাটিতে গরুর হালই একমাত্র উপযোগী। পক্ষান্তরে গবাদি আমাদের শিশুগণের আহার যোগায় এবং ঘি, মাখন, ননী, ক্ষীর, ছানা, দধি প্রভৃতি সুখাদ্য সুপেয় খাদ্যের সংস্থান করিয়া দেয়। গবাদির মলমূত্রের মত এমন সহজ প্রাপ্য ও বিশিষ্ট সার খুব কমই আছে। গবাদির মৃত দেহও আমাদের কাজে লাগে। গোচর্ম্ম চর্ম্মের মধ্যে উৎকৃষ্ট, ইহা জুতা, গাড়ীর সাজ, ব্যাগ বা পোর্টমাটো নির্ম্মাণে, মৃদঙ্গ বা ঢোলকাদি ছাওয়াইতে এবং অন্য শত শত কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই কারণে ব্যবসায়ীর ইহা একটি লাভবান পণ্য। গরুর লোম হইতে গদী, জিন, কুশান প্রস্তুত হয়, শিঙ হইতে ছুরির বাঁট, চিরুণী তৈয়ারি হয়; গো-পদ হইতে নীটস্‌-ফুট অয়েল নামক একপ্রকার তৈল প্রস্তুত হয়। ইহা মাখাইলে চর্ম্ম নরম ও মসৃণ থাকে। গরুর শিঙ খুর, হাড়, মেধ হইতে শিরীশ নামক আঠা প্রস্তুত হয়। হাড়ে জমির সার হয়। গো-রক্তও জমির সার। ইহাদ্বারা চিনি পরিষ্কারও হইতে পারে। রক্তে রঞ্জন বা রঙ প্রস্তুত হইতে পারে। গো চর্ব্বিতে সাবান ও বাতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

প্রকাশ বাবু হিন্দু, হিন্দু মাত্রেই গো-হত্যার বিরোধী সুতরাং গোরক্তের গুণাগুণ লইয়া বিচারে হিন্দুর লাভ নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, গো-লোমে গদী, জীন, কুশান হয় কিন্তু আমরা জানি, যে গরুগুলিকে হত্যা করা হয় তাহাদের লোমই অধিক কার্য্যকরী, রোগাক্রমণে মৃত গরুর লোম ভগ্নপ্রবণ হইয়া থাকে এবং তাহা তত কাজে লাগে না। রোগে মৃত গোচর্ম্মও অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট। যাহা হউক লোম বা রক্ত বাদ দিলেও বা গরুদ্বারা কেবল গাড়ী টানা, হাল চালান কিম্বা খাদ্য সরবরাহ ব্যতীত অন্য কার্য্য না হইলেও গরুকে গৃহ পালিত পশুর শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। এই জন্য গোকুল সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে পূজ্য। গাভীগণ যেন খাদ্যবস্তুর প্রস্রবণ, এবং সাক্ষাত শক্তিরূপিণী তাহাদের শক্তি মাটিতে সঞ্চারিত

হইয়া আজ পৃথিবী শস্যপূর্ণা, সেই শক্তি ধরিত্রী মানবে সঞ্চারিত করিয়া মানবকে অশেষ বলশালী, শ্রেষ্ঠজীব করিয়াছেন।

গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থে গবাদির আকার গঠন বর্ণনা করিয়াছেন, বিভিন্ন দেশীয় গবাদির সহিত ভারতীয় গোর তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন। নানা স্থানের গো বংশের আলোচনা দেখিলে তাঁহার পুস্তক খানি গো বংশের অভিধান বলিয়া মনে হয়। ষাঁড়রক্ষা, বৎসপালন, গোজনন, সাঙ্কর্য্য দ্বারা গোবংশের উন্নতি, গবাদির খাদ্যাখাদ্য বিচার, গো-শালা নির্ম্মাণ প্রভৃতি অনেক আবশ্যকীয় খরচ তাঁহার পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, পুস্তক খানিতে বিষয় বিশেষ সাজাইবার পদ্ধতি ভাল নহে। এক সঙ্গে অনেক কথা মাথায় প্রবেশ করিয়া যেন পাঠককে কিংকর্ত্তব্য অবধারণে অশক্ত করিয়া ফেলে।

গো-শালা স্থাপন ও দুগ্ধাদির ব্যবসা সম্বন্ধে অনেক গুরুতর বিষয়ের সমাবেশ তাঁহার পুস্তকে দেখিতে পাই, তিনি কিন্তু বিষয় বিশেষের তন্ন তন্ন বিচার করিয়া তাঁহার লেখনী চালান নাই। তাঁহার ভাণ্ডারে অনেক জিনিষ আছে বটে কিন্তু সেগুলি স্তূপাকারে অযত্নে রক্ষিত।

স্বদেশী বিদেশী অনেক কাজগপত্র বা বুলেটীন হইতে তিনি গোপালন, গোশালা স্থাপন ও দুধের ব্যবসা সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন কিন্তু সম্যক আলোচনা দ্বারা সেগুলি নিজস্ব করিবার প্রয়াস পান নাই। ভাষারদিকে তাঁহার আদৌ দৃষ্টি নাই, স্বদেশী বিদেশী ইংরাজী বাঙলা ভাষা যখন যাহা তাঁহার লেখনী মুখে বাহির হইয়াছে তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন, এবং বোধ হয় একবার ফিরে না তাকাইয়া ছাপাইয়া গ্রন্থকার একা একটু চেষ্টা করিলে এই সকল দোষ পরিহার করিতে পারিতেন কিন্তু সে চেষ্টায় তিনি যেন উদাসী। পুস্তক খানিতে এত বিভিন্ন বিষয় সন্নিবেশিত আছে, এত বিস্তর কাজের কথা আছে, যে এখানি এই অবস্থারই সাধারণের বিশেষতঃ ভারতীয় গোপালকগণের বিশেষ প্রয়োজনে লাগিবে বলিয়া মনে হয়। পুস্তক খানির একটু সুশৃঙ্খলা থাকিলে এবং সুপদ্ধতিতে লিখিত হইলে এই গ্রন্থের প্রচার নিতান্ত সময়োচিত বলিয়া বিবেচিত হইত।

সার-সংগ্রহ

কারীগরী শিক্ষা

এ দেশে শিল্পের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়াছে, তাহাতে দেশে কারীগরী শিক্ষার বিস্তার ব্যতীত শিল্পের উন্নতি অসম্ভব। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ; কিন্তু

ভারত পূর্ব্বে কৃষি-সর্ব্বস্ব ছিল না। পরন্তু ভারতে বহুবিধ শিল্পের অশেষ উন্নতি সংসাধিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ হইতে বিবিধ পণ্য এসিয়ার নানা স্থানে ও ইউরোপে যাইত। ভারতের সহিত বাণিজ্য করিতে ইউরোপীয় জাতিরা ব্যগ্র হইত। ভারতের পথ আবিষ্কার-চেষ্টার ফলেই কলম্বস্ আমেরিকা আবিষ্কার করেন। ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য-ব্যাপারেই ইংরাজের ভারতে আগমন। প্লিনী দুঃখ করিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষ হইতে যে সব দ্রব্য রোমান-সাম্রাজ্যে আইসে, তাহার জন্য রোমান-সাম্রাজ্যকে প্রতি বৎসর ৬৮ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা দিতে হয়। শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার প্রণীত 'সমসাময়িক ভারতে' দেখা যায়, প্লিনী বলিয়াছিলেন—"অল্প দিন হইল ভারতবর্ষ হইতে নীল আমদানী হইতেছে। ইহার দর পাউণ্ড প্রতি সতেরো দিনারি। পূর্ব্বাঞ্চল হইতেই আমাদের দেশে কাচের আমদানী হয়, এবং ভারতীয় কাচই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পছন্দ করা হয়।" মিষ্টার রয়েটস্ বলেন, "খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতীয় কার্পাস-বস্ত্র গ্রীসদেশে বিক্রীত হইত।" শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন রায়ের 'ঢাকার ইতিহাসে' দেখা যায়, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দেও ঢাকা সহরে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার, সোনার গাঁয়ে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার, ডেমরাতে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ও তিতবদ্দিতে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার মসলিন প্রস্তুত হইয়াছে। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় প্রথম বিলাতী সুতার আমদানী হয়। ভারতে ভারতবাসীর ব্যবহারোপযোগী সর্ব্ববিধ আবশ্যক দ্রব্যই প্রস্তুত হইত; আবার বিদেশে মাল রপ্তানীও হইত।

বর্ণভেদে ব্যবসায়ভেদহেতু এ দেশে শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। বিলাতে যাহাকে শিক্ষানবিসী বলে, এ দেশে তাহাই নিয়ম ছিল। কর্ম্মকারের পুত্র বাল্যকাল হইতেই কর্ম্মকারের কার্য্যে ও কুম্ভকারের পুত্র বাল্যকাল হইতেই কুম্ভকারের কার্য্যে শিক্ষিত হইত। সে ব্যবসায়ে সম্পূর্ণ শিক্ষা লাভ করিত। এ বিষয়ে আর কোন দেশে ভারতের মত সুব্যবস্থা ছিল না।

ভারতীয় শিল্পের অবনতির কারণ যাহাই হউক না কেন,—বর্ত্তমানে রাজা প্রজা সকলেই বুঝিয়াছেন, দেশে শিল্প-প্রতিষ্ঠা ব্যতীত দেশের দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে। সেই জন্য দেশে কারীগরী-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইতেছে। সংপ্রতি সরকার এ বিষয়ে একটি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে এ দেশে কারীগরী-শিক্ষাসম্বন্ধে অনুসন্ধান-সমিতির যে বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহাতেও অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে।

এ দেশে কারীগরী বিদ্যালয়গুলি বিলাতী আদর্শে প্রতিষ্ঠিত। ইহাই বিদ্যালয়গুলিতে আশানুরূপ সুফল না ফলিবার অন্যতম কারণ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণেও দেখা যায়,—ভারতে শিল্পের অবস্থা, কাজের ধরণ,

কারীগরী শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের কাজের সুবিধা—সবই প্রতীচ্য দেশ হইতে এত স্বতন্ত্র যে, উভয় দেশের ব্যবস্থার তুলনা করা যায় না। ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় যেরূপ কারীগরী শিক্ষার প্রয়োজন, ভারতে সেরূপ শিক্ষা অনাবশ্যক।

সে দিন শ্রীযুত মন্মথকুমার বসু হাতেহাতিয়ারে শিক্ষাসম্বন্ধে সরকারের নিকট যে সুদীর্ঘ পত্র পাঠাইয়াছেন, তাহাতে তিনি বিলক্ষণ বিচক্ষণতা সহকারে ইহার আর একটি কারণের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, এ দেশের অভিভাবকের ছেলেকে স্কুলে পাঠাইবার উদ্দেশ্য এই যে, ছেলে সাহিত্য বা বিজ্ঞান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে। কিন্তু যখন ছেলে ২।৩ বার চেষ্টা করিয়াও প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে না, তখন তিনি তাহাকে কারীগরী বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। কাজেই অনুপযুক্ত ছেলের দলই কারীগরী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। এই অবস্থার প্রতীকার কল্পে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষা-কমিশন প্রস্তাব করেন, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীতে পাঠ্য বিভাগ করা হউক। কিন্তু ইহাতেও বিশেষ সুফল ফলে নাই। সেই জন্য বসু মহাশয় প্রস্তাব করিয়াছেন,—প্রাথমিক, মধ্য ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলিতে সাহিত্যের মত হাতের কাজও অবশ্য শিক্ষণীয় করা হউক। বলা বাহুল্য, কারীগরী বিদ্যালয় ব্যতীত অন্য বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে কারীগরীবিদ্যায় সম্পূর্ণরূপে শিক্ষিত করা অসম্ভব। সাহিত্য-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যে হাতে কাজ শিখান হইবে, তাহার উদ্দেশ্য—ছেলেদের হাতের কাজে অভ্যস্ত করা, হাতের আড়ষ্ট ভাব দূর করা। এই জন্য ছেলেদের অঙ্কন শিখাইতে হইবে—সঙ্গে সঙ্গে সূত্রধরের কাজ বা সীবন বা ঝুড়ি নির্ম্মাণ—এইরূপ একটা কাজ শিখাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সাধারণতঃ বালকদিগকে সপ্তাহে ২৭।২৮ ঘণ্টা পড়ান হয়। সপ্তাহে ৩ দিন ১ ঘণ্টা করিয়া মোট ৩ ঘণ্টা হাতের কাজ শিখাইলে—পাঠের ক্ষতি হইবে না, বরং বৈচিত্র্য বশতঃ ছেলেদের উন্নতিই হইবে। ইংলণ্ডে এরূপ ব্যবস্থা নাই বটে, কিন্তু জর্ম্মাণীতে ও আমেরিকায় আছে। আমেরিকানগণ ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া সফলপ্রযত্ন হইয়াছেন। এরূপ ব্যবস্থায় উত্তরকালে শিক্ষার্থী হাতের কাজে ভয় পাইবে না, আর সে কোন্ দিকে তাহার ঝোঁক আছে বুঝিয়া সেই কাজ লইতেও পারিবে।

প্রথম হইতে এইরূপ কাজে অভ্যস্ত হইলে শিক্ষার্থীর আরও একটা ত্রুটি সংশোধিত হইবে। কারীগরী-শিক্ষা-বিষয় অনুসন্ধানসমিতি বলিয়াছেন--ভারতীয় ছাত্রের শ্রমবিমুখতাই আজকাল কারীগরী-শিক্ষায় তাহার অসাফল্যের প্রধান কারণ। ইহার জন্য শিক্ষানবিশী ব্যতীত ছাড়পত্র দেওয়া বন্ধ করিতে হইবে—

অলস ও শ্রমবিমুখ ছাত্রগণকে দূর করিয়া দিতে হইবে। প্রথম হইতে হাতের কাজ অভ্যস্ত হইলে ছাত্রগণ আর শ্রমবিমুখ হইবে না।

কেবল ইহাই নহে, সকল বা অধিকাংশ ছাত্র হাতের কাজে শিক্ষিত হইলে আপনাদিগের কার্য্যক্ষমতা ও আদর সম্বন্ধে কারীগরী শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদিগের ভ্রান্ত ধারণাও আর থাকিবে না। মান্দ্রাজের মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ার মিষ্টার রিচার্ডস অনুসন্ধানসমিতিকে বলিয়াছেন,—ভারতীয় ছাত্রগণ মনে করে যে, তাহারা সব করিতে পারে, কিন্তু কার্য্যকালে দেখা যায়, তাহারা প্রায়ই কাজ করিতে পারে না। কানপুর কটন-মিলের ম্যানেজার বলিয়াছিলেন,—কারীগরী-শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসীরা অন্য কর্ম্মচারী অপেক্ষা ভাল ব্যবহার চাহে, যেন তাহারা সাধারণ শিক্ষানবিশ হইতে স্বতন্ত্র ও বহু উচ্চে অবস্থিত। মুইর মিলসের মিষ্টার হল্‌ডেন বলিয়াছেন---ইহাদের ধারণা বড় অসাধারণ।

এরূপ হইবার কারণ এই যে, ইহারা জানে, ইহারা যে কাজ শিখিয়াছে, সে কাজে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক নহে। বসু মহাশয় যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে তাহাদের সে ধারণা আর থাকিবে না।

মোট কথা, এ দেশে যে কারীগরী-শিক্ষার বহুল প্রচার ব্যতীত চলিবে না, তাহা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অনুসন্ধানসমিতিও স্পষ্ট বলিয়াছেন, এ দেশে কারীগরী শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের কাজের অভাব নাই!

দেশে কলকারখানা দিন দিন বাড়িতেছে। এত দিন বিদেশীয় কলে ভারতবাসী মজুরের কাজ করিয়াই দিন গুজরান করিত, এখন সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে। দেশের লোক ক্রমে বুঝিতেছে, দেশের লোকের টাকায় কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। মোটা মাহিনার চাকরীগুলা দেশের লোককে না দিলে—টাকা দেশে থাকিবে না। যাঁহাদের টাকা আছে, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে যৌথকারবারে টাকা দিতেছেন। লোন অফিস, ব্যাঙ্ক, জীবনবীমা অফিস, বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের মত ঔষধের কারখানা, বেঙ্গল মিস্‌নেলির মত গন্ধ-দ্রব্যাদির কারখানা, কাপড়ের কল, পাটের কল ক্রমে নানারূপ অনুষ্ঠানে দেশের লোক টাকা দিতেছেন। সুতরাং দেশে কারীগরী শিক্ষার শিক্ষিত লোকের আদর হইতেছে ও হইবে। দেশের লোকের টাকায় ষ্টীমার লাইন খোলাও হইতেছে।

দেশের কারীগরী-শিক্ষার সুব্যবস্থা না হইলে এ সব অনুষ্ঠানে সাফল্যলাভ-সম্ভাবনা সুদূরপরাহত হইয়া দাঁড়াইবে। চাকরীর সংখ্যা অধিক নহে,—ডাক্তারী, ওকালতী—এ সকলে আর স্থান নাই। সুতরাং দেশের লোককে কলকারখানার দিকে দৃষ্টি দিতেই হইবে। আর কারীগরী শিক্ষা ব্যতীত কলকারখানার উন্নতি সাধিত হইবে না। বিদেশী কারীগর আনিয়া দেখা গিয়াছে, তাহারা এ দেশের

শিক্ষানবীশদিগকে শিখাইতে চাহে না। পাইওনিয়ার গ্লাস ফ্যাক্টরী সেই জন্যই অচল হয়; এ দেশে কারীগরী বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিয়া এ দেশের লোককে শিখাইয়া লইতে হইবে।

সরকার এ বিষয়ে সচেষ্ট হইয়াছেন। এখন আমাদিগকে এ কাজে তৎপর হইতে হইবে। আমাদিগকেও অর্থ ও ছাত্র দিতে হইবে। কারণ, এ সব বিদ্যালয়ে সুশিক্ষার সুব্যবস্থা হইলে তাহার ফল আমরাই ভোগ করিব।

বাগানের মাসিক কার্য্য

মাঘ মাস।

সব্জীক্ষেত্র।—বিলাতী সব্জী প্রায় শেষ হইতে চলিল। যে গুলি এখন ক্ষেত্রে আছে, তাহাতে মধ্যে মধ্যে জল দেওয়া ছাড়া আর অন্য কোন বিশেষ পাট নাই।

কপি প্রভৃতি উঠাইয়া লইয়া, সেই ক্ষেত্রে চৈতে বেগুন ও দেশী লঙ্কা লাগান উচিত।

ভূয়ে শসা, করলা, তরমুজ, ঝিঙ্গা প্রভৃতি দেশী সব্জীর জন্য জমি তৈয়ারি করিয়া ক্রমশঃ তাহার আবাদ করা উচিত। তরমুজ মাঘ মাস হইতে বপন করা উচিত। ফাল্গুন মাসেও বপন করা চলে।

ফলের বাগান।—আম, লিচু. লকেট, পীচ এবং অন্যান্য ফল গাছের ফুল ধরিতে আরম্ভ হইয়াছে। ফল গাছে এখন মধ্যে মধ্যে জল সেচন করিলে ফল বেশী পরিমাণে ধরিবে ও ফল ঝরিয়া যাইবে না। আনারসের গাছের এই সময় গোড়া বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। গোবর, ছাই ও মাটি আনারসের পক্ষে প্রকৃষ্ট সার। আঙ্গুর গাছের গোড়া খুঁড়িয়া ইতিপূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। যদি না হইয়া থাকে, তবে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে।

ফলের বাগানের অনতিদূরে তৃণ, কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়া, তাহাতে আগুন দিয়া মুকুলিত বৃক্ষে ধোঁয়া দিবার ব্যবস্থা করিলে, ফলে পোকা লাগার সম্ভাবনা কম হয় এবং ফল ঝরা নিবারণ হয়। পশ্চিমাঞ্চলে আম বাগানে এই প্রথা অবলম্বন করা হইয়া থাকে। গাছে অগ্নির উত্তাপ যেন না লাগে, কিন্তু ধোঁয়া অব্যাহত ভাবে লাগিতে পায়, এরূপ বুঝিয়া অগ্নিকুণ্ড রচনা করিবে।

বর্ষাকালে যে সকল স্থানে বড় বড় গাছ পুতিবে, সেই সকল স্থান প্রায় দুই হাত গভীর করিয়া গর্ত্ত করিবে এবং সেই খোঁড়া মাটিগুলি কিছু দিন সেই গর্ত্তের ধারে

ফেলিয়া রাখিবে। পরে সেই মাটি দ্বারা ও তাহার সঙ্গে কতক সার মাটি মিশাইয়া সেই গর্ত্ত ভরাট করিবে। উপরের মাটি নীচে এবং নীচের মাটি উপরে করিয়া, খোঁড়া মাটি দ্বারা গর্ত্ত ভরাট করিবে।

পুরাতন ডালের কুল ও পিয়ারা ছোট হয় ও তাহাতে পোকা ধরে, সেই জন্য পুরাতন ডাল প্রতি বৎসর ছাঁটা উচিত।

কৃষিক্ষেত্র।—সম্বৎসরের চাষ এই মাসেই আরম্ভ হইয়া থাকে। এই মাসে জল হইলেই জমিতে চাষ দিবে। যে সকল জমিতে বর্ষাকালের ফসল করিবে, তাহাতে এই মাসে সার দিবে। আলু ও কপির জন্য পলিমাটি দিয়া জমি তৈয়ারি করিয়া রাখিবে। এই মাস হইতেই ইক্ষু কাটিতে আরম্ভ করে। মূলার অগ্রভাগ কাটিয়া মাটিতে পুতিয়া দিলে, তাহা হইতে উত্তম বীজ জন্মে। ফুল ধরিবার আগে মূলার আগার দিকে চারি অঙ্গুলি রাখিয়া, তাহার মধ্যে খোল করিবে এবং ঐ খোলে জল দিয়া নীচের দিকে মুখ রাখিয়া টাঙ্গাইবে। প্রতিদিন ঐ খোল পুরিয়া জল দিবে। ক্রমে উহার শীষ বাঁকিয়া উপরের দিকে উঠিবে। এই উপায়েও উত্তম বীজ উৎপন্ন হইবে। এই মাসের প্রথম পনের দিনের পর, হলুদ ও আদা তুলিতে আরম্ভ করিবে। হলুদের ও আদার মুখী বীজের জন্য শীতল স্থানে রাখিয়া দিবে। হলুদ, গোবর মিশ্রিত জলে অল্প সিদ্ধ করিয়া শুকাইতে দিবে। একবার উৎলাইয়া উঠিলেই নামাইয়া ফেলিবে। আধ শুক্‌না হইলেই হলুদগুলি রোজ একবার দলিয়া দিবে। দলিলে হলুদ গোল, শক্ত ও পরিষ্কার হয়। চীনা বাদাম এই মাসে উঠাইবে।

ফুলের বাগান।—ফুলের বাগানের শোভা এখন অতুলনীয়। মরসুমী ফুল সমস্ত ফুটিয়াছে। গোলাপ এখন প্রচুর ফুটিতেছে। গোলাপ ক্ষেতে এখন যেন জলের অভাব না হয়। গোলাপের কলম বাঁধা শেষ হইয়াছে। বেল, মল্লিকা, যুথিকা ইত্যাদির ডালের অগ্রভাগ ও পুরাতন ডালগুলি ছাঁটিয়া দিবে।

শীতপ্রধান পার্ব্বত্যপ্রদেশে এখন এষ্টার, হার্টিজ, লর্কস্পর, পিঙ্কস্, ফ্লক্স, ডেজী, পিটুনিয়া প্রভৃতি মরসুমী ফুলবীজ বপন করিতে হইবে এবং শীতকালের সব্জী যথা,—গাজর, সালগম, লেটুস্, বাঁধাকপি, ফুলকপি, মূলাবীজ প্রভৃতি এই সময় বপন করিতে হইবে।

এই মাসের শেষে বেল, জুঁই, মল্লিকা প্রভৃতি ফুল গাছের গোড়া কোপাইয়া জল সেচন করিতে হইবে। কারণ এখন হইতে উক্ত ফুল গাছগুলির তদ্বির না করিয়া জলদি ফুল ফুটাইতে না পারিলে ফুলে পয়সা হইবে না। ব্যবসার কথা ছাড়িয়া দিলেও বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুল না ফুটিলে ফুলের আদর বাড়ে না।

কৃষক

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৪শ খণ্ড। } মাঘ, ১৩২০ সাল। { ১০ম সংখ্যা।

কৃষির অবনতি ও কৃষিশিক্ষা

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার লিখিত

আমাদের কৃষিপ্রধান দেশ। আমাদের দেশে দিন দিন কৃষির অবনতি কেন ঘটিতেছে তাহার কারণ কি? কেন দিন দিন আমাদের খাদ্যসামগ্রী দুর্মূল্য হইতেছে? কেন আমাদের দুগ্ধ দুষ্প্রাপ্য হইতেছে? এই সকল প্রশ্ন সমূহের মীমাংসা করার সময় আসিয়াছে। এ বিষয়ে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মনোযোগ আকর্ষণ করা কর্ত্তব্য। দেশে কৃষির অবনতি ঘটিবার কারণ অনেকগুলি। আমাদের প্রথমতঃ কৃষি শিক্ষার অভাব। এ অভাব দূর করিবার বস্তুতঃ দেশে কোন উপায় বর্ত্তমান সময়ে নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকের যে তালিকা নির্ব্বাচিত হয় তাহাতে কোনরূপ বালকদের কৃষিশিক্ষার সহায়তা করিবার বিধান নাই। দেশে পর্য্যাপ্ত সংখ্যক কৃষিকলেজ, কৃষিবিদ্যালয় বা পাঠাগার নাই, যে কয়েকটি আছে তাহাতে দেশের অভাব মোচন হয় না। এই সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ পাশ্চাত্য কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন মাত্র। তাঁহাদের প্রকৃত কার্য্যকরী অভিজ্ঞতা (Practical Knowledge) খুবই কম, কাজেই তাঁহারা এদেশের কৃষিকর্ম্মে দেশ কাল পাত্রের সম্যক বিচার না করিয়া তাঁহাদের বই পড়া বিদ্যা প্রয়োগ করিয়া থাকেন, ফলে অযথা অর্থব্যয় এবং নৈরাশ্য হইয়া থাকে। আমেরিকা মহাদেশে কৃষিশিক্ষার জন্য প্রত্যেক কাউন্টিতে কৃষিকলেজ, কৃষিস্কুল, কৃষিবিদ্যালয়, লেক্‌চারার, ভ্রমণশীল কৃষিসম্প্রদায়িক স্কুলের ব্যবস্থা আছে। এই সকল ভ্রমণশীল কৃষি বিদ্যালয়ে কতকগুলি উচ্চশ্রেণীর শিক্ষক ও কৃষি স্কুলের বালকগণ কৃষককুলের কেন্দ্রে কেন্দ্রে গিয়া কৃষি বিষয়ক গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা দান করিয়া দেশের অজ্ঞ কৃষককুল মধ্যে কৃষিবিদ্যা বিস্তার করিয়া থাকেন। তথায় কৃষক বালকদিগকে কৃষিশিক্ষা করিতে

বাধ্যকরা হয়। দিনেমার প্রদেশেও ঐরূপ ব্যবস্থা আছে। ঐদেশে প্রাথমিক ও উচ্চ কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। গো উৎপাদন, মুরগী চাষ, ডিম্ব ফোটান প্রভৃতির বিষয় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থাও বহুল আছে। ইংলণ্ডের বার আনা ভাগ ডিম্ব এবং মুরগী, পণীর, মাখন ও ননী, দিনেমার দেশ হইতে আমদানী হয়। কৃষক পত্নীদেরও কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা ঐ সকল শিক্ষিত দেশে আছে। ফরাসীরাজ্য, দিনেমার, হলণ্ড, জার্ম্মেনী প্রভৃতি দেশে কৃষক বালকদের স্বল্পকাল ব্যাপী শিক্ষার (Short Course) ব্যবস্থা আছে। এখন আমাদের আদর্শ দেশ ইংলণ্ডে, কৃষি শিক্ষার কিরূপ ব্যবস্থা আছে তাহা তুলনা করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায় যে, আমাদের কৃষিপ্রধান দীন ভারত কত নিম্নস্তরে পড়িয়া আছে। বিলাতের কৃষি বিভাগ "বোর্ড অব্ এগ্রিকাল্চার ও ফিশারীর" অন্তর্গত। ঐ দেশে বাৎসরিক সাড়ে আঠার হাজার পাউণ্ড কৃষিশিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে কি ব্যয় হয়, তাহা দেশের লোকে কোন খবর রাখেন না। বোধ হয় আমাদের দেশের বড় কাউন্সিলে তাহার আলোচনা হয়ই না। আমাদের দেশে প্রকৃত কৃষি সম্প্রদায় হইতে কৌন্সিলে আসন পাইবার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য নহে কি? প্রকৃত কৃষি শিক্ষিত লোকের অভাবে একজন সিভিলিয়ান আমাদের দেশের কৃষি-বিভাগের কর্ত্তা। ইউরোপ, আমেরিকায় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ, কাউন্টিতে ক্ষেত্র-চর্চ্চা বা field experiment or demonstrations বর্ত্তমান, কোন কোনটিতে ফল উৎপাদনের ব্যবসা শিক্ষণোপযোগী বিদ্যালয় বা ক্ষেত্র আছে। তাহা ছাড়া এই সকল ব্যবসায় শিক্ষার জন্য কত শত সুবিধা আছে তাহা বলা যায় না। বিশেষতঃ গো চিকিৎসা, গোপালন, গো-সেবা, দুগ্ধ-ব্যবসা, মুরগী পালন, ডিম্ব ফোটান প্রভৃতির জন্য কত পত্রিকা বিদ্যমান তাহা বলা যায় না। আমাদের দেশে কৃষি পত্রিকা নাই বলিলেই হয়। "কৃষক" প্রমুখ দুই একখানি পত্রিকাও প্রকৃত উৎসাহ অভাবে চলা ভার। আমাদের দেশের লোকে নাটক ও গল্প লিখিতে খুব মজবুত হইয়া দাঁড়াইতেছে কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব কথা আলোচনার লোক খুঁজিয়া মেলা ভার। কৃষি কথার আলোচনা অতি অল্প লোকেই করিতে চায়। চিন্তাশীল লেখা কয়টা বাহির হয় এবং কয়জনই বা তাহা পাঠ করে। গোপালন, গোচিকিৎসার বই বা সহজ কৃষি-শিক্ষার বই বাঙলা ভাষায় কয় খানা আছে? যাহা দু এক খানা আছে তাহাও লোকে পড়িতে চায় না। গিরীশ বাবু ও নৃত্যগোপাল বাবুর বই বা গোপাল বান্ধব পুস্তক পড়িতে কয়জন লোকের আস্থা আছে?

বাঙলা দেশে কৃষি শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র পুষা ও সাবর। তাহা ছাড়া জেলায় জেলায় কৃষিক্ষেত্র আছে যেমন মুঙ্গের, পাটনা, চুঁচুড়া, মেদিনীপুর, রঙ্গপুর, শিলং, খুলনা ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের বেশ বোধ হয় কোনটিতে দেশ কাল

পাত্র উপযোগী ও আবশ্যক মত কৃষি শিক্ষা হয় না। আমাদের আদর্শ এখন বিলাত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিলাতে কিন্তু প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংযুক্ত উচ্চ কৃষি কালেজ আছে। এই কলেজেও সাধারণ পাঠের ব্যবস্থা আছে, বি, এস্, সি, উপাধিপ্রদত্ত হয়। কৃষিকলেজে পাঠ সমাপ্ত করিয়া ছাত্রগণকে পরীক্ষাক্ষেত্রে হাতে কলমে (Practical work) কাজ শিক্ষা করিতে হয়। রেডিং নগরস্থিত ইউনিভার্সিটী কলেজ সর্ব্বাগ্রগণ্য। এইখানে দুগ্ধব্যবসা (Dairy), কৃষি (Agriculture) এবং উদ্যান বিদ্যায় (Horticulture) নিয়মিত শিক্ষাপ্রদত্ত হয়। তিন বৎসর পাঠের পর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে ছাত্র কৃষিতে উপাধি প্রাপ্ত হয়। কৃষি সংক্রান্ত মুর্গীপালা (Poultry Farming) বিদ্যা এখানে খুব ভালরূপই শিক্ষা দেওয়া হয়। কার্য্যকরী অথবা ব্যবহারিক (Practical) শিক্ষার জন্য ছাত্রগণকে "বৃটিশ" ডেয়ারি ইন্‌ষ্টিটিউট্" ভবনে দুগ্ধ ব্যবসা বিদ্যা শিক্ষার জন্য পাঠান হয়। এইখানে কম এবং অধিক দিন পাঠের (Short & long course) ব্যবস্থা আছে। এই সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ে অনুসন্ধানেচ্ছুক লোক পোষ্টেজসহ পত্র দিলে বা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে সব জানিতে পারেন। সাইরন্‌সেষ্টারের রয়েল এগ্রিকালচারাল কলেজের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। আমাদের দেশের খ্যাত নামা ৺গিরিশচন্দ্র বসু, ৺ডি এল রায়, ৺নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষিগণ এই কলেজের ছাত্র ছিলেন। দেশের কৃষি সম্বন্ধে তাঁহারা বড় কিছু করিয়া যাইতে পারেন নাই। ইহাঁরা দেশের কৃষি-উন্নতি বিধান বিষয়ে কোন কিছু করিবার জন্য রাজা কিম্বা জমিদারগণের নিকট হইতে কোনপ্রকার উৎসাহ পান নাই। কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়নের দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ উপকার করিতে পারিয়াছেন মাত্র। তাঁহাদের সহপাঠী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভূপালচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত এন এন বন্দ্যোপাধ্যায় অদ্যাপিও বর্ত্তমান। তাঁহাদের, দেশের কৃষি হিতের দিকে অতি অল্পমাত্রই দৃষ্টি দিবার সময় আছে এবং তাঁহাদিগকে লইয়া কৃষির উন্নতি কল্পে নিয়োগ করিবার তীব্র অভিলাষ না আছে রাজার, না আছে দেশীয় লোকের। দেবেন্দ্র বাবু ও ভূপাল বাবু সরকারী কৃষি আফিসের শোভাবর্দ্ধন করিতেছেন মাত্র। এন এন ব্যানার্জ্জি ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট-গিরি করিতেছেন। ইঁহারা যখন যেখানেই থাকেন আফিসের কাজ লইয়া থাকেন। সাক্ষাত সম্বন্ধে চাষের কাজের সঙ্গে ইঁহাদের সম্বন্ধ খুব কম। এ প্রকার ব্যবস্থার অর্থ আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না অথবা আমরা বুঝি যে, এদেশের কৃষি উন্নতি বিষয়ে রাজা প্রজা কাহারও আন্তরিক ইচ্ছা নাই।

সমগ্র ইংলণ্ড বাঙলা দেশ হইতে অনেক ছোট কিন্তু এক ইংলণ্ডেই সতেরো আঠারটি কৃষি-কলেজ এবং আট দশটি কৃষি-বিদ্যালয় আছে। আর আমাদের বাঙলা, বেহার, উড়িষ্যার মধ্যে পরিচয় দিবার এক পুষা ও সাবর কলেজ আছে।

এই দুইটি দ্বারা কতটুকু শিক্ষা কার্য্য সম্পাদন হইতে পারে? যে কয়টি কৃষি-পরীক্ষা ক্ষেত্র আছে, তাহাতে সাধারণ চাষীর প্রবেশাধিকার নাই বলিলেই হয়। প্রবেশাধিকার থাকিলেই বা কি হইত? সেখানে গিয়া দেখিবে যে সারের পরীক্ষাই চলিতেছে। আগে ভাল বীজ মিলিলে তারপর ত সার। বীজ নির্ব্বাচনের চেষ্টা আদৌ নাই, ভাল বীজ উৎপাদনের কোন বন্দোবস্তই নাই। সরকারী কৃষি-বিভাগ হইতে যদি কেহ ভাল বীজ চায় তাঁহারা অম্লান বদনে বাজার হইতে বীজ খরিদ করিয়া সরবরাহ করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। অপরিপক বাজারে নৈনিতাল আলুর চাষ করিয়া কয়েকজন ভদ্রচাষী নিতান্ত বিফল মনোরথ হইয়াছেন। ইহা যেন ছেলেখেলা বা একটা তামাসার ব্যাপার বলিয়া মনে হয়।

আজ কাল কলের সাহায্যে ডিম্ব ফোটাইয়া পেরু, মুরগী, হাঁস, গিনিফাউল, তিতর, বটের, অষ্ট্রীচের ব্যবসা করা খুব লাভজনক হইতেছে। আমাদের দেশে এসব কিছুই নাই। কত লোক অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে তত্রাপি এইসব অল্প পুঁজী-সাধ্য স্বাধীন ব্যবসা দেশের লোক অনুসরণ করিবে না। পুল্‌টী ফার্ম্মিং এদেশে খুব লাভজনক, এবং এই ব্যবসা সহজে চলিতে পারে। এই সকল কৃষি অন্তর্গত বলিয়া আমরা ইহার উল্লেখ করিতেছি। এ বিষয় জানিতে হইলে ২।১ টি পত্রিকা ও বই আগে পড়িয়া ব্যবহারিক কার্য্য ক্ষেত্রে নামিতে হয়। ডিম্ব ফোটান ও তা দেওয়া ও ব্রুডার যন্ত্রের পরিচালন শিক্ষা একটু কঠিন হইলেও বুদ্ধিমান ও অধ্যবসায়ী লোকের নিকট তাহা কিছুই নহে বলিতে হইবে। ইনকুবেটার, গরম বাতাস এবং গরম জল এই উভয়বিধ উপায়ে পরিচালিত হইয়া থাকে। কৃষক অফিসে পত্র লিখিলে এ বিষয়ের অনুসন্ধান হইতে পারে। ডাক যোগেও আমেরিকা হইতে ইহার বিবরণ পত্রিকা আনান যাইতে পারে। হীন ভারতে কৃষির কোন অঙ্গই পুষ্ট নহে।

তাহার পর গোকুলের অবনতিতে আমাদের দেশের কৃষির সমধিক অবনতি ঘটায় খাদ্য সামগ্রীর মূল্য চতুর্গুণ বাড়িয়াছে। আবার তাহার উপর দেশের সংস্থান না রাখিয়া শস্য অবাধে বিদেশে অপর্য্যাপ্ত রপ্তানি হওয়ায় খাদ্যের মূল্য বিগত ৪০ বৎসরে চতুর্গুণেরও বেশী বাড়িয়াছে। বিগত বন্যায় বঙ্গ ও বিহার প্রদেশের শত শত বলদ এবং গাভী নষ্ট হইয়াছে, তাহাদের স্থান কি পূরণ হইয়াছে না ত্বরায় হইবে? গোপগণ স্বার্থপর হইয়া ও নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানগণ প্রতিনিয়ত গোহত্যা ব্যাপারে নিযুক্ত থাকিয়া বিশেষ অপরিণামদর্শিতার পরিচয় দিতেছে। দেশের মধ্যে অনেক গো-রক্ষিণী সমিতি, পিঞ্জরা পোলাদি আজকাল গোবৎসল ভারতবাসীর কৃপায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সকল পশু-রক্ষিণী শাখা হইতে তাহাদের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ যদি উপযুক্ত পাত্র নির্ব্বাচিত করিয়া এবং চুক্তি পত্র

শিখাইয়া লইয়া তাঁহাদের রক্ষিত উদ্বৃত্ত বলদ ও তেজস্কর ষাঁড় বৃন্দ কৃষক কুলকে বিতরণ করেন তাহা হইলে দেশের কৃষির উপকার হয়। আমি এসব ভাসা কথা বলিতেছি না। ইহা বিশেষ চিন্তার জিনিষ। কলিকাতায় গো-রক্ষিণী সভা, কলিকাতা কর্পোরেশানের অন্যতম সভ্য বাবু অমূল্যধন আঢ্য, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের আনন্দবিহারি লাল, হরিদ্বারের বাবা ভগবান দাস মহান্ত মহারাজ জীউ, বোম্বাই প্রদেশের সেই বিখ্যাত গোবৎসল পার্শী মি কাসেরওয়ানজী সাপুরজী জাসাওয়ালা, বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব জজ বাবু সারদাচরণ মিত্র, এবং হাবড়ার গো-রক্ষিণী সভার কার্য্যকরী সভ্যগণ এই দেশের গো রক্ষায় যত্নবান হইয়াছেন। দেশের লোক তাঁহাদের সহায় না হইলে, রাজা উহাদের উৎসাহবর্দ্ধন না করিলে তাঁহাদের কার্য্যে স্থায়ী ফল প্রসব করিবে না ইহা সুনিশ্চিত। আমাদের দেশের কৃষক-কুলের পক্ষ হইতে বঙ্গীয় সাহিত্য সমিতি এসম্বন্ধে কয়েক বার আবেদন পত্র গভর্ণমেণ্টে পাঠান কিন্তু আজকালকার বাজারে "পাণ্ডা" বিনা দেবতার কাজ ঘটে না। কাজেই ঐসব আন্দোলনে কার্য্যত কিছুই হয় নাই। আশাকরি মাননীয় সার এ, টি, মুখার্জ্জি, বা মাননীয় মহারাজ বর্দ্ধমান বা চক্রবর্ত্তী বা মহারাজ নন্দী বা মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর বা সুরেন্দ্র নাথ রায় মহাশয় এবিষয়ে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতে ক্রটী করিবেন না। গোকুলের অবনতির প্রধান কারণ,—আমাদের দরিদ্র সাধারণ লোকে নিজেরাই দুবেলা খাইতে পায় না তাহারা গাভী বলদের আহার যোগায় কোথা হইতে? বিশেষ সংস্থান না থাকায় আমাদের দেশের কৃষক বা গোয়ালাগণ খেঁড়ে গাভী বসিয়া খাওয়াইতে না পারায় অগত্যা বাধ্য হইয়া স্বল্প মূল্যে কসাই হস্তে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। ভারত হেন বিশাল দেশে ইহার প্রতিকার থাকিলেও আমরা তাহা অনুসরণ করি না। বিলাতে বা ডেনমার্কে বা আমেরিকা বা জার্ম্মেনীতে যেমন গো-বীমা কোম্পানি আছে তাহার অনুকরণে "গো জীবনবীমা সমিতি" অস্মদ্দেশে প্রবর্ত্তিত করিলে মন্দ হয় না। এইরূপ সমিতি পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হউক এবং তাহাদের তত্ত্বাবধারণে বড় গোচারণের মাঠ থাকুক। বিলাত প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে এইরূপে বহু সমিতি থাকায় সেই সকল দেশের দুগ্ধ ব্যবসায়ে আমাদের দেশাপেক্ষা লাভকর ভিত্তির উপর সংস্থাপিত এবং দুধ, মাখনও সস্তা দরে বাজরে বিক্রয় হয়। ঐ সব দেশের দুগ্ধ ভেজাল নহে এবং জীবাণু বর্জ্জিত। গো-বীমা কোম্পানি দেশের কৃষক এবং গৃহস্থ লোক লইয়া গঠিত। তাঁহারা খেঁড়ে গাভীদের এই কোম্পানির গোয়ালে পাঠাইয়া দেন এবং খাদ্যও অপরাপর ব্যয়ভার বহন জন্য সামান্য সামান্য চাঁদা বা পলিশী দেন। গাভী আসন্ন প্রসবা হইলে কোম্পানি গোস্বামীকে তাহা পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। ইহাতে গোয়ালা এবং গৃহস্থের খুবই সুবিধা। যদি

কোন অদৃষ্ট পূর্ব্ব কারণে ইন্‌সিওর কৃত গাভী মরিয়া যায় তাহা হইলে তাহার মালিককে শতকরা কতক অংশ দিয়া ক্ষতি পূরণ করা হয়। কৃষক কুলের সুবিধার জন্য যেমন পাশ্চত্য দেশে ক্রেডিট্ সোসাইটি আছে সেইরূপ গোয়ালা এবং মধ্যবিৎ গৃহস্থ লোকের সুবিধার জন্য গো-বীমা কোম্পানি বহুল আছে। গো-বীমা কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হইলে অন্যুন ২।৩ হাজার গাভীর রক্ষার স্থান আমার গয়া জেলার পার্ব্বত্য জমিদারীতে করিয়া দিতে পারি। ঐ সকল স্থানে অপরাপর পশুও রক্ষা করা যাইতে পারে। ইংলণ্ডে বিগত ১৯০৫ হইতে ১৯১১ সালের মধ্যে কচি বাছুরের বেশী হননে মূল্য শত করা ৩০ পারসেণ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় সেদিন কমন্স্ সভায় গোপালকবৃন্দের উদ্যোগে মি, রান্সিম্যানকে প্রশ্নে প্রশ্নে উদ্‌বাস্ত করা হয় এবং তাহার ফলে খাদ্যের জন্য হৃষ্টপুষ্ট ও তেজস্কর বাছুরের হনন অন্ততঃ দুই বৎসরের জন্য রহিত করা হইয়াছে। আমাদের দেশে খাদ্যের জন্য গো-উৎপাদন হয় না। তথাপিও খাদ্যার্থ হনন কার্য্য সম ভাবেই চলিতেছে। আমাদের দেশের বড় বড় সহরের কসাইখানার তালিকা লইয়া জানা গিয়াছে যে শত করা ৮ পারসেণ্ট প্রাইম গাভী কাটা পড়ে, তন্মধ্যে শতকরা ৩ পারসেণ্ট মাংসভক্ষিত হয় এবং বক্রী ৫ পারসেণ্ট ধাপায় নীত হয়। এই ৫ পারসেণ্ট মাংস প্রত্যহ যে নষ্ট হয় তাহাতে কত টন প্রত্যহ হনন হয় তাহা বুঝিয়া পাঠক অবধারণ করুন, যে দেশে গোবৃন্দ কিরূপ দ্রুতবেগে নিঃশেষিত হইতেছে। আমাদের দেশের ও বিলাতের কথা তুলনা করিয়া দেখিলে এই উভয় দেশের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ সহজেই উপলব্ধি হইবে।

গো কুলের উন্নতি করিতে হইলে কয়েকটী বৈজ্ঞানিক নীতির স্মরণ রাখা প্রত্যেক কৃষকের কর্ত্তব্য। তাহা আমি গোপাল-বান্ধব পুস্তকে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। সেই নীতিগুলি মোটামুটি এই,—১। সম হইতে সম হয়। ২। দেশের সর্ব্ব তেজস্কর ষাঁড় ও বকনা সংযোগে গোজনন করিবে। ৩। পৃথক করণ সর্ব্বতোভাবে অনুসরণীয় অর্থাৎ ষাঁড় ও গাভীকে কদাচ একসঙ্গে মাঠে চরিতে দিবে না। তাহাতে বকনাগণের অকাল পরিপক্কতা আনয়ন করে এবং ৪। বিধিবদ্ধ নির্ব্বাচিত বিধি প্রত্যেক গো-উৎপাদকের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে দেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ষাঁড় ও দ্রোণদুগ্ধা গাভীর বকনা সংযোগে উৎকৃষ্ট শাবকের উদ্ভব হয়। অতঃপর প্রশ্ন হইতেছে যে ভাল ষাঁড় পাওয়া যায় কোথা হইতে? এ বিষয়ও খুব তীক্ষ্ণ চিন্তার বিষয় বটে যেহেতু "পালের অর্দ্ধেক খানি হইতেছে পালের ষাঁড়টি"। গৃহস্থ সেইজন্য দেশের ভিতর যতদুর পারে বাছিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট ষাঁড় সংগ্রহ করিয়া নিজ পাল ভুক্ত করিবে।

• চাষের জন্য ভাল বলদ, গোরক্ষার জন্য ভাল ষাঁড়, শস্যের উন্নতির জন্য সুবীজ সংগ্রহে যতদিন না আমরা প্রাণপাত করিয়া লাগিব, ততদিন আমাদের ভবিষ্যত অন্ধকারই থাকিবে। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার M,D,S,U, M,M,D,A, সহঃ সঃ বঙ্গীয় সাহিত্য সমিতি, গোপাল-বান্ধব প্রণেতা, উকীল হাইকোর্ট ১৮ নং রসারোড নর্থ ভবানীপুর, কলিকাতা।

শিলঙে ফলের বাগান

শ্রীশশীভূষণ সরকার লিখিত

ইতি পূর্ব্বে কার্য্যোপলক্ষে আমাকে আসাম অঞ্চলে কিছু দিন ঘোরা ফেরা করিতে হইয়াছিল, সুতরাং শিলঙের জলহাওয়া মাটি সম্বন্ধে আমার কিছু অভিজ্ঞতা থাকা সম্ভব সেই কারণে সম্পাদক মহাশয় কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া শিলঙে ফলের বাগানের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। শিলঙের আবহাওয়া কতকটা দার্জ্জিলিঙের মত, উভয় জায়গার মাটিও প্রায়, সমান বলিয়া মনে হয়। শিলঙের পর্ব্বতময় ভূমি সমুদ্রতট হইতে ৫০০০ হাজার ফুট উচ্চ সুতরাং খুব শীত প্রধান। দার্জ্জিলিঙ আরও উচ্চ, ৭০০০ ফিটেরও অধিক। দার্জ্জিলিঙের শীত শিলঙ অপেক্ষা অনেক অধিক। এই সকল শীত প্রধান স্থানে যে সকল ফল হওয়া সম্ভব তাহাদেরই আবাদ করা চলিতে পারে।

শিলঙ সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানে গভর্ণমেণ্টের কৃষি-ক্ষেত্র ও ফলের বাগান আছে। তাহাতে আপেল ন্যাসপাতি, পিচ, আখরোট, খোবানি কুল, বাদাম, বিলাতী ডুমুর (Fig) প্রভৃতি শীত প্রধান স্থানের ফলের আবাদ করিয়া বহুদিন যাবৎ পরীক্ষা চলিতেছে। এই সকল গাছ এ সকল জায়গায় বেশ হয় দেখা যাইতেছে। আমি দেখিয়াছি যে দার্জ্জিলিঙ ও শিলঙে কলা, পেঁপে বেশ সুন্দর জন্মায়; কিন্তু এই সকল ফল নিম্ন বঙ্গের গ্রীষ্ম প্রধান স্থানের মত তত স্বাদু নহে। দার্জ্জিলিঙ ও শিলঙে পিয়ারা ও কমলা লেবুর চাষ বেশ চলে পেয়ারা, কমলা লেবু খুব ফলে। শিলঙ গভর্ণমেণ্ট ফলের বাগানে পেয়ারা গাছগুলি ফল ধরিতেছে কিন্তু সেগুলির ফল পাকিবার পূর্ব্বে ঝরিয়া পড়া এই একটা দোষ দাঁড়াইয়াছে। কমলা লেবুর কিন্তু সে সব দোষ দেখা যায় না।

দার্জ্জিলিঙ বা শিলঙের স্থানীয় ন্যাসপাতীর ফল তত বড় ও ভাল হয় না। ফলে শাঁস বিশেষ আঁসযুক্ত হয়। আমার বিশ্বাস বিলাতী বা কাবুলী ভাল

ন্যাসপাতীর আবাদ করিলে ফল উৎকৃষ্ট হইতে পারে। শিলঙের বাগানে খাসিয়া ও বিলাতী ন্যাসপাতীর আবাদ করিয়া এই কথার সত্যাসত্য প্রমাণ হইয়াছে।

পিচ অপেক্ষাকৃত নিরস স্থানিয় ফল সেই দার্জ্জিলিঙ বা শিলঙের মত রসা মাটি বা জলহাওয়ায় ভাল না হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং যে কেহ পিচ বাগান করিবেন তাঁহাদের এ অঞ্চলে না আসাই ভাল। শিলঙ, দার্জ্জিলিঙ প্রভৃতি শীত প্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশে শীত আর বর্ষা এই দুইটী ঋতুই যেন প্রবল ভাবে বিরাজ করিতেছে।

শিলঙে আঙ্গুর চাষ বেশ চলিতে পারে বলিয়া মনে হয়। খাসিয়া পাহাড়ে এক প্রকার আঙ্গুর স্বভাবতঃ জন্মে, সে গুলি কিন্তু বড় টক্। চাষ করিয়া তাহাদের উন্নতি বিধান করিলেও বোধ হয় টকত্ব সহজে নষ্ট হইবে না। সরকারী বাগানে কাশ্মীরী ও বিলাতী আঙ্গুরের আবাদ করা হইয়াছে। এ গুলির ফল মিষ্টই হইয়াছে। এক প্রকার কাল আঙ্গুর গাছ শিলঙের অনেক বাগানে দেখা যায় এই আঙ্গুর মিষ্ট নহে কিন্তু ইহা প্রচুর ফলে। ইহার আর একটা গুণ এই যে ইহাতে পোকা ধরে না। লক্ষ্য করিয়া দেখিলে আর একটা বিষয় দেখা যায় যে খোলা জায়গায়, যেখানে রৌদ্র বাতাস অবাধে লাগিতে পায়, আঙ্গুর চাষ করিলে পোকার উপদ্রব বড় হয় না। দার্জ্জিলিঙের নিম্ন স্তরে আঙ্গুর চাষ চলিতে পারে কিন্তু দার্জ্জিলিঙের মত ঠাণ্ডা জায়গায় আঙ্গুর চাষ চলে না।

কি শিলঙ বা দার্জ্জিলিঙ এই উভয় জায়গায় আমি বহু গাছ টমাটোর (Tree Tomato) গাছ দেখিয়াছি। ইহা অপরিয্যাপ্ত ফলে। ফলগুলি তেলাকুচা ফলের মত কিন্তু উভয় দিক ডিমের মত সুঁচালো। পাকিলে অম্ল মধুর ; চাটনি বা অম্ল রাঁধিয়া খাইতে বেশ।

বিলাতী সব্জী সব রকমই হয়। তাহার মধ্যে মটরশুঁটি খুব ফলে এবং খাইতে নিম্নতর প্রদেশের শুঁটি অপেক্ষা মিষ্ট। এই সকল স্থানে স্কোয়াস এত জন্মায় যে তেমন আর কোথায়ও দেখা যায় না। বিলাতী কুমড়া ও শসা দার্জ্জিলিঙে প্রচুর হইতে দেখিয়া সুতরাং আমার বিশ্বাস শিলঙে সে গুলি আরও ভালই হইবে ও হইতেছে। গৌহাটির বাজারে বড় বড় মর্ত্তমান কলা ও পাঁড় শসা দেখিলেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

দার্জ্জিলিঙ ও শিলঙে আলু বেশ ভাল হয়। দার্জ্জিলিঙ হইতে বীজ লইয়া নিম্নতর সমতল ক্ষেত্রে বহু আলু চাষ হইতেছে। খাসিয়ারা বহু কাল ধরিয়া এক রকম আলুর চাষ করিয়া আসিতেছে। অধুনা গবর্ণমেণ্ট ক্ষেত্রে প্রতিবৎসর বিলাতী নানা জাতীয় আলুর পরীক্ষা হইতেছে। শিলঙে নৈনিতাল আলুর খুব চাষ আরম্ভ হইয়াছে। খাসিয়া আলু অপেক্ষা তথায় নৈনিতাল আলু অধিক ফলে

কিন্তু স্থানীয় নৈনিতাল বীজ লইয়া চাষ করিলে দুই তিন বৎসর পরে তাহাতে পোকা লাগে, সেই জন্য দুই এক বৎসর অন্তর নূতন বীজ আনাইয়া লইতে হয়।

শিলঙ ও দার্জ্জিলিংএর মত স্থানে আখের চাষ বেশ হয় এবং এই সকল স্থানে অনেক আখের বাগান আছে। খুব বড় ইক্ষু ক্ষেত্র স্থাপন করিয়া আখের গুড় ও চিনির ব্যবসা চালাইতে পারিলে লাভের সম্ভাবনা অধিক।

সরকারী কৃষি সংবাদ।

শিলঙ পরীক্ষা ক্ষেত্র—

শিলঙ ফলের বাগানে আপেল, ন্যাসপাতী, পিয়ারা, কুল, পিচ, বেরী, ফিগ বা আমেরিকান ডুমুর, খোবানি, কমলা লেবু, ষ্ট্রবেরী এই সকল ফলের গাছ লইয়া পরীক্ষা করা হইতেছে। পরীক্ষার ফলাফল আজিও কিছুই নির্ণীত হয় নাই।

এই সমস্ত ফলের গাছে সুপার ফস্ফেট, সল্‌ফেট অব পটাস ও সল্‌ফেট অব এ্যামোনিয়া সার দিয়া তাহাদের ফলাফল নির্ণয়ের চেষ্টা করা হইতেছে। পরীক্ষার পদ্ধতি নিম্নলিখিতানুযায়ী।

আপেল বা পেয়ারা ১ম সারি (৫টি গাছ) সার সুপার ফস্ফেট ৬ আউন্স।
সলফেট অব পটাস ৪ ,,
সলফেট অব এ্যামোনিয়া ৩ ,,

২য় ,, ,,
সুপার ফস্ফেট ৬ ,,
সলফেট অব এ্যামোনিয়া ৩ ,,

৩য় ,, ,,
সলফেট অব পটাস ৪ ,,
সলফেট অব এ্যামোনিয়া ৩ ,,

৪র্থ ,, ,,
বিনা সারে

আসামে আলু চাষের আবাদ—

ছোট ছোট ক্ষেত্র কিং গোলালু, ম্যাগনম বোনাম আলু, খাসিয়া নৈনিতাল আলু ইহাদের মধ্যে কোন জাতটী ভাল তাহাই পরীক্ষার বিষয়।

কিং আলু	১০ একরে উৎপন্ন ৭ মণ ৯ সের প্রতি একরে ফসল ৯২ মণ ১০ সের			
ম্যাগনাম বোনাম ০৭	,, ,, ৫ ,, ২৬ ,,	,, ,,	,, ৮০ ,, ২৯ ,,	
খাসিয়া নৈনিতাল ০৫	,, ,, ২ ,, ২৫ ,,	,, ,,	,, ৫২ ,, ২০ ,,	

এক্ষণে সাধারণে জানিতে চায় যে কিং আলু কোন দেশীয় আলু, ম্যাগনাম বোনাম নৈনিতাল জাতীয় কি না এবং খাসি নৈনিতাল অর্থে নৈনিতাল আলু খাসিয়া পাহাড়ে আবাদ করিয়া তদুৎপন্ন বীজ কিনা ইত্যাদি স্পষ্টত জানিতে চায়।

কৃঃ সঃ।

মান্দ্রাজে মৎস্যের আবাদ—

মান্দ্রাজে শক্ষেমুলা মাছের আবাদ আছে। এতদ্ব্যতীত নীলগিরির স্রোতগুলিতে মাছ ধরার বন্দোবস্ত আছে এবং নিয় আনিকটে ইলিস মাছ আবাদের স্থান আছে। উক্ত ক্ষেত্রে ডিম ফুটাইবার জন্য পুষ্করিণী—আছে, এবং মাছের পোনা ও বড় মাছকে খাবার যোগাইবার বন্দোবস্ত করা আছে। রুই, কাতলা মাছের আহারের জন্য ছাতু মাটির সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়, মুরেল ও মাসির (বোধ হয় ভেটকি ভাঙ্গন জাতীয় মাছ) জন্য ব্যাঙ ও চুনা মাছ পুকুরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এ প্রকার মাছের জন্য ব্যাঙ ও চুনা মাছ পালিবার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। মাছ ও মাছের পোনাকে রোজই খাইতে দেওয়া হয়। মাছের পোনা এক পুকুর হইতে আর এক পুকুরে, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার গাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাতে মাছ চালাচালি করিবার সুবিধা হইয়াছে, ইহাতে পোনা খুব কমই নষ্ট হয়।

করমুল-কদাপার একটি ৪১ মাইল খালে মাছের পোনা রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, কিন্তু সেই সকল পোনা গাড়ী দ্বারা স্থল পথে ইতস্ততঃ পাঠান অসুবিধা হেতু এক খানি মোটার বোট রাখিবার চেষ্টা হইতেছে।

এতদঞ্চলে ইলিশ মাছের সংখ্যা দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। এই বিভাগের বিশেষজ্ঞ উইল্‌সন সাহেব দুইবার আনিকটে যাইয়া ইলিস মাছের খাল তত্ত্বাবধান করিয়াছেন এবং মাছ ধরাইয়া দেখিয়াছেন যে, কোন ইলিসের পেটে তাদৃশ ভাল ডিম নাই। উক্ত খালের মাছ যাহাতে ধরা আপাততঃ বন্ধ থাকে তিনি সেই ব্যবস্থা করিয়াছেন।

নীলগিরি পর্ব্বতের উপরে টেঞ্চ নামে একপ্রকার মাছ পাওয়া যায়। সেই মাছ নিয়ে সমতল ভূমিতে আবাদ করা যায় কি না তাহার চেষ্টা হইতেছে। টেঞ্চ? মাছের পোনা পাহাড় হইতে আনাইয়া শঙ্কেমুলা আবাদে চাষ করা হইতেছে।

নীলগিরি পর্ব্বতে ট্রাউট মাছ পাওয়া যায়। বেশ বড় ট্রাউট মাছ নীলগিরি পর্ব্বতের নদী গুলিতে মেলে। তথায় ৬ পাউণ্ড বা ৩ সের ওজনের ট্রাউট মাছও পাওয়া যায়। মাছের পরিমাণও কম নহে। ট্রাউট মাছ ধরিবার জন্য ১৮২ খানা লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে এবং লাইসেন্স হইতে ১,৪৯৫ টাকা আয় হইয়াছে। বিলাতের হিম প্রধান স্থানের নদ নদীতে ট্রাউট মাছ পাওয়া যায়। সেখানে ইহার আদর খুব। আমাদের দেশের রুই, মিরগেল মাছের সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য আছে। ইহা কিন্তু এই সকল মাছের মত বড় হয় না।

অনেকের বিশ্বাস যে মশার দ্বারা ম্যালেরিয়া জীবাণু মনুষ্য শরীরে নীত হয়। মশা পুষ্করিণী ও খাল বিলের পচা জলে জন্মে। কোন কোন মাছে মশার জীবাণু খাইয়া ফেলে, তাহাতে ম্যালেরিয়াও প্রশমিত হয়। ইহা বিশেষজ্ঞ উইলসন্ সাহেব বিবিধ প্রকার পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি মিউনিসিপাল কর্ত্তৃপক্ষগণকে চেলা মাছ পালন করিতে বলেন এবং চেলা মাছ ইতস্ততঃ পুকুরে ছাড়িয়া জল পরিষ্কার রাখিতে বলেন।

পঞ্জাবে তিল আদি তৈল শস্য—১৯১৩—

বিগত বৎসরে ১,৫৬,৮১৩ একর জমিতে তিলের আবাদ হইয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষের তিলের আবাদী জমির পরিমাণ ১৪৩,৫৫১ একর, শতকরা প্রায় ৯ ভাগ জমি কম। তিল চাষের পক্ষে আবহাওয়া বড় সুবিধা জনক ছিল না। মোটের উপর ৩১৪,৭৬৩ হন্দর তিল উৎপন্ন হইয়াছে। ১ হন্দর=১মণ ১৪ সের।

বাঙলার পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ে একপ্রকার তে-চোখো মাছ দেখা যায়। সে গুলিও জীবাণুভুক্। মাথায় চখের মত একটা দাগ আছে বলিয়া তাহার ত্রি-চক্ষু বা তে-চোখো নাম হইয়াছে। কৃঃ সঃ

বিহার ও উড়িষ্যায় তিলের আবাদ—১৯১৩—

এই বিভাগের মধ্যে সম্বলপুরে সমধিক পরিমাণে তিলের আবাদ হইয়া থাকে। সমগ্র বিভাগের প্রায় অর্দ্ধেক তিল এই খানেই উৎপন্ন হয়। ছোটনাগপুর, ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগণা এবং অঙ্গুলে তিলের আবাদ নিতান্ত কম নহে। বিগত বর্ষে ২১১,৬০০একর জমিতে তিলের চাষ হইয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষের আবাদী জমির পরিমাণ ২১৪,৯০০। তিলের আবাদ ক্রমশঃই বাড়িতেছে। উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ৪॥ মণ একর প্রতি ধরিয়া লইলে আমরা দেখিতে পাই যে ৩০,৫০০টন উৎপন্ন হইয়াছে। বিগত বর্ষে ২৩,১০০ টন মাত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। এক টনের ওজন মোটামুটি ২৭॥ মণ।

বিহারে নীলের আবাদ—১৯১৩—

বিহারে ৮টি জেলায় নীলের আবাদ হয়; বিশেষতঃ উত্তর বিহারই নীল চাষের প্রধান কেন্দ্র। নীলের আবাদ বর্ত্তমান বর্ষে খুব কম, দাম খুব কমিয়া যাইতেছে এই কারণে আবাদও কমিতেছে। বিগত বর্ষের নীলের জমির পরিমাণ ৯০,১০০ একর, বর্ত্তমান বর্ষে ৬৩,১০০ একর মাত্র জমিতে নীল চাষ হইয়াছে। উৎপন্ন নীলের পরিমাণ ১০,৪৮৮ ফ্যাক্টরি মণ। নীল ব্যবসায়ী মোরাণ কোম্পানির অনুমান ৮,৮০০ ফ্যাঃ মণ মাত্র। বাজার মণ = ১ মণ ১৫ সের ফ্যাক্টরি মণ।

বিহারে ভাদুই শস্য—১৯১৩—

আউশ ধান, ভুট্টা, বাজরা, মাড়ুয়া, যোয়ার, কলাই প্রভৃতি ভাদুই শস্যের অন্তর্গত। বর্ত্তমান বর্ষে ৮,৬১২,৯০০ একর জমিতে ভাদুই শস্যের আবাদ হইয়াছে এবং উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ ২৩,৭০৫,৩০০ হন্দর অনুমিত হয়।



পৌষ, ১৩২০ সাল।

বঙ্গদেশীয় ফসল

প্রতি বৎসরই সরকারী কৃষি-বিভাগ হইতে এতদ্দেশের বিভিন্ন জেলার উৎপাদিত ফসল সমূহের এবং বারিপাতের পরিমাণ সম্বন্ধে একটি বাৎসরিক বিবরণী প্রকাশিত হইয়া থাকে। উক্ত বিবরণীতে যে সমুদয় অঙ্কাদি দেওয়া হয়, সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করিতে গেলে সে গুলি যে কতদূর ভ্রম প্রমাদ শূন্য তাহা বলা যায় না। অন্ততঃ পাট চাষের পরিমাণ সম্বন্ধে সরকারী বিবরণী লইয়া যেরূপ তর্ক বিতর্ক চলিতেছে তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, অঙ্কাদি সঠিক করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট বিশেষ যত্ন অথবা চেষ্টা করেন না। যখন এত ইংরাজ সওদাগরের জীবিকার উপায় পাট সম্বন্ধে হিসাবের ভুল হয় তখন অন্যান্য ফসল সম্বন্ধে যে নূন্যাধিক ইতরবিশেষ হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? যাহা হউক পূর্ব্বোক্ত বিবরণী হইতে আমাদের দেশীয় ফসলাদির উৎপাদনের মাত্রার একটা মোটামুটী আভাস পাওয়া যায়। এস্থলে আমরা তাহাই সমালোচনা করিব।

বিভক্ত বঙ্গ পুনরায় যুক্ত হইবার পর এখন বঙ্গদেশে সর্ব্ব সমেত ২৮টি জেলা হইয়াছে। উহাদের আয়তন সর্ব্ব সমেত ৫০৩½ লক্ষ একরের কিছু কম হইবে। ইহার মধ্যে জঙ্গল, কর্ষণ অনুপযোগী, পতিত এবং গোচারণ জমি বাদ দিয়া ১৯১২-১৩ সালে কর্ষিত জমির পরিমাণ ২৫৯½ লক্ষ একরের কিছু বেশী হইবে। সুতরাং দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, বিগত বৎসর বঙ্গদেশের সমস্ত ভূমির মধ্যে অর্দ্ধেকের সামান্য উপর ভূমি কর্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, কোন কোন জমিতে একাধিক ফসল উৎপাদিত হইয়াছে; সে সমুদয়ের পরিমাণ ধরিতে গেলে মোট কর্ষিত জমির পরিমাণ প্রায় ৩০৫ লক্ষ একর হয়। আর মোট কর্ষিত জমির পরিমাণ হইতে প্রকৃত পক্ষে কর্ষিত জমির পরিমাণ বাদ

দিলে ইহা অনুভূত হইবে যে, বঙ্গদেশে একাধিক ফসল উৎপাদন যোগ্য জমির পরিমাণ প্রায় ৪৫½ লক্ষ একর হইবে। বিশেষ উর্ব্বরা মৃত্তিকা হইলেই তাহাতে দুইবার ফসল উৎপাদন করিতে পারা যায়। এইরূপ মৃত্তিকার পরিমাণ যে এতদ্দেশে শতকরা ২০ ভাগের অধিক হইবে না তাহা বিবরণীতে প্রকাশিত অঙ্ক সমূহ হইতে বুঝিতে পারা যায়। ইহা যে সাধারণ কৃষক সমাজের পক্ষে বিশেষ গবেষণা যোগ্য বিষয় তৎ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

উৎপাদিত ফসল সমূহের সমালোচনা করিতে গেলে প্রথমেই বলা আবশ্যক যে, উক্ত ফসলাদি ৬টি বিভাগে এবং ২৭টি উপবিভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। (১) খাদ্য (২) তৈলোৎপাদক (৩) শর্করা এবং (৪) তন্তু উৎপাদক (৫) মাদক ও ভৈষজ্য এবং (৬) অন্যান্য শস্যাদি এই ছয়টিই প্রধান বিভাগ। প্রথমোক্ত বিভাগে ধান্য, গোধুম, যব, যোয়ার, বাজরা, ভুট্টা, ছোলা, মারুয়া এবং বিভিন্ন দাইল জাতীয় শস্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তন্মধ্যে অবশ্য ধান্যই প্রধান। ধান্যের জমির পরিমাণ গতবৎসর ২১১½ লক্ষ একরের অধিক হইয়াছিল। ইহা স্বাভাবিক ধান্য জমির পরিমাণ ২২২ লক্ষ একর অপেক্ষা অনেক কম কিন্তু মোট কর্ষিত জমির পরিমাণ ধরিতে গেলে ধান্য জমির পরিমাণ শতকরা ৬৯ ভাগ হইবে। ধান্য ব্যতীত যে সমুদয় ফসল লক্ষ অথবা লক্ষাধিক একর পরিমিত জমিতে উৎপাদিত হয় তৎ সমূহের নাম ও জমির পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১।	পাট	...	২৯, ২৭, ১০০	একর।
২।	সরিষা	...	১৩, ২৫, ৪০০	,,
৩।	তামাক	...	৩, ১৩, ৭০০	,,
৪।	তিল	...	২, ৫১, ২০০	,,
৫।	ইক্ষু	...	২, ২১, ৮০০	,,
৬।	তিসি	...	১, ৯৯, ৮০০	,,
৭।	ছোলা	...	১, ৮৪, ১০০	,,
৮।	গোধুম	...	১, ৪৬, ৩০০	,,

উৎপাদনের হিসাবে ধান্যের পরেই পাট, কিন্তু যে জমিতে পাট উৎপাদিত হয় মোট কর্ষিত জমির তুলনায় তাহার পরিমাণ শতকরা ৯½ ভাগের অধিক হইবে না। সুতরাং যাঁহারা পাট চাষে ধান্য চাষের জমি অধিকার করিবে বলিয়া আশঙ্কিত আছেন তাঁহারা অনেকটা আশ্বস্ত হইতে পারেন। বিশেষতঃ বঙ্গদেশের ২৮টি জেলার মধ্যে ১০টি জেলাতেই প্রধানতঃ পাট চাষ হয় বলিতে পারা যায়। লক্ষাধিক কিন্তু ২ লক্ষ একরের কম জমিতে যশোহর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, বগুড়া ঢাকা ও ফরিদপুর জেলায় পাট জন্মিয়া থাকে। ২ লক্ষের অধিক কিন্তু তিন লক্ষ

একর অপেক্ষা কমি ত্রিপুরা, পাবনা ও রঙ্গপুর জেলায় পাটের জন্য ব্যবহৃত হয়। পাট চাষে মৈমনসিংহ জেলাই সর্ব্ব প্রধান। এইস্থলে ১৯১২-১৩ সালে ৭,৫৬,০০০ একর পরিমিত জমিতে পাট চাষ হইয়াছিল।

আমাদের বহির্ব্বাণিজ্য বিস্তারের সহিত তৈলোৎপাদক ফসলের প্রাধান্য বাড়িয়া উঠিতেছে। আমাদের পূর্ব্বোক্ত তালিকায় দেখিতে পাওয়া যাইবে যে ধান্য বাদে বঙ্গদেশের আটটি প্রধান ফসলের মধ্যে তিনটি তৈলোৎপাদক শস্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সরিষা, তিল, তিসি তিনটির মধ্যে কোনটিই স্বাভাবিক পরিমাণ জমিতে উৎপাদিত হয় নাই। সাধারণতঃ তৈল শস্যের জমির পরিমাণ ২২ লক্ষ একর। তন্মধ্যে গত বৎসর কেবল ১৮ লক্ষ একর পরিমিত জমিতে তৈল শস্য উৎপাদিত হইয়াছিল। সরিষা, রাই প্রভৃতি উৎপাদন সম্বন্ধে মৈমনসিংহ, রঙপুর ও পাবনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এতদ্ভিন্ন রাজসাহী জেলাতেও তৈলশস্য যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদিত হয়। কিন্তু মৈমনসিংহ জেলাই পাটের ন্যায় তৈলশস্যের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। মোট তৈলশস্যের জমির পরিমাণ ১৮ লক্ষ একরের অনুপাতে এক মৈমনসিংহ জেলাতেই ৫½ লক্ষ একর পরিমিত তৈলশস্যের জমির হিসাব পাইলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

তামাক এতদ্দেশের অন্যতম ফসল। যদিও চুরুট অথবা সিগারেটের পক্ষে সম্পূর্ণ ভাবে উপযোগী তামাক এখনও আমাদের দেশে উৎপাদিত হয় নাই, তথাপি তামাক চাষ অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। বঙ্গদেশে সাধারণতঃ তামাক চাষের জমির পরিমাণ অল্পাধিক ৪ লক্ষ একর। ইহার মধ্যে মাত্র চারি লক্ষ ১৩ হাজার একর জমিতে গতবৎসর তামাক উৎপাদিত হইয়াছিল। বিহার বঙ্গদেশ হইতে বিভক্ত হইয়া যাওয়ার পর তামাক উৎপাদনের কয়েকটি বিশেষ স্থান কমিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান সময় যে সমুদয় জেলায় অধিক পরিমাণ তামাক উৎপাদিত হয় তন্মধ্যে রঙ্গপুর, যশোহর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, ঢাকা ও মৈমনসিংহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবশ্য রঙ্গপুরই তামাক চাষে সর্ব্বপ্রধান, তন্নিম্নে জলপাইগুড়ি। তামাক উৎপাদনের আধিক্যের সঙ্গে যদি উহার উৎকর্ষ সাধনের জন্য সাধারণে আরও মনযোগী হয় তাহা হইলে বঙ্গদেশ অচিরে একটি তামাক বাণিজ্যের কেন্দ্র হইয়া উঠিতে পারে।

আমাদের পূর্ব্বোক্ত তালিকার মধ্যে তিনটি খাদ্য শস্যেরই (ইক্ষু, ছোলা ও গোধুম) জমির পরিমাণ স্বাভাবিক অপেক্ষা কম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা অবশ্য সাধারণ চাষের জমির পরিমাণ কমিয়া যাওয়ার জন্যই হইয়াছে। কারণ স্বাভাবিক মোট কর্ষিত জমির পরিমাণ ৩০৫ লক্ষ বিঘা হইতে বিগত বৎসর উক্ত জমির পরিমাণ ৩০৪ লক্ষ বিঘা দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং বুঝিতে পারা যাইতেছে, প্রায়

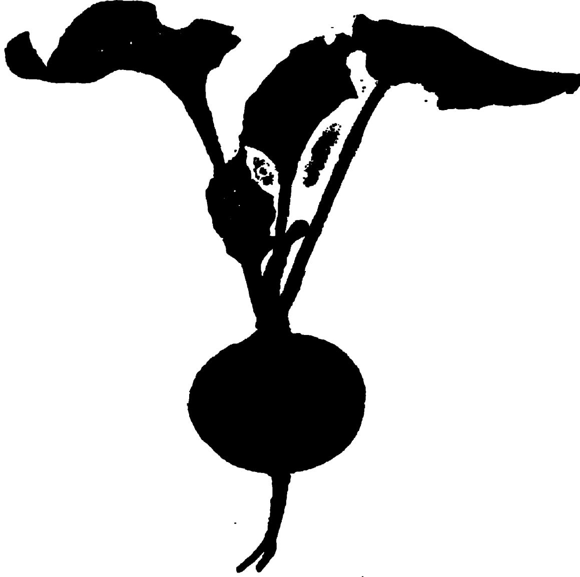
সকল ফসলই অল্লাধিক কম পরিমাণে উৎপাদিত হইয়াছে। অবশ্য ২৭ শ্রেণীর ফসলের মধ্যে কেবল পাট সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রযুজ্য নহে। কারণ পাটের জমি স্বাভাবিক ২৬ লক্ষ একর হইতে ২৯ লক্ষ একরে দাঁড়াইয়াছে।

সাধারণ ক্ষেত্রজ ফসল বাদ দিলে আর দুইটি শ্রেণীর ফসল থাকে, যাহার চাষের পরিসর বৃদ্ধি পাওয়া বিশেষ বাঞ্ছনীয়—যথা পশুখাদ্য ও উদ্যানজাত ফসল। একের অভাবে আমাদের গবাদি ক্রমশঃ হীনবল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে এবং অন্যের অভাবে আমাদের শারিরীক পুষ্টি সাধনের একটি প্রধান উপকরণ হইতে আমরা বঞ্চিত হইতেছি। কৃষি-বিভাগের বিবরণী হইতে কোন্ জেলায় যে কি কি প্রকার পশুখাদ্য, ফল কিম্বা শাক সব্জী প্রভৃতি প্রধানতঃ উৎপাদিত হইয়া থাকে তাহার কোন আভাস পাওয়া যায় না। তবে মোটের উপর বুঝিতে পারা যায় যে, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ অপেক্ষা অন্যান্য স্থানে পশুখাদ্য অথবা উদ্যান-জাত ফসল চাষ করিবার অধিক আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে পশুখাদ্য উৎপাদনের স্বাভাবিক জমির পরিমাণ ১ লক্ষ ১৭ হাজার একর; তন্মধ্যে গত বৎসর ১ লক্ষ ১৫ হাজার একর জমিতে উক্ত ফসল উৎপাদিত হয়। জেলার হিসাবে ধরিতে গেলে মৈমনসিংহ ও মেদিনীপুরই উক্ত ফসল উৎপাদনে সর্ব্বপ্রধান। অবশ্য আয়তন হিসাবে ও এই দুইটি জেলা সর্ব্বাপেক্ষা বড়।

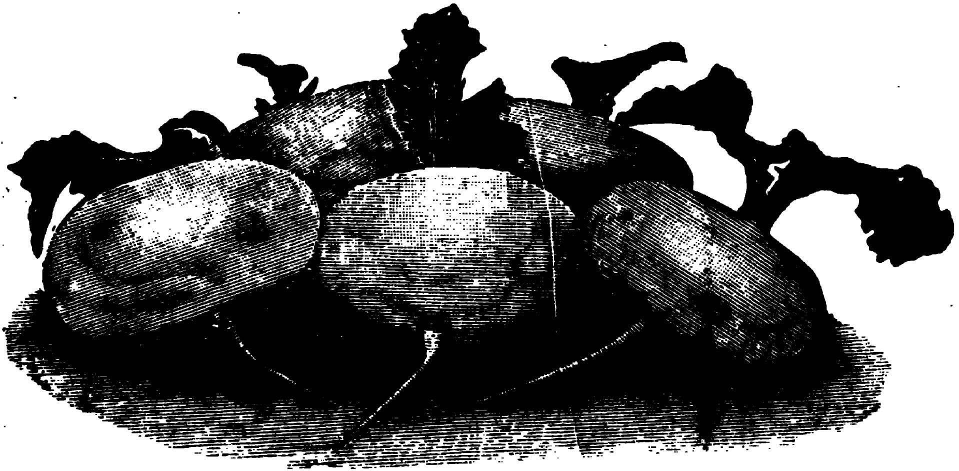
উদ্যান জাত ফসল সম্বন্ধে বিবরণী প্রদত্ত তালিকা হইতে বিশেষ কিছু বুঝিতে পারা যায় না। তবে ইহা নিশ্চয় যে, ফল অথবা সব্জী চাষ সম্বন্ধে কোন স্থানেই উল্লেখযোগ্য কোন রূপ চেষ্টা করা হয় নাই। কিন্তু কোন কোন স্থানে ফল চাষ যে সাধারণ কৃষি অপেক্ষা অনেক লাভজনক ব্যবসায় তাহা নিঃসন্দেহ। বারান্তরে এ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ রূপে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

সালগম—(BRASSICA RAPA.)

সালগম—ইহারও জন্ম ইউরোপে--এখন পৃথিবীতে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহার শাস্ত্রীয় নাম (Brassica Rapa)। মূলার ন্যায় ইহার মূল খাওয়া হয়। সিদ্ধ করিয়া তৈল লবণ দিয়া খাইতে বেশ। ইউরোপের লোকে সরিষার তৈল মাখিয়া খাইতে জানে না। সেখানে রাই ও লবণ দিয়া সিদ্ধ তরকারী খাওয়া হয়। মাংস কিম্বা মাছের সহিত খাইতেও বেশ। শরত কাল হইতে আরম্ভ করিয়া শীত ভোর ইহার চাষ করা চলে। ইহাও আধ গোল ও ঈষৎ লম্বা আকারের ছিল। মূলের গায়ে শিকড় ছিল; এখন শিকড় ঘুচিয়া টর্ণিপ বাস্তবিক টর্ণিপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—বেশ সুগোল। দুধে রঙের সালগম গুলি দেখিলে মন মুগ্ধ হয়। কোন কোন সালগমের মাথার দিকে ঈষৎ লাল রঙ হয়। সরস মাটি ও আর্দ্র জল হাওয়া পাইলে বীট কিম্বা সালগম খুব বড় হয়। দার্জ্জিলিঙের বীট, সালগম, মূলা দেখিলে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া থাকিতে হয়।

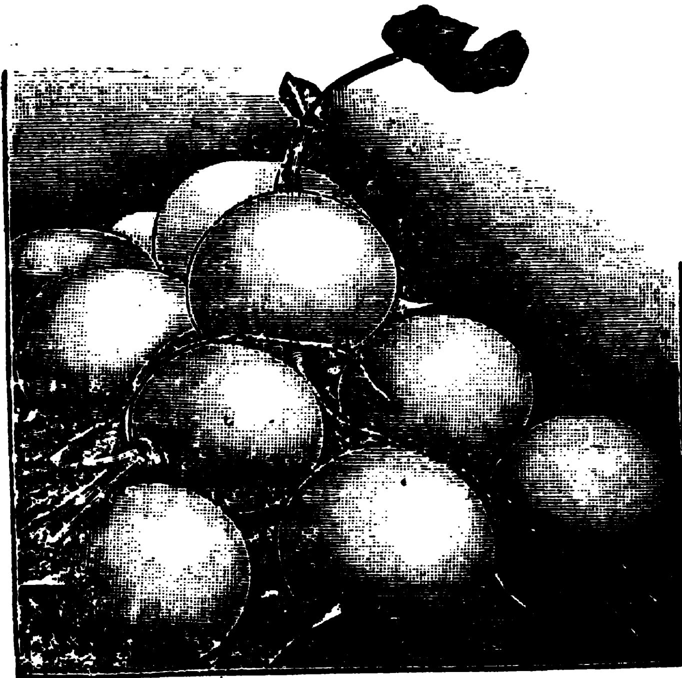


বিলাতী সালগম আর্লি মডেল।



বিলাতী সালগম—ফ্লাটডচ।

গ্রীষ্ম কিম্বা বর্ষার সময় সালগম জন্মিতে পারে। তখন কিন্তু ইহা আহারের অনুপযুক্ত, এমন শক্ত এবং আঁস বিশিষ্ট হয়। গ্রীষ্মের হাওয়া দিতে আরম্ভ করিলেই বীট, সালগম ও কপি প্রভৃতিতে পোকা অধিক মাত্রায় লাগিতে দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে এই সকল সব্জীর স্বাদ ও গন্ধ তাদৃশ ভাল থাকে না।



আকারে খুব বড় না হইলেও এই সালগমগুলি দেখিতে খুব সুন্দর। বড় তুষারের ন্যায় শাদা। খেলিবার বলের মত গোল। গাত্র মসৃণ ও শিকড় শূন্য। ফ্লাট ডাচ ও স্নোবল উভয়ই খাইতে সুস্বাদু।

বিলাতী সালগম—স্নোবল।

গ্রীষ্মকালে সালগম চাষ করিতে হইলে খুব ঠাণ্ডা জায়গা বাছিয়া লওয়া কর্ত্তব্য এবং শীত কালে যখন জমি স্বভাবতঃ রসশূন্য হইয়া পড়ে তখন নিয়ত জল সেচনের আবশ্যক। অসময়ের জন্য এই প্রকারে আবাদ রক্ষা না করিলে চলে না। কেহ কেহ অসময়ের জন্য সালগম সঞ্চয় করিয়া রাখে। সালগম তুলিয়া জলে ধৌত করিতে হয়। তাহার পাতাগুলি মাথার উপর হইতে কিঞ্চিৎ রাখিয়া কাটিয়া ফেলিতে হয়। পরে মাচানের উপর বালির মধ্যে রাখিয়া দিলে অসময়ে সালগম ব্যবহার করা যাইতে পারে। ক্ষেত নিড়াইয়া, আবশ্যক মত জল দিয়া বারমাস ক্ষেতে সালগম রাখা যাইতে পারে। নরম সারবান দোয়াঁস মাটিতে সালগম ভাল হয়। কঠিন অসার মাটিতে সালগম বাড়ে না এবং ঐ জমির সালগম স্বাদে গন্ধে খাইবার অনুপযুক্ত। সকল উদ্ভিদের ন্যায় ইহাও বৎসরের পর বৎসর গাছ বাছাই দ্বারা এবং সেই বাছাই গাছের বীজ উৎপন্ন করিয়া সালগমের এত উন্নতি সাধন হইয়াছে।



পাটনাই—সালগম।

পাটনাই সালগমের মূলে এখনও শিকড় আছে। পাটনার সব সালগম সম্পূর্ণ গোল নহে, অধিকাংশ সালগমই লম্বাকৃতি। বিলাতী ফ্লাটডচ সালগমের মত সালগম পাটনায়ও আছে কিন্তু তাহাও শিকড় শূন্য বা সুগোল নহে। পাটনাই সালগম বিলাতী সালগমের মত এত নরম ও খাইতে এত সুস্বাদু হয় না। বিলাতী সালগমের ক্রমশঃই উন্নতি হইতেছে কিন্তু এখানে সে উন্নতি চেষ্টা কোথায়? কে এখানে ভাল বীজ উৎপন্ন করিয়া ফসলের উন্নতি করিবার চেষ্টা করে?

কৃষি-বিভাগ সম্বন্ধে সাধারণের অভিমত—যাঁহারা ভারতীয় কৃষি-সমিতির সহিত সাক্ষাত সম্বন্ধে বা পরোক্ষ ভাবে কোন সংস্রব রাখেন তাঁহাদের কথায় বুঝা যায় যে, সাধারণের বিশ্বাস ভারতীয় কৃষি-বিভাগ সাধারণের জন্য নহে। ভারতীয় কৃষির উন্নতিবিধান করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট এই বিভাগ স্থাপন করিয়াছেন সত্য; উক্ত কৃষি-বিভাগ কৃষির সূক্ষ্ম মৌলিক তত্বগুলির বিচার ও গবেষণা লইয়া ব্যস্ত তাহাও ঠিক, হয়ত তাহাতে সুদূর ভবিষ্যতে কোন ভাল ফল ফলিবে, আপাততঃ কিন্তু সাক্ষাত সম্বন্ধে চাষীরা বিশেষ কোন উপকার পাইতেছে না। আমাদের দেশের চাষীর প্রধান অভাব সুবীজ। কোন্ বীজ লইয়া চাষ করিলে তাহাদের শস্যের ফলন দ্বিগুণ বা চতুর্গুণ বাড়িয়া যাইবে, কোন্ বীজ অনাবৃষ্টি সহ, কোন্ বীজ অতিবৃষ্টি সহ্য করিতে পারিবে, এমন সব বীজ তাহারা কোথায় পাইবে, এই তাহাদের খোঁজ। চাষীদের এই অভাব পূরণ হইতেছে না। কৃষি-বিভাগ দুই চারি জন ভদ্রলোককে কিছু কিছু বীজ পরীক্ষার্থ দিয়া নিশ্চিন্ত, সাধারণ চাষীর বা চাষের অবস্থা যথা পূর্ব্ব তথা পর এক ভাবেই রহিয়া গেল। চাষীরা চায় ঊষর জমির পুনরুদ্ধার করিতে, চাষীরা চায় সমুদ্র উপকূলে পতিত লোণা জমিতে আবাদ পত্তন করিতে কিন্তু তাহারা কোন সাহায্য পায় না। কৃষির সূক্ষ্ম তত্বালোচনায় ফল সাধারণ চাষী কিছুই অবগত নহে, কে তাহাদের এ সকল তত্ব জানাইবে। কৃষি সম্বন্ধে যাহা কিছু পরীক্ষা হয় তাহাত সাধারণ চাষীগণকে সঙ্গে লইয়া হয় না বা চাষের এক একটা কেন্দ্রে যাইয়া পরীক্ষার প্রতিপন্ন ফল গুলি তাহাদিগকে জানাইবার কোন ব্যবস্থা নাই। তবে চাষীর অভাব কিসে মোচন হইবে? সে দিন লাট সভায় কৃষি-বিভাগের কথা উঠিয়াছিল। মিঃ বি, চক্রবর্ত্তী প্রশ্ন করিয়া জানিয়া লন যে ১৯১২-১৩ সালে কৃষি-বিভাগের ব্যয় ৩,০৩,০০০ টাকা, ইহার মধ্য হইতে অফিস খরচা ১,৭০,০০০ টাকা বাদ যায়। বাকী টাকায় কোন না কোন পরম হিতকারী কৃষির উন্নতি বিধায়ক কার্য্য সংসাধিত হইতে পারে। লাট সভায় কৃষি-বিষয়ের বিশেষ আলোচনা হয় ইহা আমরা সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনা করিয়া থাকি এবং তাহাতে সাধারণ কৃষির কিছু কিছু আশু উপকার হইলেও হইতে পারে।

আরও পরিতাপের বিষয় এই যে, আমরা সময়ে সময়ে দেখিতে পাই যে, কৃষি-পরীক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয় বাহুল্য হেতু লাভ না হইয়া লোকসান হয়। ঐ সকল পরীক্ষা ক্ষেত্রে যে সমুদয় দামী সার ব্যবহার করা হয় তাহা হয়ত সাধারণ চাষী কোন কালেই ব্যবহার করিতে পারিবে না সুতরাং ঐ সমস্ত পরীক্ষায় সাধারণের আস্থা খুবই কম। দেশের ভাব ও গতিতে যতদূর জানা যাইতেছে তাহাতে সাধারণে, গবর্ণমেণ্ট কৃষি-ক্ষেত্রের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া দূরে থাকুক একবার

ফিরিয়া তাকাইতেও যেন সাহস করে না। সাধারণের অভিমত যখন এই, তখন কৃষি-বিভাগের কর্ত্তব্য যে সহজ প্রতিপাদ্য কৃষি-উন্নতিতে প্রথমে হাত দেওয়া, পরে ক্রমশঃ চাষীরা সুফল দেখিয়া উৎসাহিত হইলে তাহাদিগকে লইয়াই ব্যয় ও আয়াস সাধ্য অথচ লাভজনক কৃষি আরম্ভ করা যাইতে পারিবে। আমরা চাই সাধারণ চাষীকে সঙ্গে লইয়া কার্য্য করিতে, আমরা চাই তাহাদের দ্বারা কার্য্য করাইতে নতুবা অসংখ্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করিলেও ভারতীয় কৃষির উন্নতি হইবে না।

পত্রাদি

শ্রীগোবিন্দ প্রসাদ কবিরত্ন—ভরদ্বাজহাট, চট্টগ্রাম।

লাউ, কুমড়া, কলা, পেঁপে গাছে কোন্ সার আবশ্যক জানিতে চান,—

লাউ, কুমড়া লতায় পটাস প্রধান সারের আবশ্যক—খনিজ পটাস সার, কাইনিট ব্যবহার করিতে পারেন। এক বিঘায় ৩২ পাউণ্ড পটাস আবশ্যক। কাইনিটে পটাসের পরিমাণ শতকরা ১২·৫ ভাগ। অন্য সার মিলিলে রাসায়নিক বা কৃত্রিম, বা খনিজ সার ব্যবহার ইচ্ছা ভাল নহে। গোময় ভস্মে পটাস সারের পরিমাণ শতকরা ১২ ভাগ। এঁটেল মাটিতেও পটাস পাওয়া যায়। মাছের আঁস বা মাছ ধোয়া জল দিলে নাইট্রোজেন ও ফস্‌ফরিক এসিড প্রদানের কার্য্য হয়। এখন দেখুন, আপনার লাউলতাটিকে সবল করিতে পাঁকমাটি, ছাই মিশ্রিত গোয়ালের আবর্জ্জনা, এবং আঁস বা মাছ ধোয়া জল দিলে আপনার দরকার মত সব জিনিষ গুলি দেওয়া হইল কি না?

কলা ও পেঁপে গাছেও পটাস প্রধান সার দেওয়া আবশ্যক—প্রত্যেক বিঘাতে ৭০ পাউণ্ড হিসাবে পটাস এবং ৭০ পাউণ্ড হিসাবে ফস্‌ফরিক এসিড ব্যবহার করা আবশ্যক। হাড় ভস্মে শতকরা ৩৫ ভাগ ফস্‌ফরিক এসিড পাওয়া যায়। গোয়ালের আবর্জ্জনা সার ও গোময় ভস্ম পর্য্যাপ্ত পরিমাণ আটাল মাটির সহিত মিশাইয়া প্রত্যেক গাছের গোড়ায় দিতে হয়। ইহাতে সারের সম্পূর্ণ উপাদান গুলি দেওয়া হইল। ফস্‌ফরিক এসিড ও নাইট্রোজেনের মাত্রা বাড়াইবার জন্য হাড়ভস্ম ও রেড়ীর খৈল কিঞ্চিৎ পরিমাণে দিতেও পারেন।

গুয়ানো—ইহাতে নাইট্রোজেন ও ফস্‌ফরিক এসিড সমভাবে পাওয়া যায়।

নাইট্রেট অব লাইম,—চূণ প্রধান সার। ইহা সকল রকম শস্যে উপকারী। শুঁটিধারী শস্যের পক্ষে চুণ উত্তম সার।

পটাস সার,—কলা, পেঁপের বিশেষ উপকারী ও শুঁটি-ধারী শস্যের ইহা প্রধান সার। ফল গাছের সারের সহিত পটাস না থাকিলে, তাহার সম্পূর্ণ সার দেওয়া হইল না।

সার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা নিবারণ বাবুর "কৃষি-রসায়নে" পাইবেন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী—মিহিজাম, ই, আই, আর,

অর্কিড বা রাস্না,—প্রশ্ন করিয়াছেন যে অর্কিড্‌কে কয় শ্রেণীতে বিভাগ করা যায় এবং সমুদ্র উপকূল হইতে দুই তিন হাজার ফিট উর্দ্ধে কোন্ কোন্ অর্কিডের ফুল হয়, ৪ বা ৫ হাজার ফিট উর্দ্ধে কোন গুলি পুষ্পিত হয়?

উত্তর—এই প্রশ্নগুলির সমাধান সংক্ষেপে হয় না, অর্কিড সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখার আবশ্যক। ভারতীয় কৃষি-সমিতির দার্জ্জিলিঙ সংবাদ দাতা এই বিষয়ের প্রথম প্রবন্ধ পাঠাইয়াছেন তাহা আগামী মাসে কৃষকে বাহির হইবে।

শ্রীঅখিল চন্দ্র দত্ত—শ্রীরামপুর।

গোলাপ গাছে জল বসা—গোলাপ গাছ বিবর্ণ হইয়া যাইতেছে, সার যথেষ্ট দেওয়া হইয়াছে বলিতেছেন। জল সেচনের পর এই অবস্থা হইয়াছে।

উত্তর—বোধ হয় জল নিকাশের পথ ঠিক নাই। নিম্নের কঠিন স্তরে জল আটকাইয়া গাছের ক্ষতি করিতেছে। শিকড় গুলি আহার ও পানীয় সত্বেও খাদ্য গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। মাটি অত্যধিক জলসিক্ত হইলে এই অবস্থা ঘটিয়া থাকে। বিশেষ বিবরণ লিখিবেন।

শ্রীপঞ্চানন সিংহ—কেশবপুর, হুগলি।

বিলাতী আমড়া গাছে পোকা—১। বিলাতী আমড়া গাছে পোকা ধরিলে, তাহার নিবারণোপায় কি?

চীনা বাদাম—২। চীনাবাদামের উৎপাদন প্রণালী কিরূপ? অর্থাৎ চাষের সময়, উহার উপযুক্ত মাটী, মাটীর পাইট, বিঘা প্রতি বীজের পরিমাণ, বীজ বসাইবার নিয়ম, সার, জলসেক, উত্তোলনের কাল ও প্রণালী এবং উহার লাভ জনক ব্যবহার ইত্যাদি উদ্ভিদ শাস্ত্রমতে ইহাকে কোন পর্য্যায়ভুক্ত করা যায়? ইহা ফল না মূল?

উত্তর—১। গাছে কি পোকা লাগিয়াছে না জানিতে পারিলে প্রতিকার নির্ণয় করা যায় না। যদি গাছের গাত্র হইতে রস বা গুঁড়া বাহির হইতেছে দেখিতে পান তবে জানিবেন যে ঘুণ পোকা লাগিয়াছে এবং গাছের মধ্যে ফুকর করিয়া গাছের মাঝ খাইতেছে। ইহার প্রতিকার মাছ ধরা বঁড়শীর মত হুক বিশিষ্ট সুচাল লৌহশলা চালাইয়া দিয়া পোকাটাকে বিঁধিয়া বাহির করিয়া আনা। সব সময় গর্ত্তগুলি সোজা না হইয়া বক্র হয় এবং পোকা বাহির করা দুরূহ হইয়া পড়ে। কেরোসিন তৈল, জলের সহিত মিশাইয়া গর্ত্তের মধ্যে পিচকারী দিতে পারিলে পোকা মরিলেও মরিতে পারে। পাতা কিম্বা ডাঁটায় পোকা লাগিলে কীট নিবারক আরক পিচকারী দ্বারা গাছটি সিক্ত করিয়া দিলে প্রতিকারের আশা করা যাইতে পারে। কি প্রকার পোকা লাগিয়াছে জানাইবেন। এই সকল খবর জানিতে হইলে "ফসলের পোকা" পুস্তক খানি রাখা আবশ্যক।

২। চীনা বাদামের শাস্ত্রীয় নাম Archis hypogæ; ইহা শুঁটীধারী (Leguminosæ) শস্য পর্য্যায়ভুক্ত।

চীনাবাদাম মাটীর নীচে জন্মিলেও ইহা ফল, মূল নহে। এই গাছের শুঁটি বা ফল মাটীর নীচে উৎপন্ন হয়। উহার ফুল একটী লম্বা বোঁটার মত পুষ্পকোষ (calyx) নলের প্রান্তে থাকে এবং বীজাধার তলায় থাকে। ফুলটী ঝরিয়া যাইবার পর ফুলের বোঁটা লম্বা হইয়া নীচের দিকে বাঁকিয়া পড়ে এবং কয়েক ইঞ্চি মাটীর নীচে ঢুকিয়া যায়। উহার প্রান্তভাগের বীজাধারটী সেই খানে বাড়িতে আরম্ভ করে, এবং ঈষৎ হরিদ্রা রঙের, কোঁচকান, ঈষৎ বাঁকা শুঁটিতে পরিণত হয়; অনেক সময়ে উহার মধ্যদেশটী সরু হয়। এই কুয়ার মধ্যে ১ হইতে ৩টী পর্য্যন্ত বীজ থাকে। যদি ফুলটী ঝরিয়া যাইবার পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফুলের বোঁটাটী (spike) ঘটনাক্রমে আপন সূচাল অগ্রভাগ মাটীর ভিতর ঢুকাইয়া দিতে না পারে, তাহা হইলে উহা শুকাইয়া মরিয়া যায়; সুতরাং ফলটিকে বাড়িতে দিবার নিমিত্ত মাটী শক্ত ও জমাট না হইয়া আলগা ও ঝুরা থাকা অত্যাবশ্যক।

মাটি—অত্যন্ত শুষ্ক বা বেলে নহে, কিন্তু হালকা ও সচ্ছিদ্র এমন বেলে দোয়াঁস মাটীতে যে মাঠ বাদাম জন্মে, তাহাই বাজারে অধিক দরে বিক্রীত হয়।

সার—এই ফসলে প্রথমে চূণ, ফসফরিক্ এসিড ও পটাস এবং পরে নাইট্রোজেন আবশ্যক। একর (৩ বিঘা) প্রতি নিম্নলিখিত সার ব্যবহার করিতে হয়,—

সূক্ষ্মরূপে গুঁড়া-করা-চূণ	...	...	... ২ মণ।
সুপার ফসফেট	...	...	... ২ ,,
সাধারণ ছাই	...	...	... ১০ ,,

বীজ বুনিবার সময়— দুইবার, ১ম বর্ষারম্ভে জ্যৈষ্ঠ মাসে, ২য় বার কার্ত্তিক মাসে। বীজের পরিমাণ বিঘা প্রতি ৬ কিম্বা ৭ সের। শুঁটি ছাড়াইয়া দাগী গুলি বাছিয়া ফেলিয়া ভাল বীজ বুনিতে হয়। ১৮ইঞ্চি তফাৎ লাঙ্গলের শিরালে শিরালে বীজ বুনিতে হয়। **মাটি**—লাঙ্গল, মৈ দ্বারা বার বার চষিয়া ধুলিবৎ করিতে হইবে। গাছ জন্মিবার পর মাঝে মাঝে নিড়ান বা খুর্পী দ্বারা জমি সর্ব্বদা আল্‌গা করিয়া রাখিতে হইবে। লতা বা ডাঁটা শুকাইয়া আসিলে তবে ফসল সংগ্রহ করিতে হয়। **ফলন**—এক বিঘাতে ১০ হইতে ১২ মণ; জঙ্গল তোড়া পাতাপচা সারে সারবান জমিতে আরও অধিক ফলিতে পারে। **জল সেচনের**—বিশেষ আবশ্যকতা দেখা যায় না।

কাষ্ঠ হইতে চিনি—আখ হইতে, বীট হইতে কিম্বা খেজুর রস হইতে চিনির বিষয় আমরা অবগত আছি। অন্ততঃ কাঁচা গাছের রস হইতে আমরা চিনি পাইবার আশা করিতে পারি কিন্তু কেহ শুক্‌না কাঠ হইতে চিনি লাভের আশা করে না। আজ কাল বোধ হয় বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহাও সম্ভবপর হইবে। কাঠের গুঁড়া জল মিশ্রিত সালফিউরিক অম্লে ভিজাইয়া কোন আবদ্ধ পাত্রে কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে তাহা হইতে শতকরা ২৫ ভাগ চিনি পাওয়া যায়। এই চিনি মদপ্রস্তুতের বিশেষ উপযোগী। যদি এখন কোন কারখানা স্থাপন করা হয় যে, তাহাতে প্রতি সপ্তাহে ২০০ টন কাঠের গুঁড়া সালফিউরিক দ্রাবণ সংযোগে চিনি উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহাহইলে সেই কারখানা হইতে বৎসরে ৩০ কিম্বা ৪০ হাজার গ্যালন সুরাসার উৎপন্ন হইবে। ভারতের মধ্যে দেরাদুন বন-বিভাগে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত প্রণালীতে কার্য্য পরিচালিত হয়। তথায় কাষ্ঠ চিনির কারখানা স্থাপিত করা খুব বাঞ্ছনীয়।

রেঙ্গুনে অসময়ে আমের মুকুল—একজন সংবাদ দাতা রেঙ্গুন গেজেটে আশ্চর্য্য খবর দিতেছেন যে, পর পর দুই বৎসর একটি আম গাছে সময়ে আম হইবার পরও আবার বড় দিনের সময় তাহাতে মুকুল ধরিয়া ফল হইয়াছে। নভেম্বর মাসের প্রথমেই ঐ আম গাছ মুকুলিত হইয়াছে। আমরা বলি ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই। বাঙলা দেশে এমন এক জাতীয় আম্র বৃক্ষ আছে যে তাহাতে বৎসরের দুই এক মাস ছাড়া সর্ব্বদাই আম দেখিতে পাওয়া যায়। আমের মুকুল ও কাঁচা, পাকা আম একই গাছে এক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। বৎসরে দুই বার ফলিবার আম গাছও আছে। এই সকল গাছে যে, জুন মাসে একবার আম পাকে তারপর আবার বউল হয়, সেই আম আশ্বিন কার্ত্তিক মাস

পর্য্যন্ত গাছে থাকে। মান্দ্রাজে ও সিংহলেও দোফলা আম দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতীয় কৃষি-সমিতি ঠিক ঠিক দোফলা ও বারমেসে আমের কলম নানাস্থানে সরবরাহ করিয়াছে, এমন কি রেঙ্গুনেও সম্প্রতি এই জাতীয় আমের কলম চালান হইয়াছে।

যুক্ত প্রদেশে শস্যহানী—বৃষ্টির অভাবে মাঠের ফসল শুকাইয়া গিয়াছে। তাহার উপর আবার পঙ্গপাল ও উইয়ের উপদ্রব আছে। গবাদির খাদ্য তৃণ ঘাসও বিরল। সঞ্চিত সরকারী ঘাস গবাদির জন্য বিতরিত হইতেছে। বুন্দেলখণ্ড এবং উনাও জেলা সমূহে জলাভাবে সব নষ্ট হইয়াছে। ঐ সকল স্থানে খাদ্য দ্রব্য মিলিতেছে না, দর বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে; দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে।

যবদ্বীপে বাণিজ্য—এসিয়ার দক্ষিণ পূর্ব্ব প্রান্তে যবদ্বীপ এক সময়ে হিন্দুদের এক প্রধান বাণিজ্যের বন্দর ছিল। মুসলমানগণ এই স্থানের ব্যবসায় আয়ত্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এখন যবদ্বীপের বাণিজ্য চীনাদিগের একচেটে। যবদ্বীপে এক মুসলমান সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহার নাম সারকত ইস্‌লাম। যবদ্বীপের বাণিজ্য চীনাদিগের হস্ত হইতে গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। খ্রীষ্টানগণের হস্ত হইতেও বাণিজ্য অধিকার গ্রহণ করিবার জন্য মুসলমানগণ বিপুল চেষ্টা করিতেছেন।

এডেনের লবণ—এডেনে প্রচুর পরিমাণে লবণ তৈয়ার হইতেছে—সেই লবণ ভারতবর্ষে আমদানি করাতে বিলাতী লবণের কাট্‌তি হ্রাস হইতেছে। বিলাতী লবণওয়ালারা বিপন্ন হইতেছেন।

কাপাস চাষের নূতন প্রণালী—সিউজি নামক জর্ম্মাণ বিজ্ঞানবিদ্‌ সম্প্রতি লণ্ডনে অবস্থান করিতেছেন। ইনি কার্পাস উৎপাদন সম্বন্ধে এক অভিনব বৈজ্ঞানিক প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন। সিউজি যে প্রণালী নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে বৎসরে বৎসরে নূতন গাছ উৎপাদন করিতে হইবে না, পরন্তু এক গাছ হইতে বহুদিন পর্য্যন্ত সমানভাবে কার্পাস পাওয়া যাইবে। তাঁহার আবিষ্কৃত প্রণালী অবলম্বন করিয়া বৃক্ষ উৎপাদন করিলে সেই গাছ কোন দিন পোকায় নষ্ট করিতে পারিবে না, পরন্তু গাছে কলম বাঁধা যাইবে। সম্প্রতি পূর্ব্ব আফ্রিকায় এ সম্বন্ধে পরীক্ষা চলিতেছে।

জুতায় প্যারাফিন—জুতায় জল লাগিয়া চামড়া নরম হইয়া গেলে পালিশ করিবার পূর্ব্বে কালিতে কয়েক ফোঁটা প্যারাফিন মিশাইয়া লইবে। ইহাতে জুতার চামড়া ভাল থাকিবে, পরন্তু চামড়ার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাইবে।

আরশুলা নিবারণের উপায়—ঘরে আরশুলার উপদ্রব হইলে কিছু সোহাগা চূর্ণ ছড়াইয়া দিবে। দুই একদিনের মধ্যে আর আরশুলার চিহ্নমাত্র থাকিবে না।

সার-সংগ্রহ

সম্মিলনে শিল্প কথা।

করাচীর শিল্প-সম্মিলনীর নবম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি মাননীয় শ্রীযুত লালুভাই শ্যামলদাস মহাশয় বক্তৃতা করিয়াছিলেন, বস্ত্র-শিল্প সম্বন্ধে সরকারের রাজস্বসচিব বলিয়াছেন যে, শতকরা সাড়ে তিন টাকা হিসাবে স্বদেশী কর ধার্য্য থাকাতেও স্বদেশীয় বস্ত্রের উৎপত্তি বৃদ্ধি পাইতেছে, সুতরাং ইহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ঐ শুল্কপ্রভাবে দেশীয় বস্ত্র-শিল্পের কোন ক্ষতি হয় নাই। আমরা সরকারের এই যুক্তি পাঠ করিয়া বিস্মিত হইলাম। যদি এই কর ধার্য্য না থাকিত, তাহা হইলে দেশীয় কলজাত বস্ত্র আরও অধিক সুলভ হইত এবং উহার কাট্‌তি আরও বৃদ্ধি পাইত। এই কর যে দেশীয় বস্ত্র শিল্পের উন্নতির প্রধান অন্তরায়, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

অন্য অন্য আরও কতকগুলি কারবারে উন্নতির লক্ষণ দেখা গিয়াছে, সভাপতি মহাশয় এ কথাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। তুলা এবং পাটের গাঁট বাঁধার কারবার, পেঁজার কারবার, লৌহ এবং পিতলের কারবার, ধান ভানা কল, টালি প্রস্তুত প্রভৃতির কারবারে বিলক্ষণ উন্নতি দেখা গিয়াছে। কেবল নীলের কারবারের অবস্থা দিন দিন অবনত হইয়া পড়িতেছে। কৃত্রিম নীলই এই অবনতির কারণ। আসল নীল যাহাতে কৃত্রিম নীলের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে, যত দিন তাহার ব্যবস্থা না হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত আসল নীল কৃত্রিম নীলের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইবে না।

অতঃপর শ্রীযুত শ্যামলদাস মহাশয় ভারতে লৌহ এবং ইস্পাতের কারখানার কথার আলোচনা করিয়াছেন। স্বর্গীয় জে, এন, তাতার চেষ্টায় ভারতে যে

লৌহের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা বাস্তবিকই ভারতের গৌরবের জিনিষ। তাঁহার পুত্রদ্বয়ের প্রতিষ্ঠিত এই কারখানাতেই স্বদেশী শিল্প জয়যুক্ত হইয়াছে। এই কারখানার কর্ত্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা ভাল লোহার জিনিসপত্র প্রস্তুত করিতে পারিতেছেন। ইহা ভিন্ন তাঁহারা অতি উৎকৃষ্ট ইস্পাতও প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের প্রস্তুত ইস্পাত ভারতবর্ষের পণ্যবীথিকায় বৈদেশিক ইস্পাতকে এখনও সম্পূর্ণ পরাভূত করিতে পারে নাই; তবে শীঘ্র পারিবে, এরূপ আশা জন্মিয়াছে। তাঁহারা ইদানীং কলকারখানা প্রভৃতির যেরূপ উন্নতি করিয়াছেন, তাহাতে অতি শীঘ্রই তাঁহারা ব্রিটিশ ষ্টীলের সমান ইস্পাত ভারতে অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প মূল্যে বেচিতে সমর্থ হইবেন। স্বর্গীয় জে, এন, তাতার পুত্রগণ এই কারখানার প্রতিষ্ঠাতা সত্য, কিন্তু উক্ত স্বর্গীয় মহাত্মাই এই কার্য্যের প্রকৃত প্রবর্ত্তক। স্বর্গীয় তাতা ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া লৌহ-কারখানা প্রতিষ্ঠা করিবার উপযুক্ত স্থান সন্ধান করিয়া লইয়াছিলেন। ঐ সন্ধানকার্য্যে অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল এবং এদেশের কয়লা হইতে উৎকৃষ্ট কোক্ কয়লা প্রস্তুত হইতে পারে কি না, তাহা জানিবার জন্য তিনি অনেক কয়লা মার্কিণে চালান দিয়াছিলেন। বিশেষজ্ঞ দ্বারা ঐ অনুসন্ধান-কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য তাঁহাকে ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হয়। যখন অনুসন্ধানের দ্বারা সাব্যস্ত হইল যে, ভারতে অতি উৎকৃষ্ট লৌহ-কারখানা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবে, তখনই তাঁহার পুত্রগণ যৌথকারবারের প্রতিষ্ঠা করিয়া এই কারখানার পত্তন করিয়াছেন। কিন্তু প্রারম্ভে এত অর্থ ব্যয় করিবার পরও যখন কারবার প্রতিষ্ঠিত হইল, তখনও কারবারের প্রতিষ্ঠাতাদিগকে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহারা সেই সমস্ত অসুবিধা পরিহার করিতে সমর্থ হইতেছেন।

এই ব্যাপার হইতে আমাদের একটি বিলক্ষণ শিক্ষালাভ হয়; বৃহৎ কারবারের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে ঐ কারবারের উৎপন্ন পণ্য বৈদেশিক আমদানী পণ্যের সহিত প্রতিযোগিতায় সম্পূর্ণ সক্ষম হইবে কি না, অতিশয় সাবধানে তাহার অনু-সন্ধান করা কর্ত্তব্য। যদি বুঝা যায় যে, এ কারবার বৈদেশিক পণ্যের সহিত প্রতিযোগিতায় আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইবে, তাহা হইলেই ঐরূপ কারবারের প্রতিষ্ঠা করা উচিত—নতুবা ঐরূপ বৃহৎ কারবারের প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য নহে। যে সকল ব্যক্তির প্রচুর ধন আছে এবং যাঁহাদের অর্থনীতি ও বাণিজ্যসম্পর্কিত ব্যাপারের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারাই ঐরূপ অনুসন্ধান করিতে সমর্থ। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে এইরূপ লোকের সংখ্যা অতি অল্প। সেই জন্য আমাদের দেশে এত অল্প বৃহৎ-কারবার প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। অনুসন্ধানের দ্বারা যদি জানিতে

পাওয়া যায় যে, আমাদের দেশে কোনও কারবার পরিচালনের জন্য আবশ্যক কাঁচা মাল যথেষ্ট পাওয়া যায় এবং সেই কাঁচা মাল হইতে পণ্য প্রস্তুত করিয়া লাভ করিবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে সেই শিশু-শিল্পের রক্ষাকল্পে সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। সরকারও সেই শিল্পের সাহায্য করিবেন, এইরূপ আশা করা যায়। সরকার নানা উপায়ে লৌহ কারখানার সাহায্য করিতেছেন; প্রতি বর্ষে তাঁহারা কারখানা হইতে অন্যূন বিশ হাজার টন রেলের পাটী প্রভৃতি খরিদ করিতে প্রতিশ্রুতি করিয়াছেন। শ্রীযুত শ্যামলদাস মহাশয় অবাধবাণিজ্য-নীতির সেবক। সেই জন্য তিনি শিশু-শিল্পের রক্ষাকল্পে শুল্ক-প্রাকার প্রতিষ্ঠিত করিবার আবশ্যকতা স্বীকার করেন না। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, এ দেশে শিশু-শিল্পের রক্ষাকল্পে শুল্ক-প্রাকার প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে আমরা 'বসুমতীতে' বহুবার আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং বর্ত্তমান সময়ে তাহার বিস্তৃত সমালোচনা অনাবশ্যক।

এ দেশে অনেক যৌথ-কারবার দেউলিয়া হয়, তাহা ইতিপূর্ব্বে পূর্ব্ববর্ত্তী শিল্প-সম্মিলনীর সভাপতি কর্ত্তৃক আলোচিত হইয়াছে। পূর্ব্বে অনেক সম্মিলনে এ সম্বন্ধে বাদানুবাদ হইয়াছে। সম্মিলনের সম্পাদক মহাশয় এই সাফল্যের কারণ-নির্ণয়কল্পে অনুসন্ধান করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু অর্থাভাবে তিনি সে অনুসন্ধান করিতে পারেন নাই। সভাপতি মহাশয় এবার সাধারণভাবে তাহার কয়েকটি কারণ উল্লেখ করিয়াছেন। সে কারণগুলি এই:—

(১) কোন বিশেষ কারবার লাভজনক হইবে কি না, অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধানের অভাব। (২) কি প্রকারে কার্য্যপরিচালনা করিতে হয়, সে সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানের অভাব। (৩) এজেণ্টগণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে কার্য্য-পর্য্যবেক্ষণের অভাব। (৪) ঐ কারবার সম্বন্ধে বাণিজ্য-সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাব। (৫) যাহাতে লাভ হইতে পারে, এইরূপ হারে সুদ দিয়া আগ্রামী খরচ বাবত মূলধন গ্রহণের অসুবিধা। আগ্রামী খরচ বাবত মূলধন শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, কারখানা বাড়ী ও কল-কব্জাদি অংশ বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করিতে হয় যাহাতে কারবারের ক্ষতি না হয়, তাহার ব্যবস্থাকল্পে কারবারের প্রতিষ্ঠাতৃবর্গের প্রথম হইতেই ঐসকল বিষয়ে সাবধান হওয়া আবশ্যক। সভাপতি মহাশয় এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। ঐ সকল জটিল বিষয় সাধারণ পাঠকের বিশেষ রুচিকর হইবে না বলিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে উহাদের উল্লেখ করিলাম না। যাঁহারা এ সকল কথা জানিতে চাহেন, তাঁহারা সভাপতি মহাশয়ের ইংরাজী অভিভাষণ পাঠ করিয়া দেখিবেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় লৌহ-কারবার ভিন্ন যে সকল কারবারের সাফল্য হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করেন। আকোলায় কার্পাসবীজ হইতে তৈলনিষ্কাশন ব্যাপারে বিলক্ষণ লাভ হইতেছে, সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। ভারতের অন্যান্য স্থানে এই কারবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহার অনেক কারবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া উঠিয়া গিয়াছে। সভাপতি মহাশয় যৌথ-কারবারের দেউলিয়া হইবার যে সকল কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার এক বা ততোধিক কারণ ঘটিয়াছিল বলিয়া ঐ সকল কারবার নষ্ট হইয়াছে। বিলাতী মাটীর কারবার সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কাথিবাড়ের পোরবন্দরে একটি এবং মধ্যপ্রদেশের কাটনীতে একটি বিলাতী মাটীর কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি আর একটি নূতন কারবারও প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণে প্রকাশ,—বিশেষ অনুসন্ধানের পর ঐ সকল কারবারের প্রতিষ্ঠাতারা কারবার আরম্ভ করিয়াছেন। সুতরাং কারবার সফল হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই কারবারের কর্ত্তারা সুলভ মূল্যে 'সিমেণ্ট' যোগাইতে পারিবেন। ইহা ভিন্ন আমেদাবাদের আর্ট পেপার প্রস্তুতের কথাও সভাপতি মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন। স্থানাভাবে আমরা তাঁহার সকল কথার আলোচনা করিতে পারিলাম না।

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়। ইন্দোর, মধ্যভারত—বসুমতী।

দুর্ভিক্ষ-নিবারণ *

আসন্ন দুর্ভিক্ষ।

সেদিন এক ভীষণ জলপ্লাবন বাংলা দেশের অনেকগুলি জেলাকে বিধ্বস্ত করিয়া গেল। অসংখ্য গো-মহিষাদি পশু বিনষ্ট হইল। অসংখ্য লোক সর্ব্বস্বান্ত হইল। অসংখ্য লোক এখনও অন্নাভাবে প্রপীড়িত রহিয়াছে, এক মুঠা অন্নের জন্য হাহাকার করিতেছে। অতিবৃষ্টির পর কয়েক জেলায় অনাবৃষ্টি হইল। অতি-বিস্তার-বদনা, অসংখ্য নরকঙ্কাল শোভিতা সে দানবী সমগ্র বাংলা দেশকে গ্রাস করিবার জন্য মুখ ব্যাদন করিয়া রহিয়াছে। সকলেই এজন্য ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। দুর্ভিক্ষ এদেশে যে নূতন, তাহা নহে। দেশে অনেকবার দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, অনেক লোক অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। অনেক জেলায় দুর্ভিক্ষ কিয়ৎপরিমাণে এমন কি সম্বৎসর ধরিয়াই দেখা যায়। বাস্তবিক যদি দুর্ভিক্ষ অর্থে আমরা ভিক্ষা-সংগ্রহের দুঃসাধ্যতা বুঝি, তাহা হইলে অনেক জেলাই

---

* কলিগ্রামে মালদহ সাহিত্য-সাম্মিলনীর প্রথম অধিবেশনে পঠিত, শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় লিখিত। "প্রবাসী।"

আধুনিক কালে দুর্ভিক্ষপীড়িত। আমাদের দেশে এখন কালের নিয়মে দুর্ভিক্ষ অর্থে অন্নাভাবে মৃত্যু বুঝায়, কেবল অন্নদাতার অভাব বুঝায় না। কাজেই দুর্ভিক্ষের কথা শুনিলেই সকলেই শিহরিয়া উঠে।

দুর্ভিক্ষের কারণ।

দুর্ভিক্ষের কারণ কি অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। অনেকেই বলেন, দুর্ভিক্ষের কারণ দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতা, পূর্ব্বে একটাকায় এমন কি একমণ চাউল ক্রয় করিতে পারা যাইত, এক্ষণে এক টাকায় অনেক সময়ে চারি পাঁচ সের চাউল ক্রয় করিতে হয়। কাজেই অর্থাভাব বশতঃ দরিদ্রেরা চাউল ক্রয় করিতে পারে না বলিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পৃথিবীর সব দেশেই, কেবলমাত্র ভারতবর্ষে নহে, দ্রব্যসমূহের মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। অনেক দ্রব্যের মূল্য নয়-দশগুণ পর্য্যন্ত বাড়িয়াছে, কিন্তু তাহার জন্য ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন প্রদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা যায় নাই। ভারতবর্ষের দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতার সহিত দুর্ভিক্ষ জড়িত, কিন্তু পাশ্চাত্য জগতে তাহা নহে। বাস্তবিক আমাদের দেশের দুর্ভিক্ষের কারণ নির্ণয় করিতে গেলে কেবলমাত্র দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলে চলিবে না।

আমাদের দেশের দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতা শুধু নহে, দুর্ম্মূল্যতার সহিত দ্রব্যাভাব দেখা দিয়াছে। দ্রব্যাভাবই দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতার প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেশে অন্য দ্রব্যের সহিত চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে,—কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা চাউলের মূল্য বৃদ্ধির কারণ দেশে চাউলের অভাব।

(ক) কৃষিকার্য্যের অবনতি।

এই চাউলের অভাবের কারণ নির্ণয় করিতে পারিলে আমরা দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিব, এবং তাহা বুঝিয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণের উপায় সম্বন্ধেও জ্ঞানলাভ করিতে পারিব। দেশে নানা কারণে কৃষির অবনতি হইতেছে—(ক) কৃষকগণ দারিদ্র্য হেতু উপযুক্ত সার এবং কৃষি-যন্ত্রাদি ব্যবহার করিতে অক্ষম, (খ) উপযুক্ত শিক্ষা অভাবে তাহারা সার এবং যন্ত্রাদির ব্যবহার জানে না, (গ) গো-জাতির ক্রমশঃ অবনতি দেখা যাইতেছে, (ঘ) ম্যালেরিয়া প্রভৃতি কারণে কৃষকগণের স্বাস্থ্যহানি হইতেছে, (ঙ) রেল-লাইন স্থাপন প্রভৃতি কারণে জল সরবরাহ হইতেছে না, (চ) মধ্যবিত্ত শ্রেণী গ্রাম ত্যাগ করিয়া আসাতে কৃষকদিগের উৎসাহ নাই। এই সমস্ত কারণে দেশে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে।

(খ) বিশেষতঃ খাদ্য-শস্য চাষের অবনতি—পাট আবাদ।

দেশে যে কেবল উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ কমিতেছে তাহা নহে ; যে-সকল শস্য বিদেশে রপ্তানি হইয়া বিদেশীয় বাজারে অধিক মূল্যে বিক্রয় হয় সেই-সকল ফসলই অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। দেশবাসীগণের অন্নসংস্থানের সহায় না হইয়া আমাদের কৃষককুল বিদেশীয় কারখানায় উপকরণ-সামগ্রী যোগাইতেছে। বাংলা দেশে পর পর নীল, তুঁত এবং পাটের চাষ ধান্যচাষের মতনই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। প্রথমে নীল এবং তাহার পর তুঁত চাষ করিয়া কৃষকগণ মনে ভাবিয়াছিল তাহারা হাতে হাতে স্বর্গ পাইবে। তাহারা কিছু নগদ টাকা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল সত্য ; কিন্তু নীলকর এবং কুঠিয়ালদিগের অত্যাচার-কাহিনী

নীল এবং তুঁত আবাদের বিষময় ফল সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত সাক্ষ্য দিতেছে—বাংলা দেশের কৃষকসমাজ কখনও সে অত্যাচার-কাহিনী ভুলিতে পারিবে না। নীল এবং তুঁত চাষের পর পাটের চাষ খুব প্রচলিত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পাট প্রথম বিলাতে রপ্তানি হয়; ১৮২৯ খৃঃ অব্দে কলিকাতার কাষ্টম্ হাউস পাট রপ্তানির প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাত করেন। সে বৎসর ৪৯৬ মণ পাট রপ্তানি হইয়াছিল। তাহার পর হইতে পাটের চাষ ক্রমশঃ বাড়িতেছে।

পাট আবাদের পরিমাণ।

	১৯১২	১৯১৩
বঙ্গদেশে	২,৫৭৬,৫০৩	২,৭৫৫,১৬৬ + ১৭৮,৬৬৩
বিহার ও উড়িষ্যা	২৯৮,৩৪৪	৩১৮,৩১৮ + ২০,০১৪
আসাম	৯৫,৬৪৭	৯৬,০৯০ + ৪৪৩
মোট	২,৯৭০,৪৯৪	৩,১৬৯ ৬১৪ + ১৮৯,১২০

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, সর্ব্বত্রই অধিক জমিতে পাটের আবাদ হইয়াছে।

বিহারে পাটের আবাদ ক্রমশঃই বাড়িতেছে, কয়েক বৎসরের আবাদী জমির পরিমাণ দেখিলে তাহা বেশ বুঝা যায়,—

১৯০৯	...	...	২৪১,৪০০ একর
১৯১০	...	...	২৪৮,২০০ „
১৯১১	...	...	২৫৮,১০০ „
১৯১২	...	...	১৯৮,৩০০ „
১৯১৩	...	...	৩৩৮,৪০০ „

পাটের আবাদের একটা সুবিধা আছে। কুঠিয়ালগণ নিজেরাই মুখ্যভাবে পাটের চাষ পরিচালন করিতেছে না। পাটের চাষ পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, এখন তাহা বিস্তৃত হইতেছে; এবং এই বিস্তৃতির জন্য কুঠিয়ালগণ অপেক্ষা দালাল পাইকারগণই অধিক দায়ী হইয়াছে, কাজেই নীলকরদিগের অত্যাচার আবার দেখা দেয় নাই। কিন্তু নীল এবং তুঁত আবাদের মত পাট আবাদের একটা প্রধান দোষ আছে। পাট খাদ্য-শস্য নহে। কাজেই পাট অধিক পরিমাণে দেশে উৎপন্ন হইলে উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ অবশ্য হ্রাস পাইবে। কোন দেশের শ্রমজীবির শক্তি এবং মূলধনের পরিমাণ অসীম নহে, তাহা নির্দ্দিষ্ট। অতএব বিদেশে রপ্তানির জন্য যদি পাট উৎপন্ন হইতে থাকে তাহা হইলে অচিরেই চাউলের চাষ কমিয়া যাইবে। বিশেষতঃ যে জমিতে চাউল হয় সেই জমিতে পাটও হয়, পাটের বাজার-দর অধিক হওয়াতে কৃষকগণ অধিক খাজনা দিয়া জমিদারের নিকট হইতে চাউল আবাদ ছাড়িয়া পাট আবাদের জন্য জোত লইয়া থাকে। এরূপে দেশে খাদ্য-শস্য চাষের পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে। বাস্তবিক পাট, তিসি প্রভৃতি উপকরণ-শস্যের চাষ বাড়িয়া যাওয়া দেশের পক্ষে প্রভূত অনিষ্টকর। দেশে যে দুর্ম্মূল্যতা দেখা গিয়াছে তাহার একটা প্রধান কারণ খাদ্য-শস্য চাষের পরিমাণ শতকরা কমিতেছে।

১৮৯৬ হইতে ১৯০৬ সনের মধ্যে খাদ্যশস্য চাষের পরিমাণ কেবলমাত্র ৭.১৭ বৃদ্ধি হইয়াছে; কিন্তু তুলা ও পাট চাষের পরিমাণ ঐ দশ বৎসরেই শতকরা ৫০.০ বৃদ্ধি হইয়াছে। (ক্রমশঃ)।

বাগানের মাসিক কার্য্য

ফাল্গুন মাস।

সব্জী বাগান—তরমুজ, খরমুজ, শশা, ঝিঙ্গা প্রভৃতি যে সকল দেশী সব্জী চাষ মাঘ মাসে প্রায় আরম্ভ হইয়াছে, তাহা এই মাসে প্রায় শেষ করিতে হইবে। সব্জীক্ষেত্রে জল সেচনের সুব্যবস্থা করিতে হইবে। চাঁপানটে বীজ এই সময় বপন করিলে ও জল দিতে পারিলে অতি সত্বর নটে শাক পাওয়া যায়।

কৃষি-ক্ষেত্র—ছোলা, মটর, যব, সরিষা, ধনে প্রভৃতি সমুদয় এত দিনে ক্ষেত্র হইতে উঠাইয়া গোলাজাত করা হইয়াছে। এই সময় ক্ষেত্র সকল চষিয়া ভবিষ্যতে পাট, ধান প্রভৃতি শস্যের জন্য তৈয়ারি করিয়া লইতে হইবে। ইক্ষু এই সময় বসান হইয়া থাকে।

ফলের বাগান—ফলের বাগানে আম, লিচু, লকেট, পিচ প্রভৃতি ফলবৃক্ষে জল দিবার ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কার্য্য নাই।

ফুলের বাগান—এখন বেল, জুঁই, মল্লিকা প্রভৃতি ফুল গাছের গোড়া কোপাইয়া জল সেচন করিতে হইবে। কারণ এখন হইতে উক্ত ফুল গাছ গুলির তদ্বির না করিলে জল্দি ফুল ফুটিবে না। জলদি ফুল না ফুটিলে পয়সা হইবে না। ব্যবসার কথা ছাড়িয়া দিলেও বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুল না ফুটিলে ফুলের আদর বাড়ে না।

টব বা গামলার গাছ—এই সময় টবে রক্ষিত পাতাবাহার, পাম প্রভৃতি ও মূলজ ফুল ও বাহারি গাছ সকলের টব বদলাইয়া দিতে হয়।

পান চাষ—পান চাষ করিবার ইচ্ছা করিলে এই সময় পানের ডগা রোপণ করিতে হয়।

বাঁশের পাইট—বাঁশ ঝাড়ের তলায় পাতা সঞ্চিত হইয়াছে, সেই পাতায় এই সময় আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সেই ছাই বাঁশের গোড়ায় সারের কার্য্য করে, এবং নিম্ন-বঙ্গে যেখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অধিক, সেইখানে এই প্রকার বহুদুরব্যাপী অগ্নি জ্বালিলে গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতি হয়।

ঝাড়ের গোড়া হইতে পুরাতন গোড়া ও শিকড় উঠাইয়া না ফেলিলে ঝাড় খারাপ হয়। আগুন দ্বারা পোড়াইলে এই কার্য্যের সহায়তা হয়। পুকুরের পাঁক মাটিতে বাঁশের খুব বৃদ্ধি হয়।

কৃষক

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৪শ খণ্ড। | ফাল্গুন, ১৩২০ সাল। | ১১শ সংখ্যা।

তামাক

শ্রীনিবারণচন্দ্র চৌধুরী M.R.A.S., Dip.-in-Agriculture (Shibpore), লিখিত

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই তামাক ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে। বাঙ্গালীগণ প্রধানতঃ হুঁকা দ্বারা তামাকের ধূম্র সেবন করেন, হিন্দুস্থানীগণ চিবাইয়া ইহার রস পান করেন। বাঙ্গালী স্ত্রীলোকগণ ধূম্র পান করেন না সত্য কিন্তু অনেকে পানের সহিত ইহা গ্রহণ করেন, কেহ কেহ অর্দ্ধ দগ্ধ পত্র দন্তে মর্দ্দন করেন। বর্ত্তমানে চুরট বা সিগারেট রূপেও ইহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি। ইউরোপ ও আমেরিকায় তো কথাই নাই। তামাকের গুণাগুণ বিচার আমাদের আয়ত্তাধীন নহে তবে ইহার অনেক প্রতিবাদী থাকিলেও যখন ইহার এত গৌরব তখন আমরা চাষীলোক ইহার চাষবাস সম্বন্ধে দুই চারি কথা শিখিয়া চাষের প্রচার করা বোধ হয় আমাদের পক্ষে অন্যায় হবে না।

মৃত্তিকা

দোয়াঁস পলি মাটিতে তামাক অধিক পরিমাণে জন্মে। এঁটেল মাটিতে তামাকের পাট কষ্ট সাধ্য এবং ইহাতে চুরটের জন্য উত্তম তামাক কখনও জন্মে না। বালি মাটীতে সিগারেটের তামাক জন্মিয়া থাকে কিন্তু ইহার পরিমাণ অধিক হইবে না। বঙ্গদেশের মধ্যে কুচবিহার, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, নদীয়া, যশোর প্রভৃতি জেলায় যথেষ্ট পরিমাণে তামাক উৎপন্ন হয়। এই সকল স্থানের তামাক গড়গড়া বা হুঁকায় গ্রহণ যোগ্য কিন্তু ইহার দ্বারা চুরট বা সিগারেট প্রস্তুত হয় না। চুরটের তামাক হুঁকার উপযুক্ত উৎকৃষ্ট তামাকের মূল্য অপেক্ষা অন্ততঃ দশ গুণ। চুরটের নিমিত্ত আমেরিকার তামাক বহুমূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। চুরটের উপযুক্ত তামাক উৎপন্ন করিতে পারিলে বঙ্গদেশের ধনবৃদ্ধি হইতে পারে।

বঙ্গদেশের যে যে স্থলে তামাক উৎপন্ন হয় তথাকার মৃত্তিকা যে চুরট তামাকের পক্ষে অনুপযুক্ত তাহা নহে। তামাক প্রস্তুত করণের অজ্ঞতা ইহার প্রধান কারণ। চাষের প্রণালীও যৎসামান্য পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। বর্ত্তমানে বঙ্গদেশে সিগারেটের বহুল প্রচলন হইতেছে, তজ্জন্য সিগারেটের উপযুক্ত তামাকের যথেষ্ট প্রয়োজন হইবে। সিগারেট তামাক প্রস্তুত করা অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য।

চারা

চারা উৎপন্ন করিবার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। তবে আমাদের দেশে বীজ কিছু অধিক মাত্রায় বপন হইয়া থাকে। বীজ পাতলা করিয়া না বুনিলে অনেক চারা নষ্ট হয়। বিঘাতে এক তোলা বীজই যথেষ্ট।

মৃত্তিকা রচনা ও সার

মৃত্তিকা কর্ষণ দ্বারা ধূলিবৎ করা প্রয়োজন। এ দেশীয় কৃষকগণ তাহা বেশ জানে। তবে হুঁকার তামাক উৎপন্ন করিতে যে পরিমাণে গোবর সার দেওয়া হয় তাহাতে চুরটের তামাক হয় না। অধিক গোবর সার দিলে চুরটে ভালরূপ গন্ধ হয় না এবং পত্রের বর্ণ উজ্জ্বল হয় না। গোবর সম্পূর্ণ রূপে পচিয়া গেলে তাহা বিঘা প্রতি ২৫ মণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। চারা বসিয়া গেলে বিঘা প্রতি এক মণ সোঁরা সার প্রদান করিলে উত্তম তামাক জন্মিয়া থাকে। সোরা সার দ্বারা উৎপন্ন তামাকের চুরট উত্তমরূপে দগ্ধ হয়। খুব বালু মৃত্তিকায় যেখানে অন্য ফসল ভাল জন্মে না, তথায় উত্তম সিগারেট তামাক তৈয়ারী হয়।

চারা রোপণ ও তদ্বির

যখন চারা বীজতলায় ৪ বা ৫ ইঞ্চি দীর্ঘ হয় তখন উঠাইয়া কর্ষিত ক্ষেত্রে রোপণ করা হয়। রোপণের নিমিত্ত কার্ত্তিক মাস উপযুক্ত সময়। যে তামাকের পত্র বৃহৎ সেই তামাকের চারা ৩ ফিট্ অন্তর, হিংলি, হাভানা প্রভৃতি চুরটের উপযুক্ত তামাক ২ ফিট্ অন্তর লাগান উচিত। উত্তর বঙ্গে সাধারণতঃ জল সেচনের প্রয়োজন হয় না কিন্তু মধ্য বঙ্গে দুই বা তিন বার সেচনের আবশ্যক হয়। তামাকের জমি সর্ব্বদা ধূলিবৎ রাখা উচিত। মৃত্তিকা শক্ত হইয়া পড়িলে উত্তম তামাক জন্মে না। এই জন্য ফুল দেখা পর্য্যন্ত প্রত্যেক সপ্তাহে একবার করিয়া হাত লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণ করা কর্ত্তব্য।

হুঁকার নিমিত্ত তামাক উৎপাদনকালে গাছের ফুলের কুঁড়ি দেখা দিলে গাছের মাথা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় এবং তলার পুরাতন পাতা ফেলিয়া দিয়া মাত্র ৮ বা ১০ পত্রশাখা হইয়া থাকে। এইরূপ তামাকের পত্র অতিশয় মোটা এবং কড়া হইয়া থাকে। চুরটের আবরণের নিমিত্ত তামাকের জন্য গাছের মাথা ভাঙ্গা

উচিত নয়। ইহাতে প্রত্যেক গাছ হইতে ষোল হইতে কুড়ি পত্র পাওয়া যায়। এই পত্রের শিরা মোটা হয় না এবং পাতলা হয়। প্রস্তুত করিলে পাতা বাদামি রঙ্গে পরিণত হয় এইরূপ পত্র আবরণ হইবার উপযুক্ত। আবরণ পত্রের মূল্য চুরটের অন্তরস্থ পত্র অপেক্ষা অন্ততঃ চতুর্গুণ। সিগারেটের নিমিত্ত তামাকের পাতা কখনও ভাঙ্গিতে নাই।

কর্ত্তন

তামাকের পত্র পাকিলে তামাক কাটা হয়। সব পত্র এক সঙ্গে পাকে না সুতরাং উত্তর বঙ্গে যে যে পাতা পাকে তাহাই কাটা হয়; ইহাতে কিন্তু নানা অসুবিধা। এক গাছে চারি বা পাঁচটী করিয়া পাতা পাকে। এই সময় গাছ গোড়া ঘেঁসিয়া কাটা উচিত। পাতা বা গাছ কাটিবার সময় গাছে শিশির জল না থাকে তাহা দেখিয়া লইতে হইবে। পাতা জলে সিক্ত থাকিলে ইহাতে ধূলা লাগিয়া কর্দ্দমাক্ত হয় এবং তজ্জন্য ইহার মূল্য ও হ্রাস হইয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় কৃষকগণ কোন শস্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে মনোযোগী হয় না। সময় সময় তাহারা কিম্বা বেপারিরা ধূলা বালি বা পাথরের কোণা, মাটীর ডেলা মিশ্রিত করিয়া শস্য নিকৃষ্ট করিয়া তুলে। এমন কি প্রধান খাদ্য চাউল, দাইল, ঘি, তৈল প্রভৃতি সব জিনিষেই ভেজাল দিয়া থাকে। বৃষ্টি হইয়া গেলে দুই বা তিন দিন অপেক্ষা করিয়া তামাক কর্ত্তন করা উচিত

প্রস্তুত করণ

তামাক প্রস্তুত করা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। অনেক প্রকারেতা মাক শুষ্ক করা যায়। তামাক প্রধানতঃ রৌদ্রে এবং ঘরে শুষ্ক করা হইয়া থাকে। ঘরের শুষ্ক তামাকই ভাল হইয়া থাকে। সিগারেট তামাক রৌদ্রে তিন বা চার দিনের মধ্যে শুষ্ক করা উচিত। শীঘ্র শীঘ্র শুষ্ক হইলে পত্র সুবর্ণের ন্যায় বর্ণ ধারণ করে। আমেরিকায় এই তামাক ঘরে অগ্নি জ্বালিয়া দুই বা তিন দিনে শুষ্ক করা হইয়া থাকে। কিন্তু এই প্রণালী সহজ সাধ্য নয়। সিগারেটের জন্য সাধারণতঃ তামাক রৌদ্রে ঝুলাইয়া শুষ্ক করিলেই চলিবে। দড়িতে ছয় ইঞ্চি ফাঁক ফাঁক করিয়া রাখিয়া ঝুলাইয়া বান্ধিবে। এই তামাক সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হইতে প্রায় দুই মাস লাগে। বৃষ্টি না হইলে তামাক নাবাইবে না। বৃষ্টি আরম্ভ হইলে তামাক নাবাইয়া ছোট বড় ছেঁড়া পাতা ভিন্ন ভিন্ন করিয়া বাছিয়া লইবে এবং কুড়িটী পাতা একটার উপরে আর একটা সাজাইয়া এক একটী মুঠা বান্ধিবে। এই মুঠা দ্বারা চারি ফিট্ উর্দ্ধ প্রস্থ করিয়া গাদা প্রস্তুত করিবে। এক গাদায় বারো মণের কম তামাক রাখিলে উত্তমরূপ তামাক প্রস্তুত হয় না এবং ইহাতে সুঘ্রাণ উৎপন্ন হয় না। গাদার মধ্যের

তামাক অধিক উত্তপ্ত না হয়, তজ্জন্য সময় সময় পরীক্ষা করিতে হয়। বিচক্ষণ কৃষক হস্ত দ্বারা পরীক্ষা করিতে পারে। তাপমান যন্ত্র বাঁশের চোঙ্গের মধ্যে রাখিয়া গাদার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া পরীক্ষা করা যায়। চুরটের আবরণ পত্রের উত্তাপ ১২০ ডিগ্রির অধিক এবং অভ্যন্তরস্থ পত্রের উত্তাপ ১৬০ ডিগ্রির অধিক হওয়া উচিত নয়। সাধারণ হুঁকার তামাক ১৬০ বা ১৭০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উত্তপ্ত করা যায়। ১৬০ ডিগ্রি উত্তাপে তামাকের উত্তম গন্ধ হয় ও ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হয়। এই বর্ণ আবরণের জন্য অনুপযুক্ত। ১২০ ডিগ্রি আবরণের পত্র কৃষ্ণাভাযুক্ত বাদামী বর্ণ প্রাপ্ত হয়। কেবল উত্তম বর্ণের জন্যই প্রধানতঃ আবরণ পত্রের এত আদর হইয়া থাকে। পত্র কিঞ্চিত আর্দ্র (শত করা ২০ ভাগ) না থাকিলে তামাকের সুঘ্রাণ হয় না। উত্তাপ যথেষ্ট হইলে গাদা ভাঙ্গিয়া নূতন গাঁদা প্রস্তুত করিতে হয়। তখন চতুষ্পার্শ্বের তামাক অভ্যন্তরে এবং অভ্যন্তরের পাতা চতুষ্পার্শ্বে স্থাপন করিতে হইবে। দ্বিতীয় বারে প্রায় চারি দিনে উত্তপ্ত হইয়া থাকে। পরে আরও গৌণে উত্তপ্ত হয়। এইরূপ পাঁচ বা ছয় বার করিয়া সাধারণতঃ গাদা ভাঙ্গিতে ও গড়িতে হয়। যখন উত্তাপ উঠে না, তখন তামাক প্রস্তুত হইল বুঝিতে হইবে।

শিক্ষিত ব্যক্তিগণ প্রজার নিকট হইতে তামাক ক্রয় করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রণালী মতে উত্তম তামাক প্রস্তুত করিয়া লাভবান হইতে পারেন।

বর্দ্ধমানে ধানের চাষ

শ্রীরাজনারায়ণ বিশ্বাস লিখিত

ধান চাষে যেরূপ জলের প্রয়োজন হয়, অন্য কোন ফসলের চাষে সেরূপ জলের দরকার হয় না। ধান্য চারা রোপণের সময় হইতে ধানের শীষ নির্গত হইবার পর পর্য্যন্ত ধানের জমিতে জল দাঁড়াইয়া থাকা আবশ্যক। ধান্য চারা রোপণের মুখ্য সময় আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি হইতে শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত। হৈমন্তিক ধানের শীষ কার্ত্তিক মাসের ২০ তারিখের মধ্যেই বাহির হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে আষাঢ় হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত হৈমন্তিক ধানের জমিতে জল থাকা আবশ্যক। ইহার মধ্যে যদি কোন সময় হৈমন্তিক ধানের জমির জল শুষ্ক হইয়া মাটি ফাটিয়া যায়, তবে সে বৎসর আর সে জমিতে আশানুরূপ ধান পাওয়া যায় না। প্রতি বৎসর—আষাঢ় হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত প্রায় পাঁচ মাস জমিতে জল থাকিতে দেখা যায় না। এরূপ সুবর্ষা কচিত দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রতি দশ

বৎসরে ২।৩ বৎসর এরূপ সুবর্ষণ হইতে দেখা যায়। কোন কোন বৎসর হয়ত এক প্রদেশের কিয়দংশ স্থানে বেশ সুবর্ষণ হইয়া প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হইল; অন্য স্থানে হইল না। এমন কি কোন কোন বৎসর এক গ্রামের কিয়দংশ স্থানে বেশ ফসল জন্মিল, অন্য স্থানে সুবর্ষণাভাবে ভাল ধান প্রচুর পরিমাণে জন্মিবার আশা সুদূর পরাহত হইল।

অন্যান্য ফসলের ন্যায় ধান্যও দোয়াঁস জমিতে উত্তম রূপ জন্মিয়া থাকে। এঁটেলের আধিক্য জমিতেও ধান মন্দ জন্মে না বরং দোয়াঁস জমি অপেক্ষা এঁটেল মাটির ধানের ফসল অধিক হইতে দেখা যায়। এঁটেল মাটির জমির জল শুষ্ক হইলে, মাটি যেরূপ ফাটিয়া যায়, দোয়াঁস বা বেলে জমির মাটি সেরূপ ফাটে না। দোয়াঁস জমির জল শুষ্ক হইয়া যাইলে যে পরিমাণ ক্ষতি হয়, এঁটেল মাটির জমির জল শুষ্ক হইলে তাহা অপেক্ষা ক্ষতি অনেক বেশি হইয়া থাকে। বিশেষতঃ এঁটেল মাটির জমিতে ধান্য চারা রোপণের পূর্ব্বে জল দাঁড়াইবার ৮।১০ দিন পরে যদি জল শুষ্ক হইয়া ফাটিয়া যায়, তাহা হইলে সেই জমিতে পুনরায় জল দাঁড়াইবার পর চাষ দিলে সে মাটি আর গলে না; মাটি চাপ চাপ থাকে এবং তাহার পর মই দিলে বসিয়া যায়। এরূপ অবস্থায় সে জমিতে সুচারু রূপে ফসল জন্মিবার আশা থাকে না। বালুকাধিক্য জমিতে মহাজলে জল দাঁড়ায় না; বরং দোয়াঁস জমিতে জল দাঁড়াইতে পারে। জল দাঁড়াইবার পর জল শুষ্ক হইয়া গেলে এঁটেল মাটির ন্যায় ফাটে না। যদি পুনরায় জল দাঁড়ায় তাহাতে চাষ দিলে, কিছু দিন মধ্যে সেই মাটি পচিয়া গলিয়া যাইতে দেখা যায়।

প্রায়ই প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ ও আষাঢ় মাসের প্রথমে প্রচুর বৃষ্টি হইতে দেখা যায়। ঐ বৃষ্টির জল জমিতে দাঁড়াইলে, যদি তৎপরে বৃষ্টির অভাবে জমির জল শুষ্ক হইয়া গিয়া মাটি ফাটিয়া যায়; তবে আর সে বৎসর প্রচুর পরিমাণ ধান্য জন্মিবার আশা থাকে না। আর সেই জল যদি কার্ত্তিক মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত বজায় থাকে, তবে সে বৎসর প্রচুর পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। জমিতে জল দাঁড়াইবার পর জল শুষ্ক হইয়া গেলে যদি দীর্ঘকাল রৌদ্র পাইবার পর জমিতে পুনরায় জল দাঁড়ায়, তবেই জমির মৃত্তিকার পূর্ব্বোক্ত দোষ নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহাতে চাষ দিলে মাটি পচিয়া অল্প দিনের মধ্যেই গলিয়া যায়। কোন কোন বৎসর মাঘ ফাল্গুন মাসে প্রচুর বর্ষণ হইয়া জমিতে জল দাঁড়াইয়া যায়। তাহার পর সুদীর্ঘকাল রৌদ্র পাওয়ায় জমির মৃত্তিকার সে দোষ আর থাকে না।

আমাদের এ প্রদেশের মৃত্তিকায় এঁটেলের অংশ অধিক, বালির অংশ কম। বিশেষতঃ গ্রামের নিকটবর্ত্তী আউশ ও কেলেস জমির মৃত্তিকা অপেক্ষা গ্রামের

নিকটবর্ত্তী হৈমন্তিক ধানের জমির মাটিতে এঁটেলের অংশ অত্যধিক। এঁটেল মাটিতে অন্যান্য ফসল ভাল না জন্মিলেও ধান্য মন্দ জন্মে না। এঁটেল জমির জল ধারণা শক্তি প্রবল কিন্তু জল শোষণ শক্তি কম। বেলে মাটির জমির ঠিক ইহার বিপরীত। ধানের জমির জল ধারণা শক্তি প্রবল থাকা নিতান্ত আবশ্যক বটে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে ইহাতে জল বসা দোষও দৃষ্ট হইয়া থাকে। জমিতে পরিমিত পরিমাণে সার প্রয়োগ করিলে জল বসা দোষ নষ্ট হইয়া যায়। সার প্রয়োগে বেলে জমির জল শোষণ শক্তিও কমিয়া যায়। বেলে জমির জল যত শীঘ্র মরিয়া যায়, এঁটেল মাটির জল তত শীঘ্র মরিয়া যায় না; এজন্য ধান চাষের পক্ষে এঁটেলের আধিক্য জমি বিশেষ উপযোগী। শুদ্ধ এঁটেল বা বালুকায় প্রায় কোন ফসলই ভাল জন্মে না। দোয়াঁস জমির জল ধারণা শক্তি এঁটেল মাটি অপেক্ষা জল শোষণ শক্তিও বেলে মাটি হইতে কম। বিশেষতঃ দোয়াঁস মৃত্তিকার কৈশিকার্ষণ শক্তি অতিশয় প্রবল। এই সকল কারণে দোয়াঁস মৃত্তিকায় সকল প্রকার উদ্ভিদই উত্তম রূপ জন্মিয়া থাকে।

যে জমিতে এঁটেলের অংশ অধিক, সে জমিতে ৫।৭ দিন জল দাঁড়াইয়া থাকিবার পর, জমির জল শুষ্ক হইয়া গেলে, বাত (যো) পাইলেও চাষ দিবার সুবিধা হয় না। জমির উপরিভাগের মৃত্তিকা খুব কঠিন হইয়া যায়, খুব বলিষ্ঠ গরুতেও লাঙ্গল ভাল টানিতে পারে না। যদিও খুব বলিষ্ঠ গরুতে অতি কষ্টে লাঙ্গল টানে, তাহাতে এত বড় বড় মাটির চাপ উঠে যে, সে মাটি আর সহজে চূর্ণ হয় না এবং জল দাঁড়াইলে তাহা আর ভাল গলে না। ঐ চাপ দীর্ঘ কাল রৌদ্র পাইয়া শুষ্ক হইলে পর যদি বৃষ্টি হয়, তবে তাহার পর যো পাইলে চাষ ও মই দিলে ঐ চাপ মাটি চূর্ণ হইতে দেখা যায়।

বিগত বর্ষে আমাদের এ প্রদেশে গত ফাল্গুন মাসের প্রথম হইতে কয়েক দিন ধরিয়া অতিশয় বৃষ্টি হওয়ায়, প্রায় সকল জমিতেই জল দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। ঐ জল শুষ্ক হইবার পর যো পাইলে আশানুরূপ ভূমি কর্ষণ হয় নাই। কেবল অতি কষ্টে বীজ তলা গুলিতে চাষ দিয়াছিল মাত্র। তৎপরে চৈত্র, বৈশাখ মাসে মোটেই বৃষ্টি হয় নাই। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হওয়ায় কিছু কিছু জমিতে চাষ দেওয়া হইয়াছিল। কেহ কেহ সামান্য সামান্য ধান বীজও বপন করিয়াছিল। তৎপরে ১৮ই জ্যৈষ্ঠ হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া প্রতিদিন বৃষ্টি প্রায় পাঁচ সপ্তাহ অতীত হইল আকাশ মণ্ডল অনবরত মেঘাবৃত থাকিয়া মধ্যে মধ্যে বিলক্ষণ বৃষ্টি হইয়াছিল। এই পাঁচ সপ্তাহ কাল একবারও সূর্য্যোদয় হয় নাই, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মাঠের সমস্ত জমিতেই জল পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এরূপ অবস্থায় কি ক্ষতি হইয়াছে সকলেই দেখিয়াছে।

এখানকার কৃষকেরা জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত মাবি জেটো করিয়া শুষ্ক মৃত্তিকায় ধান্য বীজ বপন করিয়া থাকে। ধান্য বীজ বপন করিবার পর অন্যূন একমাসে ধান্য চারা রোপণোপযোগী হইয়া থাকে। ভূমির উর্ব্বরতার ন্যূনাধিক্যতা অনুসারে ধান্য চারা রোপণোপযোগী হইবার সময়ের ও ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে অর্থাৎ ভূমি খুব তেজস্কর হইলে এক মাসের মধ্যেই ধান্য চারা রোপণোপযোগী হয়। নিস্তেজ জমিতে ধান্য চারা রোপণোপযোগী হইতে এক মাস অপেক্ষা অধিক সময় লাগে। এখানকার কৃষকেরা অন্যান্য জমি অপেক্ষা যে জমিতে ধান্য বপন করিয়া রোপণোপযোগী চারা তৈয়ার করে, তাহাতে অধিক পরিমাণে প্রতি বৎসরই সার দিয়া থাকে। এজন্য বীজ তলা অন্যান্য জমি অপেক্ষা অধিক তেজস্কর। ধান্য চারা অধিক দিনের হইলে চারার ডাঁটা শক্ত হইয়া যায় এবং তাহার বহু সংখ্যক শিকড় চতুর্দ্দিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ভূমির মৃত্তিকা জলমগ্ন থাকা সত্ত্বেও বীজ তলার বীজ (ধান্য চারা) রোপণোপযোগী হইবার পর শীঘ্র না উপড়াইলে কঠিন হইয়া যায়, এজন্য ঐ সকল ধান্য চারা উপড়াইতে বিশেষ কষ্ট হইয়া থাকে এবং উপড়াইবার সময় অনেক চারার ডাঁটা ছিঁড়িয়া যায়। পাক্‌লো চারা রোপণ করিলে ধান ও ভাল হয় না। তাহার কারণ পাক্‌লো চারা লাগিতে ও ঐ চারা ঘোর হরিদ্বর্ণ হইতে অনেক বিলম্ব হয়। ধান্য চারা রোপণ করিলে তাহার পুরাতন শিকড়গুলি পচিয়া পুনরায় নূতন শিকড় বাহির হইয়া থাকে। ধান্য চারা উপড়াইয়া আটি বান্ধিয়া থাকে। যদি একদিনে সমস্ত চারা রোপিত না হয়, তবে ঐ উপড়ান আটি বান্ধা চারা ২১ দিন বিলম্বেও রোপিত হইয়া থাকে। ঐ উপড়ান চারা ২।১ দিন পড়িয়া থাকিলে, দেখা যায় যে পুরাতন মূলগুলি পচনোন্মুখ হইয়াছে এবং শিকড়ের মূল হইতে নূতন শিকড় বাহির হইতেছে। রোপণের সময় বা রোপণের পর ধান্য চারার পাতা হরিদ্রাবর্ণ হইয়া যায়। অন্যূন দশ দিনের পর হইতে অল্প অল্প করিয়া কৃষ্ণবর্ণ হইতে আরম্ভ করে। রোপিত ধান্য চারা কৃষ্ণবর্ণ না হইলে, তাহার মূল হইতে নূতন চারা উদ্ভূত হয় না। ভূমির উর্ব্বরতার ইতর বিশেষ অনুসারে ধান্য চারা কৃষ্ণবর্ণ হইতে অল্প বা অধিক সময় লাগে অর্থাৎ ভূমি উর্ব্বরা হইলে রোপিত চারা শীঘ্র ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। অনুর্ব্বরা ভূমিতে ধান্য চারা রোপিত হইলে তাহা কৃষ্ণবর্ণ হইতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে। উর্ব্বরা ভূমিতে রোপিত চারার বর্ণ যেরূপ ঘোর হয়, অনুর্ব্বরা জমিতে রোপিত চারার বর্ণ সেরূপ ঘোর হয় না। রোপিত চারার বর্ণ ও পত্র দেখিয়া ভাবী ফসলের অনুমান করিয়া লইতে পারা যায়। উর্ব্বরা ভূমিতে রোপিত ধান্যের চারার বর্ণ যেরূপ ঘোর হয়, নির্গত নূতন পত্রও সেইরূপ বড় ও বিস্তৃত হইয়া থাকে। উর্ব্বরা ভূমিতে রোপিত চারার মূল দেশ হইতে

অল্প সময় মধ্যেই বহু সংখ্যক চারা বহির্গত হইয়া থাকে। কিন্তু অনুর্ব্বরতা অনুসারে রোপিত চারা তেজস্কর হইবার সম্ভাবনা নাই। জমিতে জল না থাকিলে ধান্য চারার বর্ণ ঘোর ও পাতা বড় হয় না। অতএব ধান গাছের পক্ষে জলই নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু। বরং বিনা সারে ধান জন্মিতে পারে, কিন্তু জল ব্যতীত কিছুতেই ধান জন্মিতে পারে না।

জ্যৈষ্ঠ মাসই ধান বীজ বপনের মুখ্য সময় এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত নাবি জেটো করিয়া এখানকার কৃষকেরা ধান্য বীজ বপন করিয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৫ই হইতে ২৬এ ২৭এ পর্য্যন্ত এখানকার কৃষকেরা বেশি ধান্য বীজ বপন করে। জ্যৈষ্ঠ মাসে শুষ্ক মৃত্তিকায় ধান্য বীজ উপ্ত হইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাসের উপ্ত বীজ সামান্য এক পশলা জল পাইয়া অঙ্কুরিত হইয়া চারা বাহির হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে শুষ্ক মৃত্তিকার মধ্যে মধ্যে বৃষ্টির জল পাইয়া চারাগুলি বড় ও মোটা হইয়া থাকে। তাহার পর জমিতে জল দাঁড়াইলে সেই চারা অল্প দিন মধ্যেই রোপণোপযোগী হইয়া থাকে। ধান্য বীজ বপনের পরই যদি অধিক বৃষ্টি হইয়া জমিতে জল দাঁড়াইয়া যায়, তাহা হইলে সেই বীজের অধিকাংশ পচিয়া যায়, যদিও জলে ডুবিয়া কতক চারা বাহির হয় বটে, তাহা এত নিস্তেজ ও সরু যে তাহা শীঘ্র বা সহজে রোপণোপযোগী হয় না। ধান্য বীজ বপনের পর জমিতে জল দাঁড়াইলে ও সেই জল বাহির করিয়া দিলে, অনেক উপ্ত বীজ অঙ্কুরিত হইয়া চারা বাহির হয় বটে, তাহা এত নিস্তেজ ও সরু হয় যে, তাহাও শীঘ্র রোপণোপযোগী হয় না। বীজ তলার জমির জল কাটাইয়া দিবার পর, জমির মাটি শুষ্ক হইয়া গেলে, সে মাটিতে পুনরায় জল দাঁড়াইলে বহু বিলম্বে যদি চারাগুলি রোপণোপযোগী হয়. সে চারাগুলি উপড়ান অতিশয় কষ্ট সাধ্য হয়। ফলতঃ শুষ্ক মৃত্তিকায় ধান্য বীজ বপনের পর চারা বাহির হইলে, কিছু দিন পরে জমিতে জল দাঁড়াইলে সেই চারা বেশ তেজস্কর .ও শীঘ্র রোপণোপযোগী হয়। বীজবপনের পর চারা বাহির হইবার পূর্ব্বে জমিতে জল দাঁড়াইলে সে চারা শীঘ্র তেজস্কর ও রোপণোপযোগী হয় না। এজন্য এখানকার কৃষকেরা ঐরূপ নিস্তেজ চারাকে শীঘ্র রোপণোপযোগী করিবার জন্য রেড়ির খইল ও গোমূত্রাদি বিশেষ তেজস্কর সার বীজতলায় দিয়া থাকে। বোনা ধানের চাষ করিতে হইলে, জমিকে উত্তম রূপে কর্ষণ করিয়া বৈশাখ মাসের শেষে অথবা জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৫ই এর মধ্যে ধান্য বীজ বপন করিয়া থাকে। এখন বোনা ধানের চাষ প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। এ প্রদেশে এখন খুব অল্প জমিতেই ধান বোনা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে রোপণোপযোগী ধান্য চারার অভাব হইলে বোনা ধানের চারা উপড়াইয়া অন্য জমিতে রোপণ করা হইত। পূর্ব্বে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে অথবা আষাঢ় মাসের

প্রথমে বর্ষা আরম্ভ হইয়া জমিতে জল দাঁড়াইলে, যদি বীজ তলায় ধান চারা তখন রোপণোপযোগী না হইত, তবে বোনা জমির চারা উপড়াইয়া অন্য জমিতে রোপণ করা হইত। এখন বোনা ধানের চাষ প্রায়ই উঠিয়া যাওয়ায় সে সুবিধা ঘটিয়া উঠে না। বোনা ধানের আর এক সুবিধা এই যে, যদি ভাদ্র মাসে বর্ষা আরম্ভ হইয়া জমিতে জল দাঁড়ায়, তাহাতেও বোনা ধান বেশ হইয়া থাকে কিন্তু রোয়া ধান তাদৃশ হয় না।

এ বৎসর বৈশাখ মাসে মোটেই বৃষ্টি হয় নাই, এজন্য অনেকেই বৈশাখ মাসে বীজ ফেলিবার জমির পাইট করিতে পারে নাই। তজ্জন্য জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমে বীজ ধান বপন করিতে পারে নাই। তাহার পর যাহারা ১০ই, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ বীজ ধান করিয়াছিল, অল্প বৃষ্টির জলে তাহাদের চারা বাহির হয় নাই। ১৮ই জ্যৈষ্ঠ হইতে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়া সমস্ত জ্যৈষ্ঠ মাসই অনবরত মুষল ধারায় বৃষ্টি হইয়া মাঠ প্লাবিত হইয়া যায়। বীজ তলার আইল কাটিয়া দিয়াও জমির জল নিঃশেষ করিতে পারে নাই। অধিকাংশ বীজ ধানই পচিয়া গিয়াছিল। যদি ও সামান্য সামান্য চারা কাহার কাহার বাহির হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা এত নিস্তেজ ও সরু যে আষাঢ়ের ২৬ তারিখ পর্য্যন্ত রোপণোপযোগী হইয়া উঠে নাই। তাহা যে শীঘ্র রোপণোপযোগী হইবে, সে আশাও ছিল না। অনেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমেই শুষ্ক মৃত্তিকায় কিছু কিছু বীজ ধান বপন করিয়াছিল, শুষ্ক মৃত্তিকাতেই সেই সকল উপ্ত বীজ অঙ্কুরিত হইয়া চারা বাহির হয়। ঐ সকল চারাই কতক পরিমাণে রোপণোপযোগী হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু তাহাও এত সামান্য যে ২।৪ বিঘা ভূমি রোপণ করিতেই ফুরাইয়া গেল। যাহাদের ঐরূপ চারা ছিল তাহারাই কতক কতক রোপণ করিয়াছিল। অনেকেরই সেরূপ চারা না থাকায় চুপ করিয়া বসিয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে হইয়াছে। অনেকেরই চারার অভাবে রোপণ কার্য্য হয় নাই। যে সময় হইতে জমিতে জল দাঁড়াইল, চারা পাইলে, আবাদের কার্য্য অনেক দূর অগ্রসর হইত। চারার অভাবে রোপণ কার্য্য সম্পন্ন হইল না।

শুষ্ক মৃত্তিকায় ধান্য চারা আশানুরূপ না হওয়ায় সকল কৃষককেই নিয়াজ বীজ ফেলিতে হইয়াছে। নিয়াজ বীজের চারাও আশানুরূপ জন্মে নাই। নিয়াজ বীজ কিরূপে উৎপন্ন করিতে হয়, যদিও আমরা পূর্ব্বে "বৰ্দ্ধমান অঞ্চলের ধান চাষ" প্রস্তাবে কৃষকে প্রকাশ করিয়াছি, তথাচ এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ করিতেছি। নিয়াজ বীজের চারা শুষ্ক মৃত্তিকায় উৎপন্ন চারা অপেক্ষা কম সময়ে রোপণোপযোগী হইয়া থাকে। নিয়াজ বীজের চারা এক মাসের মধ্যেই রোপণোপযোগী হয়। যে জমিতে নিয়াজ বীজ ফেলিতে হইবে, সে জমিতে জল সেচনের ও জল নির্গমনের

বিশেষ সুবিধা থাকা আবশ্যক। বেশ উর্ব্বরা জমিতে নিয়াজ বীজ ফেলিতে হয়। জমি নিস্তেজ হইলে তাহাতে গোময় সার ও খইল প্রভৃতি দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। যে জমিতে জল আছে ধূলায় চাষ দেওয়া থাকিলেও খুব ঘন ঘন করিয়া এরূপ ভাবে ৩টী চাষ দিতে হইবে, যে জমির কোন স্থান যেন খাত হইতে বাদ না থাকে। তৎপরে নিড়াইয়া জমিকে তৃণাদি শূন্য করিতে হইবে। ২৩ দিন পরে জমির মাটি একটু পচিলে পুনরায় একটা চাষ দিয়া মই দিতে হইবে। এরূপ ভাবে মই দিতে হইবে যেন জমির মৃত্তিকা উঁচু নীচু না থাকে। জমির মধ্যে মধ্যে এরূপ জুলি কাটিয়া রাখিতে হইবে, যেন বৃষ্টির জল হইবামাত্র (যত দিন চারা ৩।৪ আঙ্গুল বড় না হয়) সেই জুলি দিয়া জল বাহির হইয়া যায়। জমির কোন স্থানেই যেন গরু বা মানুষের পদ চিহ্ন না থাকে। ঐরূপ পদ চিহ্ন থাকিলে তাহাতে জল দাঁড়াইবে, তাহাতে যে বীজ পড়িবে, তাহা অঙ্কুরিত না হইয়া পচিয়া যাইবে, তজ্জন্য এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। নিয়াজ বীজের জমি বেশ সমতল হওয়া আবশ্যক ; জল বাহির করিয়া দিলে, যেন জমির সকল স্থানের জলই অবাধে বাহির হইয়া যায়। যে স্থানেই জল দাঁড়াইবে, সেই স্থানেরই বীজ পচিয়া যাইবে। প্রতিকাঠায় দেড় সের হইতে দুই সের হিসাবে এক দিন জলে ভিজাইয়া রাখিয়া ধান্য বীজ জমিতে সমভাবে ছড়াইতে হইবে। যেন কোন স্থানে কম, কোন স্থানে বেশি বীজ না পড়ে। বীজ বপনের এক দিন পরে জমির সমস্ত জল বাহির করিয়া দিতে হইবে। যেন কোন স্থানে জল দাঁড়াইয়া না থাকে। অথচ প্রতিদিন এরূপ ভাবে একটু একটু করিয়া জল দিতে হইবে যেন জমিতে জল না দাঁড়ায় এবং জমির মৃত্তিকা শুষ্ক হইয়া ফাটিয়া না যায়। এইরূপ করিলে ৩ ৪ দিন মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া চারা বহির্গত হয়। চারা বড় হইলে জমিতে জল দাঁড়াইবার মত জল দিতে হইবে। এরূপ ভাবে জল দিতে হইবে, যেন চারাগুলি জলে ডুবিয়া না যায়। যেমন চারাগুলি একটু একটু বড় হইতে থাকিবে তেমনি একটু একটু করিয়া বেশি জল দিতে হইবে। জল যেন কখনই ৩ ৪ আঙ্গুলের অধিক না হয়। এইরূপ অল্পদিনের মধ্যেই নিয়াজ বীজের চারা রোপণোপযোগী হইয়া উঠে।

এ বৎসর এখানে যে সকল নিয়াজ ফেলা হইয়াছিল, তাহাতে আশানুরূপ চারা বাহির হয় নাই। তাহার কারণ গত ১৮ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ২২এ আষাঢ় পর্য্যন্ত এ প্রদেশে প্রায় প্রতি দিনই প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টি হইয়াছে। তজ্জন্য মাঠ প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। কৃষকেরা অনেক চেষ্টা করিয়া নিয়াজ বীজের জমি সম্পূর্ণরূপে জল শূন্য করিতে পারে নাই। তজ্জন্য অনেক উপ্ত বীজ পচিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সামান্য সামান্য চারা বাহির হইয়াছিল মাত্র।

ধূলার বীজের চারা অপেক্ষা নিয়াজ বীজের চারার রোপিত ধান গাছ বিশেষ তেজস্কর হয় এবং অল্প দিন মধ্যেই রোপিত ধান চারার মূল দেশ হইতে বহু সংখ্যক চারা বাহির হইয়া থাকে। ধূলার বীজের চারায় সেরূপ হয় না। কিন্তু অতি বর্ষণে এবং অনাবৃষ্টিতে ধূলার বীজের চারা অপেক্ষা অধিক ক্ষতি হইয়া থাকে। যদি কখন কখন এ প্রদেশের কৃষকেরা চারার জন্য অগ্রে ধান রোপণ করিতে পারে না বটে, কিন্তু যদি ভূমির এই জল কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকে, তাহা হইলে শ্রাবণ মাসের শেষ নাগাইদ রোপণ করিলেও প্রচুর ফসল পাইবার আশা আছে।

এ প্রদেশের কৃষকদিগের ধান চাষই প্রধান অবলম্বন। অন্য কোন চাষই এখানে হয় না বলিলেই হয়। কোনরূপে যদি এক বৎসর অজন্মা হয়, তাহা হইলে এ প্রদেশে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইয়া থাকে। এখানকার সাধারণ কৃষক দিগের অবস্থা নিতান্ত হীন। তাহাদের সঞ্চয় কিছুমাত্র থাকে না। চাষ করিয়া যাহা পায়, তাহা রাজা মহাজনকে দিতেই ফুরাইয়া যায়। পূর্ব্বের ন্যায় এখনকার কৃষকেরা কষ্ট সহিষ্ণু ও পরিশ্রমী নহে। যদিও কোন কোন কৃষকের রাজা মহাজনকে দিয়া কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহা তাহাদের বিলাসিতায় ফুরাইয়া যায়। পূর্ব্বে যে কার্য্য একজনে সম্পন্ন করিত, এখন সে কার্য্য দুই জনের কমে সম্পন্ন হয় না।

মাটকড়াই

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার এম, ডি, এস, ভি, (লণ্ডন) লিখিত

চীনাবাদাম—ফল, মূল নহে। এই গাছের শুঁটি বা ফল মাটীর নীচে উৎপন্ন হয়। উহার ফুল একটী লম্বা বোঁটার মত পুষ্পকোষ (calyx) নলের প্রান্তে থাকে এবং বীজাধার তলায় থাকে ফুলটী ঝরিয়া যাইবার পর ফুলের বোটা লম্বা হইয়া নীচের দিকে বাঁকিয়া পড়ে এবং কয়েক ইঞ্চি মাটীর নীচে ঢুকিয়া যায়। উহার প্রান্তভাগের বীজাধারটী সেই খানে বাড়িতে আরম্ভ করে, এবং ঈষৎ হরিদ্রা রঙের, কোঁচকান, ঈষৎ বাঁকা শুঁটিতে পরিণত হয়; অনেক সময়ে উহার মধ্যদেশটী সরু হয়। এই কোয়ার মধ্যে ১ হইতে ৩টী পর্য্যন্ত বীজ থাকে। যদি ফুলটী ঝরিয়া যাইবার পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফুলের বোঁটাটী (spike) ঘটনাক্রমে আপন স্থচাল অগ্রভাগ মাটীর ভিতর ঢুকাইয়া দিতে না পারে, তাহা হইলে উহা শুকাইয়া মরিয়া যায়; সুতরাং ফলটিকে বাড়িতে দিবার নিমিত্ত মাটী শক্ত ও জমাট না হওয়া ও ঝুরা থাকা অত্যাবশ্যক।—কৃষক, মাঘ।



মাটবাদাম বা চীনা বাদাম।

মাটকড়াই (Archis hypogœa) ইহার অপর নাম মাটবাদাম, চীনাবাদাম বা বিলাতী মুগ। মাটকড়াই বা চীনাবাদাম সম্বন্ধে আমি যৎকিঞ্চিৎ ইতিপুর্ব্বে লিখিয়াছি। এখন ঐ সম্বন্ধে আরও যাহা কিছু বাকী বলা দরকার। মাটকড়াইর চাষ মরিশাস্, ষ্ট্রেট্ সেটেল্‌মেণ্ট, রেঙ্গুন ও মান্দ্রাজ প্রদেশে বহুল রূপে হইয়া থাকে। বীজ বপনের কাল হইতে ইহা পরিপক হইয়া ঘরে উঠিতে প্রায় ৫ মাস সময় লাগে। বর্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বেই ইহা বপন করা উচিত এবং আশ্বিন মাসে উঠাইয়া রৌদ্রে

শুখাইয়া বীজ জন্য রাখিবে। বেলে বা পলী মাটীতে ইহার চাষ ভালরূপ হয়, ইহার ক্ষেত্রে যাহাতে জল না জমিতে পারে তাহা দেখা কর্ত্তব্য। ইহার মাটী প্রস্তুত করিতে হইলে চারি পাঁচ বার আড়ে, দীর্ঘে চাষ দিবে এবং মই দিয়া ঢেলা ভাঙ্গিয়া দিবে। পরে "তাড়ী" বা ড্রিলের দ্বারা এক ফুট অন্তর বীজগুলিকে রোপণ করিয়া ক্ষেতে মই দিয়া দিবে। মধ্যে মধ্যে ঘাস ও আগাছা নিড়াইয়া দিবে। শেষ বার জমি চষিবার পূর্ব্বেই সার দেওয়া প্রশস্ত। প্রত্যেক একরে ১৫ হইতে ২০ গাড়ি গোময়, সহরের আবর্জ্জনা, ছাই বা এই রকম অপর কোন রূপ সার প্রয়োগই যথেষ্ট বোধ হয়। যা তা বীজ ক্রয় করাও উচিত নহে। বেশ পুরুষ্ট এবং পরিপক্ক পূর্ব্ব বৎসরের বীজ ক্রয় করা কর্ত্তব্য এবং রোপণের পূর্ব্বে বীজগুলি হস্তের দ্বারা খোলা ভাঙ্গিয়া দানাগুলি বাহির করিবে। বীজগুলি একফুট অন্তর রোপণ করা কর্ত্তব্য এবং হাল বা সারি গুলি এক হইতে দেড় বিঘৎ অন্তর পার্শ্বে যেন হয়। গাছ বড় হইলে যদি দেখা যায় যে গাছের গোড়ার মাটী শক্ত হইয়াছে তাহা কোদালি বা নিড়ান দিয়া উস্‌কাইয়া ২।১ বার ঢিলা বা আল্লা করিয়া দিতে হয়। গোড়ার মাটী আল্লা হইলে ইহাতে ফসল বেশী হয়। গাছের ডাঁটা শুখাইয়া যাইলেই বুঝিবে যে কড়াই তৈয়ার হইয়াছে। তখন তাহা ক্ষেত হইতে তুলিবে। শুষ্ক ডাঁটায় বেশ পশু খাদ্য হয়। ইহা অপর প্রকার ভুষী বা খড়ের সহিত মিশাইয়া গবাদি পশুকে দেওয়া যাইতে পারে। আমাদের দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর ধারে কত জমী পতিত রূপে পড়িয়া আছে তাহার প্রতি কাহারও লক্ষ্য নাই। এই সকল স্থানে যদি মাটকড়াই চাষ অনায়াসে হইতে পারে। মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত লিঙ্গাবল্লী, পালুর, দক্ষিণ আর্কট প্রভৃতি স্থানের কৃষকগণ বেশ ভাল জাতীয় চিনাবাদাম উৎপাদন করে। বীজ ঐ সকল স্থান হইতে আনাইয়া আমাদের দেশের কৃষকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে।

মাটকড়াই চাষের জন্য জল সেচনের আবশ্যক হয় না। অপেক্ষাকৃত শুষ্ক জমিতে ইহার চাষ ভাল হয়।

মাটবাদামের তৈল অতি পরিষ্কার প্রায় অলিভ তৈলের সমতুল্য। অলিভ তৈলের পরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ মাটবাদামের তৈল ঔষধার্থে এদেশে ব্যবহার হইতে দেখা যায়। ইউরোপেও ইহা অলিভ তৈল বা অন্য তৈলের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। ইহাতে তৈলের পরিমাণ খুব অধিক। একশত মণ বাদাম হইতে প্রায় ৩৭ হইতে ৪২ মণ কখন বা ৫০ মণ পর্য্যন্ত তৈল পাওয়া যায়।

মাটবাদাম এক্ষণে বাজারে ৮৲ হইতে ১০৲ টাকা দরে বিক্রয় হইতে দেখা যায়। ইহার তৈলের দর যেমন বাড়িতেছে বাদামের দরও তদনুসারে বাড়িতেছে। কলিকাতার বাজারে মান্দ্রাজী মাটকড়াই যথেষ্ট আমদানী হইতেছে। বোম্বাইয়ের

মাটকড়াইয়ের তৈলের মাত্রা অধিক, মান্দ্রাজী বাদামে তৈল কম হয়। বাঙলায় বন্য শুকর ও শিয়ালের উৎপাতে কড়াইয়ের চাষ উঠিয়া যাইতেছে। বাঙলায় বাদামে তৈলের মাত্রা অধিক এবং ইহা খাইতে অপেক্ষাকৃত অধিক সুস্বাদু। সুপরিষ্কৃত মাটকড়াই তৈলের দাম প্রতি মণ ১২৲ কিম্বা ১৪৲ টাকার কম নহে।

খাদ্য—খাদ্যের হিসাবে ইহার আদর যথেষ্ট। মাটির নীচে ফল হয় বলিয়া ইহার নাম মাটবাদাম বা মাটিবাদাম বা মাটিকড়াই। ভারতের বাজারে যথাতথা মাটবাদাম ভাজা বিক্রয় হয়। ইউরোপীয়গণ কখন কখন সখ করিয়া মাটবাদাম খাইয়া থাকেন। ইহাতে শরীর পোষণ উপযোগী শ্বেতসার, শর্করা, তৈল এবং এলবুমেন জাতীয় পদার্থ আছে। তৈল নিষ্কাষিত হইবার পরও ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে সার পদার্থ থাকে, সেই জন্য ইহার খৈল খুব সারবান এবং গবাদির তেজস্কর খাদ্য।

ইহার লতা পাতাগুলি শুষ্ক করিয়া রাখিয়া দিলে অসময়ের শুষ্ক ঘাসের মত গবাদির খাদ্যে লাগে। এই শুষ্ক তৃণ খাইলে গাভীর দুধ বাড়ে। মাটবাদামের খৈল নিয়ম মত গবাদিকে খাওয়াইলে তাহারা স্থুলকায় ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠে। খৈল জমিতে দিলে জমির তেজ বাড়ে।

সপ বা মাদুর

শ্রীগুরুচরণ রক্ষিত লিখিত

উত্তর বঙ্গের মধ্যে দিনাজপুর জেলার ঠাকুর গাঁ সবডিভিসনের এলাকায় বিস্তর সপ প্রস্তুত হয়। এখানে মাদুরকাঠির যথেষ্ট চাষ হইয়া থাকে যে গাছের দ্বারায় সপ প্রস্তুত করে, তাহাকে স্থানীয় লোকেরা "মুথা" বলে। ঐ জাতীয় আরও একপ্রকার মোটা মোটা গাছ তত্তৎ দেশে এবং অন্যান্য জেলাতেও দেখা যায় তাহাকে "নাগর মুথা" বলে। ইহা দ্বারাও মোটা রকমের সপ প্রস্তুত হয়। বোধ হয় ঐ অঞ্চলের মুথাগুলি উচ্চ ডাঙ্গা জমীতে রোপণ করিলে সকল দেশেই হইতে পারে। ঐ সকল মাদুর দুই চারি আনা হইতে চারি বা পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত এক এক খানি বিক্রয় হয়, বালক বালিকারাও সুন্দর ভাবে মাদুর বুনিয়া বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করিতেছে।

এখানকার লোকে চৈত্র, বৈশাখ মাসে এক বা দেড় ফিট গভীর করিয়া জমীকে কোপাইয়া ফেলে, কিছু দিন ঐ ক্ষেত্রে বাতাস পাইলে তাহাতে পুষ্করিণীর পুরাতন পাঁক আনিয়া সার রূপে ছড়াইয়া দেয়, দোয়াঁস বালুকাময় ভূমি কিম্বা

এঁটেল মাটী ইহার চাষের উপযুক্ত, ছায়াযুক্ত স্থানে কিম্বা পুষ্করিণীর পাড়ের নিম্নে উহা ভালরূপ জন্মিয়া থাকে। চারা রোপণ করিবার পূর্ব্বে ঐ ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে উচ্চ করিয়া আইল বান্ধিয়া দেয়, যেন বৃষ্টি হইলে উহার জল গড়াইয়া বাহির হইয়া যাইতে না পারে, কয়েকদিন ঐ জমীতেই থাকে।

অনন্তর বৃষ্টি আরম্ভ হইলে জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে ঐ জমীতে এক একটী পটী প্রস্তত করিয়া তাহাতে পুরাতন গাছের মূল হইতে বহির্গত ছোট ছোট চারা সকল আনিয়া রোপণ করিতে হয়, রোপণের পর যদি বৃষ্টি হয় কিম্বা ক্ষেত্রে রস থাকে তাহা হইলে আর জল দিবার আবশ্যক করে না, ২।১ মাসের মধ্যে ঐ রোপিত চারাগুলি কিছু বড় হইলে উহার ঘাস ও আগাছা পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। আর কোন বিশেষ যত্ন করিতে হয় না।

আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসের মধ্যে ঐ গাছগুলি ৪ বা ৫ হাত লম্বা হইয়া কাটিবার উপযুক্ত হইলে তখন ঐ গুলিকে কাটিয়া লয়, পুনরায় ক্ষেত্রের আগাছাদি পরিষ্কার করিয়া অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে একবার পাঁক মিশ্রিত জল সেচিয়া দিলে ঐ কর্ত্তিত পুরাতন গাছের চতুর্দ্দিক হইতে বহু পরিমাণে চারা জন্মিয়া থাকে। ঐ চারাগুলি বড় হইলে মাঘ মাসের মধ্যে ক্ষেত্রে আর একবার তরল পাঁক সেচিয়া দেয়, তখন চারা-গুলি খুব তেজাল ও মোটা হইয়া চৈত্র মাসের মধ্যে পুনরায় কাটিবার উপযুক্ত হয়। তখন ঐ গুলিকে কাটিয়া ক্ষেত্র কোপাইয়া মূল গুলিকে কোন ছায়াযুক্ত স্থানে লাগাইবার চারার জন্য রাখিতে হয়। পুনরায় নূতন করিয়া ঐ ক্ষেতে পাঁক সার দিয়া চারা লাগাইতে হয়, ক্রমান্বয়ে একই ক্ষেত্রে প্রতি বৎসর উহার চাষ করিলে কাঠি উত্তমরূপে জন্মে না, এজন্য দু এক বৎসর অন্তর ক্ষেত্র পরিবর্ত্তন করিলেই ভাল হয়।

কাঠিগুলি কাটিবার পর অগ্রে বড় ছোট পৃথক বাছিয়া মোটা সরু অনুসারে সেগুলিকে লম্বা দিকে দুই চারি অথবা ততোধিক খণ্ডে চিরিয়া ফেলিয়া, খুব লম্বা লম্বা কাঠিগুলিকে প্রস্থের দিকে মাঝামাঝি দুই খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিতে হয়। একদিন রৌদ্রে রাখিবার পর ২।১ দিন জলে ফেলিয়া ও জল হইতে উঠাইবার পর রৌদ্রে পুনর্ব্বার শুকাইয়া ঐ কাঠির দ্বারা মাছুর বুনিতে হয়। পাটের দড়ির দ্বারা মাছুর বুনা হয়। উৎকৃষ্ট মছলন্দী মাছুর কিন্তু সুতা দিয়া বুনে। বয়ন কালে এক কি দেড় ফিট বিস্তৃত ও ৫।৬ হাত লম্বা কাষ্ঠের হাতার প্রয়োজন হয় এই হাতাটিতে লম্বালম্বি ভাবে পাশা পাশি দুইটী করিয়া দুই সারিতে অনেকগুলি ছিদ্র থাকে। প্রথমে কাপড় বুনিবার টানার ন্যায় মাছুরের দীর্ঘ বিস্তারের মাপে দড়ি বা সুতার টানা করিতে হয়। টানার দুই মাথায় দুই খানি কাষ্ঠের দ্বারা টানার দড়িগুলি আবদ্ধ থাকে ও পূর্ব্বোক্ত হাতাটীর ছিদ্রের মধ্যে

দিয়া টানার দড়িগুলি থাকে, ঠিক কাপড় বুনিবার ন্যায় এক একটী কাঠি ঐ টানার মধ্য দিয়া চালাইয়া দু এক ইঞ্চ বুনা হইলে ঐ হাতা দ্বারা সেগুলিকে একত্র বেশ করিয়া ঠাসিয়া দিতে হয়। ঐ প্রকার বয়ন কার্য্য শেষ হইলে তৎপরে উভয় দিকের মাথাগুলি দড়ির মধ্য দিয়া মুড়িয়া বাঁধিয়া বেশীর ভাগ সমান করিয়া কাটিয়া দিতে হয়। ইহাতে বৎসরে গড়ে দুই মাসের বেশী পরিশ্রম লাগে না। প্রতি বিঘায় বৎসরে প্রতিবারে ৫০।৬০৲ টাকা হিসাবে শতাধিক টাকার কাঠি জন্মিয়া থাকে এবং তাহাতে প্রায় ২।৩ শত টাকার মাদুর প্রস্তুত হইতে পারে। সর্ব্বপ্রকার খরচাদি বাদে বিঘায় প্রায় শতাধিক টাকা লাভ হইয়া থাকে।

সরকারী কৃষি সংবাদ

বাঙলার অরণ্য—

বাঙলার বনের মধ্যে সুন্দরবন, পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ও আসামের জঙ্গল ও দার্জ্জিলিঙের জঙ্গলই উল্লেখযোগ্য। আরও ছোট খাট জঙ্গল নানা স্থানেই আছে। বাঙলায় এই বিস্তৃত অরণ্যের ৪,৮৮৮ মাইল মাত্র গভর্ণমেণ্ট দ্বারা সংরক্ষিত। সংরক্ষিত জঙ্গলের সীমানার মধ্য হইতে বিনা অনুমতিতে কাঠ, পাতা কিছুই কাটিয়া আনিবার কাহারও অধিকার নাই, এমন কি বিনা ছাড়ে কেহ এই জঙ্গলে পশু, পক্ষী শিকার করিতে পারে না। এই অরণ্য রক্ষণাবেক্ষণ জন্য ৭ জন তত্ত্বাবধারক এবং ৪৪৬ জন সহকারী কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন। সংরক্ষিত জঙ্গলের সন্নিহিত প্রায় ৪,৭৭০ মাইল জঙ্গল গোচারণের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। স্থানীয় চাষীদিগকে প্রত্যেক গো-মহিষ প্রতি সামান্য কিছু কিছু কর দিতে হয়। ইহাতেও কিছু আয় হয়।

বিগত বর্ষে (১৯১২—১৩) কাষ্ঠাদি বিক্রয় দ্বারা খরচাদি বাদে ৯,০৫,৪৬১৲ টাকা লাভ হইয়াছে। বিগত ৫ বৎসরের গড় হিসাবে ৬,৭২,৬৫৬৲ টাকা লাভ হইতে দেখা যায়। ১৯১১—১২ সালে ৭,৭৯,৮৪৬, টাকা মুনফা হইয়াছিল। এই সকল বনে বাঘের উৎপাতও ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। বিগত বর্ষে ৭০টি মাত্র লোক বাঘে মারিয়াছে, তৎপূর্ব্ব বৎসর ১৪২ জন লোক বাঘের দ্বারা হত হইয়াছিল।

মধ্য প্রদেশে কৃষি-বিভাগের কার্য্য—

কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিলেও এখানে কৃষি-কলেজে পাঠের উপযুক্ত চাষী ছাত্রের অভাব দেখা যাইতেছে। সেই জন্য নিম্নশ্রেণীর

হইতে ছেলেদের কৃষি-শিক্ষা দিবার চেষ্টা হইতেছে এবং বাঙলা ও মধ্য ইংরাজী স্কুলে কৃষি-শিক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে।

পরীক্ষা ক্ষেত্র—

এখানকার চাষীরা পরীক্ষা ক্ষেত্রের পরীক্ষিত বিষয় গুলির খবর অল্প বিস্তর রাখে। এতদঞ্চলে তুলা চাষ লাভ-জনক হইতেছে। কিন্তু প্রচুর জমি পড়িয়া থাকা সত্ত্বেও ইক্ষু চাষ হয় না। গভর্ণমেণ্ট এই সকল স্থানে পুষ্করিণী আদি খনন বিষয়ে অনেক পয়সা ব্যয় করেন; গভর্ণমেণ্ট যদি কোন ক্রমে সেচন জলের সুবিধা করিয়া দিতে পারেন, তবে ইক্ষু চাষ হওয়া সম্ভব।

বীজ ক্ষেত্র—

এখানে কয়েকটি বে-সরকারী বীজ উৎপাদন ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহারা ভালজাতীয় তুলা, তিল, গমের বীজ উৎপাদন করিতেছেন। গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী সময়ে সময়ে তাঁহাদের কার্য্য তত্বাবধারণ করেন। এই সকল ক্ষেত্রের কার্য্য অধিকমাত্রায় পরিদর্শন করা স্থানীয় কৃষি-বিভাগের প্রধান কার্য্য হওয়া উচিত।

গবাদি পশু উৎপাদন—

এখানে দুইটি পশুপালন ক্ষেত্র আছে। এই দুই ক্ষেত্রপালিত গবাদি পশুগুলি স্থানীয় সাধারণ গবাদি পশু অপেক্ষা অনেকাংশে ভাল বলিতে হইবে। নাগপুর কৃষি-কলেজের সংশ্লিষ্ট একটি গোশালা আছে। তথা হইতে দুগ্ধাদি সরবরাহ হয়। তাহার কার্য্য ও দৃষ্টান্ত দেখিয়া একটি বে-সরকারী গোশালা স্থাপিত হইতেছে। ইঁহারা স্থানীয় গোয়ালাদিগের সহিত এক জোটে এবং উন্নত প্রণালীতে কার্য্য করিবেন। একা গভর্ণমেণ্ট কি করিতে পারেন; যদি আদর্শ ক্ষেত্র গুলিতে লোকের শিক্ষা হয় এবং সেই দৃষ্টান্তে স্থানীয় লোকে কার্য্য করে তবেই আশা পূরণ হইবে।

রেসম চাষ—

রেসম চাষ এখানে ভালরূপ সম্ভব নহে। এই কারণে এতদঞ্চলের কৃষি-বিভাগ রেসম চাষের পরীক্ষা ক্ষেত্র উঠাইয়া দিয়াছেন।



ফাল্গুন, ১৩২০ সাল।

ভারতে ফলের বাগান রচনা

বাগানে গাছ বসাইবার প্রণালী নির্দ্ধারণ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে, ইহাতেও অনেক বুদ্ধি বিবেচনার প্রয়োজন। বাগানে বৃক্ষ লতাদি রোপণ কালে একটা মূল কথা মনে রাখা উচিত যে, মনুষ্য ও জীব, জন্তুর মত বৃক্ষ লতাদির হাওয়া ও রৌদ্রের প্রয়োজন হয়। কোন গাছে আট পিঠে রৌদ্রের প্রয়োজন, কোন গাছের বা অল্প ছায়াতে কোন ক্ষতি হয় না। সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত রৌদ্র না পাইলে গোলাপ বাঁচিবে না বা তাহাতে ফুল হইবে না, কিন্তু আনারস গাছ কিছু কিছু ছায়াযুক্ত স্থানে জন্মিতে ভালবাসে। বাঁশ বাগানের ভিতর এই জন্য কেহ কেহ আনারসের আবাদ করেন। বাঁশের পাতার ভিতর দিয়া যে টুকু রৌদ্র আসে বা বাঁশের পাতা পড়িয়া গেলে যে কিছু দিন অধিকতর রৌদ্র পায় তাহাতেই আনারস গাছের বৃদ্ধির ও ফল প্রসবের পক্ষে পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে হয়। চাঁপাকলা গাছ কোন গাছের তলায় না হইলেও গাছের তলাটি বাদে তাহার ছায়াতে বেশ হয় এবং ঐ সকল ছায়ায় গাছের কাঁদিও ছোট হয় না। কিন্তু কাঁচকলা গাছ ছায়ায় হয় না। কাঁটালী কলা গাছ ছায়ায় বসাইলে ১৫।২০ ফিট লম্বা হইয়া উঠিবে এবং অনেক বিলম্বে অতি ছোট কাঁদি ফেলিবে। কাঁটাল অপেক্ষাকৃত ছায়ায় ফলে কিন্তু আম লিচু ছায়ায় ফলিবে না। এই প্রকার, প্রত্যেক গাছ, লতা, গুল্মের এক একটা স্বভাব আছে। উদ্যান রচনায় সিদ্ধ হস্ত হইতে গেলে বৃক্ষলতাদির স্বভাব বিচার করিয়া তাহাদিগের যথাযথ স্থান নির্দ্দেশ করিতে হয়।

ভূগোলকের যে অংশে ভারতবর্ষ অবস্থিত তাহাতে বৎসরের অধিকাংশ দিন আমরা সূর্য্যের গতি অনুসারে দক্ষিণ দিক হইতে অধিক মাত্রায় আলোক প্রাপ্ত

হই এবং পূর্ব্বদিক হইতে উদয়কালীন সূর্য্যের যে আলোক পাওয়া যায়, তাহা বৃক্ষ লতাদির পরম হিতকর। সুতরাং উদ্যান রচনা কালে পূর্ব্ব বা দক্ষিণ দিকে বড় গাছ বসাইয়া বাগানে আলো প্রবেশের পথ বন্ধ করিতে পারিব না, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ছাড়িয়া উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে বড় বড় গাছ গুলির স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইবে। হাওয়ারও গতি অনুসরণ করিতে হইবে। বাঙলা দেশের পূর্ব্বে ও দক্ষিণে বাতাসই প্রবল, অতএব বাগানে হাওয়া চলাচলের পথও উন্মুক্ত রাখিতে হইবে। বাঙলা ছাড়াইয়া গেলে বেহার ও যুক্ত প্রদেশে পশ্চিমে বাতাস প্রবাহিত। অতএব ঐ সকল স্থানে পশ্চিম দিকে ছোট ছোট গাছ বসাইয়া হাওয়ার পথ খুলিয়া রাখিতে হয়। সর্ব্বত্র কিন্তু উত্তরে বাতাস পরিবর্জ্জনীয়। বাগানের উত্তর দিকে পাহাড় বা উচ্চ ভূমি থাকিলে ত ভাল নতুবা কাষ্ঠদায়ী বড় বড় গাছ বসাইয়া বাগানে উত্তরে বাতাসের অবাধে প্রবেশ বন্ধ করিতে হইবে। উদ্যান রচনার একটা কৌশল এই যে, উদ্যানে অযথা একটুও জমি পড়িয়া থাকিতে দেওয়া হইবে না। এই যে উত্তর দিকে কাষ্ঠদায়ী দুই তিন সার গাছ বসান হইল তাহার তলায় ত অনেক জমি পড়িয়া থাকিবে তাহার উপায় কি করা, তাহা ত ভাবা উচিত। কাঠ হইতে আর কত লাভ হইবে? মনে করিয়া দেখ যে তোমার বাগান নিতান্ত ছোট নহে, ছোট হইলে ভাবনাটাও ছোট হইত। বাগান বড় সুতরাং রাস্তা চাই এবং বড় রাস্তা চাই। রাস্তায় ত অনেক জমি বাজে নষ্ট হয়, অতএব বড় রাস্তাটা উত্তর দিকে ঐ দুই সারি কাষ্ঠদায়ী গাছের মধ্য দিয়া কর। আবশ্যকীয় ছোট ছোট রাস্তা গুলি ঐ রাস্তা হইতে বাহির হইয়া চারি দিকে যাইবে। উত্তরদিকের গাছের শীতল তলায় বাগানের আহৃত ফল শস্যের খটি করিতে পার। দুপুর রৌদ্রে গাভী বলদাদির দাঁড়াইবার স্থানও সেই দিকে নির্দ্দিষ্ট হইবে।

কোন্ গাছ কত উঁচু হয় কিম্বা আশে পাশেই বা কি রকম বাড়ে ইহা জানিয়া লইলে তবে প্রত্যেক গাছের ব্যবধান ঠিক করিতে পারা যায়। কলমের আম গাছ অপেক্ষা আঁটির আমগাছ অনেক বড় হয়। সেইজন্য কলমের আমগাছ ৩০ ফিট অন্তর এবং আঁটির আমগাছ ৪০ ফিট অন্তর বসাইতে হইবে। লিচু লকেট গাছের ব্যবধান ৩০ ফিট পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে হয়, পেয়ারাও তাই। কাঁটাল গাছ বীজ হইতে উৎপন্ন। গাছও খুব বড় হয় কিন্তু বড় হইতে দীর্ঘকাল সময় লাগে এবং একটু ঘন বসাইলে বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় না। জামরুল, লিচু, লকেট, পিয়ারা, কাঁটাল গাছ বৎসর বৎসর ছাঁটিতে হয় সুতরাং এই সকল গাছ ৩০ ফিট অন্তর বসাইলে ক্ষতি হয় না। সব গাছই প্রতি বৎসর অল্প বিস্তর ছাঁটিতে হয়। গাছ ছাঁটিলে তাহাদের বেশ মন মত আকার হয় এবং তাহাতে ফলও

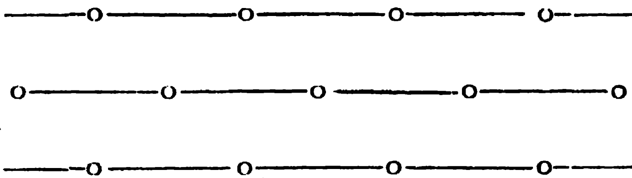
ভাল হয়। বেল ও ম্যাঙ্গোষ্টীনের গাছ, আম গাছ অপেক্ষা উচ্চ হয় সুতরাং সে গুলির ব্যবধান আম অপেক্ষা অধিক হওয়া আবশ্যক এবং উদ্যান রচনা কালে উত্তর মাথার সারিতে তাহাদিগকে বসাইতে হয়। পূর্ব্ব দিকে, দক্ষিণ দিকে আতা, পেঁপে, কাগজী, সরবতী লেবু বা কলার বাগান করিবে। নোনাও কিন্তু আতার জাতি হইলেও, বাতাবী, কমলা লেবু, লেবুর জাতি হইলেও উহাদের সহিত একত্র বসান চলে না। ছোট বড় হিসাবে তাহাদের ব্যবধান নির্ণয় করিতে হইবে এবং গাছগুলির উচ্চতানুসারে তাহাদিগকে ক্রমশঃ উত্তর ও উত্তর পশ্চিম মাথা ঘেঁসিয়া স্থান দিতে হইবে।

এক এক জাতীয় গাছ পৃথক পৃথক Group বা স্তবকে রোপণ করা ভাল। এক সারি পিয়ারা গাছ তার পর এক সারি ন্যাসপাতির, তার পর এক সারি কমলা লেবুর গাছ রোপণ করিলে উদ্যানের পাইটের সময় বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, ফল আহরণে কষ্ট হয় এবং জল সেচনের সুব্যবস্থা হয় না। নিমন্ত্রণ বাটিতে যেমন ফলাহার, লুচী ও. ভাত খাইবার কিম্বা নিরামিষ আমিষ খাইবার আমন্ত্রিত লোকগণকে একত্র খাইতে বসাইলে অসুবিধা হয় এখানেও সেই রকম অসুবিধা হয়। বাগানের পরিমাণ অনুসারে এক একর (৩ বিঘা), দুই একর, তিন একর বা ততোধিক একর জমি লইয়া এক এক রকমের ফলের গাছ বসাও। জমি ও আবহাওয়া বুঝিয়া তিন, চারি বা পাঁচ রকম ফল গাছ বসাইবার চেষ্টা করিবে। যে ফলের আবাদ কর তাহা একটু সংখ্যায় অধিক না হইলে ব্যবসায়ের সুবিধা হইবে না একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

এক এক স্তবক বৃক্ষ রোপণ করিয়া মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণ জায়গা ছাড়িয়া আবার এক স্তবক গাছ রোপণ করিলে বাগানে হাওয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ফিরিয়া চলাচল করিতে পারে। এই গুলি হইল হাঁপ ছাড়িবার জায়গা। এই গুলি না থাকিলে গাছগুলি সারি ধরা হইয়া অবিচ্ছিন্ন প্রাচীরের মত দাঁড়াইয়া রহিল, রৌদ্র, বাতাস বাগানে ঢুকিয়া পথ পাইল না ; বৃক্ষগণকে পথ ছাড়িয়া দিতে বলিলেও তাহারা এক ইঞ্চিও সরিয়া দাঁড়াইবে না। বাতাস স্বীয় বলে এ গাছের ডাল নাড়িয়া অন্য গাছের মাথাটা হেলাইয়া কোন ক্রমে আপনার কার্য্য সাধিবার চেষ্টা করিল এবং যথাসাধ্য করিল, কখন বা রাগে ডাল পালা ভাঙ্গিল। রৌদ্রের সে প্রভাব নাই সে দাঁড়াইয়া রহিল অবশেষে ক্রোধে রাঙিয়া উঠিয়া মাথায় চড়িয়া বসিল, আওতার গাছগুলি দেখিল যে বড় হইতে না পারিলে আর রোদ পাইবার আশা নাই, অতএব তাহারা বাড়িতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিল কিন্তু আশে পাশে বাড়া হইল না কেন না লম্বা হইতে হইবে। লম্বা হইয়া উঠিয়া সূর্য্যকর মাথায় ধারণ করিল। সকল উদ্যান পালকের মনে রাখা উচিত যে. রোদ, বাতাস

তাহাদের সাহার্য্যার্থ তাহাদের দুয়ারে সর্ব্বদাই উপস্থিত, তাহাদিগকে দুয়ার খুলিয়া দিলে বিনা খরচে তাহার কত কার্য্যই সাধিত হইবে। বড় বড় সহরের মাঝে মাঝে যেমন পুষ্প উদ্যান বা ঘাস মাঠ রচনা করিবার আবশ্যক, যেমন মানুষদের হাঁপ ছাড়িবার জায়গা চাই, তেমনি বৃক্ষলতাদিরও চাই। বৃক্ষাদি পায়ে চলিয়া হাঁপ ছাড়িবার জায়গায় না আসিতে পারিলেও এক একটি বৃক্ষ স্তবক চারি দিক হইতে রৌদ্র বাতাস পাইয়া শাখা প্রশাখা হেলাইয়া দোলাইয়া ফাঁকা স্থানের নির্ম্মল বাতাসটা উপভোগ করে। ফাঁকা স্থানটা অকেজো হইয়া পড়িয়া থাকে ইহাও সঙ্গত নহে। কারণ ব্যবসায়ের জন্য বাগান করিলে লাভের দিকে দৃষ্টি আগে চাই। এই সকল স্থান সব্জী চাষে কিম্বা আদা, হলুদ, আনারস চাষে নিয়োগ করা যাইতে পারে।

সম সূত্রে গাছ না বসাইলে বা গাছ নিতান্ত ঘন বসাইলে বাগান কারকিৎ মেরামতের অসুবিধা হইবে। বৃহৎ বাগান কোদাল দিয়া কোপাইতে হইলে চলে না। লাঙ্গল চালাইবার সুবিধামত গাছের সারি গুলি হওয়া উচিত। চৌকা রচনা করিয়া গাছ বসাইলে সবগাছ সমান্তরালে বসে না, কিন্তু ত্রিকোণাকারে বসাইলে সব গাছের সমান অন্তর হয় এবং এই প্রণালীতে গাছ বসাইলে একরে অধিক গাছ ধরে। কলা, নারিকেল গাছ ৮ হাত বা ১২ ফিট অন্তর বসাইতে হয়। চৌকাক্ষেত্র রচনা করিলে একরে ৩০২টা কলা বসিবে কিন্তু ত্রিকোণাকারে বসাইলে ৩৪৭টা গাছ ধরিবে। বিশ্বাস না হয় নিম্নের চিত্র দেখুন।



চখের নজরে অনেক সময় গাছের সারি গুলি সোজা হয় না। আমাদের দেশের চাষীরা যেমন বেগুন ক্ষেতে চারা বসাইবার সময় দড়ি দিয়া সারি ঠিক করিয়া লয় এবং কত অন্তর চারা গুলি বসিবে তাহাও দড়ির গায়ে গোময়ের ফোঁটা বা কালির দাগ কিম্বা আলকাতারা দ্বারা চিহ্নিত থাকে, ফল গাছ বসাইবার সময় সেই রকম এক গাছি দড়ির আবশ্যক। একগাছি অপেক্ষা দুগাছি দড়ি হইলে আরও ভাল হয়। এক গাছি দড়িতে কত অন্তর সারি তাহার ঠিক হইবে অন্য গাছি আড়াআড়ি চালাইয়া গাছ হইতে গাছের দূরত্ব ঠিক করিয়া দিবে। দড়ি ঘন ঘন ছিঁড়িয়া যায়, দড়ির বদলে লোহার পাকান তার ব্যবহার করাও চলে। গাছ বসাইবার সন্ধি স্থল গুলি ছোট ছোট খোঁটা পুতিয়া লইয়া পরে গাছ বসাইতে

আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। এইরূপ কৌশলে গাছগুলি নিশ্চয়ই সমান্তরালে বসিবে এবং সারি সমসূত্র হইবে। সারিগুলি সমরেখা হইল কি না দেখিবার জন্য বার বার, একবার এদিক, একবার অন্য দিক হইতে এক চোখ বুজিয়া চাহিয়া দেখিতে হইবে না। দড়ি পাতিয়া গাছ বসাইলে আর একটা লাভ আছে। জমির কোথাও উচুনীচু থাকিলে তাহাও ধরা পড়ে, গাছগুলি কেবল সমসূত্রে নয়, সমতলে বসান হয় ইহাও দেখা দরকার, ইহাতে জল সেচনাদির সুবিধা হয়।

দুই একটি প্রধান কথা মনে রাখিলেই গাছ বসান ব্যাপারটা দুরূহ বলিয়া মনে হয় না। গাছের কলম বা চারা যেমন বড় বা ছোট, গর্ত্তটিও পরিসরে ও গভীরতায় তদ্রূপ হইবে। একটি নারিকেল গাছ বসাইতে যত পরিসর গর্ত্তের আবশ্যক, একটি সুপারি গাছের জন্য তাহা দরকার হয় না অথচ উভয় স্থলে গর্ত্তটি সমান গভীরই হইবে। বাঁশ কিম্বা কলা গাছের মূলটা বাড়িয়া মাটির উপর ভাসিয়া উঠে সুতরাং ইহাদিগকে ১ হাত বা ততোধিক গভীর গর্ত্ত করিয়া বসাইতে হয়। আচট জমিতে গাছ বসাইতে হইলে কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণ জমি কোপাইয়া খুঁড়িয়া তৈয়ারি করিয়া লইতে হয়। কিন্তু সমস্ত জমিটি তৈয়ারি থাকিলে আবশ্যকানুযায়ী গর্ত্তটি করিলেই চলে। হাপরে(১) গাছগুলি যে ভাবে থাকে—যে দিকে তাহার ডালাপালা ও শিকড় বিস্তৃত থাকে, নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে বসাইবার সময় সেই ভাবে বসাইবার চেষ্টা করা উচিত। অনেক শৈত্যপ্রধান স্থানে হাপর হইতে গাছ তুলিয়া লইয়া শিকড় সংলগ্ন মাটি বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা হয়, কখন বা দুই একটা শিকড় ছাঁটিয়া ফেলা হয়। মূল শিকড়ের অগ্রভাগ যৎসামান্য ছাঁটা, শৈত্যপ্রধান শুষ্ক প্রদেশমাত্রেই এই প্রথা আছে, কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গাছগুলি হাপর হইতে তুলিবার সময় শিকড়গুলি আঠাল মাটি দ্বারা গুল বাঁধা হয়। গাছগুলি স্বক্ষেত্রে বসাইবার পূর্ব্বে দুই এক দিন ছাওয়ায় রাখিয়া গুলের মাটি নিরস হইয়া কিঞ্চিৎ টানিয়া গেলে তবে গাছ জমিতে বসান হয়। এইরূপ গুল বাঁধা গাছের চারিদিকের মাটি সিক্ত হইলেও গুল সহজে ভাঙ্গিয়া যায় না। এক কিম্বা দুই বর্ষা পর্য্যন্ত গুল ঠিক থাকে। তাই বলিয়া কিন্তু গাছগুলির শিকড় চুপ করিয়া থাকে না। শিকড় গজাইয়া গুলের মাটি ভেদ করিয়া বাহির হয় এবং সংলগ্ন মাটিতে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কলম বা চারার হাপরে থাকা কালে গোড়ার যে অংশ মাটি ঢাকা থাকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসাইবার সময় সেই পর্য্যন্ত ঢাকা দিতে হইবে। গাছগুলি সাধারণ জমির তল হইতে কিঞ্চিৎ উঁচু করিয়া

(১) হাপরে—চৌকা, যেখানে গাছের চারা বা কলমগুলি বসাইয়া রাখা হয় ; ইহাকে ইংরাজিতে Nursery bed বলে।

বসান ভাল, কেননা চারিদিকের মাটি টানিয়া গোড়ায় দেওয়া বরং সহজ, কিন্তু গাছ নীচু বসান হইলে গোড়ায় জল বসিবে, তাহা শোধরাইয়া লওয়া নিতান্ত সহজ কার্য্য নহে। যে জমিতে রস বেশী থাকে, সে জমিতে গাছ উঁচুই বসাইতে হয়।

গাছগুলি সকাল বেলা বা সন্ধ্যা বেলা হাপর হইতে তোলা কর্ত্তব্য। প্রচণ্ড রৌদ্রের সময় গাছ তুলিতে বা বসাইতে নাই। শিকড়ে গরম বা শীতের হাওয়া লাগিলে কিম্বা প্রখর রৌদ্র লাগিলে অনিষ্ট হয়। দিনের অবসানে গাছ বসান ভাল, কারণ রাত্রের ঠাণ্ডায় গাছ অনেকটা সামলাইয়া যাইতে পারে। হাপর হইতে গাছ নাড়িয়া অন্যত্র বসাইবার সময় সতর্ক হইলে, গাছগুলি তুলিবার ও বসাইবার সময় ধীরতা ও নিপুণতার সহিত কার্য্য করিলে গাছ প্রায় মরে না। গাছের শিকড়গুলি গুল বাঁধিয়া বসাইবার অর্থ, তাহাদিগকে অতিরিক্ত শীতাতপ ও আর্দ্রতা হইতে রক্ষা করা। শিকড় মাটি বিচ্ছিন্ন করিয়া বসাইবারও একটা অর্থ আছে। এরূপ স্থলে শিকড়গুলি বেশ ভাল করিয়া দেখিয়া লওয়া যায়। রুগ্ন অকেজো শিকড় বা শিকড়ের অংশটুকু বাদ দেওয়া যায়। নারিকেল, গুপারি, কলা প্রভৃতি গাছের মত অন্য গাছগুলির ইচ্ছামুরূপ শিকড়াংশ বাদ দেওয়া যায়। শিকড় ছাঁটার আবশ্যকতা আছে। শিকড় ছাঁটিবার গুণে গাছে শীঘ্র ফল ধরে। সুনিপুণ অস্ত্র চিকিৎসকের মত পেটের নাড়িভুঁড়ি বাহির করিয়া লইয়া, দুষ্ট অংশ বাদ দিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া আবার যথা স্থানে সন্নিবেশিত করিলে যেমন রোগী মরে না, সেইরূপ গাছগুলি যত্ন সহকারে উঠাইয়া নিপুণতার সহিত অন্যত্র বসাইতে পারিলে গাছও মরে না।

ইতিপূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি যে, এক এক জাতীয় গাছ পৃথক ক্ষেত্রে বসাইবে। নতুবা গাছের পাইটের ও ফলাহরণের ব্যাঘাত ঘটে। এক জাতীয় বিভিন্ন প্রকারের গাছ পৃথক বসাইতে পারিলে ফলাহরণের আরও সুবিধা হয়। কিন্তু

বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞান বলিতেছে যে, এক কার্য্যে একটু ক্ষতি আছে। বিজ্ঞান দেখিয়াছে যে, বৃক্ষের ফুলগুলি নিজ নিজ পরাগরেণু নিষিক্ত হইলে গর্ভ ধারণ করে বটে, কিন্তু ফল তেমন ভাল হয় না এবং প্রচুরও হয় না। এক প্রকারের ভিন্ন গাছের পরাগরেণু নিষিক্ত হইলে তাদৃশ শুভ ফল প্রদান করে না বলিয়া, মানুষের স্বগোত্রে বিবাহ যেমন নিষিদ্ধ, গাছেরও স্বগোত্রীয় পরাগরেণু নিষেক তেমনি ফলদায়ী হয় না বলিয়া উহাও নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। স্বজাতীয় ও স্বশ্রেণীর গাছ এক সঙ্গে থাকা চাই, কিন্তু কেবল মাত্র স্বগোত্রের গাছ একত্র থাকিলে চলিবে না। যেমন যেখানটায় পিয়ারা বাগান করিতে হইবে সেখানে কাশীর পিয়ারা, পাটনাই পিয়ারা, দেশী পিয়ারা এক সঙ্গে মিশাইয়া বসাইতে হইবে, বিভিন্ন গোত্রের গাছ পরস্পর পাশাপাশি ঠেকাঠেকি থাকিবে। এক সময় ফুল হয় এমন সব গাছ একত্র বসান চাই, ভিন্ন গোত্রের পরাগরেণু নিষেকের সুবিধা হওয়া আবশ্যক। ঘরে দুয়ার দিয়া বিজ্ঞান তাহার পরীক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া নাই। একথা হাটে বাজারে প্রচার হইয়া পড়িয়াছে। বিদেশীয় বণিকগণ ব্যবসায়ার্থ ফলের বাগান রচনা কালে এই বিধি অবলম্বন করিয়া ভাল ফল ও অধিক মাত্রায় ফল উৎপাদন করিতেছেন। ইহাতে ফল আহরণ ও নির্ব্বাচনের কষ্ট হইলেও এই প্রথার মর্ম্ম তাঁহারা বুঝিয়াছেন এবং ইহা প্রচলন করিতেছেন।

গাছ বসান পর্য্যন্ত উদ্যান রচনা কার্য্য শেষ হইয়া গেল তারপর বাগানের কারকিৎ মেরামত, ফল আহরণ, ফল নির্ব্বাচন, ফল বাজারে পাঠান—এ গুলি এক একটি স্বতন্ত্র ব্যাপার এবং বলিতে গেলে স্বতন্ত্র এক একটি প্রবন্ধ হইয়া পড়ে। যাহা কিছু বলা হইল তাহা সংক্ষেপেই বলা হইল। দৃষ্টান্তগুলি দ্বারা বুঝিয়া লইতে হইবে যে ফলের বাগান রচনা করিতে হইলে কি বুদ্ধি কৌশল অবলম্বন করা আবশ্যক। অনেক বিষয় সুবিচার করিয়া, অনেক গুলি ব্যাপারের সমাধান করিয়া তবে ফলের বাগান রচনায় হাত দিতে হয়।

যাহা কিছু করিবে তাহা সম্পূর্ণ ভাবে করিবে, অসম্পূর্ণ কোন কার্য্যই শুভ ফল প্রদান করে না। ভারতের হিন্দুমাত্রেই এ কথা বুঝে। যাগ, যজ্ঞে, পূজা তোমাদিতে কোন অঙ্গহানি হইলে যেমন তাহা ফলদায়ী হয় না তেমনই ব্যবহারীক কৃষিকর্ম্ম বা উদ্যান রচনা বা যে কোন কর্ম্ম বল তাহাও এক একটা মহাযজ্ঞের সামিল; তাহার কোন অংশে হানি হইলে ফল মনোমত কখনই হইবে না। ব্যবহারিক যজ্ঞ তপশ্চারণে আজ কাল ইংরাজগণ অগ্রণী সুতরাং ভাগ্যলক্ষ্মী ত তাহাদের করায়ত্ত। আজ কালকার সুবিধা তাঁহারাই উপভোগে সমর্থ। রাজ্যে রাজ্যে কৃষিবিভাগ প্রতিষ্ঠিত, কত তত্ত্বানুসন্ধানাগারে কত তথ্যই আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহারা তাহার সন্ধান রাখে এবং তদনুসারে কার্য্য করিয়া থাকে। আমাদের দেশের লোকের সাধনার আস্থা কমিয়া আসিয়াছে, মন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, কার্য্য করিবার শক্তি কমিয়া আসিয়াছে, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস তিরোহিত হইতেছে। তাহাদের টাকার যোগাড় হয় না, তাহাদের জমির যোগাড় হয় না, জমি ও অর্থ জুটেত বুদ্ধিতে কুলায় না। সাধনার দেশে আমরা সাধনায় আস্থা শূন্য, তাই এ দুর্দ্দশা।

কৃষি কলেজ—কৃষি কলেজ গুলিতে আশানুরূপ ছাত্র জুটিতেছে না। ইহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কৃষি আমাদের দেশের প্রধান অবলম্বন। বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রণালী শিক্ষায় লাভ নাই এ কথা কেহই বলিবে না। লাভ যদি থাকে তবে সুযোগ পাইয়াও কেন ছাত্রগণ এই সুযোগ উপভোগ করিতে বিরত এই কথা আমাদের বারম্বার মনে আসে। হইতে পারে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি নির্ব্বাচনের কিছু একটু দোষ আছে, সে রকম কত শত দোষত বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলির পাঠ্য নির্ব্বাচনে দেখিতে পাওয়া যায় তথাপি কিন্তু বিশ্ব বিদ্যালয়ের স্কুল, কলেজে ছেলে ধরে না। আমাদের অনুমান যে এখন হয়ত অনেকেই ভাবিতেছেন যে কৃষিকর্ম্মটা কাজের মধ্যেই নহে। চাকরি করাটা আমাদের অস্থি ও মজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু চাকুরি আর জুটে কৈ? চাকুরি না জুটলে আমরা করিব কি এই বেলা একবার ভাবিয়া দেখিবে না কি? আমাদের প্রচুর মূলধন নাই যে আমরা শিল্প বাণিজ্যে লাগিয়া যাইব। সম-জোটকতাই কি আছে যে, দশজনে মিলিয়া এক একটা কাজ গুছাইয়া করিব। তখন যে কৃষিই আমাদের একমাত্র অবলম্বন হইবে। ছোটই হউক আর বড়ই হউক কৃষি-ক্ষেত্রই আমাদের একমাত্র কর্ম্মক্ষেত্র হইবে। আমরা সকল কাজেই নিরুৎসাহ, বিশেষ কৃষিতে।

জমিদার পুত্রগণের ও কৃষক সন্তানগণের সুবিধার জন্য সাবরে ছয় মাস ব্যাপী ব্যবহারিক কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বিগত বর্ষে ঐ শ্রেণীতে মোটে ১২টি মাত্র ছাত্র জুটিয়াছিল। কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টার বলেন যে কৃষক

পুত্রগণকে বোধ হয় আরও অধিক প্রলুব্ধ করিতে হইবে। তাহাদিগকে যাতায়াতের খরচ এবং কলেজে অবস্থিতি কালে তাহাদিগের যে আর্থিক ক্ষতি হইবে তাহাও পূরণ করিয়া দিতে হইবে নতুবা কাজ ক্ষতি করিয়া, পয়সা লোকসান করিয়া তাহাদের আসিতে ইচ্ছা হইবে না। দীন কৃষক—পুত্রগণ সম্বন্ধে এই কথাটা সম্ভবপর হইলেও হইতে পারে কিন্তু জমিদার পুত্রগণ কি কারণে আসেন না তাহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিতে হইবে? জমিদারগণের মধ্যে অনেকেই পীড়ন অতি পীড়ন করিয়া জমির কর আদায়ে মজবুত কিন্তু যদি জানিতেন জমির কর জমি হইতেই উৎপন্ন হয় তাহা হইলে তাঁহাদের এবং তাঁহাদের প্রজাবর্গের বিশেষ সুখ হইত। তাঁহাদের ছেলে পিলেরা এখনও যদি কৃষি-কর্ম্ম শিক্ষায় মনোযোগী হয় তাহা হইলে ভবিষ্যতেও একটা আশার সঞ্চার হয়।

বিস্তৃত ইক্ষুক্ষেত্র—বিদেশী চিনির যেরূপ আমদানী বাড়িতেছে এবং তাহা যেমন সস্তা, ভারতীয় চিনি সেই রকম সস্তা না হইলে বাজারে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে পারিবে না। ইক্ষু কারখানার একজন ইঞ্জিনিয়ার গোম সাহেব বলেন যে ভারতের কারখানাগুলি সবই ছোট। চিনির বিপুল কাট্‌তির তুলনায় সে সকল কারখানায় কম খরচে এত পর্য্যাপ্ত চিনি প্রস্তুত হইতে পারে না যে এ দেশের চিনিতে বাজার ছাইয়া যাইবে এবং বিদেশী চিনি আমদানী করিবার আবশ্যকতা থাকিবে না। এলাহাবাদ প্রদর্শনীতে চিনি প্রস্তুতের যে কলকব্জা প্রদর্শিত হইয়াছিল তাহা উন্নত প্রণালীর হইলেও তাহাও ছোট বলিয়া মনে হয়। অল্প সময়ে অধিক চিনি যতদূর সম্ভব কম খরচে উৎপন্ন হইবে তবে ত প্রতি-যোগিতায় সস্তা চিনির সহিত টিকিয়া যাইবে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে উৎপন্ন চিনির পরিমাণ যত অধিক হইবে তদনুপাতে খরচের হার কমিয়া যাইবে। এই হেতু পঞ্জাবে ৫০ হাজার একর লইয়া একটা সুবিস্তৃত ইক্ষু আবাদ করিবার চেষ্টা হইতেছে। এই সঙ্গে এক বড় রকমের চিনির কারখানা স্থাপন করিয়া, তাহাতে চিনি প্রস্তুতের বড় বড় কল কব্জা বসাইয়া কম দামে চিনি প্রস্তুতের আয়োজন করা হইবে। ছোট ছোট কারখানাও নিকটে কাছে থাকিবে। ৫০ হাজার একরে আখের চাষ বড় সহজ কথা নয়। ইহাতে পর্য্যাপ্ত ফসল জন্মিলে দুই চারিটা ছোট বড় ইক্ষু চিনির কারখানা চলিতে পারে। বড় কারখানা গুলিতে চিনি প্রস্তুত হইবে, ছোট কারখানাগুলি গুড় পরিষ্কার কার্য্যে নিয়োজিত হইবে। জাভা ও মরিসস্ চিনির সহিত বাজারে প্রতিযোগিতা করিতে গেলে ভারতের কারখানাগুলির উন্নতি বিধান করা অগ্রে আবশ্যক।

নূতন তৈল বীজ—পৃথিবী জুড়িয়া কতই কল কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। নানা রকম রাসায়নিক কার্য্যে ও ঔষধার্থে তৈল ও চর্ব্বির আবশ্যক হইতেছে। এখনকার লোক আর কেহ অরণ্যচারী নহে যে তাহাদের ফলমূল খাইয়া বা মৃগয়ালব্ধ পশু মাংস আহার করিয়া এবং গাছের তলায় শুইয়া দিন কাটিয়া যাইবে। মানুষের এখন কত রকমে অভাব। বর্ত্তমানকালে যে সকল তৈল বা চর্ব্বি মিলিতেছে তাহাতে কিছুতেই কুলাইতেছে না। মানুষ সেইজন্য নূতন নূতন তৈল উৎপাদক বীজের সন্ধানে ফিরিতেছে এবং যাহাতে তৈল আছে বলিয়া মনে হইতেছে তাহা হইতে তৈল বাহির করিয়া পরীক্ষা করা হইতেছে। কে আর আগে মুলা কিম্বা তুলা বীজের তৈলের তত্ত্ব লইত। ভারতের লোকে সরিষার তৈল ও রেড়ির তৈলের সন্ধান পাইয়া পরম তুষ্ট হইয়াছিল। ক্রমশঃ নারিকেলের শাঁসে তৈল হয় জানিল। নারিকেলের আবাসভূমি সিংহল ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে প্রচুর তৈল উৎপন্ন হইতে লাগিল। মহুয়া বীজ হইতে তৈল তৈয়ারি হইল। মাট বাদামের তৈলে বাজার ছাইয়া গেল। সরিষার তৈলে শেয়ারগুঁজা তৈল ভঁজাল চলিতে লাগিল। পোস্তদানারও তৈল উৎপাদিকা শক্তি জানা গেল। সিংহল হইতে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে প্যারা রবার বীজ হইতে আবশ্যকানুযায়ী তৈল পাওয়া যায়। ব্রিটিস্ পূর্ব্ব আফ্রিকা বলিতেছে যে তামাক বীজ ফেলিয়া দিয়া নষ্ট করিও না, ইহার মধ্যে তৈল আছে। কাবুল ও পার্ব্বত্য বাদামের তৈল ঔষধার্থে ব্যবহারের উপযোগী। আবার খোবানীর দানার ভিতর তৈল পাওয়া গিয়াছে. গোণ্ডাকাষ্ঠ বাদামের ত কথাই নাই। তত্ত্বানুসন্ধিৎসুরা বলিতেছেন যে, গম ও চাউলের মধ্যে যে তৈল তাহা কোন রকমে জমাইয়া ফেলিতে পারিলে তাহার ভিতর হইতে ঘন চর্ব্বি মিলিতে পারে।

পত্রাদি

আলুতে সার—শ্রীশশীভূষণ মুখোপাধ্যায়, ঝিনাদহ, যশোহর।

উত্তর—আলু চাষে সর্ব্ববাদীসম্মত কোন একটা সারের কথা জানিতে চান, কিন্তু তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া বলা কঠিন, কারণ এবিষয়ে কেহই একমত হইতে পারেন না। জমির অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা সকলকেই করিতে হয়।

আলুতে পটাস সারের সমধিক প্রয়োজন। বাঙলায় এঁটেল মাটিতে পটাস পাওয়া যায়, কিন্তু খুব শক্ত এঁটেল মাটিতে আলু চাষ চলে না। এঁটেল মাটির আলু বাড়ে না। আলুর জন্য হাল্‌কা দোয়াঁস মাটি চাই এবং তাহাতে উদ্ভিজ্জ

সার যথেষ্ট থাকা আবশ্যক। আলু চাষে ফস্ফরিক অম্লও যথেষ্ট থাকা আবশ্যক, উহার মাত্রা পটাস হইতে কিছু কম। নাইট্রোজেন তদপেক্ষা অল্প পরিমাণে দরকার হয়। ইহাই হইল আলুতে সার দিবার মূলসূত্র। আমরা পটাসের জন্য খনিজ পটাস বা ঘুঁটের ছাই, ফস্ফরিক অম্লের জন্য পুরাতন গোময় মিশ্রিত গোয়ালের আবর্জ্জনা সার দিতে বলিতে পারি। এই গোয়ালের আবর্জ্জনা সারে গোময় ও গোমূত্র মিশ্রণ জনিত যথেষ্ট আমোনিয়া থাকায়, ইহাতে উপযুক্ত মাত্রায় নাইট্রোজেন পাওয়া যায়। অধিকন্তু পচা খড়কুটিতে জমির প্রাকৃতিক গঠনের পরিবর্ত্তন হয়, মাটি আল্গা হয়—তাহাতে আলুর ফলন বাড়ে এবং এরূপ জমির আলু সুস্বাদু হয়। আলুতে হাড়চূর্ণ দিতে গেলে অনেক পূর্ব্বে অর্থাৎ বর্ষারম্ভেই দেওয়া কর্ত্তব্য, কারণ হাড়চূর্ণ পচিতে বিলম্ব হয়। হাড়চূর্ণে চূণ থাকায় জমির আমোনিয়া ও পটাস বিমুক্ত হইয়া পড়ে। তখন গাছ ইহা অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারে। এতদ্বারা আলুতে হাড়চূর্ণ ব্যবহারের ইহাও একটা কারণ বুঝা যাইতেছে। বর্দ্ধমান-ক্ষেত্রে আলুর চাষে রেড়ীর খৈলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সার বলিয়া পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছে। রেড়ীর খৈলে নাইট্রোজেন, ফস্ফরিক অম্ল ও পটাস তিনটাই আছে। তবে ফস্ফরিক অম্লও পটাসের মাত্রা অপেক্ষকৃত কম। ঐ মাটিতে স্বভাবতঃ পটাস অধিক থাকিতে পারে, সেই জন্য অন্য সার অপেক্ষা রেড়ীর খৈলে অধিক কার্য্য করিয়াছে। রেড়ীর খৈলের আর একটা গুণ, ইহা শীঘ্র গলে এবং ইহাতে উদ্ভিজ্জ পদার্থ থাকায় জমির মাটি আল্গা করে। সমস্ত খৈল সারের ঐ সকল গুণ আছে, তন্মধ্যে রেড়ীর খৈল অধিক তেজস্কর। যে কোন ফসল উৎপন্ন কর না, তাহাতে জমির অবস্থা বুঝিয়া সার পূরণ করিয়া দিয়া উদ্ভিদের খাদ্য যোগাইতে হইবে, তবে ফলনও মাত্রায় বেশী হইবে।

নিম্নে আলুতে কতকগুলি পরীক্ষিত সারের উল্লেখ করা গেল।

Mr. B. Leslie Emslie C.D.A. (Glas.) F.C.S. পরীক্ষিত সার—

একর প্রতি

নাইট্রোজেন	১৫০ পাঃ নাইট্রেট অব্ সোডা বা ১২০ পাঃ সলফেট অব্ আমোনিয়া বা ৮০০ পাঃ গোয়ালের আবর্জ্জনা সার
ফস্ফরিক এসিড	৩০০ পাঃ এসিড ফস্ফেট বা ৩৫০ পাঃ বাসিক স্লাগ্ বা ৩৫০ পাঃ বোন্ সুপার
পটাস	১৫০ পাঃ মিউরিয়েট অব্ পটাস ৮০০ পাঃ গোময় ছাই

ইংলণ্ডের বিখ্যাত আলু উৎপাদনকারী—সটন সাহেব একর প্রতি সহরের আবর্জ্জনা ১৫ টন ও উপযুক্ত মাত্রায় ছাই দিতে বলেন। এক টনের ওজন ২৭ মণ।

ধান্যের উপরা ব্যাধি—শ্রীনফরচন্দ্র দাস রায়, গোরাবাজার, বহরমপুর।
মহাশয়ের গত পৌষমাসের কৃষকে ২৬৭ পৃষ্ঠায় "ধান্যের ব্যাধি নামক" নামক প্রবন্ধে নোয়াখালি, ত্রিপুরা ও ঢাকা জেলার অধিকাংশ স্থলে ধান্যের "পাতা উপরা" "থোড় উপরা" ও "পাকা উপরা" নামক ব্যাধির উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে "যে ধান্যে "উপরা" ব্যাধি হয় নাই এরূপ বীজ বপন করা উচিত।" এ সম্বন্ধে অদ্য লণ্ডনের "দি নিয়ার ইষ্ট" (The Near East) নামক কাগজের ২রা জানুয়ারী ১৯১৪ সাল, ৩০৫ পৃষ্ঠায় তুলার বীজের "পিঙ্ক বল্ ওয়ার্ম" (Pink Boll Worm), নামক পোকার প্রতিকারের নিমিত্ত লিখিত হইয়াছে যে, সাড়ে বার সের জলে এক তোলা "সাইলিন্" (Cyllin) গুলিয়া তাহাতে দুই ঘণ্টাকাল তুলার বীজ ভিজাইয়া রাখিলে সমস্ত বীজগুলি নির্দ্দোষ হইবে এবং জলে ভিজাইলে যেরূপ বীজ অঙ্কুরিত হয়, ইহাতেও ঠিক সেইরূপ হইবে। যদি ছয় ঘণ্টা পর্য্যন্তও ঐরূপ বীজ ভিজান থাকে তাহাতেও বীজের অঙ্কুর উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইবে না। কিন্তু ভিজা মাটিতে ঐ বীজ বুনিতে হয়, কারণ শুক্‌না মাটিতে অঙ্কুরিত বীজ বুনিলে, অঙ্কুর শুকাইয়া যায়। এক্ষণে যে যে স্থানের ধান্যে উপরা ব্যাধি হইতেছে তথাকার বীজধান্য, বুনিবার পূর্ব্বে তাহা উপরোক্ত রূপ "সাইলিন্" মিশ্রিত জলে দুই ঘণ্টা হইতে ছয় ঘণ্টা পর্য্যন্ত ভিজাইয়া বুনিয়া দেখিলে ভাল হয়।

সার-সংগ্রহ

ঋণ-দান-সমিতি

আমাদের দেশে এখন শতকরা আশী জন কৃষিজীবী। নানা কারণে আমাদের কৃষক সম্প্রদায় দারিদ্র্য পীড়িত ও ঋণজালে জড়িত।

এ কৃষককুলের রক্ষা-কল্পে আমাদের দেশে "কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি" বা সমবায় ঋণ-সমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কৃষককুলকে অনেক সময় অমানুষিক অতিরিক্ত সুদে মহাজনদিগের নিকট হইতে ঋণ করিতে হয়। ফলে কৃষককুল ঋণ-জালে এমনই জড়াইয়া পড়ে যে, তাহা হইতে তাহাদের সহজে উদ্ধার পাইবার উপায় থাকে না। এইরূপ ধারণার বশে ঋণ-সমিতির প্রতিষ্ঠা। কৃষককুল চিরকালই মহাজন-সম্প্রদায়ের নিকট ঋণগ্রস্ত।

তাহাদের রক্ষাকল্পে ঋণ-সমিতির প্রতিষ্ঠা, এ ঋণ-সমিতির প্রতিষ্ঠা বা কার্য্যকরণ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা কৃষকমাত্রেরই যে আছে, এমন কথা বলা যায় না। এখনও যে অনেকেই ইহার উপকারিতা বা সুবিধা উপভোগ করিবার সুযোগ পায় নাই বা পাইতেছে না।

তবে ঋণ-সমিতির দ্বারা যে অনেক উপকার হইতেছে এবং ক্রমে যে ইহার কার্য্যপ্রসারণ হইয়া উঠিতেছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। ফসল বা নগদ টাকায় ঋণ দেওয়া ব্যবস্থায় অনেকেরই উপকার হইতেছে। এ সমিতির কার্য্যব্যাপারে দেশের লোক যে একটা সমজোটতার পরিচয় দিতেছে বা দিতে শিখিয়াছে বা পরিচয় দিতে পারিতেছে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। এবার বুঝিবার একটা সুযোগও ঘটিয়াছে।

এই ঋণ-সমিতি সম্বন্ধে প্রত্যেক বৎসর একটী করিয়া "কনফারেন্স" বা পরামর্শ সমিতি হইয়া থাকে। বার বার এইবার ছয় বার হইল। বিগত পরামর্শ সমিতির অধিবেশনকালে লাট বাহাদুর লর্ড কারমাইকেল উপস্থিত ছিলেন। অনারেবল লায়ন সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। নানা স্থান হইতে নানা লোক আসিয়া সভায় উপস্থিত ছিলেন।

লর্ড কারমাইকেল সমবেত প্রতিনিধিবর্গকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি পূর্ব্বাপর আপনাদিগের কার্য্যপ্রণালী বিশেষ আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। সমিতির অবস্থা সম্বন্ধে আপনারা আমার অপেক্ষা অধিকতর অবগত আছেন। আমার এই মাত্র মনে হয়, নূতন স্থানে কর্ম্মক্ষেত্র গঠন করিবার পূর্ব্বে পুরাতন কর্ম্মক্ষেত্রগুলিকে অধিকতর কার্য্যোপযোগী করিবার চেষ্টা করা উচিত। বিগত এক বৎসরে আপনাদের সভার সংখ্যা শতকরা ২০ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সমিতির সভ্যসংখ্যা দ্বিগুণ ও সমিতির মূলধন ৪ গুণ হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমান হয় যে, পুরাতন সভাগুলির কার্য্যক্ষেত্র ও অর্থবল খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। আর একটী আনন্দের কথা এই যে, সমিতি যে ঋণ প্রদান করিয়াছেন, তাহার সমস্ত আদায়ের সম্ভাবনা হইয়াছে। অনুমান ১২॥০ লক্ষ টাকার মধ্যে কেবল মাত্র ২৫,০০০ হাজার ব্যতীত আর সমস্ত টাকাই নিয়মিত সময়ে আদায় হইয়াছে। এখন সমগ্র প্রদেশের মধ্যে আর্থিক আদান প্রদানের জন্য একটী কেন্দ্রসভা গঠন করা প্রয়োজন হইয়াছে। আপনারা দেশের কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, সুতরাং ইহাদিগের সাহায্যে আপনাদিগের আর্থিক অবস্থা ভাল করিবার সম্ভাবনা নাই। বাঙ্গলা দেশের কৃষক সম্প্রদায়কে যে সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ঋণ প্রদান করিতে হয়, ঠিক সেই সময়ে দেশের শিল্প ও ব্যবসায়গুলিকেও সাহায্য করার প্রয়োজন হইয়া থাকে। সুতরাং এই উভয় দিকের অভাব পূর্ণ করিবার জন্য আপনারা এককেন্দ্র সভা গঠন করিয়া

অর্থ সরবরাহের সুবন্দোবস্ত করুন। ইউরোপের জনসাধারণ সমবায় ও সাহচর্য্যের দুর্জ্জয় শক্তি অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছেন—ভারতের জনসাধারণও এই শক্তি অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইউরোপের ন্যায় ভারতবর্ষেও এ বিষয়ে জনসাধারণের ও দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। এখন সকলেই বুঝিয়াছেন, এই একমাত্র উপায়ে বাঙ্গলার কৃষকগণকে দারিদ্র্যের গভীরতম পঙ্ক হইতে উদ্ধার সাধন করিতে হইবে। আমি অনেক ভারতবাসীর সহিত আলাপ করিয়া অবগত হইয়াছি, ভারতের কোটী কোটী লোক দিবসে এক বারের অধিক আহার করিতে পায় না। আরও কোটী কোটী লোক এরূপ গভীর দরিদ্রতার মধ্যে নিমজ্জিত যে, খাদ্যশস্যের মূল্য সামান্য বৃদ্ধি হইলেই তাহাদিগের নিরতিশয় কষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদিগের আদৌ অর্থবল নাই, সুতরাং সামান্য আর্থিক বিপর্য্যয়েই ইহারা কাতর হইয়া পড়ে। গবর্ণমেণ্ট এইরূপ দরিদ্রতা দূর করিতে সর্ব্বতোভাবে সক্ষম নহেন। সমগ্র দেশের অর্থনীতির পরিবর্ত্তন ও উন্নতি সাধন করিতে পারিলেই ইহার মীমাংসা হইতে পারে। আমার বিশ্বাস আপনারা সমবায় ঋণদান সমিতির চেষ্টায় উহা সম্ভবপর করিতে পারিবেন। আমরা প্রকৃতই এমন এক বিরাট আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, যাহাতে ভারতের আর্থিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন হইবে এবং পরের প্রতি দয়া ও সহানুভূতিতে অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য্য করিবার শিক্ষা প্রদান করিবে। পরস্পরের উন্নতি চেষ্টা ও উন্নতি সাধনের ফলেই যে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে, আমরা কর্ম্মের মধ্য দিয়া তাহা উপলব্ধি করিতে পারি। আমার বিশ্বাস বাঙ্গলার যুবকগণ এই পবিত্র কার্য্যভার গ্রহণের জন্য সম্পূর্ণ ভাবে উপযোগী। যখন বন্যার ফলে বর্দ্ধমান বিভাগের অনেক স্থান ভাসিয়া গিয়াছিল, তখন তাঁহারা কিরূপ অপূর্ব্ব একপ্রাণতার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন, এখনও বন্যাপ্লাবিত মেদিনীপুরে তাঁহাদিগের মঙ্গলহস্ত নিয়োজিত রহিয়াছে! বন্যার সময়ে যুবকগণ যে মহাপ্রাণতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতেই আমি তাঁহাদিগের পরার্থে আত্মোৎসর্গের প্রবৃত্তি অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছি। যুবকদিগের সাহায্যে এরূপ সমাজ সেবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে উহাতে দেশের অসীম উপকার সাধিত হইবে—আমি বাঙ্গলার যুবকগণকে এই মহৎকার্য্যের জন্য আহ্বান করিতেছি।"

যুক্তপ্রদেশে দুর্ভিক্ষ—গভর্ণমেণ্ট পূর্ত্তকার্য্যে প্রায় ৩০ হাজার লোক খাটিতেছে। কাজ করিতে অশক্ত প্রায় ৩৬ হাজার লোককেও অর্থ সাহায্য করা হইতেছে।

গভর্ণমেণ্ট কূপ খনন, বাঁধ নির্ম্মাণ করাইতেছেন, কারণ স্থানে স্থানে অন্নকষ্ট অপেক্ষা পানীয় জলের কষ্ট প্রতি বৎসরই অনুভূত হয়। গবাদির খাদ্য শস্য ক্রয়ের জন্য সরকারি দাদন দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

বাগানের মাসিক কার্য্য

চৈত্র মাস

সব্জীবাগান।—উচ্ছে, ঝিঙ্গে, করলা, শশা, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি দেশী সব্জী চাষের এই সময়। ফাল্গুন মাসে জল পড়িলেই ঐ সকল সব্জী চাষের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হয়। তরমুজ, খরমুজ প্রভৃতির চাষ ফাল্গুন মাসের শেষে করিলেই ভাল হয়। সেই গুলিতে জল সেচন এখন একটী প্রধান কার্য্য। ঢেঁড়স ও স্কোয়াস বীজ এই সময় বপন করিতে হয়। ভুট্টা দানা মাসের শেষ করিয়া বসাইলে ভাল হয়। গবাদি পশুর খাদ্যের জন্য অনেক সময় গাজর ও বীটের চাষ করা হইয়া থাকে। সে গুলি ফাল্গুনের শেষেই তুলিয়া মাচানের উপর বালি দিয়া ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিতে হইবে। ফাল্গুনে ঐ কার্য্য শেষ করিতে না পারিলে চৈত্র মাসের প্রথমেই উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করা নিতান্ত আবশ্যক। আশু বেগুনের বীজ এই সময় বপন করিতে হয়। কেহ কেহ জলদি ফলাইবার জন্য ইতিপূর্ব্বে বেগুন বীজ বুনিয়া থাকে।

কৃষিক্ষেত্র।—এই মাসে বৃষ্টি হইলে পুনরায় ক্ষেত্রে চাষ দিতে হইবে এবং আউশ ধানের ক্ষেত্রে সার ও বাঁশ ঝাড়ে, কলা গাছে ও কোন কোন ফল গাছে এই সময় পাঁকমাটী সার দিতে হয়। এখানে বাঁশের পাইট সম্বন্ধে একটী প্রবাদবাক্য লোককে স্মরণ করাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। "ফাল্গুনে আগুন, চৈত্রে মাটী, বাঁশ রেখে বাঁশের পিতামহকে কাটি।" বাঁশের পতিত পাতায় ফাল্গুন মাসে আগুন দিতে হয়, চৈত্র মাসে গোড়ায় মাটী দিতে হয় এবং পাকা বাঁশ না হইলে কাটিতে নাই।

এই মাসেই ধঞ্চে, পাট, অড়হর, আউশ ধান বুনিতে হয়।—চৈত্রের শেষে ও বৈশাখ মাসের প্রথমে তুলা বীজ বপন করিতে হয়। ফাল্গুন মাসেই আলু তোলা শেষ হইয়াছে। কিন্তু নাবী ফসল হইলে এবং বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত শীত থাকিলে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা যাইতে পারে।

ফুলের বাগান।—বিলাতী মরসুমি ফুলের মরসুম শেষ হইয়া আসিল। শীতেরও শেষ হইল, গোলাপেরও ক্রমে ফুল কমিয়া আসিতেছে; এখন বেল, মল্লিকা, জুঁই ফুটিতেছে। এই ফুলের ক্ষেত্রে জল সেচনের বিশেষ বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। শীতপ্রধান পার্ব্বত্য প্রদেশে মিগ্নেনেট, ক্যাণ্ডিটাফ্‌ট, পপি, ষ্টারসম, ফ্লক্স প্রভৃতি ফুলবীজ এই সময় বপন করা চলে। পার্ব্বত্যপ্রদেশে এই সময় সালগম, গাজর, ওলকপি প্রভৃতি বীজ বপন করা হইতেছে, আলু বসান হইতেছে।

ফলের বাগান।—ফলের বাগানে জল সিঞ্চন ব্যতীত এখন অন্য কোন বিশেষ কার্য্য নাই। জলদি লিচু যাহা এই সময় পাকিতে পারে, সে লিচু গাছে জাল দ্বারা ঘিরিতে হইবে।

কৃষক

কৃষি শিল্প সংবাদাদি বিষয়ক মাসিক পত্র।

১৪শ খণ্ড। } চৈত্র, ১৩২০ সাল। { ১২শ সংখ্যা।

আয়ুচর্য্যা ও সুস্থ থাকিবার পন্থা

জনৈক সুচিকিৎসক লিখিত

প্রাতঃকালে দাঁতন কাষ্ঠের দ্বারা দন্ত সকল পরিষ্কার করা আবশ্যক। দাঁতন কাষ্ঠ চারি প্রকার,—কষায়, মধুর, তিক্ত এবং কটু। তিক্তের মধ্যে নিম্ব শ্রেষ্ঠ কষায়ের মধ্যে খদির, মধুর মধ্যে মৌল্ ও কটুরসের মধ্যে করঞ্জ। এই চারি প্রকার দাঁতন কাষ্ঠের মধ্যে শ্লেষ্মা প্রকৃতির ব্যক্তি কটুরাগ বিশিষ্ট বৃক্ষের দাঁতন করিবেন। পিত্ত প্রকৃতির ব্যক্তি মধুর রস বিশিষ্ট এবং বায়ু প্রকৃতির ব্যক্তি কষায় রস বিশিষ্ট দাঁতন করিবেন।

মধু, ত্রিকটু, ত্রিফলা, গজপিঁপুল, তৈল ও সৈন্ধব লবণ এই সকল চূর্ণ সহযোগে দাঁতন কাষ্ঠের দ্বারা নিত্য দন্ত মার্জ্জনা করিবে ও জিব ছুলিবে। সাবধান যেন দন্ত মূলের মাংস ক্ষত না হয়। এইরূপ দন্ত ধাবন করিলে মুখের নির্ম্মলতা, অন্নেরুচি, মনের প্রফুল্লতা আনয়ন করে।

নিষেধ। গলরোগে, তালুরোগে, ওষ্ঠ রোগে এবং জিহ্বা রোগে দাঁতন করা নিষিদ্ধ। তাহাদের পক্ষে উল্লিখিত চূর্ণ, তৈল দ্বারা দন্ত মার্জ্জনা বিধেয়।

কিম্বা গেরিমাটী, চা খড়ি, আমলা, তেজপাতা, দারুচিনি, এলাইচ, সমুদয় চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত দগ্ধ সুপারী গুঁড়া করিয়া দিবেন; পরে কিছু কর্পূর দিয়া মাজন প্রস্তুত করিয়া দন্ত ধাবন করিবেন।

সরিষার তৈলের কুলকুচা করিলে মুখের বৈরস্য, দুর্গন্ধ ও জড়তা দূর হয়।

ব্যায়াম—ব্যায়াম করিলে শরীরের স্বচ্ছন্দতা, মনে সুখ অনুভব ও দেহ স্নিগ্ধ হয়। সকল অঙ্গ সমভাবে বৃদ্ধি পায়, দেহের কান্তি বৃদ্ধি, দিপ্তাগ্নি, নিরালস্য দৃঢ়তা, লঘুতা, শ্রম, ক্লম, তৃষ্ণা, শীত এবং উষ্ণ এই সমুদায় ক্লেশে সহিষ্ণুতা গুণ

উৎপন্ন হয়। ব্যায়ামের দ্বারা আরোগ্য লাভ হয়, দেহের স্থূলতা নিবারণ করে, জ্বরে হঠাৎ আক্রমণ করিতে পারে না। ব্যায়াম শালী ব্যক্তির দেহের মাংস দৃঢ় হয়। এইজন্য সকলের পক্ষে ব্যায়াম হিতকারী। শক্তির অর্দ্ধ মাত্রানুসারে ব্যায়াম কর্ত্তব্য অর্থাৎ হাঁপাইলেই ব্যায়াম করা হইল মনে করিবে। রক্তপিত্ত, কৃশ, শোষ রোগী, শ্বাস, কাশ এবং ক্ষতরোগীর পক্ষে ব্যায়াম নিষিদ্ধ।

তৈল লেপন—সুশ্রুতোক্ত শীতল তৈল মস্তকে মাখিলে শিরোরোগ প্রশমিত হইয়া কেশ বর্দ্ধিত হয় ও উকুন, মরামাস প্রভৃতি জন্মায় না। তৈল ব্যবহারে সর্ব্বশরীরের ক্লেদ দূর হইয়া লোমকূপের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়।

স্নান—স্নান করিলে আহারে রুচি, মলনষ্ট, সমুদায় ইন্দ্রিয় শোধিত হইয়া মনের প্রফুল্লতা, পুরুষত্ব লাভ হইয়া থাকে। নিজের দেহের দোষ ও বায়ুর প্রকোপ বুঝিয়া শীতল বা উষ্ণ জলে স্নান করা বিধি।

শীতকালে অত্যন্ত শীতল জলে স্নান করিলে, শ্লেষ্মা ও বায়ু কুপিত হয়। গ্রীষ্মকালে গরম জলে স্নান করিলে পিত্ত ও রক্ত কুপিত হয়।

অনুলেপন—সৌভাগ্যকর, বর্ণকর, প্রীতি এবং বলবর্দ্ধন কর। স্বেদ, দৌর্গন্ধ, শ্রম ও ক্লম নাশক।

আহার—আহারে প্রীতি, বল, আয়ু, তেজ, উৎসাহ, স্মৃতি বর্দ্ধন হয়। যেমন ক্ষুধা থাকিবে তাহার অর্দ্ধেক মাত্রায় আহার করা কর্ত্তব্য। অপরার্দ্ধ বায়ু ও জলের জন্য খালি রাখিতে হইবে। সমাগ্নি ব্যক্তির দিবসে একবার ও রাত্রে একবার অন্ন ভোজন হিতকারী। দুর্ব্বল দিগের পক্ষে এক কালীন আহার হিতকর।

তাম্বুল সেবন বিধি—কর্পূরাদি দিয়া তাম্বুল খাইলে মুখের নির্ম্মলতা সুগন্ধি ও দেহের ক্লান্তি এবং শোভা বর্দ্ধন হয়।

পদ প্রক্ষালনে—পদের ময়লা নষ্ট, শ্রমদূর, দৃষ্টির প্রসন্নতা ও মনের প্রফুল্লতা হয়।

পদে অভ্যঙ্গ—প্রদান করিলে নিদ্রা, শরীরের সুখানুভব, প্রখর দৃষ্টি ও পদের ত্বক কোমল হয়।

নেত্র অঞ্জন—নেত্রে অঞ্জন প্রদান করিলে নেত্র দাহ, কুণ্ড, মলনাশ, ক্লেদ ও বেদনার শান্তি হইয়া দর্শন শক্তি বৃদ্ধি করে ও কোনরূপ নেত্রপীড়া হয় না।

স্বচ্ছন্দ শয়ন ও উত্তম উপবেশনে শ্রম ও বায়ুর শান্তি হয়। তদ্বারা শরীরের পুষ্টি, সুখ নিদ্রা এবং মনের ধারণাশক্তির উন্নতি হইয়া থাকে। পশ্চিম শিওর হইয়া শয়ন করিবে না।

দেহের কেশ, নখ, এবং রোম কামাইলে মনে আনন্দ জন্মে ও উৎসাহ বাড়ে।

মস্তকে আবরণ ধারণ করিলে আঘাত, বায়ু, আতপ, ধুলি লাগেনা ও বর্ণ, তেজ, বল এবং কেশ বৃদ্ধি হয়। ছত্রধারণে বৃষ্টি, হিম, আতপ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, দৃষ্টি প্রসন্ন হয়।

যষ্টি ব্যবহারে—হিংস্রক জন্তুর ভয় থাকে না। শ্রমের লাঘব হয়। এবং পদস্খলন হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। পথ ভ্রমণে শরীরের স্থূলতা দূর হয়।

বাগানের বেড়া

শ্রীশশীভূষণ সরকার লিখিত।

সম্পাদক মহাশয় বড় বিস্তৃত উদ্যান রচনা করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। বাগানের বেড়া দিলেন না। আমি তাঁহার বাগানটায় বেড়া দিয়া দিতে পারি কি না তাহারই চেষ্টা করিব। বাগান রচনার সময় বাগানের বেড়ার কথা মনে পড়ে। গো, মহিষ, ছাগল, ভেড়া বাগানে ঢুকিয়া বাগানের চারা সকল নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারে। তোমার দুই, তিন বা ততোধিক বৎসরের পরিশ্রম এক মুহূর্ত্তে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। তোমার বিস্তৃত বাগানে স্থানে স্থানে সব্জী চাষ করিতে হইবে। বন্য বরাহ বা শিয়ালের উৎপাতে তোমার সব্জী ক্ষেতের তছরুপ হইতে পারে। বাগানের মৃত্তিকা সারবান করিবার জন্য তোমাকে বৃক্ষাদির অন্তরালে ও তল দেশে শণ ধঞ্চে বুনিতে হইবে, কিম্বা কলাই বা মাট কলাইয়ের চাষও তুমি করিবে, বাগানের মধ্যে নিচু জমি পাইলে তাহাতে ধান্য রোপণ করিতে তুমি ছাড়িবে না কিন্তু পালে পালে হরিণ শশকাদি আসিয়া তোমার ফসল নষ্ট করিয়া দিবে। ইহার প্রতিকার কি? ইহার প্রতিকার করিতে হইলে বাগানে বেড়া দিতে হয়। বাগান ছোট হইলে এ সমস্যার মীমাংসা সহজেই হয় কিন্তু দুই পাঁচ কিম্বা দশ হাজার বিঘা বড় ফলের বাগানের বেড়া একটা বড় ব্যাপার। তুমি হয়ত বলিবে যে বেড়া দিতে পয়সা খরচ হইবে, কিন্তু তাহা যে অবশ্য কর্ত্তব্য। অধিক মূলধন যোগাড় না হইলে বড় বাগান রচনা করিতে যাওয়া ভুল। যে খরচ অবশ্য কর্ত্তব্য তাহার জন্য কৃপণতা করিলে চলিবে কেন? সত্য কথা—ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মূলধন নিয়োগ করা একান্ত প্রয়োজন, মূলধনের একটি পয়সাও বাজে খরচ না হয় ইহা দেখিতে হইবে। কিন্তু তোমার মনে থাকে যেন যে, ফলের বাগান রচনা করিয়া তিন চারি বৎসর কাল তোমার পরিশ্রমের সম্পুর্ণ ফল তুমি পাইবে না। তৃতীয় বৎসরে তোমার খরচের মত টাকাটা উঠিতে পারে কিন্তু তখনও তুমি লাভের মুখ দেখিতে পাইবে না। টাকাটা ব্যাঙ্কে রাখিয়া সুদে খাটাইলে যে

লাভ হইত তাহাও হইবে না। ভবিষ্যতে এক গুণের পরিবর্ত্তে দশ গুণ লাভ হইবে বলিয়া ঘরের টাকা জমিতে ছড়ান হইয়াছে। লাভের আশাও যেমন বলবতী, টাকাটা লোকসানের ভয়ও তাহার পিছনে তেমনি ঘনীভূত হইয়া থাকে। এমন অবস্থায় তোমাকে যদি বলা যায় যে তুমি মূলধনের অষ্টমাংশ বেড়ায় খরচ কর, সে কথা তোমার কাণে পৌঁছিবে মাত্র, মনে লাগিবে না কিন্তু তুমি হয়ত স্বচ্ছন্দ মনে শতাংশের একাংশ বেড়ায় খরচ করিতে পার, কেন না ভবিষ্যতে দশগুণ লাভের আশা তোমার আছে অতএব তোমায় সহজে, কম খরচে বাগান রক্ষা করিবার উপায় চিন্তা করিতে হইবে।

মেহদী, ডুরেন্টা, চিতা, গাবভেরেণ্ডা পারিজাত বা মাদার এই সকল গাছের সুন্দর বেড়া হয়। বেড়ার গাছে কাঁটা থাকিলে গরু বাছুর সহজে তাহার ধারে ঘেঁসে না। ডুরেণ্ডা, ইঙ্গাডলসিস্, মাদার গাছে কাঁটা আছে। এইজন্য এই গুলি বেড়ার পক্ষে অধিক উপযোগী। অত বিস্তৃত স্থানে যে একই রকমের বেড়ার গাছ লাগাইয়া বেড়া সহজে প্রস্তুত করিয়া লওয়া যায় তাহা কখন মনে ভাবিও না। আর্দ্র স্থান না হইলে ডুরেন্টা বা ইঙ্গাডলসিসের বেড়া শীঘ্র বাড়িয়া উঠে না। মাদার গাছ অপেক্ষাকৃত শুষ্ক মাটিতে জন্মে। ডুরেন্টা, ইঙ্গাডলসিসের বেড়া ঘন ঘন ছাঁটিতে না পারিলে গাছ বাড়িয়া জমি আওতা করিয়া ফেলে। গাব-ভেরেণ্ডা ইহা এক প্রকার বুনা ভেরেণ্ডা বা এরণ্ড। ইহার বেশ ভাল বেড়া হয় বটে কিন্তু ফল পাকিবার পূর্ব্বে বেড়া না ছাঁটিলে, ফল ফাটিয়া বীজ চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হয় এবং বাগানের ধারে অনেক দূর পর্য্যন্ত গাব-ভেরেণ্ডার বন হইয়া যায়।

বাগানের উত্তর দিকে দেবদারু বা ঝাউ গাছ বসাইয়া তাহার গায়ে কাঁটা তার চালাইয়া বেড়া দেওয়া যায়। দেবদারু, ঝাউ প্রভৃতি গাছ বেশ সরল সোজা হইয়া উঠে এবং এইগুলি শীঘ্র বাড়ে। ইহাদের তক্তায় বহু প্রয়োজনীয় কার্য্য সাধিত হয় সুতরাং এই বেড়ার ধারের গাছ গুলিতে ভবিষ্যতে একটা আয়ের পন্থা হয়। বড় গাছের মাঝে মাঝে ছোট চারা বসাইয়া নূতন গাছ জন্মাইয়া বড় গাছগুলি কাটিতে হয়। বেড়া ঠিক থাকিবে, তখন নূতন গাছে তার সংলগ্ন করা হইবে।

বেউড় বাঁশেরও বেশ ঘন বেড়া হয়। এই বাঁশের গায়ে কাঁটা আছে। ইহার বেড়া অতিক্রম করিয়া গো মহিষও ঢুকিতেই পারে না এমন কি চোরেও এ বেড়া ভেদ করিতে পারে না; ইহা দুর্ভেদ্য। কিন্তু ইহার বেড়াতেও জমির আওতা হয় এবং মাটি টান বা শুষ্ক হয়। অকেজো জায়গার ধারে আশে পাশে যতদূর সম্ভব ইহার বেড়া রচনা করা মন্দ নহে।

বাগানের ধারে ধারে জিবালীর খুঁটি পুতিয়া তাহাতে কাঁটা তার বাঁধিয়া বেড়া দিবার পদ্ধতি বাঙলা দেশে কোথাও কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়। জিবালী

গাছ খুব শীঘ্র বাড়ে। ইহার কাষ্ঠ কিন্তু আট দশ বৎসরে ব্যবহার উপযোগী হয় না অথচ ইহার শিকড়ের টানে জমি শুষ্ক হইতে থাকে। তবে যদি একটা কৌশল করা যায় তা'হলে জিবালীকে বিশেষ কার্য্যোপযোগী করিতে পারা যায়। জিবালীর খুঁটী লাগাইয়া বেড়া দিয়া মধ্যে মধ্যে গুপারি চারা বসাইয়া গাছ তৈয়ারি করিয়া লইলে ভবিষ্যতে সেই গুলিই খুঁটির কার্য্য করিবে তখন জিবালীগুলি কাটিয়া ফেলিলেই চলে। কিন্তু সর্ব্বত্র গুপারি জন্মিবে না। কোথাওবা গুপারি গাছ বাড়িতে বহু বিলম্ব হয়।

বাগানের সর্ব্বত্র যে গাছ বসাইয়া বেড়া দেওয়া সম্ভব তাহা নহে। কোথাও খুব গভীর পগার কাটিয়া, কোথাও ঝিল কাটিয়া, কোথাও মাটির চাপ দিয়া উঁচু করিয়া পাহাড় বাঁধিয়া বাগান রক্ষা করিতে হয়। যদি সরস মাটি পাওয়া যায় তবে পগারের ধারে ধারে আনারসের আবাদ করিলে গবাদি পশু হইতে বাগান রক্ষার অধিকতর সুবিধা হয়।

বেহার, যুক্তপ্রদেশ ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বাগানের পাহাড়ের উপর ফণী মনসার গাছ বসাইয়া বাগানের বেড়া রচনার বিধি আছে। ফণী মনসার গাছ খুব অনাবৃষ্টি সহ, সেইজন্য শুষ্ক প্রদেশে বেড়া দিবার পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী। কিন্তু বেড়া ছাঁটা নিতান্ত প্রয়োজন। বিশেষতঃ এই রকম গাছের বেড়া। নতুবা মনসা তাহার অধিকার বিস্তার করিয়া বাগানের মধ্যস্থলে আসিয়া হাজির হইবে। যাহাদিগকে বাগানের রক্ষা কল্পে সৃজন করিলে তাহাদিগকে দমনে রাখিতে না পারিলে তাহারা তোমার বাগানের সত্বভোগী হইয়া তোমারই সর্ব্বনাশ করিবে।

বাগানের ধারে, পগারের ধারে অরহর কড়াইয়ের বেড়া দেওয়া মন্দ পরামর্শ নহে। ইহাতে বেড়া দেওয়া ও বেড়ার মেরামতের আয় উঠিয়া যায়। এক বৎসর অরহর গাছ করিলে তিন বৎসর বা ততোধিক কাল সেই গাছ সজীব থাকিতে পারে। গাছগুলি সোজা রাখিবার জন্য তাহাদের গায়ে বাঁশের চটা বা বাখারি বাঁধিয়া দিতে হয়। বাঙলা দেশের সরস মাটিতে তিন বৎসরেরও অধিক গাছগুলি সজীব থাকে। কিন্তু অন্যত্র শুষ্ক প্রদেশে এক দুই বৎসরের অধিক জীবিত থাকে না। অরহর একটা খন্দ, প্রতি বৎসর ইহার চাষে অলাভ নাই। এক লাইন গাছ কাটা হইতে না হইতে আবার তার পাশে নূতন এক লাইন লাগান হইল। এই প্রকারে চির দিনই বেড়া ঠিক করিয়া রাখা যায়।

বাগানের ধারে কাসাভা, শিমুল, আলুর চাষ করিলেও বেড়ার সমস্যা মিটিয়া যায়।

আর এক প্রকারে লাভজনক বেড়ার সৃজন হইতে পারে। কাগজী, গোঁড়া প্রভৃতি লেবু গাছের গায়ে কাঁটা আছে। ইহাদের পাতা বা ডাল সাধারণতঃ

গবাদিতে খায় না। লেবু গাছ বসাইয়া বেড়া তৈয়ারি করিয়া লওয়া কিছু সময় সাপেক্ষ। ৪ বা ৫ বৎসরের কম গাছগুলি তৈয়ারি হইয়া উঠিবে না। গাছগুলি খুব ঘন বসাইলে কিন্তু ফল ভাল হইবে না। ঘন না হইলে আবার বেড়া হয় না, সুতরাং একটু কৌশলে এই বেড়ার কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। কৌশল— গাছের ডালগুলি ছাঁটিয়া বাঁকাইয়া, বাঁধিয়া বেড়ার আকৃতি করিয়া লওয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। একবার কিন্তু লেবুর বেড়া জন্মাইয়া তুলিতে পারিলে, বেড়া হইতেই বিশেষ একটা আয় হইয়া যায়।

এতক্ষণ আমরা কাজের বাগানে কার্য্যোপযোগী বেড়ার কথা বলিতেছিলাম। আমাদের দরকার ছোট ফলের গাছগুলিকে গবাদি পশুর কবল হইতে রক্ষা করা, মানুষও অবাধে বাগানে প্রবেশ করিয়া ফল চুরী বা নষ্ট করিতে না পারে তাহা দেখা। এই কারণে আমাদের কাঁটা বেড়ার আবশ্যক, এই কারণে আমাদের স্থানে স্থানে গভীর পগার কাটা আবশ্যক, কোন দিকে পাহাড় পাইলে তাহার গায়ে যদি সম্ভব হয় মুর্গা বা লতা গোলাপের চাষ করিয়া সেই দিকটা গরু মানুষের পক্ষে দুর্ভেদ্য করিয়া রাখা প্রয়োজন, কোন দিকে জল স্রোত পাইলে তাহার পাহাড় উচ্চ করিয়া বাঁধা উচিত। সখের বাগানে কিন্তু সৌখিন বেড়া দিতে হইবে।

বেড়া সৌখিন হইলে যে একবারে অকেজো হইবে একথা আমরা বলি না। মেহদির বেড়া ছাঁটিয়া তৈয়ারি করিতে পারিলে ঘন দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মত হয়। তবে তাহাতে অপেক্ষাকৃত অধিক সময়, অধিক পরিশ্রম, অধিক ব্যয়ের আবশ্যক হয়।

এরেলিয়া গাছ গুলি চিতা বা চিত্রার গাছের মত খুব শীঘ্র বাড়িয়া উঠে এবং এই গাছ ছাঁটিয়া ঠিক করিয়া রাখিতে পারিলে বেশ সুদর্শন বেড়া হয়। এই গাছের বেড়ায়ও গো-মহিষ আটকান যায়। গবাদির স্বধর্ম্ম এই তাহারা সম্মুখে একটা যা তা বেড়া দেখিলে বা কোন বাধা প্রাপ্ত হইলে ফিরিয়া যায়। ছাগলের স্বভাব একটু স্বতন্ত্র তাহারা গলিয়া ঘুষিয়া ফাঁক পাইলে তাহার মধ্যে প্রবেশ করে। আবার ছাগলের কিছুই অখাদ্য নহে, লোকে কথায় বলে "ছাগলে কি না খায়, পাগলে কি না বলে"। এইজন্য ছাগল আটকাইতে হইলে একটু বিশেষ সতর্ক হইতে হয়। আমরা কিন্তু জানি যে ছাগলে এরেলিয়ার পাতা খায় না।

একালিফা এক রকম পাতা বাহার গাছ। বেড়ার মত সারিবদ্ধ বসাইয়া ছাঁটিয়া কাটিয়া ইহাদ্বারা বেশ বেড়া তৈয়ারি করা যায়। ইহার ডাল কাটিয়া বসাইলে গাছ জন্মান যায়।

রঙ্গন ফুলের গাছেরও বেশ সুন্দর বেড়া হয় এবং নানা রঙের ফুল ফুটিলে বাগানের অতুলনীয় বাহার হয়। কিন্তু ইহার বেড়া তৈয়ারি করা একটু আয়াস সাপেক্ষ। কামিনীর বেড়া অতি নয়ন রঞ্জন। ঘন রোপিত কাঁচকাটা কামিনী গাছ গুলি সার বদ্ধ দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলে মনে হয়, বিধাতা বুঝি রাত্রে নির্জ্জনে সবুজ প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বেড়ার জন্য ডালছাঁটা গাছে ফুল কমই হয়। যাহা দুই চারিটি হয় তাহাতেই বাগানে আমোদিত করে। ইহার বেড়া প্রস্তুতে কষ্ট আছে।

হোসেনা হেনার বেড়া সহজে হয়। ইহা ডাল পুঁতিলেই গাছ হয়। সদ্য বৎসরে গাছ গজাইয়া মানুষের মাথার সমান উঁচু হয়। ইহার ফুলের গন্ধ একটু তীব্র এই কারণে বাসগৃহ হইতে কিঞ্চিৎ দূরে এই গাছ রোপণ করিতে হয়। দূরাগত গন্ধ বাতাসের সহিত মিশিয়া ঘ্রাণপথে আসিলে মনমুগ্ধ করে।

যে সকল গাছে ফুল হয় এবং ফুলে গন্ধ আছে, সেই সমুদয় গাছের বেড়া দিলে আর একটা লাভ হয়। ফুলে ফুলে পরাগ নিষেক করা মক্ষিকা ও পতঙ্গের কার্য্য। পরাগ নিষেক ব্যতীত ফুলের গর্ভকোষে বীজ সঞ্চার হয় না। উদ্যান সহচর মক্ষিকা কুলকে আকৃষ্ট করিবার জন্য বাগানের ধারে, ভিতে চারি দিকে ফুল ফুটিয়া উঠিলে উদ্যান পালকের বিশেষ সুবিধা হয়। বার মাস কোন না কোন ফোটা ফুল পাইলে মক্ষিকাকুল বাগান ছাড়িয়া কোথাও যায় না, সেখানেই বাসা বাঁধিয়া থাকিতে চায় এবং ফলের ও ফুলের গাছের মধু আহরণ করিয়া উদ্যান স্বামীর একটা নূতন আয়ের পন্থা করিয়া দেয়। সুচতুর উদ্যান স্বামী মক্ষিকুলের সুবিধার্থ উদ্যান মধ্যস্থ ক্ষেত্র গুলিতে সাময়িক শস্যের চাষ করিতে চেষ্টা করেন।

আজ কাল লোহার খুঁটী পুতিয়া কাঁটা তার বা তারের জালের বেড়া দিবার বেশ সুব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু এই বেড়া প্রস্তুত করিতে বিস্তর ব্যয় পড়ে। বিস্তৃত বাগানে এককালে এই রকম বেড়া খাটাইয়া দেওয়া অনেক পয়সার খেলা। সুরুতেই ব্যয় বাহুল্য না করিয়া অবস্থা বুঝিয়া ক্রমশঃ কার্য্য সমাধান করাই সুবিবেচনার কার্য্য। বাগানের মধ্যে আলু, মাটবাদাম, শসা, ফুটী, কাঁকুড়ের চাষ করিতে হইলে তারের জালের নিতান্ত আবশ্যক। অন্য যে কোন বেড়া দাও তাহাতে খরচ অধিক পড়িবে এবং অধিক দিন টিকিবে না এবং তাহার দ্বারা শিয়াল, শুকর, বুনো মুরগী আট্‌কাইতে পারিবে না। বুনো মুরগীর উৎপাতও উপেক্ষার বিষয় নহে।

লতা গোলাপের বেড়া দিলে এবং সেই গোলাপ গাছের সময়মত তদ্বির করিলে তোমার সখ মিটান হইবে এবং হয়ত বেড়ার খরচ উঠিয়া যাইবে।

বেড়া দিলেই কি সর্ব্বতোভাবে বাগান রক্ষা করা হইল এ কথা সম্পাদক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। আমি স্বীকার করি যে, বেড়া দিলেও রক্ষণাবেক্ষণের

জন্য রক্ষী চাই। ঘাটিতে ঘাটিতে মঞ্চ বাঁধিয়া রক্ষীগণ বাগান রক্ষায় নিযুক্ত থাকিবে তবে বাগানের গাছপালা ও ফল রক্ষা হইবে। বেড়া দেওয়া থাকিলে তবে রক্ষীতে বাগান রক্ষা করিতে পারে; নতুবা গো মহিষাদি বা দুষ্ট লোক কোন্ দিক দিয়া বাগানে ঢুকিবে কোথা দিয়া বাহির হইবে, শত রক্ষীতেও তাহা নির্ণয় করিতে পারিবে না। এই জন্য আমি আপনার বাগানে বেড়া দিতে এত ব্যস্ত।

বেড়ার বা বেড়ার খুঁটীর উপযুক্ত গাছ

ডুরেন্টা	...	...	Durenta Ellisia; D. Plumieri. কাঁটা বেড়া হয়।
পারিজাত	...	...	Eranthemum জাতীয়।
পালিতামাদার	...	...	Erythrina জাতীয়, কাঁটা আছে।
মানিলা তেঁতুল	...	...	Inga dulcis. কাঁটা বেড়া হয়।
রঙ্গন	...	...	Ixora. ফুলদার বেড়া হয়।
কামিনী	...	...	Murrya exotica
বিলাতী মেহদী	...	...	Lawsonia alba. লবণাক্ত জমিতে জন্মিতে পারে। ডালে গাছ হয়। ইহার ডালপাতা বাজারে বিক্রয় হয়। পাতায় হাত পায়ে রঙ করে।
মেহদী	...	...	Myrtale, Myrtus জাতীয়।
রাঙচিতা	...	...	Plumbago Capensis
লাল ,,	...	...	Do. rosea
সাদা ,,	...	...	Do. Zeylanica
পাম কেন্টিয়া	...	...	Kentia Palm. ঘন বসাইলে ইহার ঝাড় গুলি বেড়ার মত, এমন কি প্রাচীরের মত দেখায়, বেশ সুদৃশ্য।
গুপারি	...	...	Areca Catechu; খুঁটী হয়।
বাগ ভেরেণ্ডা বা গাব ভেরেণ্ডা		...	Jatropha Gossipifolia.
জিবালী	...	...	Odina woodier. খুঁটীর জন্য ব্যবহার হয়।
দেবদারু	...	...	Bengal pine, ভারতের সমতল ভূমিতে জন্মায়।

দেবতরু বা পাইন বৃক্ষ	...	Cedar, Cedrus deodora পাহাড়ে হয়, গুঁড়িটি লম্বা হইয়া উঠে, কোনটি ৫০ ফিটের কম হয় না।
তাল	... ...	Palmyra palm বেশ খুঁটির কাজ করে।
নারিকেল	... ...	Cocus necifera ,, ,,
বাঁশ	... ...	Bambusa Arundinacea, কাঁটা বাঁশ, China Bamboo—চীনা বাঁশ। ইহাতে সৌখীন সুদৃশ্য বেড়া হয়। অন্য বাঁশের মত ইহার শিকড় ২০।২২ ফিট দূর বিস্তৃত হয় না।
ঝাউ	... ...	Casnarina Muricata—বেলে শুষ্ক জমিতে জন্মে।
ল্যানটানা	... ...	যেখানে বৃষ্টি অধিক হয় তথায় ইহার বেড়া ভাল জন্মে। ডালে গাছ হয়। ছাঁটিয়া রাখিতে না পারিলে বড় জঙ্গল হয়। শাদা ফল হয়।

লতার বেড়া—খুব দূরে দূরে খুঁটা পুতিয়া তাহাতে গাল্‌ভানাইজ্‌ড কিছু মোটা রকমের দুইটি তার খাটাইয়া তাহাতে শতমূলী Asparagus কিম্বা আন্টিগোনা Antigonum leptapus লতা উঠাইয়া দিলে বেশ বেড়া হয়। একটিতে কাঁটা আছে বলিয়া গবাদিতে খায় না, অপরটির পাতার স্বাদ কষায় এই হেতু গবাদিতে খায় না। এই রকমের আরো অনেক লতা আছে, যেমন এই বেড়াতে চোরও আটকান যায়।

বিগ্নোনিয়া ভিনষ্টা	... ...	Bignonia Vinusta— লতা, ইহাতে কাঁটা আছে। সুন্দর ফুল হয়। না ছাঁটিলে জঙ্গলে পরিণত হয়।
গোলাপ	... ...	মার্শাল নীল আদি লতা গোলাপ Climbing roses Noisette

গোলাপেরও বেশ বেড়া হয়। ডালে গাছ হয়। Gigantea গোলাপের এত কাঁটা যে তাহার মধ্য দিয়া সাপও প্রবেশ করিতে পারে না।

বেড়া প্রস্তুত প্রণালী—আচট্ জমিতে বীজ পুতিয়া বা ডাল কিম্বা গাছ দিলেই বেড়া হয় না। সরস মাটিতে বীজ বা গাছ যদি বা প্রথমে গজায় কিন্তু পরে মাটি কঠিন থাকায় তাহারা শিকড়-চালাইবার সুবিধা না পাইয়া মরিয়া যায় বা মৃত প্রায় হইয়া থাকে। অতএব যাঁহারা মনে করেন যে বেড়া প্রস্তুতের জন্য বিশেষ কোন কষ্ট নাই বা ইহাতে কোন নিপুণতার আবশ্যক নাই তাঁহাদের ধারণা ভুল। উদ্যান রচনায় উদ্যান রচয়িতা যে নিপুণতা দেখাইয়াছেন সেই রকম নিপুণতা বেড়া রচনায় আবশ্যক। বেড়াটি কাজের হইবে. দেখিতে ভাল হইবে, এবং তাহা হইতে কিছু যথা সম্ভব আয় হইবে, কোন্ স্থানে কোন্ বেড়া সাজিবে ভাল, কোন্ খানে কোন্ জমিতে জন্মিবে ভাল ইত্যাদি অনেক বিষয় ভাবিয়া তবে বেড়া দিতে আরম্ভ করিতে হয়। বেড়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকাও চলে না বেড়া ঠিক করিবার জন্য, বেড়া উঁচু হইয়া না যায়, বেড়া নিচু না হয়, বেড়া চওড়া হইয়া না যায়, বেড়া পাতলা না হয়, বেড়ার ধারে জঙ্গল না হয় এই জন্য তোমাকে ছুরী, কাঁচি হাতে করিয়া বেড়ার ধারে ধারে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে। বেড়া প্রস্তুতের সময় তোমাকে রীতিমত অন্ততঃ একহাত গভীর ২ হাত প্রশস্ত খাদ খুঁড়িতে হইবে। তাহা হইতে পুরাতন মাটি তুলিয়া খাদের দুই পার্শ্বে জমা করিয়া রাখিবে। পরে খাদের ভিতরের মাটি কোদাল বা খোন্তা দ্বারা আল্‌গা করিয়া দিয়া তাহার সহিত গোয়ালের আবর্জ্জনা সার মিশাইয়া তাহাতে বেড়ার গাছ বা বীজ বা ডাল বসাইয়া দিতে হইবে। গাছ যেমন বাড়িতে থাকিবে তাহাদের গোড়ায় খাদের দুই পার্শ্বের মাটি ক্রমশঃ টানিয়া দিবে। এই রকমে যে বেড়া হইবে তাহাই স্থায়ী হইবে এবং শীঘ্র তোমার বাগান রক্ষার উপযোগী হইবে। আমার বেড়া দেওয়াটা ঠিক হইল কি না তাহা সাধারণে বিচার করিয়া বলিলে আমি বড়ই প্রীত হইব।

বঙ্গে কৃষি-বিভাগ

বর্ত্তমানকালে কতিপয় কার্য্যকরী কৃষি-ব্যবস্থার দিকে বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের দৃষ্টি পড়িয়াছে।

(১) তাঁহারা কয়েকজন কৃষি-পরীক্ষা প্রদর্শক নিযুক্ত করিয়া কৃষির পরীক্ষিত তত্বগুলি জমিদারের জমিদারীতে যাইয়া, চাষীর ক্ষেত্রে যাইয়া বুঝাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। সম্প্রতি পূর্ব্ব বঙ্গে প্রতি সবডিভিসনে এক একজন কৃষি-পরীক্ষা প্রদর্শক (demonstrator) দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষি-বিভাগের ইচ্ছা যে প্রতি থানায় থানায় একজন কৃষিতত্বপ্রচারক থাকে। গভর্ণমেণ্টকে এই প্রকার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

(২) গভর্ণমেণ্ট কৃষি-ক্ষেত্রের সংলগ্ন গোশালা থাকিলে অনেক সুবিধা হয়। সর্ব্বত্রই দুধের অনাটন। স্থানীয় গাভী বলদের উন্নতি বিধান অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। চাষাবাদের সঙ্গে সঙ্গে পশু পালনের ব্যবস্থা হইলে কৃষি-ক্ষেত্র হইতে লাভের সম্ভাবনা অধিক। রঙপুরে এই কারণে এবম্প্রকার ক্ষেত্র স্থাপিত হইয়াছে। ফল আশাপ্রদ হইলে বে-সরকারী এই রকমের অনেক কৃষি-ক্ষেত্র অবিলম্বে স্থাপিত হইতে পারিবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

(৩) বর্ত্তমানকালে বঙ্গের রেশম ব্যবসায়ের ক্রমশঃ অবনতি ঘটিতেছে। লুপ্তপ্রায় রেশম শিল্পের উন্নতি বিধানার্থ মালদহে দুইটি, বোগ্‌রাতে একটি পলুপালন ক্ষেত্র স্থাপিত হইয়াছে।

(৪) পাটের আবাদের খবর এতাবৎ কাল পুলিসের লোকের নিকট হইতে সংগৃহিত হইত, কিন্তু এক্ষণে পল্লী পঞ্চায়েতগণের উপর এই খবর দিবার ভার পড়িয়াছে এবং পঞ্চায়েতগণের খবর সত্য মিথ্যা তদারকের জন্য কৃষি-বিভাগের কর্ম্মচারী ও জেলার সরকারী কর্ম্মচারীগণ আদিষ্ট হইয়াছেন। আমরা বলি সঠিক খবর পাইতে হইলে কিছু খরচের ব্যবস্থা করা উচিত। পঞ্চায়েতগণ অবৈতনিক অনেক কার্য্য করেন তাঁহাদের উপর ক্রমশঃ নূতন কাজ চাপাইলে তাঁহাদের কাজ ক্ষতি করিয়া বিনা লাভে এইরূপ কার্য্য করিতে কেহই সন্তোষ বোধ করিবেন না।

কৃষি-ক্ষেত্র—কৃষি-বিভাগের অধীন ৬টী কৃষি-ক্ষেত্র আছে, ঢাকা, রাজসাহী, রঙপুর, বুড়ীর হাট, চুঁচড়া ও বর্দ্ধমান। ইহা ব্যতীত কালিম্‌পং ও চট্টগ্রাম আদর্শ ক্ষেত্র এই বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট।

কৃষি-বিভাগ কর্ত্তৃক সার পরীক্ষা—ইহা স্থির হইয়াছে যে পাটাদির আবাদে ক্ষেতে চূণ দিলে ফসল কিছু না কিছু বাড়ে কিন্তু এই সঙ্গে হাড় চূর্ণাদি ফস্ফেট

সার ব্যবহার করিলে ফলনের মাত্রা পর্য্যাপ্ত দাঁড়ায়। অন্যদিকে আবার কেবল ফস্ফেট সার ব্যবহার করিলেও ফলন বাড়ে বটে কিন্তু ঐ সঙ্গে চুণ ব্যবহার না করিলে সম্পূর্ণ ফল লাভ হয় না। সুপার ফস্ফেট অম্লরসাত্মক সার, সেই কারণ এই সারের সঙ্গে চুণ মিশাইয়া ব্যবহার না করিলে পূর্ণমাত্রায় এই সারের কার্য্য হয় না।

আউশ ধানের ক্ষেতে চুণের আবশ্যকতা দৃষ্ট হয় না।

এক খণ্ড জমিতে চুণ সার পরীক্ষার ফল দেখ,—

(ক) চুণ ব্যবহার করিয়া একর প্রতি অধিক পাটের পরিমাণ ৪ মণ ২২সের—

	টাকা, আনা, পাই
৯॥০ হিসাবে	৪৩—৩—৭

(খ) সেই জমিতে চুণ ও হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করিয়া বৃদ্ধি ফলন—

সরিষা—৫ মণ ১৬ সের ২ ছটাক ৫।০ হিসাবে	২৮—৫—৯
জমিটি হইতে পুরা ফসল বৃদ্ধি তাহার মূল্য—	৭১—৯—৪

সারের খরচ

চুণ	৩০ মণ	॥৵০ আনা হিসাবে	১৮-১২-০	
হাড়ের গুঁড়া	২॥০ মণ	৩॥০ আনা হিসাবে *	৮-১২-০	
গোময়	...	... ..	৭- ০-০	
			৩৪-৮-০	৩৪-৮-০

ইহাতে দেখা গেল যে সারের খরচ বাদ দিয়া ৩৭-১-৪ টাকা লাভ হইয়াছে।

চুণ-সার—ঢাকার শক্ত লাল মাটিতে (Laterite soil) চুণ খুব ফলপ্রদ। ইহাতে মাটি আল্গা হয়। এই মাটিতে চুণ ও হাড়ের গুঁড়া ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে।

সবুজ-সার—ধঞ্চে, শণ, মাট কলাই, বরবটী এই কয়টি খন্দ সবুজ সারের জন্য ব্যবহার হয়। ধঞ্চে গাছ ছোট থাকিতে থাকিতে চষিয়া ফেলিতে না পারিলে উপযুক্ত ফল পাওয়া যায় না। কাঠ শক্ত বা ছাল কড়া হইয়া গেলে সারের কার্য্য ঠিকমত হয় না। গাছ তিন চারি ফিট হইলেই চষিতে হয়। এই অবস্থায় চষিলে একর প্রতি ৬০ হইতে ৭০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন এবং একটন শুষ্ক উদ্ভিজ্জ সার পাওয়া যায়। গাছ বড় হইলে নাইট্রোজেনের মাত্রা কমিয়া যায় এবং পত্র

* ইহা মিলের দর এই দরে সাধারণে খরিদ করিতে পারে না। তাহাদিগকে মণ ৪৲ কিম্বা ৪॥০ টাকা দরে খরিদ করিতে হয়।

শাখাদিও শক্ত হওয়ায় শীঘ্র পচে না। ১ পাউণ্ড প্রায় অর্দ্ধ সের, ১ টন প্রায় ২৭৷৷ মণ।

শণ—হাল্কা মাটিতে শণ জন্মায়, ধঞ্চের মত শক্ত, রসা মাটিতে জন্মে না। ইহাও ছোট থাকিতে চষিত হয়। ইহা হইতেও সমমাত্রায় নাইট্রোজেন ও উদ্ভিজ্জ সার পাওয়া যায়। শণের মধ্যে জব্বলপুর শণই ভাল।

মাটকলাই—ইহাও সবুজ সারের পক্ষে ভাল কিন্তু সারবান মাটি ব্যতীত জন্মে না। গাছ শীঘ্র শক্ত হইয়া যায় এবং শীঘ্র পচিয়া মাটির সহিত মিশে না। ইহাতে নাইট্রোজেন মাত্রা একর প্রতি ৭০ পাউণ্ড এবং ১ টনের উপর শুষ্ক উদ্ভিজ্জ সার মেলে।

বরবটী—ভাল সবুজ সার হাল্কা মাটিতে বেশ হয়, শক্ত মাটিতেও মন্দ হয় না, চুণ দেওয়া জমিতে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল জন্মে। ছোট থাকিতে থাকিতে চষিতে হয়। শণ, ধঞ্চে, মাটকলাই অপেক্ষা শীঘ্র পচিয়া জমির সহিত মিশে। ছোট থাকিতে না চষিলে চষা যায় না, লাঙ্গলে লতা জড়াইয়া যায়। দেড় মাসের মধ্যে গাছ বাড়িয়া যায়। তখন কোদাল দ্বারা কোপাইবার দরকার হইয়া পড়ে। বিস্তৃত ক্ষেত্র কোদাল দ্বারা কোপান সম্ভব হয় না। একরে ৮০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন এবং ১ টনের উপর শুষ্ক উদ্ভিজ্জ সার পাওয়া যায়। পাট, শণ, ধঞ্চে, মাটকলাই সময়মত চাষ না করিলে চলে না কিন্তু শীতের শেষে বৃষ্টি হইলেই এবং ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত যখন ইচ্ছা বরবটি বোনা চলে। জলদি চাষেই ফলন ভাল হয়, নাবী হইলে সে রকম হয় না। তখন অধিক বীজ ঘন করিয়া বপন করিতে হয়। সবুজ সারের মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়।

পাট ব্যতীত অন্য প্রকার খন্দ—সিডা বা বেড়েলা—১৯১২ সালে ঢাকায় একর জমিতে উহার আবাদ হইয়াছিল। ক্ষেত হইতে দুই বিঘা ৯ কাটা জমির গাছ কাটা হইয়াছিল। উৎপন্ন আঁসের পরিমাণ ৭ মণ ১১ সের। এক একরে উৎপন্ন আঁস ৮,৯০ মণ। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে একরে ১২ মণ আঁস পাওয়া গিয়াছে। গাছ অনেকটা ঢেঁড়স গাছের মত, কিন্তু পাতা ও ফুল খুব ছোট।

এগেভ বা মুর্গা—আনারসের মত ইহার তেউড় (Suckers) বা ঠোক (bulbil) পুতিয়া গাছ করিতে হয়। ইহার পরীক্ষা চলিতেছে।

রিয়া—রিয়া চাষের বা তাহার আঁস প্রস্তুতের কোন বিশেষ বিবরণ আমরা এই বিবরণীতে খুঁজিয়া পাই নাই।

এই প্রদেশের উপযোগী ধান, তৈলশস্য মুগ—ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার ধান লইয়া সঙ্কর উৎপাদনের চেষ্টা হইয়াছে। যে ধানের ফলন অধিক সেই ধানেরই এদেশে আদর অধিক। পরীক্ষায় কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই। লোণা জলে

বীজ ধান ফেলিয়া দিলে যে অপুষ্ট ধান গুলি ভাসিয়া উঠে সে গুলি বাদ দিতে হয়। পুষ্ট বীজগুলি ডুবিয়া যায়। জাপানে এই প্রথায় বীজ বাছাই হয়। সর্ব্বত্রই অধিকাংশ বীজ বাছাইয়ের এই নিয়ম। বেগুন, মটর বীজও এই উপায়ে পুষ্ট অপুষ্ট বাছিয়া লওয়া যায়। ইহা সাধারণ চাষীতে জানে, এই শিক্ষার জন্য আমরা কৃষি বিভাগের সাহায্য চাহিনা।

অন্য প্রদেশ হইতে তিল বীজ আনাইয়া এই প্রদেশে চাষের চেষ্টা হইতেছে। স্থানীয় তিলের সহিত সাঙ্কর্য্যে হয়ত এখানকার উপযোগী উৎকৃষ্ট তিল বীজ জন্মিতে পারে। এই প্রকারে লঙ্কার চাষও হইতেছে।

পুষাতে কীটতত্ত্ব ও ছত্রকতত্ত্বের আলোচনা—পুষাতে কীটতত্ত্ববিদ ও ছত্রক তত্ত্ববিদ দ্বারা কীট ও ছত্রক তত্ত্বের বিশেষ আলোচনা হইতেছে। আলোচ্য বর্ষের চায়ের পাতা ও পল্লবের নূতন পোকা, শিবপুরে সিনকোনা আবাদের নূতন কীট আক্রমণ, ঢাকায় আমের কঠিন-পক্ষ পতঙ্গের বিষয় আলোচনা হইয়াছে। কীট তত্ত্ববিদ পোকার নাম বলিয়া দিয়াছেন এবং তাহা হইতে রক্ষার উপায় যথাসাধ্য নির্ণয় করিয়াছেন। অনেক স্থানে পোকা ধরিয়া মারিতে বলিয়াছেন। যেখানে সম্ভব তাহা করা যাইতে পারে কিন্তু পোকায় অতি বৃদ্ধি হইলে দৈব প্রতিকার ছাড়া উপায় নাই। আক্রান্ত বৃক্ষাদিতে লেড ক্রমেটের পিচকারি দেওয়া কর্ত্তব্য বলিয়াছেন। লেড ক্রমেট ঔষধের দোকানে পাওয়া যায়।

টাঙ্গাইল, সুরী, খুলনা, বনগা, কুড়িগ্রাম কৃষি প্রদর্শনীতে কীট উপদ্রবের কথা আলোচিত হইয়াছিল। পোকার জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু কাহিনী সাধারণ দর্শক মণ্ডলীকে বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছিল। পিচকারী, পোকা ধরা থলে, ধোঁয়া দিবার বাক্স প্রভৃতি পোকা প্রতিকারের কতকগুলি যন্ত্রাদির ব্যবহার বুঝান হইয়াছিল। এই প্রকারের কাজ ফলপ্রদ বলিয়া প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে বটে কিন্তু সাধারণ চাষীর এই প্রকার চেষ্টা সাধ্যায়ত্ত নহে। এই সকল বিষয়ে জমিদারগণের সহায়তা আবশ্যক।

ছত্রক তত্ত্ব সম্বন্ধে ধানের উপরা ব্যাধির বিষয় পরপ্রবন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে, কৃষি বিভাগ বলিতেছেন পাটের শিকড়ে ধসা সম্বন্ধে পুস্তিকা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। আখের পোকা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা হইবে। আলুতে ধসা (Phytophthora insfestaiuse) লইয়া আলোচনা চলিতেছে ইত্যাদি কীট কিম্বা ছত্রক তত্ত্বালোচনা সম্বন্ধে কিছু সুনিয়মিত আলোচনা আমরা দেখিতে পাই। ইহা কৃষি প্রধান ভারতের খুব মঙ্গলদায়ক ব্যবস্থা বলিতে হইবে। বিগত বর্ষে রাজসাহীতে আলুর এই ছত্রক রোগে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। কলা গাছের মাজরা (Wilt desease) রোগে বর্দ্ধমান ও ঢাকার মুন্সীগঞ্জে কতই অনর্থ হইতেছে।

প্রতিকার জানিতে পারিলে কি না উপকার হইবে? আলুর ক্ষেতে বর্দ্দো মিশ্রণের পিচকারী দেওয়ার উপকারীতা চাষীদের বুঝান হইতেছে।

রেশম চাষের উন্নতির জন্য কৃষি-বিভাগ সঙ্কল্প করিয়াছেন যে তাঁহারা পলু পালনার্থ নানা স্থানে আড্ডা করিবেন। ভাল বীজ গুটি চাষীদের মধ্যে বিতরণ করিবেন। ভাল বীজ গুটি ১৸৹ টাকা কাহন দরে বিক্রয় করিতে না পারিলে এক একটি নর্সারি চালাইবার খরচ উঠিবে না। কোথায় কতগুলি তুঁতের ক্ষেত্র আছে তাহা গ্রামের পঞ্চায়তগণের নিকট হইতে খোঁজ লওয়া হইতেছে। ছোট নর্সারি গুলি স্থানীয় লোককে বেচিয়া ফেলিয়া কয়েকটি বড় পলু পালন গৃহ (Nursery) স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। গুটি পালন ও প্রস্তুত কার্য্য তত্ত্বাবধান জন্য ফরাসী বিশেষজ্ঞ রাখা হইয়াছে। বহরমপুরে ছাত্রগণকে পলু পালন শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। গত বর্ষে তথায় ৬টি ছাত্র অধ্যয়ন করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে দুইটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। উভয়কেই ২৫০৲ টাকা পলু পালনার্থ গৃহ নির্ম্মাণের জন্য বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের নর্সারি গুলি আদর্শ স্থানীয় হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই বিভাগে বিগত বর্ষে ৬১,৩৭২৸৹ আনা খরচ হইয়াছে, আয় ৮,৫৮৯৷৴৹ আনা মাত্র। কৃষি-বিভাগ আশা করেন, যে নূতন পদ্ধতিতে কাজ হইলে আয়ের মাত্রা বাড়িবে এবং ব্যয় সংক্ষেপ হইয়া আসিবে।

মৎস্যের চাষ—চাষের আনুসঙ্গিক সমস্ত ব্যাপারেই কৃষি-বিভাগ মনোযোগী হইয়াছেন। পৃথিবীর অন্যত্র বাঁধাজলে রুই, কাতলা, মিরগেল কিম্বা কালবোস মাছের ডিম ফোটে এবং তাহাদের বংশ বৃদ্ধি হয় কিন্তু এ দেশে তাহা হয় না কেন তাহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। বাঁধা জলে তাহাদের বন্ধ্যা দোষ হয় কেন ভবিষ্যতে তাহার অনুসন্ধান করা হইবে।

ইলিশ মাছের ডিম ফুটান—ইলিশ মাছের ডিম ফুটাইয়া চারাগুলি অঙ্গুলি প্রমাণ হইলে সেই গুলি লইয়া নানা স্থানের নদী খাল বিলে আবাদ করিবার চেষ্টা করিতে কৃষি-বিভাগ মানস করিয়াছেন। আমেরিকাতে এই প্রকারে আবাদ হয়। মুঙ্গেরের নিকটবর্ত্তী স্থান এই কার্য্যের উপযোগী বলিয়া মনে করা হইয়াছিল ফলত তাহা নহে। এখানে ডিম ফুটিল না। এই কারণে আরও তদন্তের আবশ্যক। এই বিভাগে একজন ডেপুটি ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন।

কৃষি-প্রদর্শনী স্থলে তিনি কিম্বা তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণ উপস্থিত হইয়া মৎস্যের আবাদ সম্বন্ধে নানা কথার আলোচনা করেন এবং মৎস্যতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রবন্ধও সাধারণকে দেওয়া হয়। মৎস্য ব্যবসায়ীগণকে লোনা মাছ, শুঁটকি মাছ তৈয়ারি করিবার প্রথা দেখান হয়। এই বিভাগের এই সবে হাতে খড়ি। নূতন কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় নাই। এখনও যাহাকে গ্রাম্য কথায় বলে "কাটা মাছের

পোঁটা গালা হইতেছে। অধিকতর দৃঢ়তার সহিত কার্য্য করিবার জন্য ডেপুটি ডিরেক্টরের ব্যবহারার্থে একখানি ষ্টীমলঞ্চ বা বাষ্পীয় বোটের বন্দোবস্ত হইবে। ভবিষ্যতে বোধ হয় আমরা তাঁহার নিকট হইতে অনেক কার্য্যকরী কথা শুনিতে পাইব। এখন কাজের মধ্যে এই যে, অনেকগুলি মৎস্যের শাস্ত্রীয় নাম নির্ণয় হইয়াছে এবং মাছের দুই এক রকম ব্যাধি ও রোগ নির্ণয় হইয়াছে অন্ততঃ কাগজে কলমে দেখিতে পাইতেছি। মাছ গুতলি পোকা, মাছের বসন্ত, মাছের পেটো চিরকালই দেখা যায়। মক্ষীভুক মাছগুলি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। চিরকালই তাহারা কীট, পোকা, মক্ষিকা ধরিয়া খায়। কামান পাতিয়া কোন কালে মশা মারা হয় না। রোগ ও তাহার প্রতিকার প্রাকৃতিক বিধানে হইয়া থাকে। এই তত্ত্বগুলি সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া মন্দ নহে। আমরা অনেক সময় আততায়ীর প্রশ্রয় দিই কিন্তু মিত্রগণের কোন খোঁজ করি না বা তাহাদের বংশ বৃদ্ধির সহায় না হইয়া তাহাদেরই বংশ উচ্ছেদ করিয়া ফেলি। শোল, বোয়াল, টেংরা, তেচোখো মাছ কীট ও ময়লাদি খাইয়া জল পরিষ্কার রাখে ও মানুষের শত্রু নিপাত করে। শোল, বোয়াল মাছ পোনার চারা খায় বটে, কিন্তু আবার সেগুলিকে তাড়া দিয়া তাহাদের বৃদ্ধির সহায়তা করে এই হিসাবেও তাহারা উপকারী।

সাবর কলেজে বৎসরে মৎস্য তত্ত্ব সম্বন্ধে ৮টি বক্তৃতা দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছে। মৎস্যের আবাদ ও মৎস্যের ব্যবসা তত্ত্ব আলোচিত হইবে।

রঙপুর ক্ষেত্রে গোশালা—ইহার সংশ্লিষ্ট গোশালাই এই ক্ষেত্রের বিশেষত্ব এখানে ১০০ বিঘায় আলু, ৫০ বিঘায় তামাক, ৫ বিঘায় সব্জী, ১৫০ বিঘায় গবাদির খাদ্য যৈ, মটর, মাটকলাই চাষ করা হইবে। ইহাতে দূর্ব্বা ঘাস জন্মান হইবে।

এই গোশালায় ২৯ গাভী, ২৩টা বাছুর এবং ১টা ষণ্ড রক্ষিত হইয়াছে।

ঢাকা ক্ষেত্রের কথা আমরা বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি অপর কয়টি ক্ষেত্রের কার্য্য আমরা ক্রমশঃ আলোচনা করিব।

সরকারী কৃষি সংবাদ

ঢাকাতে সরকারী কৃষি-ক্ষেত্র—১৯১২-১৩

এই ক্ষেত্রের মাটি (Interite Soil)।

এতদঞ্চলের সাধারণ মৃত্তিকাই এই রকম। এখানে মধুপুর জঙ্গল নামে একটা জঙ্গল আছে, অত্রস্থ সমস্ত উঁচু জমির মাটি এই জঙ্গলের মাটির অনুরূপ। মাটি মেটেল, জল হইয়া গলিয়া কাদা হয় এবং রৌদ্রে শুকাইয়া ফাটিয়া উঠে। এই মৃত্তিকার জল ধারণ ক্ষমতা খুবই কম। এই কারণে উচ্চ জমিগুলি নিকৃষ্ট। ইহাতে ফস্ফেটের ভাগ খুব কম, চুণ নাই বলিলেই হয়, লৌহ সমধিক পরিমাণে আছে। পৌষ, মাঘ হইতেই জমির রস মরিয়া যায়। রবি খন্দ, যাহার চাষ কার্ত্তিক মাসে আরম্ভ হয় এবং ফাল্গুন চৈত্রে যাহার ফসল তৈয়ারি হইয়া উঠে তাহা এই মাটিতে হওয়া সম্ভব নহে। নিচু জমিগুলি বেশ সারবান, ধান হইবার উপযুক্ত।

এখানকার মাটিতে অম্লত্ব দৃষ্ট হয় যাহা চাষাবাদের পক্ষে কিছুতেই অনুকূল নহে। শুঁটিধারী শস্যে শিকড়গুলিতে শুঁটিকা হইয়া উঠে এবং তাহাতে ভূমিস্থ নাইট্রোজেন সঞ্চিত হয়। কৃষি-বিভাগের ডেপুটী ডিরেক্টর সাহেব বলিতেছেন যে, এই ক্ষেত্রের সীম মটরের গাছে সাধারণতঃ এবম্প্রকার গুটিকা হয় না। অম্লত্ব ইহার কারণ, তাহাতে আবার চুণের ভাগ কম, প্রচুর সার ব্যবহার করিলে কতকটা সুফল হয়। জমিতে উপযুক্ত মাত্রায় চুণ থাকা নিতান্ত প্রয়োজন—চুণ জমির অম্লত্ব নষ্ট করে, জমিস্থিত ফস্ফরিক অম্ল ও পটাসকে গলাইয়া উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী করিয়া দেয়, প্রদত্ত সারের সহিত মিশ্রিত হইয়া সারের আশু কার্য্যের সহায় হয়। জমিতে পটাসের মাত্রা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে কিন্তু ফস্ফরিক অম্লের অভাব দেখা যায়।

এই ক্ষেত্রের জমির পরিমাণ ৩৫৩·৭ একর। ইহার মধ্যে ২৮৬ একর জমি উচ্চ এবং ৬৯ একর নিচু জমি আছে। নিচু জমি ও উঁচু জমির পরিমাণ যোগ করিলে কিন্তু প্রায় ২ একর জমি বাড়িয়া যায়। বোধ হয় অঙ্কপাতে ভুল আছে। উঁচু জমির ১২৩ একর বাড়ী ঘর, রাস্তা ঘাট, পুকুর ও উদ্ভিদ সংরক্ষণোদ্যানে আবদ্ধ; বাকী জমিতে চাষ হয়। ইহাতে হয়,—আউশ ধান এবং আখ। নিচু জমিতে কেবল আমন ধানের আবাদ হইয়া থাকে। পৌষের শেষ পর্য্যন্ত ইহাতে জল থাকে সুতরাং আমন ধানের আবাদ ইহাতে সুচারুরূপেই হইয়া থাকে। এখানে বৎসরে বারিপাতের পরিমাণ ৭২ ইঞ্চ। চৈত্র হইতে কার্ত্তিক মাস

পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়। সুতরাং আশু কিম্বা আমন ধান চাষের বেশ সুযোগ হইয়া থাকে।

অত্র ক্ষেত্রে ৬ প্রকার আমন ধানের আবাদ করা হয়।

(১) মালতী—শাদা, মাঝারি দানা চাউল
(২) লোহাডাঙ—লাল, মোটা দানা ,,
(৩) লাল বালাম—,, বালাম জাতীয়
(৪) কাটারি ভোগ—শাদা, খুব সরু দানা চাউল
(৫) বাদসা ভোগ— ,, ,, ,, ,,
(৬) দাউদ খানি— ,, ,, ,, ,,

ধানের ক্ষেতে সার—

কোন ক্ষেতে হাড়ের গুঁড়া, কোন ক্ষেতে ধঞ্চে বুনিয়া সবুজ সার প্রয়োগ করিয়া, কোন ক্ষেতে মাছের গুঁড়া দিয়া দেখা হইয়াছে যে, হাড়ের গুঁড়া ও ধঞ্চে বুনিয়া বিশেষ ফল পাওয়া যায়। একর প্রতি তিন মণ হাড়ের গুঁড়া দেওয়া হইয়াছিল তাহাই পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে হয়। হাড়ের গুঁড়া যে বৎসর ব্যবহার করা যায় সে বৎসর যে শুধু ফল পাওয়া যায় এমন নহে পর বৎসরও জমি যথেষ্ট সারবান থাকে এবং ফলন প্রায় সমান থাকে, সামান্য মাত্র কমে। মাছের গুঁড়াতে সদ্য বৎসরে কিছু কাজ হয় কিন্তু পরবৎসর আর সেই সারের কোন ক্ষমতা জমিতে অবশিষ্ট থাকে না, আবার জমিতে সার প্রদানের আবশ্যক হয়। ধঞ্চে বুনিয়া একরে ২২ মণ ধান, ৫৭ মণ খড় পাওয়া গিয়াছে। হাড়ের গুঁড়াতে ২৫ মণ ধান, ২৬ মণ খড়, মাছের গুঁড়া দিয়া ১৮॥ মণ ধান, ৩৭॥ মণ খড় উৎপন্ন হইয়াছে। পরবর্ত্তী বৎসরে ঐ সকল জমিতে যথাক্রমে ১৬ মণ ধান, ৩২ মণ খড় ; ১৯॥ মণ ধান, ৫০ মণ খড় এবং ১৬ মণ ধান, ৩৪ মণ খড় জন্মিয়াছে। ঢাকার জমিতে হাড়ের গুঁড়াই বিশেষ সার।

ধান রোপণে বিশেষত্ব—৮ ইঞ্চ, ১০ ইঞ্চ, ১২ ইঞ্চ, তফাতে এবং প্রতি গর্ত্তে ১, ২, ৩ টা হিসাবে চারা রোপণ করিবার উদ্যোগ ছিল কিন্তু পরীক্ষালব্ধ ফল সুস্পষ্ট বুঝা যায় নাই। চারা রোপণে মিতব্যয়ী হইলে কিম্বা অযথা বীজ ধানের অপব্যয় না করিলে একর প্রতি ১॥০ মণ বিঘা প্রতি ॥০ মণ ধানের তলা ফেলিলে যথেষ্ট। আমাদের দেশের সাধারণ চাষী যে অমিতব্যয়ী একথা আমরা কখন বলিব না। তাহারা পাতলা ও ঘন চারা রোপণের কৌশল জানে, তাহারা কখন গোছা গোছা, কখন বা দুই একটি চারা এক গর্ত্তে রোপণ করে এবং অবস্থা বুঝিয়া কার্য্য করিতে জানে। তাহাদের বিদ্যাটা কেহ লিখিয়া প্রচার করে নাই, তাই অনেকে সরকারী

বিবরণীর এই অংশটী সম্পূর্ণ নূতন তত্ব বলিয়া মনে করেন। এ সম্বন্ধে খনার বচন উদ্ধৃত করিয়া আমরা দেখাইয়াছি। তবে বীজের অভাব অপেক্ষা বীজ নষ্ট হওয়া বরং ভাল এই প্রথায় অধিকাংশ সময় এ দেশের চাষীরা কার্য্য করিয়া থাকে। এক বিঘার জন্য হয়ত ত্রিশ সের ধানের তলা ফেলিতে কুণ্ঠিত হয় না। একটা মাদায় একটা লাউ গাছ বাহির হওয়া দরকার কিন্তু তাহারা প্রত্যেক মাদায় ৩ বা ৪ টা লাউ বীজ বসাইয়া থাকে এবং গাছ বাহির হইলে একটা চারা রাখিয়া বাকি গুলি তুলিয়া অন্যত্র বসায় বা ফেলিয়া দেয়।

আমন ধান কাটিয়া লইয়া জমি চষা ইহা যে কর্ত্তব্য তাহা আর কোন চাষীকে শিখাইতে হয় না। জমিতে রস থাকিতে থাকিতে ঐ সময় জমি চষা যে ভাল তাহা সহজেই বুঝা যায়, জমিতে যত রৌদ্র বাসাত লাগিবে ততই জমির মাটি সারবান হইয়া উঠিবে। ঢাকাতে পরীক্ষা ক্ষেত্রে ইহা বেশ প্রতিপন্ন করিয়া দেখান হইয়াছে।

ঢাকাতে আউশ ধান—

এখানে আউশ বোনা হয় বৈশাখে, কাটা হয় শ্রাবণ ভাদ্রে, ২৪ পরগণারই অনুরূপ। কয়েক রকম আউশ আছে, তার মধ্যে গরফার চাউল শাদা হয় বটে কিন্তু চাউল বড় মোটা, ফলনে প্রতি একরে ২৩ মণ। লায়কোজ, সূর্য্য মুখীর বেশ সরু দানা কিন্তু লাল ; ফলন লায়কোজের ২৮৷০ মণ, সুর্য্যমুখী ২৩৸০ মণ। সি, পি আউশের ফলন ১০ মণ। সরকারি রিপোর্টে এতদঞ্চলে আউশের মধ্যে গরফা, সূর্য্যমুখী ও সেরাকোজের চাষ লাভজনক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

ঢাকাতে আখ—

দুই রকম বারবাডোজ, ডোরাকাটা টানা, হলদে টানা, ঢাকাগাণ্ডারি এই ৫ রকম আখের চাষ করা হয়। আখে একর প্রতি ৩০০ মণ গোময় ২০ মণ রেড়ীর খৈল দেওয়া হইয়াছিল এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে চুণও জমিতে ছিটান হইয়াছিল।

আখের ফলন—

সদ্য বৎসরের আখ হইতে একর প্রতি ৬১ মণ এবং পুরাতন ইক্ষু হইতে ৪০ মণ গুড় উৎপন্ন হইয়াছে। এই প্রদেশে ৩০ মণের অধিক গুড় একরে হয় না, সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে সার যত্ন করিয়া দিয়া আখ চাষ করিলে উন্নতি হইতে পারে। তদ্দেশবাসীর পক্ষে এইরূপ চাষ দৃষ্টান্তস্থল বলিতে হইবে।

সেচন জল—

এখানে আউশ ও আমন ধানের চাষের জন্য জল সেচনের কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। এই প্রদেশে ৭২ ইঞ্চ বারিপাত হয়। চৈত্র মাস হইতে আরম্ভ হইয়া কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয় সুতরাং ধানের জন্য জলের অভাব হয় না। কিন্তু উচ্চ জমি পৌষ মাসেই রস শূন্য হইয়া ফাটিয়া উঠে। এই কারণে রবি খন্দ ভাল হয় না। আখে জল সেচনের বিষয় এই বিবরণীতে কোন উল্লেখ নাই।

শস্যের ফলন—

সরকারী ক্ষেত্রে এক একরে গড়ে আমন ধান ১৯॥০ মণ, আউশ ১৮ মণ, নুতন আখের গুড় ৬১ মণ, পুরাতন আখে ৪০ মণ, পাট ১১ মণ জন্মিয়াছে। রবিখন্দ সরিষা, তিল, শোরগুজার চাষ করা হইয়াছিল। তাহাদের ফল আদৌ আশাপ্রদ নহে। জোয়ার, সয়বীন, বরবটী ও অরহর চাষ করিয়াও দেখা হইয়াছে। অরহরের ফলন ৬॥০ মণ নিতান্ত মন্দ নহে কিন্তু অন্যগুলি আদৌ ভাল হয় নাই। পাটের ফলন নিতান্ত কম।

ঢাকা ক্ষেত্রের আয় ব্যয়—১৯১২-১৩ সালে—

ব্যয় ২৭,৬৮৮-৯-১০ টাকা আয় ১১,৬৫৩-৭-৩ টাকা মাত্র। আয় ব্যয়ের কথা তুলিয়া ডেপুটি ডিরেক্টর ক্ষেত্র তত্ত্বাবধারকের (Farm Superintendent) উপর নিরতিশয় কটাক্ষ করিয়াছেন। ক্ষেত্র কর্ত্তাই এই অত্যধিক ব্যয়ের জন্য একাই দায়ী তিনি এই কথা বলেন। তিনি যন্ত্রাদি মেরামতের একটা কারখানা রাখিয়াছেন। একটা মিস্ত্রি রাখিলে যেখানে কাজ হয় সে জায়গায় একটা কারখানা স্থাপন করিয়া অযথা বেশী খরচের আবশ্যকতা দেখা যায় না। ডেপুটি ডিরেক্টরের কথায় বেশ বুঝা যায় যে, তাঁহার সহিত ক্ষেত্রাধ্যক্ষের একটুও মতের মিল নাই। বাৎসরিক কৃষি-বিবরণীতে কৃষি-বিভাগের কর্ত্তার মুখে তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীর দোষ এরূপ ভাবে প্রকাশিত হওয়া কিছুতেই বিজ্ঞোচিত নহে। ইহার ফল মন্দ হয়, ভাল কখন হয় না। সকলেই ঘরের দোষ সামলাইয়া চলে। তবে আমরা দেখিতেছি যে, যার দোষেই হউক খরচ অধিক হইয়াছে। আমরা জানি উদ্ভিদতত্ত্ববিদের জন্য, রাসায়নবিদ কিম্বা তন্তুতত্ত্ববিদ ইহাদের জন্য গভর্ণমেণ্টের বাজে পয়সা খরচ হইবে। ইঁহারা তত্ত্বানুসন্ধান কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন, তাহার ভাবী ফল ভাল হইলেও উপস্থিত তাঁহাদের পরিশ্রমে কোন অর্থলাভ হয় না। কিন্তু ডেপুটি ডিরেক্টর ঠিকই

বলিয়াছেন যে, জমি চাষ করিয়া লাভ দেখান কর্ত্তব্য নতুবা তাঁহাদের চাষাবাদ কি প্রকারে আদর্শ হইবে এবং তাঁহারা দেশের চাষীকে কোন চাষের কৌশল বুঝাইতে গেলে সে কথা তাহাদের কাণে স্থান পাইবে কেন? এই কথাই আমরা কৃষকে বার বার আলোচনা করিয়া থাকি।

ঢাকার বীজাগার—

নিম্নলিখিত বীজ, সার ও কৃষি-যন্ত্র এখান হইতে বিতরিত হইয়াছে।

জলি ধান	...	...	৭ মণ
সরু সি পি আউশ	...	...	২ ,,
বাদসাভোগ ধান	...	...	১ ,,
চিনি গুঁড়া ,,	...	...	২ ,,
দাউদ খানি ,,	...	...	২ ,,
কাটারি ভোগ ,,	...	...	৩ ,,
পাট বীজ	...	...	১৭ ,,
ধঞ্চে বীজ	...	...	১৬৪॥০ ,,
জোয়ার	...	...	॥০ ,,
ভুট্টা	...	...	৬ সের
গম	...	...	১২ মণ
অরহর	...	...	১৷০ ,,
বরবটী	...	...	৩০ সের
সয়বীন	...	...	১০ ,,
শণ	...	...	২০ ,,
ঢাকা গাণ্ডারী আখের টুকরা		...	১৪,৬০০ ,,
হলদে টানা	...	...	৭০০ ,,
১৪৭ বারবে ডোস্	...	...	২০০০ ,,
ডোরা কাটা টানা	...	...	৩,৭৬০ ,,
৩৬৭ বারবে ডোস্	...	...	৩৩০০ ,,
মেষ্টন লাঙ্গল	...	...	২ টা
টি, সি, লাঙ্গল	...	...	১ টা
হাড়ের গুঁড়া	...	...	৭৫ মণ

ঢাকাক্ষেত্রে কৃষি-শিক্ষা—৮ জন ছাত্র এই ক্ষেত্রে কাজ শিখিয়াছে। তাহারা সকলেই সরকারি ক্ষেত্র পরিদর্শকের কার্য্যে নিযুক্ত আছে।

ঢাকা গাণ্ডেরি আখ—

এই আখের আবাদ বিস্তারের চেষ্টা হইতেছে। সমবায় ঋণ দান সমিতির (Cooperative Credit Society) উদ্যোগে কতকগুলি ঢাকা গাণ্ডেরি আখের কটিং বা টুকরা মৈমনসিংহের অন্তর্গত জামালপুর সবডিবিসনের কতিপয় চাষীদের মধ্যে চাষের জন্য বিভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। চাষ সন্তোষজনক হইয়াছে। জয়পুর গবর্ণমেণ্ট খাসমহলে এই আখের আবাদ করা হইয়াছে।

খড়ি আখ—

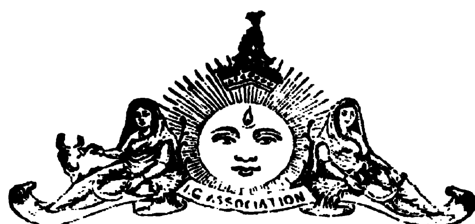
খড়ি আখে রস কম বলিয়া বড় কেহ ইহার আদর করিত না; কিন্তু এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে শৃগালাদি দুষ্ট জন্তুতে ইহা নষ্ট করিতে পারে না, ইহাতে সহজে পোকা ধরে না এবং ইহা অনাবৃষ্টি সহ। ইহাতে রস অধিক না হইলেও রসে চিনির মাত্রা অধিক। কৃষি বিবরণী পাঠে জানা যায় যে বীরভূমে ইহার চাষে ১৫৫৲ টাকা অর্থাৎ বিঘায় ৩৫৲ টাকার উপর লাভ হইয়াছে। বাঁকুড়ায় ইহার আবাদ করিয়া একরে ৫৪ হইতে ৬০ মণ গুড় উৎপন্ন হইয়াছে।

বাঁকুড়াতে জাভা ইক্ষুর চাষ হইতেছে, মুর্শীদাবাদে শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ননাথ দে মহাশয়ের ক্ষেতের মরিসস্ আক ২৬ ফিট পর্য্যন্ত হইয়াছে।

বাঁধা জলে ডিম ফুটান—

বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বাঁধাজলে ডিম ফুটেনা। সে কথা সাধরণতঃ সত্য। ছোট পুষ্করিণীর স্থির জলে কোথাও ডিম ফুটার কথা শুনা যায় নাই; কিন্তু বড় বিল বা দিঘিতে ডিম ফুটে। দিঘির কিম্বা বিলের জলে তরঙ্গ উঠে ও হাওয়ায় জল আলোড়িত হয়। জলের আলোড়ন ভিন্ন মাছের ডিমগুলি সঞ্জীবিত হয়ই না। ট্যাবট (Talbot) সাহেবের পরীক্ষায় ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। তিনি পর পর ক্রমশঃ নিম্নে তিনটি পুষ্করিণী লইয়া পরীক্ষা করিয়াছেন। নালা কাটাইয়া দিলে সহজে একটি হইতে অপরটিতে সবেগে জল আসিয়া পড়িতে পারে। স্রোতের জলে ডিম ফুটে, স্রোতের প্রতিকুলে চলিতে চলিতে এবং জল মধ্যস্থ শিলাতে আছাড় খাইয়া আঘাত পাইয়া মাছগুলি ডিম প্রসব করে। সেই ডিম পুং মৎস্যের লালা নিষেক দ্বারা সদ্যই সঞ্জীবিত হয় এবং স্রোতের টানে বহুদূরে ভাসিয়া যায়। দূরে ভাসিয়া না গেলে বা জল স্রোতস্থিত উদ্ভিদাদিতে আটকাইয়া না গেলে মাছেরা সদ্যপ্রসূত ডিমগুলি খাইয়া ফেলে। প্রবাহই ডিম ফুটিবার অনুকূল অবস্থা বলিয়া মনে হয়। প্রাকৃতিক ব্যবস্থার মত ব্যবস্থা করিতে পারিলেই ডিম ফুটান যায়। ট্যাবট সাহেব তাহাই করিয়া সফল হইয়াছেন।

একটি পুকুর হইতে ৩।৪ ফিট নিম্নে নালা কাটাইয়া জল ফেলিয়াছেন। নালাটি ক্রম নিম্ন, ঢালে ঢালে নামিয়া আসিয়াছে। তৃতায় পুকুরটি ৫ ফিট নিম্নে অবস্থিত। দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় পুষ্করিণীর সংযোজক প্রণালীটিও ক্রমনিম্ন। জল ছাড়িলে মাছগুলি স্রোত বাহিয়া সহজে উঠিতে পারে এই রকম। এই প্রকার ব্যবস্থায় ডিমও ফুটিয়াছে।



চৈত্র, ১৩২০ সাল।

কৃষি-শিক্ষা

অধুনা কৃষি-শিক্ষা বিস্তার কল্পে নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে, রাজা প্রজা মিলিয়া নানারূপ চেষ্টা করিতেছেন তথাপি আমরা দেখিতেছি যে প্রকৃত উন্নতির এখন অনেক বাকী।

কৃষির উন্নতি বিধানার্থ, রাজা কৃষি-বিভাগ স্থাপন করিয়াছেন। যে দেশের রাজস্ব প্রভুত পরিমাণে দেশের কৃষির উন্নতি অবনতির উপর নির্ভর করে, যে দেশের কোন প্রদেশে শস্যহানি হইলে প্রজাগণ অনশনে প্রাণ হারায় এবং রাজার রাজস্বহানি হয় ও কোষাগার শূন্য হইয়া পড়ে, যে দেশের অধিকাংশ লোকেরই ব্যবসা বাণিজ্য কিছুই নাই, কৃষিই তাহাদের প্রধান অবলম্বন, সে দেশের রাজা হইতে হইলে, রাজাকে কৃষির ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবেই এবং কৃষি কথার বিশেষ আলোচনা করিতে হইবে। রাজ্য রক্ষার্থ রাজস্ব আদায় হয়, প্রজাগণ সেই রাজস্ব প্রদান করে সুতরাং প্রজারক্ষা করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক এবং প্রজার রক্ষণকল্পে রাজস্বের কতকাংশ ব্যয় করা রাজোচিত।

ভারতে সম্রাটই ভূস্বামী, ভারতের সমস্ত ভূমির উপর তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার। তবে সম্রাট ইচ্ছা করিয়া অনেক স্থলে চাষীর নিকট হইতে কর আদায় না করিয়া রাজা, জমিদার বা কিম্বা পত্তনিদারের নিকট হইতে আদায় করিয়া থাকেন। ইহারা জমির মধ্য সত্বভোগী, প্রকৃত চাষীগণ তাঁহাদের অধীনে প্রজা। সম্রাটের খাস-মহল আছে ; খাস-মহলে সম্রাটই একমাত্র জমির উপসত্বভোগী। খাস-মহলের প্রজারা রাজ-সরকারে খাস কৃষাণ। সকল কৃষক সম্রাটের প্রজা হইলেও যাহারা রাজা জমিদার কিম্বা পত্তনিদারের অধীনে জমি জমা রাখিয়া চাষাবাদ করে তাহারা সাক্ষাত সম্বন্ধে সম্রাটের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখে না। জমিদারগণই

তাহাদের মা বাপ, তাহাদের ভাগ্য বিধাতা। ভারতের দুর্ভাগ্য বশতঃ ভারতের অধিকাংশ জমিদারগণের প্রজারক্ষা বিষয়ে কোন উদ্যোগ আয়োজন নাই। তাঁহারা ভূমির কর আদায়ে বদ্ধপরিকর, প্রজার দুঃখ কষ্টের কাহিনী কদাচিত তাঁহাদের কর্ণগোচর হয়। নিয়মমত, সময়মত কর আদায় হইলেই তাঁহারা সন্তুষ্ট এবং তাঁহারা সম্রাটের প্রাপ্যগণ্ডা রাজ-সরকারে পৌঁছিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত। নিশ্চিন্ত বলি কেন, তাঁহাদের মুনফার টাকা বিলাস ব্যসনে কি প্রকারে ব্যয় করিবেন তাহার চিন্তায় নিমগ্ন। জমিদারের অধীনে প্রজাগণকে ন্যায় খাজনা ছাড়া কত রকমে, কত রকম বাবে অতিরিক্ত টাকা দিতে হয়, জমিদার সরকারে প্রজার খাজনা বাকী পড়িলে আর উপায় নাই, সুদের সুদে তাহার আসল খাজনা কোন কালে আদায় হইবার উপায় থাকে না। জমিদার সরকারের কর্ম্মচারীগণ প্রবল পরাক্রান্ত, তাহাদের সহিত দ্বন্দ্বে আঁটিয়া উঠে এমন শক্তি অতি অল্প প্রজারই আছে। কর্ম্মচারীগণের চক্রব্যূহ এমনই সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত যে, তাহা ভেদ করিয়া কোন প্রজাই জমির এই সকল সত্বাধিকারীর নিকট পৌঁছিতে পারে না। এই হিসাবে খাস মহলের প্রজাগণ অপেক্ষাকৃত সুখী এবং তাহাদিগের আবাদী ভূমির করও অপেক্ষাকৃত লঘু। স্থূল কথায় মধ্যসত্বভোগী জমিদারগণের অধীন কৃষকগণ প্রকৃতপক্ষে কৃষি-মজুর মাত্র। ইহাদের সহিত তুলনায় খাসমহলের প্রজার অবস্থা কিঞ্চিৎ ভাল। কিন্তু সম্রাটের খাসমহল কতটুকু, সব জমিই, রাজা, জমিদার প্রভৃতি ব্যক্তিগণের করতলস্থ।

আমরা এই প্রথার বিরোধী নহি। আমরা চাই যাঁহারা জমির সহিত সম্বন্ধ রাখেন তাঁহারা যেন স্বচক্ষে জমির অবস্থা দেখেন এবং প্রজার ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তাহাদের অভাব অভিযোগ স্বকর্ণে শোনেন। রাজা নিজ প্রাণ বিনিময়ে প্রজার হৃদয় অধিকার করিবেন। প্রজারা ভাবুক্ যে "সঃ পিতা, পিতরস্তেষাং কেবলং জন্মহেতবঃ"। তাহাদের পিতৃগণ তাহাদের জন্মদাতা বটে কিন্তু রাজ সহায়তা ব্যতীত তাহাদের শারীরিক মানসিক সর্ব্ববিধ মঙ্গলসাধন হওয়া সম্ভব নহে। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র লোকশিক্ষার্থ এই প্রকারে রাজ্য পালন করিয়া দেখাইয়াছেন। কত কত হিন্দু রাজা এই রকমে প্রজাপালন করিতেন, এখনও অনেকে লোক রঞ্জনের জন্য আগ্রহান্বিত। বাদসাহ আকবরের রাজ্য পালনে এই নিয়ম অনুষ্ঠিত হইত। তিনি প্রজা বৎসল ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে "দিল্লিশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু কালের গতিতে এই নিয়মের বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, জমিদারগণ প্রজার সহিত এই অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ভুলিতে বসিয়াছেন।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে জমিদার বলিতে আমরা বঙ্গের প্রধান প্রধান ভূস্বামীগণকে লক্ষ্য করিয়া এত কথা বলিলাম। ইহাঁরাই আমাদের দেশের মধ্যে মান্যাস্পদ।

দেশের হিতের দিকে লক্ষ্য রাখেন ইহাঁদের মধ্যে এমন লোকও আছেন এবং প্রাণপণ চেষ্টাও করিয়া থাকেন সুতরাং তাঁহারা বাস্তবিকই গণনীয়। তাঁহাদের নিম্নস্তরে আর এক শ্রেণীর জমিদার আছেন যাহাদিগকে সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত বলা যায়। ইঁহাদেরও জমির সহিত সম্পর্ক কম নহে, কারণ ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিরই কম বেশী কিছু পরিমাণ জমি আছে। অপরাপর দেশে এ প্রকার ক্ষুদ্র জমিদার বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী নাই। কৃষির কোন উন্নতি সাধন করিতে হইলে এই শ্রেণীর লোকের কৃষি বিষয়ে উৎসাহ উদ্রেক করা প্রথমেই আবশ্যক। কারণ একদিকে তাঁহাদের উপর যে উচ্চতর শ্রেণীর জমিদার আছেন, তাঁহারা সাক্ষাত সম্বন্ধে জমির সহিত বিশেষ কোন সম্বন্ধ রাখেন না—অন্যদিকে ইহাঁদের নিম্নতর শ্রেণী অর্থাৎ কৃষকগণ মামুলী চাষাবাদ লইয়া ব্যতিব্যস্ত। তাহাদের উন্নতির উপায়োদ্ভাবনের বা উদ্ভাবিত উপায় কার্য্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা নাই। অতএব কৃষিশিক্ষা সেই মধ্য-শ্রেণীর ভূস্বামীগণকে লইয়া আরম্ভ করা কর্ত্তব্য, কারণ ইঁহাদের কৃষিজ্ঞান জন্মিলে ইহাঁরা উপর এবং নিম্ন উভয় স্তরের লোক সমূহকে কৃষি বিষয়ে উৎসাহিত করিতে পারেন।

ইঁহাদের সে ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে আছে, কিন্তু কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকায় ইঁহাদের অবসর কম। আমরা ইঁহাদের সুবিধাজনক কোন না কোন ব্যবস্থা করিতে বলি।

প্রজার জমি হাজিয়া মজিয়া যাইতেছে, অথবা জলাভাবে তাহাতে চাষ হইতেছে না, তাঁহার আবাদের মধ্যে পানীয় জলাভাবে গো মহিষ ও মানুষ দারুণ কষ্টভোগ করিতেছে, প্রজারা ভাল বীজ অভাবে ভাল ধান, ভাল পাট, ভাল আখ, বা ভাল যব, গম, জৈ উৎপন্ন করিতে পারিতেছে না, পয়সা অভাবে জমিতে ভাল সার দিতে পারিতেছে না, ভাল কৃষি যন্ত্রের অভাবে তাহারা এখনও এক গুণের পরিবর্ত্তে দশগুণ পরিশ্রম করিতেছে, কৃষির অভিনব তত্ত্বগুলির কোন সন্ধান রাখিতে পারে না বলিয়া তাহারা অদ্যাপিও মামুলী চাষাবাদ লইয়া আছে। তাহাদের দুঃখ স্বচক্ষে দেখিবার তাহাদের কান্না স্বকর্ণে শুনিবার লোক তাহারা খুঁজিয়া পায় না। তাহাদেরই পরিশ্রমলব্ধ অর্থের বিশিষ্টাংশ লইয়া জমিদারগণ বড় মানুষ হইয়া উঠিয়াছেন; তাঁহাদের গাড়ী, মোটর, তাঁহাদের সুরম্য অট্টালিকা, মনোরম উদ্যান, বারদোয়ারি বা হাওয়া খানা, তাঁহাদের লীলাকানন, তাঁহাদের শৈলাবাস দেখিলে মনে হয় তাঁহারা বাস্তবিকই শ্রীসম্পন্ন। কিন্তু রাজা, প্রজা উভয় লইয়া রাজ্য। ঐ রাজ্যের এক অঙ্গ বেশ পুষ্ট, বেশ সুন্দর কিন্তু অপর অঙ্গে ক্ষত ও উহা বেদনায় ক্লিষ্ট অতএব তাঁহাদের সুখে কি সর্ব্বাঙ্গীন শান্তি আছে? তাঁহাদের সম্পদের পিছনে কি কাল বিপদের ছায়া ঘন হইয়া উঠিতেছে না?

আমরা দেখিয়াছি যে ইউরোপ, আমেরিকার জমিদারগণ তাঁহাদের জমিদারির মধ্যে বাস করেন। দশ হাজার একর লইয়া হয়ত একটি ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে তাঁহার বাস, তিনি নিজে ক্ষেত্রকর্ম্মে নিযুক্ত, তাঁহার অধীনে তাঁহার প্রজাগণ ক্ষেত্র পালনে নিয়োজিত। আমাদের দেশে জমিদারগণ সহর নগরে বাস করেন। তাঁহাদের জমিদারী বহু বিস্তৃত হইতে পারে, কিন্তু তাহা বহুদূরে অবস্থিত। তিনি কখন তাঁহার জমিদারীতে পদার্পণ করেন কি না সন্দেহ। তাঁহার জমিদারীর কার্য্য তাঁহার লোকজন দ্বারা সংসাধিত হয়। তিনি কৃষি কর্ম্মে, উদ্যান পালনে, পশুপালনে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

এমত অবস্থায় কৃষিকর্ম্মের আরম্ভ কোথা হইতে হওয়া উচিত, কাহাকে লইয়া প্রথমে কৃষি-পর্য্যালোচনা করিতে হইবে তাহাই বিচার্য্য বিষয়। গভর্ণমেণ্ট কৃষিতত্ত্বানুসন্ধানাগার স্থাপন করিয়াছেন, স্থানে স্থানে ছাত্রগণের শিক্ষার্থ কৃষি-কলেজ স্থাপন করিয়াছেন, কৃষি পরীক্ষা-ক্ষেত্রে কৃষি কথার আলোচনা হইতেছে, গভর্ণমেণ্ট বিদেশে ছাত্র পাঠাইয়া তাহাদিগকে উন্নত প্রণালীর কৃষি-বিদ্যা-বিশারদ করিয়া আনিতেছেন। দেশের লোকও বিজ্ঞান সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহারাও বিদেশে ছাত্র পাঠাইতেছেন। ফলে ভারতে কতগুলি বিশেষজ্ঞের আমদানী হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের কার্য্য যোগায় কে? গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের জন্য কাজ খুঁজিয়া না পাইয়া তাঁহাদিগকে সাধারণ রাজকার্য্যে নিয়োগ করিতেছেন, জমিদারগণও বিশেষজ্ঞগণের অভাব অনুভব করিতেছেন না। এমত অবস্থায় কর্ত্তব্য কি?

আমরা আমাদের দেশে কৃষি শিক্ষা বিস্তারের দুইটি উপায় অবলম্বন করিতে বলি প্রথমতঃ জমিদারগণের ঘুম ভাঙ্গাইতে হইবে। তাঁহাদিগকে কৃষি বিষয়ে আস্থাবান করিতে হইবে। চাষের ও চাষীর মর্ম্ম বুঝিলে তাঁহারা জমির উন্নতির কথা ভাবিবেন এবং সুবীজ সঞ্চয়ের প্রতি দৃষ্টি করিবেন এবং কৃষির প্রধানবল গোধন রক্ষায় বদ্ধপরিকর হইবেন। জমিদারগণের কৃষিতত্ত্বালোচনার জন্য গভর্ণমেণ্ট স্থানীয় কতিপয় জমিদার ভদ্রসন্তান লইয়া প্রাদেশিক কৃষি-সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যেখানে কোন চেষ্টাই ছিল না সেখানে কতক চেষ্টা হইলেও ভাল। নেই মামার অপেক্ষা কাণা মামাও ভাল। কিন্তু এই সভা সমিতি গুলিতে যে ভাবে কৃষি কথার আলোচনা হয় আমরা তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন আলোচনার কথা বলিতে চাই। এই সকল সমিতিতে মন্তব্যের ছড়াছড়ি, কাজে কেহ কিছু করুন আর না করুন সুন্দর সুন্দর বিবরণী পাঠের মহাধুম। এখানে আমরা দেখি যে, কাজের দিকে যত কিছু হউক আর না হউক নাম কেনার দিকে অধিকতর দৃষ্টি। যাহাই হউক একেবারে কোন চর্চ্চা না থাকার চেয়ে এই রকম সভা

সমিতিও ভাল। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে ইহাতে দেশের কার্য্য বেশী কিছু অগ্রসর হইবে না।

জমিদারগণের কৃষিতত্ত্বালোচনার সুবিধার্থ নৈশশ্রেণী খোলা আবশ্যক। অনেকে কার্য্যান্তরে দিনের বেলা ব্যস্ত থাকেন তাঁহারা কিন্তু নৈশশ্রেণীতে যোগ দিতে পারেন। যাঁহারা জমির সহিত কোন না কোন সম্বন্ধ রাখেন তাঁহারা তথায় আসিয়া কৃষি রসায়ন, উদ্ভিদ বিদ্যা, কৃষি ও উদ্যান তত্ব ও কৃষি সম্বন্ধীয় নানা বিষয় আলোচনা করিতে পারেন। সুবীজ সঞ্চয় কাহাকে বলে, সুবীজ পাইলে এক গুণের স্থানে কি প্রকারে দশ গুণ শস্য উৎপন্ন করা যায় তাঁহারা শিক্ষা করিয়া ওয়াকিব হইতে পারেন এবং তখন আর তাঁহাদিগকে অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টিতে তাদৃশ বিপন্ন করিয়া ফেলিতে পারিবে না। কি কৌশলে, কম খরচে জমিতে সার যোগাইতে পারা যায়, কি কৌশলে ফসলের পোকা নিবারণ করা যায়, কি উপায়ে জমিতে রস রক্ষা করা যায় ইত্যাদি অনেক জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। বিশেষজ্ঞরা তাঁহাদেরই শিক্ষা কার্য্যে নিয়োজিত হইতে পারেন এবং তাঁহাদের দ্বারা তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কৃষি-কর্ম্মের পরিদর্শন কার্য্য হইতে পারে এবং সময় সময় ক্ষেত্রস্বামী ও চাষীগণের সমক্ষে ক্ষেতে দাঁড়াইয়া কৃষি-তত্ব বুঝাইয়া বলিবার অবসর করা যাইতে পারে। আমরা যে কার্য্য বুঝি না তাহাতে আমাদের মন সহজে আকৃষ্ট হয় না, বুঝিলে আমরা তাহাতে অনুরাগী হইতে পারি। এই জন্য আমরা বলি আগে জমিদারগণের মধ্যে কৃষি অনুরাগ জন্মাইয়া পরে কৃষকগণের কৃষিশিক্ষা বিধানের চেষ্টা বিধেয়।

দ্বিতীয় কথা—কৃষিজ্ঞান বিস্তারের দ্বিতীয় উপায় স্থানীয় ভাষায় কৃষি পুস্তকাদির বহুল প্রচার করা। ভারতে যেখানে যত কৃষিতত্ত্বের আলোচনা হউক না আলোচিত বিষয়গুলি সাধারণে প্রচারিত হওয়া কর্ত্তব্য। যাহার সামান্য ভাষা-জ্ঞান আছে সে বুঝিতে পারে এমন সহজ সরল ভাষায় পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশিত হইবে। কৃষি-বিভাগ মনে করিলে এই গুলি বিনামূল্যে বিতরণ করিতে পারেন নতুবা অতি অল্প মূল্যে এক আনারও কম মূল্য হইলে ভাল, ঐ সকল বিক্রিত হইবে। কৃষি বিভাগ কর্ত্তৃক বিভিন্ন ভাষার ঐ সকল পুস্তিকা ছাপাইবার অসুবিধা হইতে পারে। আমরা বহুবার বলিয়াছি এখনও বলিতেছি ভিন্ন ভিন্ন কৃষি সমিতির উপর ঐ ভার অর্পণ করা হউক। আমরা আমাদের তরফ হইতে বলিতেছি যে, আমরা এই প্রকারের ভার লইতে রাজী ও ইচ্ছুক আছি।

পত্রাদি

কলার ময়দা—শ্রীরামজীবন সমদ্দার, কেটিয়া, বীরভূম।

মহাশয়,

"কৃষকে" কলার চাষাবাদ ও ব্যবসা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে কলার ময়দার উল্লেখ আছে কিন্তু উহা কি প্রকারে প্রস্তুত করিতে হয় তাহা লেখা নাই। কলার ময়দা প্রস্তুত প্রণালী জানিতে ইচ্ছা করি। পালো ও ময়দা প্রস্তুত করা কি একই রকম ?

উত্তর—কলার ময়দা প্রস্তুত করা অতি সহজ। পাকা কলার ময়দা ভাল হয় না। পাকে নাই অথচ পুষ্ট হইয়াছে এমন কলা লইয়া—কাঁচা কলায় যেমন খোসা ছাড়ায় তেমনি খোসা ছাড়াইয়া চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়। এই শুষ্ক কলার চাকাগুলি ঢেঁকিতে কুটিয়া অথবা যাঁতায় ভাঙ্গিয়া সাধারণতঃ গমের ময়দা বা চাউলের গুঁড়া যেমন করিয়া করে, সেই রকমে ময়দা প্রস্তুত করিলেই হইল। যত সরু চালনি দ্বারা ছাঁকিবে তত মিহি ময়দা হইবে।

ময়দাতে খোসা ভুষি মিশ্রিত থাকে কিন্তু পালো নিভাজ শ্বেতসার। এরারুট বা পানিফল বা শুলঞ্চ বা কোন বীজ প্রভৃতির পালো প্রস্তুত করিতে হইলে, উহাদিগকে কাঁচা অবস্থায় ঢেঁকি বা হামানদিস্তায় কুটিয়া লইতে হয়। পরে সে গুলিকে জলে ফেলিয়া চট্‌কাইলে শ্বেতসার জলের নীচে জমা হয় এবং ছিব্‌ড়াগুলি জল হইতে তুলিয়া ফেলিয়া ঐ জলটা স্থিরভাবে কয়েক ঘণ্টা রাখিয়া দিলে দেখা যায় যে, সমস্ত শ্বেতসার নীচে জমা হইয়াছে, তখন জল ফেলিয়া দিয়া উহা শুকাইয়া লইলে পালো প্রস্তুত হইল। কলার ময়দা এবং পালো উভয়ই হইতে পারে।

সার-সংগ্রহ

ধানের উফরা রোগ

সাবোর কৃষি-বিদ্যালয়ের কীটতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মিত্র লিখিত।

এই রোগটী প্রথমতঃ নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলাতেই দেখা যায় এবং ইহার স্থানীয় নাম 'উফরা' বা 'উপরা'। ত্রিশ বৎসর হইতে এই রোগের অস্তিত্ব জানা

গিয়াছে, বিশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ইহার সংক্রামণ অধিক হইয়াছে, দেশীয় লোকদিগের মতে গত ৬ ৭ বৎসর হইতেই ইহার প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে। বাট্‌লার সাহেব উফরা রোগ সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়া রোগের কারণ ও সম্প্রতি ইহার কতকটা প্রতিকার স্থির করিয়াছেন। উফরা আমন ও আউশ ধানেই দেখা গিয়াছে, বোরো ধানে ইহার আক্রমণ এখনও দৃষ্ট হয় নাই। এই রোগের দ্বারা শস্যের কতটা ক্ষতি হইয়াছে তাহা সঠিক জানা যায় নাই, তবে নোয়াখালি জেলায় সুধারাম, বেগমগঞ্জ, রামগঞ্জ ও লক্ষ্মীপুর থানায় অনিষ্ট খুবই বেশী হইয়াছে। ১৯১০ সালে কেবল বেগমগঞ্জ থানায় ২০০,০০০ মণ ধান নষ্ট হইয়াছে, চৌদ্দমানিতে প্রায় অর্দ্ধেক ফসল বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। বাট্‌লার সাহেব মনে করেন ক্ষতির পরিমাণ ইহা অপেক্ষাও অনেক বেশী।



ধানের উফরা রোগ

১—পাকা উফরার পরিণত অবস্থা, ডাঁটা সরু হইয়া গিয়াছে ও শীষের নিম্নাংশে রঙের বিকৃতি হইয়াছে। ২—এই স্থলে ডাঁটার ক্ষত স্পষ্ট নহে, শীষের নিম্নাংশে আক্রমণ হয় নাই। ৩—পাকা উফরার স্বভাব-পরিচায়ক লক্ষণ। ৪—থোড় উফরার আক্রমণ।

নোয়াখালিতে জুন মাসের শেষে যখন আউশ ধানে শীষ বাহির হইতে আরম্ভ হয়, তখনই এই রোগের প্রথম আক্রমণ দৃষ্টিগোচর হয়। প্রথমে ইহা ক্ষেতের এক

এক খণ্ডে মাত্র আবদ্ধ থাকে এবং প্রথম হইতেই ইহা সমস্ত ক্ষেতে ছড়াইয়া পড়ে না। যদিও যে খণ্ডে এই রোগ ধরে সে খণ্ডের সমস্ত ধানই নষ্ট হইতে পারে তথাপি আউশ ধানের সমগ্র অনিষ্টের পরিমাণ অধিক নহে; কারণ এই রোগ বহুবিস্তৃত হইবার পূর্ব্বেই আউশ ধান মাঠ হইতে উঠান হয়।

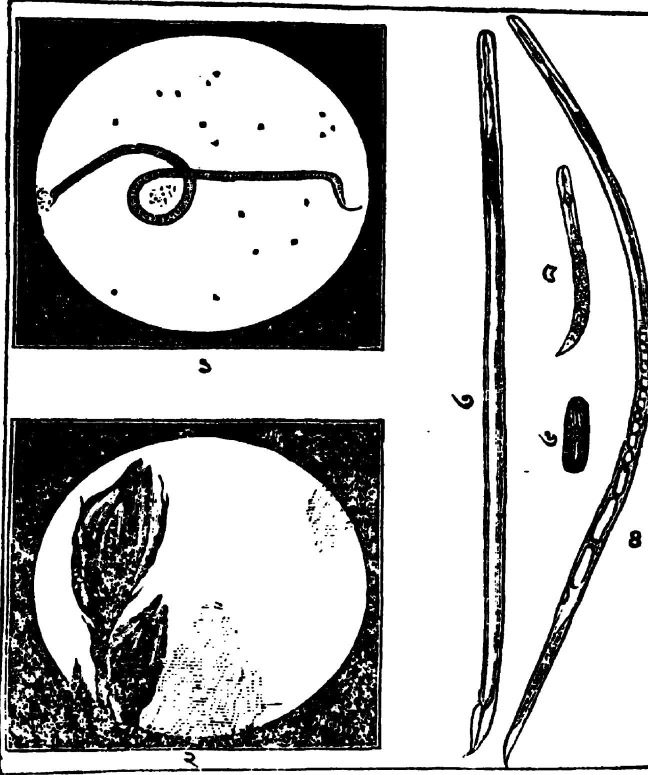
আগষ্ট মাসের প্রারম্ভেই, যখন আউশে উফরার আক্রমণ অত্যন্ত তীব্র, তখন আমন ধানের জীবনের অর্দ্ধকালও পূর্ণ হয় না এবং তখনও ইহাতে ইহার শীষ বাহির হইবার সময় হয় না। এই অবস্থাতেও আমন ধানে উফরা রোগের প্রথম লক্ষণগুলি পাওয়া গিয়াছে। জুন মাসের পূর্ব্বেই এই রোগের সূত্রপাত আউশে হওয়া সম্ভব, কিন্তু ইহার প্রথমাবস্থার লক্ষণগুলি পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাওয়া যায় নাই। ছিটান আমন ধান ও মিশ্রিত আমন ও আউশ ধান আগষ্ট মাসের শেষে কিম্বা সেপ্টেম্বরের প্রথমে এই ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে। সম্ভবতঃ আউশ ও আমন ধানের রোগপ্রবণতায় বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। কিন্তু রোগের কারণ-গুলি যত দিন যায় ততই ক্রমিক বহুগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে; তবে আউশ ধানের স্থিতি অল্পকাল বলিয়া উহার বড় বেশী ক্ষতি করিতে পারে না; আমন ফলিতে অনেক সময় লাগে, সুতরাং তাহার অনিষ্ট অধিক হয়। জুলাই মাসের শেষে কেবল ছিটান আমন ধানে এই রোগের প্রথম অবস্থা দেখা গিয়াছে; তখন দেশীয় লোকেরা ইহাকে 'পাতা' উফরা কহে। এই সময়ে সুস্থ ও আক্রান্ত গাছের বিশেষ কোন প্রভেদ দেখা যায় না, কেবল পাতার অগ্রভাগ শুকাইয়া আসে, কতকগুলি প্রশাখার উপরিভাগ মলিন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং পাতায় ও পত্রকোষে মধ্যে মধ্যে বাদামী রঙের দাগ দেখা যায়। কুঁড়ির ভিতরের পরদা কুঞ্চিত হইয়া পড়ে ও কখন কখন তাহার উপর অস্পষ্ট বাদামী রঙের দাগ থাকে। গাছের ডাঁটার নিম্নাংশের কিছুই পরিবর্ত্তন হয় না কিন্তু উপরের অংশে কতকগুলি বাদামী রঙের দাগ দেখা যায়।

মাঠ হইতে ফসল উঠাইবার এক মাস পূর্ব্বে উফরার শেষ লক্ষণগুলি দেখা যায়, তখন গাছ প্রায়ই বাড়ে না, বাহিরের পাতাগুলি কখন কখন শুকাইয়া যায়, আবার সময়ে সময়ে ইহাদের কোন পরিবর্ত্তন হয় না, পত্রকোষের উপর বাদামী রঙের দাগ থাকে ও ডাঁটার এক বা ততোধিক গাঁটের ঠিক উপরে এক প্রকার ক্ষত দেখা যায়; এই ক্ষতগুলি রোগ চিনাইয়া দেয় এবং প্রায়ই পাতাযুক্ত গাঁটের উপরে কিম্বা নীচে অর্দ্ধ ইঞ্চির ভিতরেই থাকে। ডাঁটার এই অংশের রঙ গাঢ় বাদামী কিম্বা কাল হয় এবং ইহা দুর্ব্বল ও কুঞ্চিত হইয়া যায় ও কখন কখন অত্যন্ত সরু হইয়া পড়ে। যে স্থলে রোগের আক্রমণ অপেক্ষাকৃত কম সেখানে রঙের বিকৃতি ডাঁটার কেবল এক দিকেই দেখা যায় কিন্তু ইহা সচরাচর চারি দিকেই বিস্তৃত

হইয়া থাকে। আবার কোন কোন স্থলে ডাঁটার অন্যান্য অংশেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগগুলি বর্ত্তমান থাকে, ফুলের ডাঁটার রঙও কখন কখন বদলাইয়া যায় এবং সময়ে সময়ে ইহা কুঞ্চিত হইয়াও পড়ে, শীষ উপরের পত্রকোষের মধ্যে আবদ্ধ থাকে কিম্বা উহার বাহিরেও আসিয়া পড়ে। শীষের এই প্রথম অবস্থার রোগকে চাষীরা 'থোড়' ও শেষোক্ত প্রকারকে 'পাকা' উফরা কহে। 'থোড়' উফরাতে ডাঁটার উপরের অংশ মাকুর ন্যায় ফুলিয়া উঠে, এবং উহার মধ্যেই ধানের শীষ সম্পূর্ণ ভাবে আবদ্ধ থাকে। এই স্ফীত অংশ ও পাতা সম্পূর্ণ শুষ্ক হইয়া যায়; কিন্তু রোগের প্রথম অবস্থাতে পত্রকোষের দুই ধার মাত্র শুকাইয়া যায়; কখনও নিম্নদিক হইতে, কখনও উপর দিক হইতে শুকাইতে আরম্ভ করে। পত্রকোষের মধ্য অংশ কিছুকাল সবুজই থাকে কিন্তু শীঘ্রই ইহাতে বাদামী রঙের দাগ দেখা যায়; এই সকল দাগ কখন কখন বিস্তৃত হইয়া পড়ে কিম্বা এক সঙ্গে ডাঁটার অনেকটা অংশ আবৃত করিয়া থাকে; প্রায়ই এই দাগগুলি পাতলা কিম্বা গাঢ় রঙের হয়; শেষ গাঁটের উপরে যেখানে পত্রকোষ ডাঁটার ক্ষত ঢাকিয়া থাকে তাহার নিম্নভাগে একই প্রকারের দাগ দৃষ্ট হয়। পত্রকোষের ভিতরের শীষে যে সকল ফুল থাকে তাহাতে প্রায়ই পরাগসঙ্গম হয় না ও ফলগুলি কুঞ্চিত হইয়া যায় এবং সমস্ত শীষে ছাতা পড়ে। 'পাকা' উফরাতে কোষ হইতে হয় সম্পূর্ণ শীষ কিম্বা উহার কিয়দংশ বাহিরে আসিয়া পড়ে। ফুলের ডাঁটাতে ইহার আক্রমণ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়; উপরের পত্রকোষ প্রায়ই বাদামী ও শুষ্ক হইয়া যায় ও ইহা শীষের উপরিভাগ আবদ্ধ করিয়া রাখে ও নীচের অংশ বিকৃত হইয়া পড়ে। বীজকোষের নীচের অংশে ফল প্রায়ই থাকে না এবং উপরের অংশ কখন কখন শূন্য থাকে, আবার সময়ে সময়ে ইহাতে পরিপক্ক বা অপরিপক্ক ফলও থাকে। আমন ধান অধিক দিনের ফসল বলিয়া ইহাকে এই রোগ দ্বারা গুরুতর ভাবে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়।

অনুসন্ধান দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, কীট (insect) কিম্বা কোনও জীবাণু (Bacteria) দ্বারা এই রোগের উৎপত্তি নহে। (Nematodo) বা (Eelworm) জাতীয় এক প্রকার পোকার (Worm) আক্রমণই এই রোগের কারণ। এই জাতীয় অনেক পোকা বৃক্ষ বা প্রাণীদেহের উপর থাকিয়া জীবন ধারণ করে। উফরা রোগ যে শ্রেণী হইতে উৎপন্ন তাহা (Tylenchus) জাতিভুক্ত। এবং ইহার নাম (Tylenchus Angustus)। এই পোকা গাছের পেশীর উপরই থাকে ও ইহা অত্যন্ত ক্ষুদ্র। রোগের প্রথম অবস্থাতে পাতার কুঁড়ির ভিতরের পর্দার মধ্যেই পোকাগুলিকে দেখিতে পাওয়া যায়। 'থোড়' উফরাতে ডাঁটার কুঞ্চিত, কাল অংশের শীষের নীচে পোকাগুলি একত্র সমবেত হইয়া থাকে; 'পাকা'

উফ্‌রাতেও ডাঁটার পূর্ব্বোক্ত অংশে ইহাদিগকে দেখা যায় কিন্তু শীষেই ইহারা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফলের বাহিরে থাকে। এক একটী পোকা অত্যন্ত ক্ষুদ্র, ১/২৫ ইঞ্চি লম্বা ও ১/১৫০০ ইঞ্চি চওড়া—শুধু-চোখে দেখা একেবারেই অসম্ভব; যখন এক স্থানে বহুসংখ্যক সমবেত হইয়া থাকে তখন শাদা সূত্রসমষ্টির ন্যায় দেখায়। ছোট, বড়, সকল রকম পোকা, ও তাহাদের ডিম, সব একসঙ্গে মিশ্রিত থাকে। পূর্ণবয়স্ক পোকার মুখে একটী ছোট কাঁটা থাকে, শুষিয়া খাইবার সময় ইহারা এই কাঁটা বাহির করে। প্রত্যেক স্ত্রী-পোকা ৫০ হইতে ১০০টী পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে। যদি ১০০টী ডিম ফুটিয়া ৫০টি পুরুষ ও ৫০টি স্ত্রীপোকা বাহির হয় তাহা হইলে তিনবার বংশ পর্য্যায়ে এক যোড়া পোকা হইতে ২৫০০০ পোকা উৎপন্ন হইবে—ইহা হইতেই এই পোকার বংশ বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা উপলব্ধি করা যাইতে পারে। এযাবৎ-কাল এই পোকা কেবল-মাত্র ধানেই পাওয়া গিয়াছে এবং ধানের যে অংশ মাটীর উপরে থাকে তাহাতেই দেখা গিয়াছে; শিকড়ে, মাটীতে বা জমির আগাছাতে ইহা দেখা যায় নাই। যে সকল গাছে এই রোগ ধরে শস্য উঠাইবার পর গাছের পরিত্যক্ত অংশে ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহা প্রমাণ হইয়াছে যে, শুষ্ক হইয়াও এই



ধানের উফরা পোকা

১—পরিণত বয়স্ক পুরুষ পোকা। (ফটোগ্রাফ হইতে)। ২—বহুসংখ্যক পোকার সমবেত অবস্থা। (ফটোগ্রাফ হইতে)। ৩—পুরুষ পোকা (শতাধিক গুণ বর্দ্ধিত)। ৪—স্ত্রী পোকা (শতাধিক গুণ বর্দ্ধিত)। ৫—অপরিণত পোকা (শতাধিক গুণ বর্দ্ধিত)। ৬—ডিম্বস্থিত ছোট পোকা (বহুগুণ বর্দ্ধিত)।

পোকা অনেক দিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে, এমন কি ১৫ মাস পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে। তবে জলে সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়া থাকিলে এই পোকা চারি মাসের অধিক কাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।

জুলাই হইতে নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত পোকাগুলি অধিক সজীবতা প্রাপ্ত হয় ও চারিদিকে নড়িয়া-চড়িয়া বেড়ায়। ডিসেম্বর মাসে তাহাদের নড়িয়া বেড়াইবার ক্ষমতা আর থাকে না ও তাহারা শীষের ভিতর ও শস্য উঠাইবার পর পরিত্যক্ত অংশের মধ্যে কুণ্ডলীকৃত হইয়া থাকে। বর্ষার আরম্ভে মাঠে যখন জল আসে তখন ইহারা পুনরায় কার্য্যতৎপর হয়। সজীব গাছ হইতেই ইহারা আহার গ্রহণ করে ও গাছের উপরেই ইহাদের বংশবৃদ্ধি হয়, ধান পাকিলে ইহারা নিদ্রিত হইয়া পড়ে। রোগের সংক্রামণের সময় পোকারা জলের উপরদিয়া এক গাছ হইতে অপর গাছে যায়, এমন কি জলের নীচে থাকিলেও জলের উপর উঠিয়া গাছের দিকে অগ্রসর হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে পোকার মুখে ছোট, সরু কাঁটা থাকে, ইহা বিদ্ধ করিয়া ইহারা গাছের রস টানিয়া লয়। এই সরু কাঁটা গাছের কঠিন অংশে প্রবেশ করাইতে পারে না, সেই জন্য গাছের কোমল স্থানেই এই রোগের আক্রমণ দেখা যায়; ডাঁটার প্রত্যেক গাঁটের ঠিক উপরের অংশ খুব কোমল ও সরু, সুতরাং এই স্থানেই উফরার আক্রমণ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

এই রোগনিবারক কোন সঠিক উপায় নির্দ্ধারণ বহু সময় ও পরীক্ষা সাপেক্ষ; তবে দুই প্রকার উপায়ে উহা নিবারণের চেষ্টা করা যাইতে পারে, প্রথমতঃ রোগ উৎপাদক পোকার বংশ খর্ব্ব করিবার চেষ্টা, দ্বিতীয়তঃ ধানগাছের এই রোগপ্রবণতা যাহাতে অল্প হয় তাহার উপায় স্থির করা। প্রথমেই মনে হইতে পারে যে গাছে কোনও বিষাক্ত পদার্থ মিশ্রিত করিয়া দিলে পোকার বংশ খর্ব্ব করিতে পারা যায়, কিন্তু ইহা একেবারেই অসম্ভব, কারণ পোকাগুলি গাছের কুঁড়ির অভ্যন্তরেই থাকে, উক্ত বিষাক্ত পদার্থ উহাদের সংস্পর্শে আসিতে পায় না।

ধান উঠাইয়া লইবার পর মাঠে পরিত্যক্ত অংশগুলি জ্বালাইয়া দিলে পোকা বিনষ্ট হইতে পারে; রোগাক্রান্ত বীজ পর বৎসর বপন করা উচিত নহে, কারণ যে সকল গাছে 'পোকা' উফরা ধরে সেই-সকল গাছের বীজে পোকা থাকে, এই সময়ে ইহারা জীবিত থাকে কি না তাহা জানা যায় নাই। যদি এই রোগ বীজ হইতে আসিত তাহা হইলে এই ব্যাধির ব্যাপ্তি আরও বেশী হইত, কারণ বীজ বিনিময় সর্ব্বত্রই অতি অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে; যদি মাটী হইতে এই রোগ বিস্তৃত হইত তাহা হইলে যে সকল জমিতে ধান নাড়িয়া রোপণ করা হইয়াছে সে সকল জমি নিশ্চয়ই পূর্ব্বে আক্রান্ত হইয়া পড়িত, কেননা শীতের শেষে নীচু জমি হইতে মাটী কাটিয়া পাটের জমিতে দেওয়া হয় ও ইহা হইতে হৈমন্তিক

ধানের দ্বিতীয় ফসলও লওয়া হয়। আক্রান্ত গাছের সহিত সুস্থ গাছ রাখিয়া দেখা গিয়াছে যে এই পোকা আসিলেই গাছ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং ইহাও সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে বীজ-জমি হইতে গাছ উঠাইয়া রোপণ করিবার সময় এই রোগ বর্ত্তমান থাকে না।

গাছের পরিত্যক্ত অংশ পুড়াইয়া ফেলিলে খুব উপকার হয় এবং ইহা কৃষি-কার্য্যের একটী অতি প্রয়োজনীয় কার্য্য বলিয়া মনে করা উচিত। ধান উঠাইবার পর জমিতে লাঙ্গল দিলে গাছের গোড়া মাটীর সহিত মিশিয়া অতি শীঘ্র পচিয়া যায় এবং পোকাও মরিয়া যাইতে পারে, কেননা ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ভিজা জমিতে এই পোকা বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। যে সকল জমি খুব শুষ্ক ও শক্ত হইয়া যায়, এক পশলা বৃষ্টির পর তাহা খুবই নরম হইয়া পড়ে, তখন ইহার উপর লাঙ্গল দেওয়া সহজ হইয়া উঠে। রোগ নিবারণের জন্য গাছের সুস্থতার দিকেও মনোযোগ রাখা বিশেষ দরকার। দেখা গিয়াছে যে বীজ-জমি প্রস্তুত করিয়া যে সকল ধান রোপণ করা হয় তাহাতে উফরার আক্রমণ হয় না, সুতরাং যাহাতে বীজ-জমি প্রস্তুত করিয়া ধান রোপণ করিবার প্রণালী বৃদ্ধি হয় তাহার চেষ্টা করা অতি আবশ্যক। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষিবিভাগের উপদেশানুসারে এই রোগ নিবারণের জন্য জমিতে চূণ ছিটান হইয়াছিল, ইহাতে রোগের আক্রমণ বিলম্বে হইয়াছিল বটে কিন্তু ফসল রক্ষা পায় নাই, অধিকন্তু ইহাতে ব্যয় অধিক পড়ে।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, যে সকল ধান-জমির মৃত্তিকায় বায়ুর চলাচল বহুদিন ধরিয়া বাধা পায় সেই সকল জমিতেই উফরা রোগ দেখা দিবার বেশী সম্ভাবনা। যাহাতে জমি হইতে অত্যধিক জল স্বাভাবিক উপায়ে বাহির হইয়া যায় তাহার দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

উপস্থিত রোগনিবারক যে সকল উপায় আলোচনা করা হইল তাহা এখনও পরীক্ষা সাপেক্ষ। এই রোগের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ইহার প্রতিকারের জন্য বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান বৎসরে রোগনিবারক পরীক্ষার জন্য এগার হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।—(প্রবাসী)

বাগানের মাসিক কার্য্য

বৈশাখ মাস

সব্জীবাগান।—মাখন সীম্, বরবটি, লবিয়া প্রভৃতি বীজ এই সময় বপন করা উচিত। টেঁপারি কেহ কেহ ইতি পূর্ব্বেই বপন করিয়াছেন, কিন্তু টেঁপারি বীজ বসাইবার এখন সময় হয় নাই। শসা, বিলাতি কুমড়া, লাউ, স্কোয়াস বা বিলাতী কদু, পালা ঝিঙ্গা, পুঁই, ডেঙ্গো, নটে প্রভৃতি শাক বীজ এখনও বপন করা চলে। কিন্তু বৈশাখের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ঐ সমস্ত বীজবপন কার্য্য শেষ করিতে পারিলে ভাল হয়। ভুট্টা, ধুন্দুল, চিচিঙ্গা বীজ বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত বসাইতে পারা যায়। আশু বেগুনের চারা তৈয়ারি হইয়া গিয়াছে। বৈশাখ মাসে ২।১ দিন একটু ভারি বৃষ্টি হইলে উহাদিগকে বীজ-ক্ষেত্র হইতে উঠাইয়া রোপণ করিতে হয়।

কৃষিক্ষেত্র।—বৈশাখ মাসের শেষ ভাগে আশুধান্য, ধনিচা, অরহর, পাট প্রভৃতি বীজ বপন করিতে হয়। গবাদি পশুর খাদ্যের জন্যও এই সময় রিয়ানা ও গিনি ঘাস প্রভৃতি ঘাসবীজ বপন করিতে হইবে। কিন্তু বলা বাহুল্য বৃষ্টি হইয়া জমিতে "যো" হইলে তবেই ঐ সমস্ত আবাদ চলিতে পারে। ভুট্টা, জোয়ার প্রভৃতি বীজ বৈশাখের প্রথমেই বপন করা উচিত। যদি উক্ত কার্য্য শেষ না হইয়া থাকে, তবে বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত বপন করা চলিতে পারে।

কিঞ্চিৎ অধিক বারি পতন হইলেই চৈত্রের শেষে বা বৈশাখের প্রথমেই উহাদের বীজ বপন করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে বৈশাখের শেষ ভাগে গাছগুলি তৈয়ার হইয়া তাহাদের গোড়ায় মাটি দিবার উপযুক্ত হইয়া উঠে। চৈত্র মাসের মধ্যেই বীজ-ইক্ষু বা আখের টাঁক বসাইবার কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। ইক্ষুক্ষেত্রে বৈশাখ মাসে মধ্যে মধ্যে আবশ্যক মত জল সেচন করিতে হইবে। দুই শ্রেণী আখের মধ্যস্থল হইতে মাটি উঠাইয়া আখের গোড়ায় দিয়া গোড়া বাঁধিয়া দিতে হইবে।

ইক্ষুক্ষেতে ও শসাক্ষেতে জলের আবশ্যক হইলে সেচ দিতে হইবে। চুবড়ী আলু ও ওল এই সময়ে বা জ্যৈষ্ঠের প্রথমেই বসাইতে পারিলে ভাল হয়। কলা, বাঁশ ও তুঁত গাছের গোড়ায় পাঁক মাটি এই সময় দিতে হয়।

ফুল বাগান।—বৈশাখ মাসে কৃষ্ণকলি, আমারান্থাস্, দোপাটী, গ্লোব আমারান্থাস্ সনফ্লাওয়ার বা রাধাপদ্ম, লজ্জাবতী, মার্টিনিয়াডায়াণ্ড্রা, মেরিগোল্ড, সূর্য্যমুখী, জিনিয়া, ধুতুরা প্রভৃতি দেশী মরসুমী ফুলবীজ বপন করিতে হয়। বেল ও যুঁইফুলের ক্ষেতে এখন জল সিঞ্চনের সুব্যবস্থা চাই। উপযুক্ত পরিমাণে জল পাইলে অপরিব্যাপ্ত ফুল ফুটিবে।

ফলের বাগান।—আম, লিচু, কাঁঠাল, জাম প্রভৃতি গাছে আবশ্যক মত জল সেচন ও তাহাদের ফল রক্ষণাবেক্ষণ ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ কাজ নাই। আনারস গাছগুলির গোড়ায় এই সময় মাটি দিয়া তাহাতে জল দিতে পারিলে শীঘ্র ফল ধরে ও যত্ন পাইলে ফলগুলি বড় হয়।

আদা, হলুদ, আর্টিচোক যদি ইতিপূর্ব্বে বসাইয়া দেওয়া না হইয়া থাকে তবে সেগুলি বসাইতে আর কালবিলম্ব করা উচিত নহে।